সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

প্রিয়তমা

লেখক সম্পর্কে

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর-এর পাঠাগ্রহ মূলত ইতিহাস। ইতিহাসের রাজপথ যেমন, তেমনি অসংখ্য গলি-ঘুঁপচি চষে বেড়াতে ভালোবাসেন। তুলে আনতে চেষ্টা করেন ইতিহাসের আড়ালে চাপা পড়ে যাওয়া অন্য অনেক ইতিহাসকে। আন্তর্জাতিক ধর্মদর্শন, লৌকিক-অলৌকিক ধর্ম এবং ধর্মতত্ত্ব বিষয়েও তাঁর আগ্রহ প্রবল। ঐশ্বরিক যে কোনো জ্ঞান এবং মানবিক বিজ্ঞান তাঁকে আলোড়িত করে। পাঠাগ্রহের কারণেই তিনি লিখেন মূলত ইতিহাস এবং ধর্মদর্শনের মিশেলে। প্রথাগত ধর্মীয় আবহের বাইরে গিয়ে নির্মাণ করার চেষ্টা করছেন নতুন এক ভাষাভঙ্গি। সাবলীল, প্রাঞ্জল আর সাহসী গদ্য দিয়ে তিনি আমাদের চেনা চিত্রকে দৃশ্যমান করেন নতুন এক উপাখ্যানের আদলে। এটাই তাঁর বিশেষত্ব।

জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ থেকে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) এবং দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্স শেষ করে কর্মজীবনে সাংবাদিকতা এবং সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বেশ কিছুদিন। বর্তমানে মুক্ত পৃথিবীর মানুষ হিসেবে একমাত্র কাজ-লেখালেখি। যা তিনি করতে ভালোবাসেন।

বই সম্পর্কে

প্রিয়তমা–বাংলাভাষী মানুষের সামনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও উম্মুল মুমিনিনদের দাম্পত্যজীবনকে সগৌরবে তুলে ধরার ঐকান্তিক প্রয়াস। মুসলিম নারীদের জন্য উম্মুল মুমিনিনদের জীবন এবং তাঁদের জীবনের গল্পের চেয়ে শিক্ষণীয় আর কিছু হতে পারে না। চেষ্টা করা হয়েছে, অতিকথন আর ভাষার বাহুল্য মুক্ত হয়ে এই অতুল্য মানুষদের জীবনের অসামান্য প্রেমকে সাবলীল বাংলায় তুলে আনতে। রাসুলের সাহচর্যে এতো প্রেমময় আর ভালোবাসায় পূর্ণ ছিল তাঁদের সংসার, কখনো সে সাংসারিক প্রেম আগ্রহভরে পাঠ করা হয়নি আমাদের। অথচ তাঁদের জীবনে রয়েছে প্রেম আর ভালোবাসায় পূর্ণ এক সংসারের ছায়াছবি। তাঁদের দাম্পত্যজীবনের অসংখ্য অনুপম শিক্ষা সমগ্র পৃথিবীর জন্য শিক্ষণীয়। অনাগত সকল সভ্যতার জন্য তাঁদের সাংসারিক প্রেম নক্ষত্রের মতো জাজ্বল্যমান। যে গ্রহণ করবে, আলোকিত হবে তার জীবন। এ গ্রন্থ সেই সুখী আর প্রেমময় জীবনের গল্পই বলেছে।

প্রচ্ছদ সূচীশৈলী : রাবেয়া আফরোজা

নবপ্রকাশ

শুধু বই নয়...

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয়তমা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রিয়তমা

[উম্মুল মুমিনিনদের প্রেমময় জীবনের গল্পভাষ্য]

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

নবপ্রকাশ
শুধু বই নয়...
ইসলামী টাওয়ার, দোকান : ২০
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭৪ ৮৮৮ ৪৪১

www.pathagar.com

প্রিয়তমা
সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

প্রকাশক : নবপ্রকাশ
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৭
প্রথম সংস্করণ ও চতুর্থ প্রকাশ : মার্চ ২০১৮
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ সূচিশৈলী : রাবেয়া আফরোজা

নবপ্রকাশ
ইসলামী টাওয়ার, দোকান : ২০
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৯৭৪ ৮৮৮৪৪১, ০১৯১৩৫০৮৭৪৩

মূল্য: ৫২০ (পাঁচ শ বিশ) টাকা মাত্র
Price: BDT 520.00 | US $ 18.00

PRIYOTOMA
by Salahuddin Jahangir

noboprokash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash
E-store: rokomari.com/noboprokash

ISBN: 978-984-92655-9-7

www.pathagar.com

উৎসর্গ

রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর
সকল প্রিয়তমা

এবং
আমার প্রিয়তমা রাবেয়া আফরোজাকে

www.pathagar.com

ভূমিকা

শুরুতে যে কথাটি বলতে চাই, *প্রিয়তমা* রাসুলপত্নীদের জীবনীগ্রন্থ নয়; বরং তাঁদের জীবনের সুরম্য গল্পভাষ্য। জীবনের গল্পগুলো জীবনীর মতো নয়, বাঙময় হয়েছে গল্পের আদলে। জীবনের গল্প বলতে গিয়ে ওঠে এসেছে তাঁদের সঙ্গে রাসুলের দাম্পত্য ভালোবাসা, সাংসারিক প্রেম, পারস্পরিক সৌহার্দ্য, জীবনযুদ্ধে লড়ে যাওয়ার সঞ্জিবনী, নারী অধিকার, নারীশিক্ষাসহ আরও অনেক অজানা কাহিনিকাব্য।

গল্পভাষ্য বলে এ কথা বলার অবকাশ নেই যে, এ গ্রন্থে হাদিস বা সিরাতকে বাহুল্যাকারে পরিবেশন করা হয়েছে। মূলত এ গ্রন্থে শুধু ভাষাকে গল্পের রঙে রাঙানো হয়েছে, হাদিস বা সিরাতের মূলপাঠে রঙের বাহুল্য চড়ানো হয়নি। প্রতিটি ঘটনা, ইতিহাস ও তথ্য নির্মোহভাবে হাদিস ও সিরাতগ্রন্থের আলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ কারণে বিতর্কিত বা কিছুটা অনুসন্ধানী আলোচনার দাবি রাখে, এমন বিষয় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

যদিও বলা হয়েছে *প্রিয়তমা* রাসুলপত্নীদের জীবনের গল্পভাষ্য, কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে এ অভিধা শতভাগ সম্পূর্ণ নয়। কেননা ব্যবহারিক ভাষা গল্পের মতো করা হলেও ইতিহাসের আবেদনকে একেবারে অস্বীকার করা হয়নি। কিছুটা ইতিহাস বলার ঢং গল্প বলার স্রোতের আড়ালে রাখতে হয়েছে, যাতে করে এ গ্রন্থকে কেবল গল্পগ্রন্থ মনে করে পাঠক আশাহত না হন।

প্রিয়তমার পাঠের মধ্যে কোনো টীকা বা সূত্র ব্যবহার করা হয়নি। আগেই উল্লেখ করেছি, এটি কোনো ইতিহাস বা সিরাতগ্রন্থ নয়; রাসুল ও তাঁর স্ত্রীদের গল্পময় দাম্পত্যজীবনের বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটা উৎকীর্ণ করার প্রাণান্ত চেষ্টা মাত্র। এ কারণে সচেতনভাবে টীকা-সূত্র এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। সূত্র উল্লেখ করা হলে প্রতি অনুচ্ছেদে একাধিক টীকা ব্যবহারের প্রয়োজন হতো, যা

www.pathagar.com

গ্রন্থপাঠে বিঘ্ন সৃষ্টি করা স্বাভাবিক। যেহেতু গল্পভাষ্য, এ কারণে মূলপাঠে টীকা ব্যবহার না করে গ্রন্থের শেষে স্বতন্ত্র গ্রন্থপঞ্জি উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রিয়তমা লিখতে গিয়ে একটা সময় মনে হলো, উম্মুল মুমিনিনদের নিয়ে কিছু বিতর্কিত বিষয়, আলোচনাসাপেক্ষ ঘটনা, অমীমাংসিত তর্ক বিষয়ে একটি দীর্ঘ পরিশিষ্ট লেখা প্রয়োজন। যেমন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কেন ১১টি বিয়ে করেছিলেন? কেন আয়েশার মতো সদ্যকিশোরীকে বউ হিসেবে গ্রহণ করলেন? বিয়ের সময় আয়েশার বয়স কত ছিল? কেন এক ইহুদিকন্যাকে উম্মুল মুমিনিন হিসেবে সম্মানিত করলেন? এমন আরও নানা তর্কিত বিষয় প্রাচ্যবিদ এবং পাশ্চাত্যপ্রেমীদের কাছে প্রচলিত রয়েছে। সেসব বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী পরিশিষ্ট লেখার ইচ্ছা হয়েছিল মাঝে।

কিন্তু গ্রন্থ রচনা যখন শেষের দিকে তখন ভাবলাম, উম্মুল মুমিনিনদের জীবনের বিতর্কিত বা অমীমাংসিত বিষয় নিয়ে আলাদা পরিশিষ্ট লেখার কী দরকার? আমি তাঁদের জীবনের যে গল্পভাষ্য লিখেছি, সেটা পাঠ করলে এ প্রশ্নগুলোর জবাব বইয়ের প্রেমময় উপাখ্যানেই সমাধান হয়ে যাবে। আলাদা কোনো পরিশিষ্ট রচনার প্রয়োজন হবে না। পাঠকমাত্র বুঝতে পারবেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কেন ১১টি বিয়ে করেছিলেন, কিংবা কিশোরী আয়েশাকে বিয়ে করাটা সত্যিই 'মহা অন্যায়' হয়েছিল কী-না! রাসুলপত্নীদের নিয়ে অযাচিত সকল দোলাচলের অবসান ঘটবে গ্রন্থপাঠে।

দুই

প্রিয়তমা রচনার অন্যতম কারণ–বাংলাভাষী মানুষের সামনে রাসুল ও তাঁর স্ত্রীদের দাম্পত্যজীবনকে সগৌরবে তুলে ধরা। কতোটা পেরেছি জানি না, তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি–মুসলিম নারীদের জন্য উম্মুল মুমিনিনদের জীবন ও জীবনের গল্পের চেয়ে শিক্ষণীয় আর কিছু হতে পারে না। এতো প্রেমময় আর ভালোবাসায় পূর্ণ ছিল তাদের সংসার, আমরা কখনো সে সাংসারিক প্রেম আগ্রহভরে পাঠ করে দেখিনি।

আমাদের লৌকিক সমাজের প্রায় প্রতিটি পরিবারে আজকাল শোনা যায় স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ, মানসিক টানাপোড়েন, পরস্পরের বিশ্বাসহীনতা, সংসার ভাঙার করুণ সুর। দাম্পত্য কলহের বিষবাষ্প যেন ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে আমাদের চারপাশের সমাজ। কিন্তু আমরা নিজেদের কি কখনো রাসুল ও তাঁর স্ত্রীদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছি? কখনো কি তাঁদের সংসারের আদলে আমাদের সাংসারিক সমস্যাগুলো মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছি? হয়তো

www.pathagar.com

কখনো করা হয়নি। অথচ তাঁদের জীবনে রয়েছে প্রেম আর ভালোবাসায় পূর্ণ এক সংসারের ছায়াছবি। তাঁদের দাম্পত্যজীবনের অসংখ্য অনুপম শিক্ষা সমগ্র পৃথিবীর জন্য শিক্ষণীয়। অনাগত সকল সভ্যতার জন্য তাঁদের সাংসারিক প্রেম নক্ষত্রের মতো জাজ্বল্যমান। যে গ্রহণ করবে, তার জীবন আলোকিত হবে।

এ গ্রন্থ সেই সুখী আর প্রেমময় জীবনের গল্পই বলেছে।

সবার পাঠোদ্দীপনা কামনা করছি। আল্লাহ হাফেজ!

–সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

www.pathagar.com

সূচিপত্র

উম্মুল মুমিনিন
খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ অধ্যায় ১৩

উম্মুল মুমিনিন
সাওদা বিনতে জামআ অধ্যায় ৯১

উম্মুল মুমিনিন
আয়েশা বিনতে আবু বকর অধ্যায় ১০৩

উম্মুল মুমিনিন
হাফসা বিনতে উমর অধ্যায় ২৩৫

উম্মুল মুমিনিন
জয়নব বিনতে খোজায়মা অধ্যায় ২৪৭

উম্মুল মুমিনিন
উম্মে সালামা বিনতে উমাইয়া অধ্যায় ২৫১

উম্মুল মুমিনিন
জয়নব বিনতে জাহাশ অধ্যায় ২৭৭

উম্মুল মুমিনিন
জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস অধ্যায় ২৮৯

উম্মুল মুমিনিন
উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান অধ্যায় ২৯৯

উম্মুল মুমিনিন
সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই অধ্যায় ৩১৩

উম্মুল মুমিনিন
মায়মুনা বিনতে হারিস অধ্যায় ৩২৯

উম্মুল মুমিনিন
মারিয়া কিবতিয়া অধ্যায় ৩৩৭

উম্মুল মুমিনিন
রায়হানা বিনতে জায়েদ অধ্যায় ৩৪৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রিয়তমা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উম্মুল মুমিনিন
খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ অধ্যায়
রাদিয়াল্লাহু আনহা

এক

আবদুল্লাহ তাঁর পিতা আবদুল মুত্তালিবের পেছনে পেছনে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ আগে মক্কার মানুষ পিতা-পুত্রের ভালোবাসার এক অভূতপূর্ব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। এমন ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে সচরাচর ঘটে না। পুরো মক্কা স্তব্ধ হয়ে ছিল কিছু সময়ের জন্য।

মক্কার পবিত্র স্থান কাবাঘরের পাশে ঘটছিল এ ঘটনা। কাবাচত্বরে পৌত্তলিকদের স্থাপিত হোবল দেবতার সামনেই।

মক্কার কুরাইশ গোত্রীয় নেতা আবদুল মুত্তালিব একের পর এক জবাই করছিলেন নিজের পালের উট। গুনে গুনে ১০০। কাবার আশপাশটা উটের রক্তে লাল হয়ে গেল। চারপাশে জমায়েত লোকজন আবদুল মুত্তালিবের এমন প্রতিজ্ঞারক্ষার ত্যাগ দেখে অবাক না হয়ে পারল না–১০০ উট কুরবানি করে দিলেন নির্দ্বিধায়?

না, তবু থামলেন না আবদুল মুত্তালিব। তিনি আরও ৩০টি উট আনলেন। হোবল দেবতার হাতে রাখা ভাগ্যনির্বাচনের তির উত্তোলন করলেন আবার। তিনবারই পুত্র আবদুল্লাহর নাম বাদ দিয়ে উটের নাম নির্বাচিত হলো। প্রতিবার তির উত্তোলনের বিনিময়ে ১০টি করে উট কুরবানি করে দিলেন। একে একে ৩০টি। গুনে গুনে সর্বমোট ১৩০টি! এরপর পুত্র আবদুল্লাহর হাত ধরে তাঁকে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন।

আবদুল মুত্তালিব। কুরাইশ গোত্রের এ অবিসংবাদিত নেতা কিছুদিন আগে এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করে পুরো মক্কা তো বটেই, পুরো আরবের সম্মান আদায় করে নিয়েছেন। স্বপ্নে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে তিনি নতুন করে খনন করেন

www.pathagar.com

জমজম কূপ। নবি ইসমাইল আলায়হিস সালামের পদাঘাতে প্রায় তিন হাজার বছর আগে যে কূপের ধারা প্রবাহিত হয়েছিল কাবার প্রান্তরে, কালের বিবর্তনে সে কূপ একসময় লুপ্ত হয়ে যায় মরুর বালিয়াড়ির নিচে। স্বপ্নে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে তিনি নির্দিষ্ট স্থান খনন করে আবার সে কূপ মানুষের জন্য উন্মোচন করে দেন। জমজম কূপের সুমিষ্ট সুপেয় পানি পেয়ে মক্কার মানুষজন আবদুল মুত্তালিবের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। এ ঘটনার পর পুরো মক্কা অঞ্চলে তিনি অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বরিত হন।

কিন্তু কূপ খননের এ কর্মযজ্ঞ সমাধা করা খুব একটা সহজ ছিল না তাঁর জন্য। কূপ খননকালে নানা বাধার সম্মুখীন হন তিনি। মক্কা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কয়েকজন গোত্রপতি দাবি করেন–যেহেতু কাবাঘরের মালিকানায় তাঁরাও সমান হকদার, সুতরাং এ কূপের মালিকানায় তাঁদেরও অংশীদার করতে হবে। আবদুল মুত্তালিব স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তিনি স্বপ্নাদিষ্ট এ কূপের মালিকানায় কাউকে অংশীদার করবেন না। তিনি নিজে স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছেন বিধায় এর মালিকানা এককভাবে তাঁর নিজস্ব।

এ নিয়ে উভয় পক্ষে বিবাদ ঘনিয়ে ওঠে। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয়–কূপের মালিকানা কারও একক হাতে থাকবে না, কাবা শরিফের নামে উৎসর্গিত হবে এ জমজম। প্রতিবছর উপাসনালাভে ধন্য হতে আসে যে তীর্থযাত্রীরা, তাদের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য অর্পিত হবে এ জলাধার এবং কূপের পানি অবমুক্ত করে দেওয়া হবে সর্বসাধারণের জন্য। এ সিদ্ধান্তে শান্তি ফিরে আসে মক্কায়।

সব বাধা-বিপত্তি দূরে ঠেলে যখন বালিয়াড়ির নিচ থেকে উৎসারিত হয় প্রভুর প্রেরিত জমজম অন্তঃসলিলা, আবদুল মুত্তালিব প্রভুর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রতিজ্ঞা করেন–তাঁর ছেলেরা যখন সবাই পূর্ণবয়স্ক হবেন, তাঁদের একজনকে তিনি জমজমপ্রাপ্তির কৃতজ্ঞতায় আল্লাহর উদ্দেশে কুরবানি করে দেবেন। তাঁর এ প্রতিজ্ঞার কারণ ছিল, আদি পিতা ইবরাহিম আলায়হিস সালাম যেমন তাঁর প্রিয়তম পুত্র ইসমাইলকে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য কুরবানি করে দিয়েছিলেন, তিনিও তাঁর প্রিয় কোনো এক পুত্রকে আল্লাহর জন্য কুরবানি করে দেবেন।

জমজম পুনঃখননের পর কেটে গেছে অনেক বছর। আবদুল মুত্তালিব প্রৌঢ় থেকে বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞারক্ষার কথা ভুলে যাননি। তাঁর ছেলেরা সবাই যখন পূর্ণবয়স্ক, তখন সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে সপ্তাহ কয়েক আগে তিনি সর্বকনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহকে কুরবানি দেওয়ার উদ্দেশে হোবল দেবতার সামনে নিয়ে আসেন। কিন্তু তাঁর এ কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়

www.pathagar.com

অন্য ছেলেরা। তাঁর ১০ ছেলের সবাই তাঁকে নিবৃত্ত করেন এ কাজ থেকে। বিশেষত আবু তালিব, আব্বাস ও হামজা পিতাকে এমন প্রতিজ্ঞা পূরণ করার পরিবর্তে বিকল্প কোনো পদ্ধতি খোঁজার পরামর্শ দেন। নিজেদের চোখের সামনে তাঁরা তাঁদের প্রিয়তম ভাইকে বলি হতে দিতে পারেন না।

পুত্রদের বাধার কারণে আবদুল মুত্তালিব মক্কার গুণীজনদের কাছে এ সমস্যার আশু সমাধানে পরামর্শ কামনা করেন। তাঁরা তাঁকে মদিনায় এক নারী গুনিনের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি নক্ষত্রবিচার ও মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে এ সমস্যার একটা সমাধান দিতে পারবেন। অগত্যা তাঁদের কথামতো আবদুল মুত্তালিব পুত্র আবদুল্লাহ এবং গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে মদিনায় যান। সেখানে সাজাহ নামের নারী গুনিনের কাছে তাঁর মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করেন।

সাজাহ নামের এই নারী জ্যোতিষী পরামর্শ দেন–আবদুল্লাহকে বলি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আবদুল্লাহর পরিবর্তে ১০টি উট নেবে। ১০টি উট এবং আবদুল্লাহর নাম আলাদা আলাদা তিরের মাথায় লিখে তা হোবল দেবতার হাতে স্থাপিত ভাগ্যনির্বাচন পাত্রে রাখতে হবে। সেখান থেকে একটি তির উঠাবে, যদি তিরের মাথায় আবদুল্লাহর নাম উঠে তবে তাঁর পরিবর্তে সেই ১০টি উট কুরবানি করে দিতে হবে এবং আবার আরও ১০টি উট নিয়ে ভাগ্য নির্বাচন করতে হবে। যদি আবার আবদুল্লাহর নাম উঠে তবে আবার অনুরূপ ১০টি উট ও আবদুল্লাহর নাম লিখে ভাগ্যনির্বাচন করতে হবে। আর যদি আবদুল্লাহর নাম না উঠে ১০টি উট থেকে কোনো একটি উটের নাম উঠে, তবে সেই ১০টি উট কুরবানি করে দিলেই প্রতিজ্ঞা পূরণ হয়ে যাবে। আর কোনো উট কুরবানি করার প্রয়োজন নেই।

আবদুল মুত্তালিব মক্কায় এসে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণে ১০টি উট নিয়ে আবদুল্লাহর ভাগ্যগণনায় নেমে পড়লেন। প্রথমবার আবদুল্লাহর নাম ওঠল। গুনিনের নির্দেশনা অনুযায়ী আবদুল্লাহর পরিবর্তে ১০টি উট কুরবানি দেওয়া হলো। দ্বিতীয়বারও আবদুল্লাহর নাম নির্বাচিত হলো। আবার দশ উট কুরবানি দেওয়া হলো। তৃতীয়বারও আবদুল্লাহর নাম ওঠল। এভাবে দশমবার গিয়ে উটের নাম ওঠল। অর্থাৎ ততক্ষণে ১০০ উট কুরবানি করা হয়ে গেছে।

কিন্তু এতে আশ্বস্ত হলো না আবদুল মুত্তালিবের অন্তর। তিনি আরও ৩০টি উট আনলেন এবং আরও তিনবার আবদুল্লাহর ভাগ্যগণনা করলেন। এবার প্রতিবারই আবদুল্লাহর পরিবর্তে উটের নাম নির্বাচিত হলো। এভাবেই আবদুল্লাহর জীবনের বিনিময়ে কুরবানি করা হলো ১৩০টি উট। এ ঘটনার পর আবদুল্লাহর নাম হয়ে গেল 'জবিহুল্লাহ'–আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত।

www.pathagar.com

কুরবানির এ ঘটনার কিছুক্ষণ পর যখন আবদুল্লাহকে নিয়ে তাঁর পিতা আবদুল মুত্তালিব কাবা চত্বর থেকে বেরোতে যাবেন, ঠিক তখন এক নারীকে দেখা গেল চত্বরের পাশে।

আরবীয় এ নারী যথেষ্ট সুন্দরী। বেশভূষায় অভিজাত। মাথার ওপর সবুজরঙা কাপড়ের ঘোমটা টানা। ঘোমটার নিচে তাঁর ফরসা চেহারা ফুটে আছে মরু নার্গিসের মতো।

এতক্ষণ ধরে তিনি আবদুল্লাহ আর উটের ভাগ্যপরীক্ষার এ জাগযজ্ঞ দেখছিলেন। সবাই উট জবাইয়ের মহাযজ্ঞের দিকে তাকিয়ে থাকলেও তিনি একদৃষ্টিতে দেখছিলেন আবদুল্লাহকে। দেখছিলেন আর নিজের মনের অবয়বের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিলেন সন্তর্পণে। এই কি সেই? এই কি সেই যুবক, যাঁর ব্যাপারে তাঁর ভাই ওয়ারাকা বহুদিন থেকে অপেক্ষা করে আছেন? ওয়ারাকার দেওয়া বর্ণনা হুবহু মিলে যায় এ যুবকের সঙ্গে। সেই বংশধারা–হাশেমি। সেই উন্নত চরিত্রের অধিকারী–নিষ্কলুষ।

নাকি এ যুবক প্রতীক্ষিত ব্যক্তির পূর্ববর্তী বংশধারার কেউ? হয়তো-বা তা-ই হবে। হোক, সে প্রতীক্ষিত ব্যক্তি না হোক, তাঁর পূর্ববর্তী বংশধারার কেউ হলেও তাঁর মনে কোনো দ্বিধা নেই। সেই প্রতীক্ষিত ব্যক্তির মা হতে পারলেও তাঁর সাত জনমের সাধ পূর্ণ হবে। তাঁর গর্ভ থেকে পূর্ণতা পাবে অনাগত পৃথিবী।

কুরবানির এ মহাযজ্ঞ শেষ হলো একসময়। কাবাঘরের চারপাশে পড়ে রইল ১৩০টি জবাইকৃত উট। আবদুল মুত্তালিব মক্কাবাসীর জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিলেন সমস্ত উট। যে যেভাবে ইচ্ছা খেতে পারে এ উটের মাংস, কোনো বাধা নেই।

আবদুল্লাহকে পিতার পেছনে পেছনে যেতে দেখে আরবীয় নারীটি ডাক দিলেন তাঁর নাম ধরে, 'আবদুল্লাহ, শুনে যাও! কোথায় যাচ্ছ?'

পিতার পেছন থেকে থমকে দাঁড়ালেন আবদুল্লাহ। নারীটির দিকে ফিরে তাকালেন তিনি। এ যে ফাতেমা, উম্মে কিতাল নামেই সবাই চেনে তাঁকে। মক্কার পণ্ডিতব্যক্তি ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের বোন। তিনি তাঁকে এভাবে ডাকছেন কেন? তিনি এগিয়ে এলেন উম্মে কিতালের দিকে।

উম্মে কিতাল তাঁর ভাই ওয়ারাকার মতোই গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী। পুরো আরবে অল্প যে কজন নারী তাওরাত ও ইঞ্জিলে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন, তিনি তাঁদের একজন। ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে থেকে তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন, শেষ নবির আগমন সন্নিকটে এবং সেই নবির আগমন

www.pathagar.com

ঘটবে এই মক্কা বা আশপাশের কোনো আরব ভূমিতে। সেদিন থেকে উম্মে কিতাল অপেক্ষায় আছেন–কোনোভাবে যদি সেই ব্যক্তির সান্নিধ্যে নিজের জীবন জড়িয়ে নেওয়া যায়।

আজ আবদুল্লাহকে দেখে তাঁর অবয়বের সঙ্গে কোথায় যেন সেই প্রতীক্ষিত নবির অবয়বের মিল খুঁজে পাচ্ছিলেন তিনি। তাই আর দেরি করলেন না, আবদুল্লাহ কাছে আসতেই তাঁকে ডেকে বললেন, 'কোথায় যাচ্ছ, আবদুল্লাহ?'

আবদুল্লাহ উম্মে কিতালের কাছে এসে বললেন, 'আমি তো পিতার সঙ্গে যাচ্ছি। তিনি কোথায় যাবেন, কে জানে!'

উম্মে কিতাল কোনো ভণিতায় গেলেন না, কোনো ধরনের লুকোছাপার আশ্রয় নিলেন না, সরাসরি প্রস্তাব দিলেন, 'যদি এ মুহূর্তে তুমি আমাকে বিয়ে করতে সম্মত হও, তবে তোমার পিতা তোমার নামে যতগুলো উট কুরবানি করেছেন, আমি তোমাকে সে পরিমাণ উট উপহার দেব। বলো, তুমি কি রাজি আছো?'

উম্মে কিতালের এমন সরাসরি প্রস্তাব শুনে আবদুল্লাহ হকচকিয়ে গেলেন, খানিকটা বিব্রতবোধ করলেন। কী জবাব দেবেন বুঝতে পারলেন না। শুধু বললেন, 'আমি এখন পিতার সঙ্গে যাচ্ছি। এ ব্যাপারে আমার নিজস্ব কোনো মতামত নেই, পিতা যা বলবেন আমি সেটাই মেনে নেব।'

উম্মে কিতাল বিষয়টি আবদুল্লাহকে আরেকবার ভেবে দেখার কথা বললেন। কিন্তু আবদুল্লাহ পিতার অনুমতি ছাড়া কোনো মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন না বলে উম্মে কিতালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের পথ ধরলেন।

পেছন থেকে উম্মে কিতাল তাঁর পথপানে চেয়ে রইলেন। তাঁর মনে হচ্ছে তিনি হিরণ্ময় কিছু একটা হারিয়ে ফেলছেন প্রতি মুহূর্তে, জীবনের এক প্রতীক্ষিত আলোকধারা থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছেন। হেরে যাচ্ছেন অমূল্য এক পার্থিব ও পারলৌকিক বিভূতি থেকে। তিনি অনুধাবন করতে পারছিলেন–আজ তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় পরাজয় ঘটল।

দুই

দ্বিপ্রহর। মক্কা নগরী।

লোকটির পরনের বেশভূষা বেশ অদ্ভুত ধরনের। গায়ে লম্বা আলখাল্লা, বহু ব্যবহারে মলিন হয়ে গেছে। মাথায় একটা সাদা রুমাল জড়ানো, সেটাও বেশ পুরোনো। গলার দুই পাশ দিয়ে নেমে এসেছে একটি উত্তরীয়, সেটার রং

www.pathagar.com

খানিকটা তামাটে। লোকটি বয়স্ক, চেহারায় রাজ্যের বলিরেখার ছাপ। তবে বিশেষভাবে লক্ষণীয় তাঁর চোখ দুটো, অস্বাভাবিক রকমের চকচক করছে চোখজোড়া।

বৃদ্ধলোকটি হাঁটছেন একটি লাঠি হাতে। যদিও তাঁকে দেখে বোঝা যাচ্ছে তিনি লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারেন, তবু তিনি লাঠিটা ডান হাতে ধরে হেঁটে যাচ্ছেন মক্কার পথ ধরে। লোকটি সম্ভবত ইহুদি। ধর্মপ্রাণ বয়স্ক ইহুদিরা এ ধরনের লাঠি হাতে চলাফেরা করেন। লাঠি তাঁদের ধর্মের অন্যতম নিদর্শন। তাঁদের নবি মুসার যষ্টির সঙ্গে সাযুজ্য রাখতে তাঁরা এমন লাঠি ব্যবহার করেন।

লোকটি মাথা নিচু করে হাঁটছেন। হাঁটার সময় এদিক-সেদিক খুব একটা তাকাচ্ছেন না। তাঁর বেশভূষা আর চালচলন দেখে বোঝা যাচ্ছে, তিনি কোনো ব্যবসায়ী নন। এ সময়টা যদিও ব্যবসার জন্য অনুকূল নয়, তবু অনেক দূরান্তের ব্যবসায়ী পণ্য বিক্রি করতে এ সময় মক্কায় আসেন। তা ছাড়া এখন হজের মৌসুম নয়, হজের মৌসুমে দারুণ বাজার বসে কাবার আশপাশটায়। পুরো মক্কা তখন সরব হয়ে ওঠে তীর্থযাত্রী আর ব্যবসায়ীদের আনাগোনায়।

মক্কায় এখন ছোটখাটো একটা অর্চনার সময়। এ অর্চনা শুধু নারীদের জন্য। বিশেষ এ সময়টায় নারীরা তাওয়াফ করে কাবাঘর। অনেক সময় দেখা যায়, কোনো কোনো কুসংস্কারাচ্ছন্ন বেদুইন গোত্রের মেয়েরা নগ্ন হয়ে তাওয়াফ করে প্রতিমাসজ্জিত কাবা। তাদের সঙ্গ দেয় তাদের স্বামী বা প্রেমিক কোনো পুরুষ। কাবায় সজ্জিত দেবতাদের মনোতুষ্টির জন্য নগ্নতা তাদের কাছে একধরনের উপাসনা।

তবে আজকের দ্বিপ্রহরে তেমন কোনো বেদুইন মেয়েদের আনাগোনা নেই কাবাচত্বরে। মক্কার একদল নারী তাওয়াফ করছে কাবাঘর। তাদের মধ্যে পূর্ণবয়স্ক নারীরা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে কিশোরী ও অনূঢ়া তরুণীরাও। কাবাঘরে স্থাপিত লাত, মানাত, উজ্জা, হোবল দেবতার নামে তারা স্তুতিগীত গেয়ে নিজেদের সমর্পিত হৃদয়ের ভালোবাসা জানাচ্ছে। নিজেদের মনোবাসনা দেবতাদের চরণতলে ভক্তিসহকারে অর্পণ করছে। তাদের মুখে গীত, চোখ অশ্রুসজল, হৃদয় বিগলিত।

ঠিক এ সময় বৃদ্ধ লোকটি এলেন কাবাচত্বরে। কাবার চারপাশে তাওয়াফরত নারীদের দেখে তাঁর চোখ দুটোতে কী যেন এক চমক খেলে গেল। চত্বরের পাশে একটি উঁচু বেদিতে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। পরখ করতে লাগলেন তাওয়াফরত নারীদের চলার গতি। নারীদের দলটি তাঁর কাছাকাছি আসতেই তিনি তাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য জোরে হাঁক দিলেন, 'হে মক্কার নারীরা!'

www.pathagar.com

নারীদের দলটি বৃদ্ধের বাজখাঁই আহ্বানে সচকিত হলো। তাওয়াফের সময় সাধারণত এভাবে কেউ কাউকে আহ্বান করে না। তারা তাওয়াফ থামিয়ে বৃদ্ধলোকটির দিকে তাকাল। কে এই লোক? তাঁকে তো মক্কার লোক বলে মনে হচ্ছে না! কেউ তাঁকে কখনো দেখেছে বলেও মনে করতে পারছে না। একজন বৃদ্ধ আগন্তুক কী বলতে চান মক্কার নারীদের?

নারীদের দলটিকে সচকিত হতে দেখে বৃদ্ধ বলতে শুরু করলেন, 'আমি তোমাদের এক সুসংবাদ দিচ্ছি! শুনে রাখো–নিঃসন্দেহে তোমাদের এ মক্কা নগরীতে একজন নবি আবির্ভূত হবেন। তাঁর নাম হবে আহমদ। তোমাদের মধ্যে যার সৌভাগ্য হয়, দ্বিধাহীনচিত্তে সেই নবির স্ত্রী হয়ে যেও।'

মক্কার নারীদলটি দারুণ বিরক্ত হলো বৃদ্ধের এমন কথায়। বলা নেই কওয়া নেই কোথা থেকে এক উড়নচণ্ডী বুড়ো এসে বলে গেল–এ নগরীতে নবি আসবেন! মক্কার নারীরা যেন তাঁর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্যলাভে ধন্য হয়! কী সব আবোলতাবোল কথাবার্তা! আমরা আমাদের দেবতাদের ভালোবাসি, তাদের সম্মান করি, তাদের উপাসনা করি; আমরা কেন আমাদের দেবতাদের ছেড়ে কোনো নবির কথা শুনতে যাব? কে এই বৃদ্ধ? মাতাল, নাকি বিকারগ্রস্ত কোনো লোক? তাওয়াফের মাঝে এসে এমন উদ্ভট কথা বলার সাহস সে পেল কোথায়?

কেউ কেউ পায়ের কাছ থেকে কয়েকটি নুড়ি উঠিয়ে ছুড়ে মারল বৃদ্ধের দিকে। মুখে গালমন্দের তুবড়ি ছুটিয়ে তেড়ে এল কয়েকজন। কেউ কেউ আঁচলের তল থেকে বের করল ধারালো খঞ্জর–দেব নাকি লোকটিকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে!

নারীদের এমন রুদ্রমূর্তি দেখে বৃদ্ধলোকটি সেখানে আর বেশিক্ষণ রইলেন না, কোনো রকম দৌড়ে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে চলে গেলেন ফেলে আসা পথে।

কেন লোকটি এ কথাগুলো বলতে গেলেন মক্কার নারীদের? যারা ধর্মের নামে পুজা করে শত দেব-দেবীর, যারা কাবার সামনে উলঙ্গ হয়ে উপাসনা করে মানাতের, যারা হোবলের নামে বলি দেয় পশু, যারা এক ঈশ্বরের পরিবর্তে কাবাচত্বরে বসিয়েছে ৩৬০টি দেবমূর্তি, আগন্তুক বৃদ্ধ কেন এই অন্ধকারাচ্ছন্ন নগরীর নারীদের শোনাতে গেলেন এক অনাগত নবি আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী? তমসার এ ঘোর আঁধারে কোনো নারী কি কামনা করে একবিন্দু ঐশ্বরিক আলোকবিভার? তাদের মধ্যে কেউ কি আছে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত কোনো এক নবির আগমনে অপেক্ষমাণ?

কাবার পাশে একটি বাড়ির ছায়ায় বসে ছিলেন এক নারী। দীর্ঘকায়, উজ্জ্বল মুখাবয়ব, রক্তিম অধর, চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। বয়স ত্রিশের

www.pathagar.com

কোঠায়। যৌবনের লালিমা এখনো ঢাকা পড়েনি তাঁর বয়স ও আভিজাত্যের আড়ালে। এ নারীর নাম খাদিজা। খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ।

মক্কার লোকেরা তাঁকে তাহিরা নামে ডাকে। কারণ, তাঁর চরিত্র যেমন নিষ্কলুষ তেমনি পবিত্র তাঁর জীবনালেখ্য। তিনি কখনো মূর্তিপূজা করেন না। কাবার তাওয়াফে কখনো এলে কেবল অদৃশ্য একক সত্তার আরাধনা করেন। আজও তিনি অন্য নারীদের সঙ্গে তাওয়াফে অংশ নেননি। তাঁর কয়েকজন স্বজন-বান্ধবী উপাসনায় মগ্ন, তিনি তাদের অপেক্ষায় বসে ছিলেন কাবার পাশে। এমন সময় শুনলেন বৃদ্ধের আগমনী আহ্বান।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তর্মহলে শুরু হলো এক অভাবনীয় ভাঙচুর। একজন নবি আসবেন এ মক্কা নগরীতে, তাঁর বধূ হবেন এ নগরীর কোনো এক নারী! কে হবেন সেই সৌভাগ্যবতী?

বৃদ্ধের কথায় অন্য নারীরা হাসাহাসি করলেও খাদিজা হাসতে পারলেন না। তাঁর ভেতরে তৈরি হতে লাগল এক তীব্র হাহাকার। যে হাহাকার আজ থেকে বহুদিন আগে তৈরি হয়েছিল তাঁর চাচাতো বোন উম্মে কিতালের হৃদয় অন্তঃপুরে। একজন নবির আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন তিনিও, কিন্তু ভাগ্য তাঁর সহায় হয়নি। এবার তাঁর ভাগ্যে কি হবে সেই নবির চরণতলে এক বিন্দু ভালোবাসার নজরানা পেশ করার?

খাদিজার হৃদয় ব্যথায় কুঁকড়ে গেল। নবির সহধর্মিণী না হোক, অন্তত জীবদ্দশায় কি একবার দেখতে পারবেন ঐশী বিভায় আলোকিত সেই চন্দ্রমহিম মুখাবয়ব?

চাচাতো ভাই ওয়ারাকার মুখে যেদিন প্রথম শুনেছেন শেষ নবি আগমনের সুসংবাদ, অত্যাসন্ন তাঁর মহাকাল; সেদিন থেকে হৃদয়ের ছোট্ট মণিকোঠায় সেই নবির জন্য সাজিয়ে রেখেছেন ভালোবাসার ফুলেল বাগিচা। নবি কি কখনো হাঁটবেন সে বাগিচার ফুল মাড়িয়ে?

খাদিজা আর কিছু ভাবতে পারলেন না, কাবার পাশ থেকে উঠে গেলেন। একা একা হাঁটতে লাগলেন ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের বাড়ির দিকে।

মক্কার আল-আজয়াদ মহল্লায় ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের বাড়ি। খাদিজার বাড়িও এ মহল্লায়। অবশ্য তাঁর দাদা আসাদ ইবনে উজ্জার একটি বাড়ি রয়েছে ঠিক কাবাঘরের পাশেই। কাবার মাত্র কয়েক হাত দূরে অবস্থিত এ বাড়িকে মক্কার লোকেরা ডাকে 'কাবার বোন' বলে। কাবা-সংলগ্নতার কারণে এ বাড়ির এমন নামকরণ। শুধু সংলগ্নতা নয়, এ বাড়ির একটি গাছের ডাল ঝুঁকে আছে

www.pathagar.com

কাবাচত্বরের ওপরে। কাবা তাওয়াফ করতে আসা তীর্থযাত্রীরা তাওয়াফের সময় বাধার সম্মুখীন হন এ ডালের কারণে। হাজিদের সুবিধার্থে উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ডালটি কেটে ফেলেন, বিনিময়ে বাড়িওয়ালাকে একটি গরু প্রদান করেন। পরবর্তী সময়ে কাবা সম্প্রসারণের সময় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পুরো বাড়িটি কিনে তা মাতাফের অন্তর্ভুক্ত করে দেন।

বাড়ির দহলিজে বসে ছিলেন ওয়ারাকা। দহলিজে একা তিনি। মরুর তপ্ত দুপুরের এ সময়টা একেবারে খই ফুটিয়ে তোলে মক্কাজুড়ে। কেউ সাধারণত ঘরের বাইরে বেরোয় না জরুরি প্রয়োজন ছাড়া।

ওয়ারাকা দহলিজে বসে নিবিষ্টমনে কিছু জপ করছিলেন। তিনি মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী নন। যদিও বিশ্বাসের দিক থেকে তিনি খ্রিষ্টান কিন্তু খ্রিষ্টধর্ম বা ইহুদি ধর্মেও তিনি খুব একটা আস্থা রাখেন না। তিনি ভালো করেই জানেন, এ দুই ধর্ম আর তাদের উৎসমূলে সঠিকভাবে নেই। কালের গর্ভে যেমন বিলীন হয়ে গেছে নবি মুসা (আ.) ও ঈসা (আ.) আনীত শরিয়তের অনেক পয়গাম, তেমনি সময়ের কশাঘাতে মনুষ্যসৃষ্ট অনেক নতুন বিষয়-আশয়ও আসন গেড়েছে তাদের শরিয়তে। তবে তিনি তাওরাত ও ইঞ্জিলের একনিষ্ঠ পাঠক। এ ছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থও তিনি অধ্যয়ন করেছেন ঢের। আরবের অল্প কয়েকজন ধর্মীয় পণ্ডিতের তিনি একজন এবং তাঁদের মধ্যে তিনিই একেশ্বরবাদী বিশ্বাসের প্রবক্তা। তিনি খ্রিষ্টবাদের নেস্তর বিশ্বাসী একজন সাধক। হিব্রু ভাষায় রচিত ইঞ্জিলের কিছু অংশ তিনি আরবিতে অনুবাদও করেছেন। হিব্রু, গ্রিক ও পার্সিয়ান ভাষায় রয়েছে তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি।

কিন্তু ওয়ারাকার এখন বয়স হয়েছে, চোখের দৃষ্টিশক্তি খুব একটা জোরালো নয়। কালের দুর্বিপাক তাঁর চোখের আলো ছিনিয়ে নিয়ে চোখজুড়ে দিয়ে গেছে কেবল গাঢ় অন্ধকার। পৃথিবীর রূপ দেখার সৌভাগ্য আল-বিদা জানাচ্ছে তাঁকে ধীরে ধীরে।

চোখের দৃষ্টি না থাকলেও তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যেন বাঁধনহারা। দুই চোখের বদলে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি তাকিয়ে থাকে মহিমান্বিত পৃথিবীর দিকে। সে দৃষ্টি দিয়ে তিনি মরুর কলরোল শুনতে পান, পাহাড়ের গুঞ্জরন বুঝতে পারেন, হাওয়ায় কান পাতলে অনুভব করেন অন্যলোকের অলৌকিক ঝরনার শব্দ। প্রতিটি নৈঃশব্দ্য তাঁর জন্য বয়ে আনে একেকটি মুগ্ধকর দৃশ্যরূপ। তিনি শব্দের অনন্যতা দিয়ে অনুধাবন করেন আলোহীন পৃথিবী।

দূর থেকে চাচাতো ভাই ওয়ারাকার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন খাদিজা। এ বিদ্বান ভাইটিকে তিনি বেশ পছন্দ করেন। তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা,

www.pathagar.com

ধর্মানুভূতি তাঁকে আলোড়িত করে। তাঁর বিজ্ঞদর্শিতা দেখলে মুহূর্তে শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। এ কারণে ওয়ারাকা খাদিজার কেবল ভাই-ই নন, তিনি হয়ে উঠেছেন তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু এবং অভিভাবক। এমন বন্ধু, যাঁর কাছে খুলে বলা যায় হৃদয়ের সকল অভিলাষ, আশা ও বেদনার কাহিনিকাব্য। তাই যখনই কোনো প্রয়োজন পড়ে, খাদিজা পরামর্শের জন্য সবার আগে চলে আসেন ওয়ারাকার কাছে।

জনহিতৈষী অনেক কাজে ওয়ারাকা সাহায্য করে থাকেন খাদিজাকে। এমনিতে খাদিজা অনেক বড় ব্যবসায়ী, তাঁর সম্পদও প্রচুর। কিন্তু তিনি শুধু একজন ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে পরিচিত করেন না, সমাজের অনেক উন্নয়নমূলক কাজেও তিনি উদারহস্ত। বিশেষত আরবে কন্যাসন্তানদের অবজ্ঞা করার বিষয়টি অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। অনেক উন্নাসিক আরব নিজের স্ত্রীর গর্ভে কন্যাসন্তান জন্মের সংবাদ শুনলে সঙ্গে সঙ্গে নবজাতিকাকে আঁতুড়ঘরে হত্যা করে ফেলে কিংবা কিছুদিন পর শিশুবস্থায়ই তাকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলে।

আরবে কন্যাসন্তান হত্যার এই প্রবণতার পেছনে অন্য অনেক কারণের মধ্যে প্রধান কারণ মূলত গোত্রীয় কৌলিন্য রক্ষা। গোত্রীয় ধ্বজাধারী লোকজন মনে করে, কন্যাসন্তান জন্ম নিলে একসময় এ মেয়েকে অন্য গোত্রের লোকজন বিয়ে করে তাদের শয্যাসঙ্গী করবে। এটা তাদের জন্য অপমানজনক। তেমনি তারা মনে করে, কন্যাসন্তান মানে একধরনের বোঝা। তারা যুদ্ধ করতে পারে না, গোত্রের সম্মান রক্ষায় লড়াইয়ে অংশ নিতে পারে না, জীবিকা উপার্জনে সক্ষম নয়। সন্তান জন্মদান ছাড়া তাদের আর কোনো সক্ষমতা নেই। এসব কারণে কন্যাসন্তান জন্মকে আরবের লোকজন অপয়া মনে করে। ফলে জন্মের পর বা শিশু বয়সে তাদের হত্যা করা একটা কুপ্রথায় পরিণত হয়েছে।

মক্কা ও আশপাশের অঞ্চলে এমন ঘটনা অহরহ ঘটত তখন। খাদিজা এমন নির্দয় পিতার ঘরে কন্যাশিশু জন্মের সংবাদ পেলে লোক পাঠিয়ে সে কন্যাকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন এবং তাদের প্রতিপালনের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন। শুধু প্রতিপালন নয়, প্রাপ্তবয়স্ক হলে তিনি তাদের যোগ্য ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দেন। আর এসব কাজে তাঁকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেন ওয়ারাকা ইবনে নওফেল। আরবের নারীমুক্তিতে খাদিজার এমন সাহসী পদক্ষেপকে ওয়ারাকা বরাবর সমর্থন দিয়ে আসছেন। মক্কার কুরাইশনেতাদের ভ্রুকুটি থেকে নিজের বোনকে সযত্নে সুরক্ষা করেন তিনি। পণ্ডিত ব্যক্তি বলে পারতপক্ষে তাঁর কথার অবাধ্য হওয়ার সাহস করে না কেউ।

www.pathagar.com

ওয়ারাকাও পছন্দ করেন খাদিজাকে। শুধু যে তাঁর যশস্বী খ্যাতি ও বৈভবের প্রাচুর্য রয়েছে এ জন্য নয়, তিনি পছন্দ করেন তাঁর ধৈর্যের স্নিগ্ধতা ও ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতি প্রবল অনুসন্ধিৎসার জন্য। এ কারণে খাদিজার দ্বিতীয় স্বামী মারা যাওয়ার পর তিনি তাঁকে বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। কিন্তু খাদিজা তাঁর চাচাতো ভাইয়ের প্রস্তাব হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি যেন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছেন–হয়তো সেই অনাগত তিনি, নয়তো কেউ নয়!

খাদিজা বাড়ির আঙিনায় ঢুকতেই সচকিত হয়ে উঠলেন ওয়ারাকা। বাতাসের ঢেউ তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে কিছু একটা বলে গেল। তিনি বলে উঠলেন, 'কে, খাদিজা?'

খাদিজা ধীর পায়ে ভাইয়ের কাছে এসে বসলেন। মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি!'

খাদিজার আগমনে খুশি হয়ে উঠল ওয়ারাকার মুখ। সহাস্যে বললেন, 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল আজ তুমি আসবে।'

খাদিজা টিপ্পনী কেটে জবাব দিলেন, 'সে তো আপনি জানবেনই, আপনি যে ভবিষ্যদ্বক্তা।'

খাদিজার কথায় মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানালেন ওয়ারাকা, 'না খাদিজা, আমি কখনো কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করি না আর আমি ভবিষ্যদ্বক্তাও নই। আমি কেবল সেসব কথাই তোমাকে বলি, যা আমি পূর্বেকার বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে পাঠ করেছি, যা আমি বিভিন্ন ধর্মের সত্যানুসন্ধানী পুরোহিতদের থেকে শ্রবণ করেছি। আমি গুনিন নই, জ্যোতিষীও নই। তবে নক্ষত্র বিষয়ে আমার জ্ঞান রয়েছে। যেমন জ্ঞান রয়েছে প্রাচীন শিলালিপি আর ঐতিহাসিক নিদর্শন বিষয়ে। হয়তো কিছু প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছি মানুষের স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যাকার হিসেবে। এসবই আমার লব্ধ জ্ঞান, আল্লাহ থেকে প্রদেয় দানমাত্র।'

ওয়ারাকা কথা বলেন কবিতার মতো। বরাবরই সুললিত, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের বিভূতি তাঁর সে কাব্যিক বহিঃপ্রকাশকে আরও বাঙ্ময় করে তোলে। খাদিজা মুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনছিলেন। কিন্তু পরক্ষণে তাঁর মনে পড়ে গেল কেন তিনি এখানে এসেছেন। বললেন, 'আজ কাবাচত্বরে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে।'

ওয়ারাকা মনোযোগী হলেন। তিনি জানেন, খাদিজা অনর্থক কোনো কথা বলার জন্য কখনো আসেন না। খাদিজা বলতে লাগলেন, 'কিছুক্ষণ আগে মক্কার কয়েকজন নারী যখন কাবার তাওয়াফ করছিল, তখন কোত্থেকে যেন এক বৃদ্ধলোক এলেন কাবার পাশে। সম্ভবত ইহুদি, পোশাক-আশাকে তা-ই মনে

www.pathagar.com

হলো। তিনি কাবার পাশে এক উঁচু বেদিতে দাঁড়িয়ে হঠাৎ নারীদের উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন, 'এ মক্কায় খুব জলদি একজন নবি আসবেন। তোমাদের মধ্যে যার খোশনসিব হয়, সে যেন সেই নবির স্ত্রী হয়ে যায়।' আগন্তুক বৃদ্ধের কথা শুনে কেউ কেউ তো হেসে উঠল আর কয়েকজন তেড়ে গেল লোকটিকে মারতে। নারীদের এমন রুদ্রমূর্তি দেখে লোকটি কোনো রকমে পালিয়ে বাঁচল। কিন্তু লোকটির কথাগুলো শোনার পরপর আমার মনে এল উম্মে কিতালের কথা, তিনিও তো নবির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এ কথা মনে আসতেই আমি আপনার কাছে চলে এলাম।'

ওয়ারাকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লোকটির বিবরণ, ঘটনার আদ্যোপান্ত জানতে লাগলেন খাদিজার কাছে। সবকিছু শুনে বেশ কিছুক্ষণ ক্ষয়িষ্ণু দৃষ্টির চোখ নিচু করে নীরব রইলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, 'নবি আসবেন, খুব শিগগির আসবেন। নবি আগমনের সকল নিদর্শন পরিস্ফুটিত হতে শুরু করেছে। চারদিকে ঘোর তমসা এখন, মানুষের মাঝে মনুষ্যত্ব বলতে কিছু নেই আর। জুলুম-পাপাচারে ছেয়ে গেছে ধরণিতল। মানুষ মানুষের খোদা সেজে বসেছে, মানুষ লিপ্ত হয়েছে মূর্তি আর দেবতার পূজায়। কিন্তু এ আঁধার ঘুচবেই। এ অন্ধকারের কালিমা ভেদ করে নতুন আলোকবর্তিকা হাতে একজন নবির আগমন অত্যাসন্ন হয়ে পড়েছে।

তিনি আসবেন। তিনি এ আরবে আসবেন। হতে পারে তিনি এ মক্কা নগরীতেই আবির্ভূত হবেন। তুমি যদি আমার কাছে জানতে চাও তিনি দেখতে কেমন হবেন, কোন বংশে আসবেন, কেমন হবে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য–তবে এখন আমি তোমাকে তা বলতে পারব না। তার জন্য তোমাকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তাঁর নাম হবে আহমদ, আহমদ নামেই তিনি পরিচিত হবেন তাঁর দেশে।'

খাদিজার হৃদয় আনচান করে ওঠে। তাঁর হৃৎস্পন্দনে কথা বলে ওঠে অন্য কেউ। অনাগত একজন মানুষের জন্য তাঁর হৃদয় থেকে কেন অযথাই উথলে ওঠে প্রেমের সরোবর?

তিন

আজকাল খাদিজার ঘুম খুব কম হয়। রাতে স্বস্তিতে ঘুমোতে পারেন না। একটু ঘুমোলে কী সব স্বপ্ন দেখেন, সে স্বপ্নের বাস্তবতা তিনি বুঝে ওঠতে পারেন না। স্বপ্নের মাঝে প্রায়ই দেখেন–আকাশ থেকে নেমে আসছে রুপালি ধবধবে

www.pathagar.com

আলোক বিচ্ছুরণ। সে আলো তাঁর ঘরের ছাদ ভেদ করে আশ্রয় নিচ্ছে তাঁর সমগ্র সত্ত্বায়, তাঁর কোলজুড়ে ছোটাছুটি করছে ঝলমলিয়ে। ঝলমল করতে করতে সে আলো মিনারের মতো অবয়ব নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সারা ঘরে। ঘর থেকে স্নিগ্ধ শুভ্র-শিখা হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে পুরো মক্কা, মক্কা থেকে জাজিরাতুল আরব, আরব থেকে পুরো কায়েনাত আলোকিত হয়ে উঠছে সে আলোক-মঞ্জুরিতে।

এরপর তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। একটু এদিক-সেদিক করে একই স্বপ্ন প্রায় দেখেন। তিনি বুঝতে পারেন না কেন বারবার একই স্বপ্ন দেখেন। মাঝেমধ্যে এমন স্বপ্ন দেখে হাঁপিয়ে ওঠেন। বিছানায় বসে একা একা ভাবেন নিজের অতীত জীবন নিয়ে। নিজের বৈধব্য নিয়ে ভাবেন অনেক সময়। বয়স ৩০ পেরিয়েছে, এরই মধ্যে দু-দুবার বিদগ্ধ স্বাদ পেয়েছেন বৈধব্যের। জীবন নিয়ে একধরনের বিতৃষ্ণ হয়ে গেছেন তিনি। বিয়ে বিষয়টির প্রতি একটা বিরাগ চলে এসেছে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছেন–বিয়েমুখো আর হচ্ছেন না এ জীবনে।

দ্বিতীয় স্বামী আতিক ইবনে আইয়াদ পরলোকগমন করেছেন বেশ কিছুদিন হলো, এরই মধ্যে মক্কা এবং আশপাশের নানা গোত্র থেকে প্রতিদিন দু-একজন আসছে তাঁর কাছে বিয়ের পয়গাম নিয়ে। তিনি সবাইকে সাফ জবাব দিয়ে দিচ্ছেন, 'বিয়ের বিষয়ে আপাতত কিছু ভাবছি না। দয়া করে মাফ করবেন আমাকে।'

সাধারণ পাণিপ্রার্থীদের তো দু-এক কথায় বোঝানো যায়, কিন্তু কোনো গোত্রপতি বা নামজাদা ব্যক্তিদের নিয়ে বাধে বিপত্তি। তাঁরা কিছুতেই হাল ছাড়তে চান না। তা ছাড়া খাদিজার কাছে একবার বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার পর সেটা আবার কবুল না হলে গোত্রপতিদেরও বেশ আঁতে ঘা লাগে বৈকি। এই তো কিছুদিন আগে মক্কার আবুল হাকাম (আবু জেহেল) বেশ ঘটা করে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। আবুল হাকামের প্রস্তাব খাদিজা হাসিমুখে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এতে বেশ মনঃক্ষুণ্ন হন তিনি। আশপাশের লোকজনের সঙ্গে নাকি বেশ চোটপাটও দেখান এ বিষয়ে। অবশ্য তাতে কিছু যায়-আসে না খাদিজার।

মক্কার সবচেয়ে বিত্তশালী নারী তিনি। তাঁর সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে লোকজন তাঁকে 'কুরাইশ রাজকুমারী' নামে ডাকে। ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁর সুনাম শুধু মক্কা নয়, ছড়িয়ে আছে সুদূর রোম-পারস্য, ইয়েমেন, গাসসাসিনা, হিরা ও দামেস্ক পর্যন্ত। গ্রীষ্মকালীন ব্যবসা মৌসুমে পুরো মক্কার ব্যবসায়ীদের যে

www.pathagar.com

পণ্যসামগ্রী সিরিয়ায় রপ্তানি হয়, খাদিজার একার পণ্য রপ্তানি হয় তাঁদের সমুদয় পণ্যের চেয়ে অধিক। আবার শীতকালীন মৌসুমে যখন তাঁর পণ্য ইয়েমেন অভিমুখে রওনা হয়, তখন তাঁর উটের কাফেলায় ভরে যায় মক্কার প্রান্তর। সুতরাং, এমন ধনবতী নারীকে বিয়ে করতে উৎসাহী হওয়ার কারণ সবার কাছে স্পষ্ট।

কিন্তু খাদিজার নতুন করে বিয়ে-শাদি কিংবা ঘর-সংসারে ব্রতী হতে তেমন আগ্রহ নেই। কীভাবে আগ্রহ হবে? তাঁর স্বপ্নে যে আজকাল ধরা দিচ্ছে ঊর্ধ্বলোকের আলোকবিভা! কেমন করে তিনি অগ্রাহ্য করবেন এ আলোর ঝরনাধারার স্বর্গীয় সম্মোহন! চাচাতো বোন উম্মে কিতালের সেই ভবিষ্যদ্বাণী মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলছে বেহেশতি গুলিস্তান। চাচাতো ভাই ওয়ারাকার প্রাজ্ঞ অনুধাবন তার মনমুকুরে যেন উদ্ঘাত করছিল আকাঙ্ক্ষার নতুন চারাগাছ।

মনে দ্বিধা–সত্যিই কি তিনি আমার হবেন? যিনি আসবেন সকল তমসার জীর্ণতাকে বিদীর্ণ করে। যিনি এ মানবতাকে নতুন এক আলোয় বিভাসিত করবেন। নবুওয়াতের হিরণ্ময় জ্যোতিতে বিধৌত করবেন তামাম জাহান।

তবে কেন আমি প্রতিদিন এমন স্বপ্ন দেখি? নিশ্চয় এর কোনো ঐশ্বরিক ইশারা রয়েছে! এমন ভাবনায় খাদিজা আপ্লুত হন।

আল্লাহ তাআলা খাদিজাকে অঘোষিত নবির জন্য প্রস্তুত করছিলেন। তাঁর অন্তঃকরণকে তৈরি করছিলেন রাসুলের ভালোবাসার জন্য। তাঁর হৃদয়ের সিংহাসন সজ্জিত করছিলেন নবি মুহাম্মদের জন্য।

স্বপ্নের অলৌকিক আলোক বিচ্ছুরণের কথা জানানোর জন্য খাদিজা এলেন ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে। তাঁর কাছে খুলে বললেন প্রতিটি স্বপ্নের আদ্যোপান্ত, যা যা দেখেন তিনি স্বপন মাঝার, যা কিছু ঘটে তাঁর ঘুমঘোরে।

ওয়ারাকার চোখের কোণে এক বিন্দু জল টলমল করে উঠল। খাদিজার কথা শেষ হতেই তিনি দুই হাত উত্তোলিত করে উল্লাসধ্বনি করে উঠলেন, 'সুসংবাদ! মারহাবা, হে আমার বোন! তোমার জন্য এ এক অবশ্যম্ভাবী সুসংবাদ, খাদিজা! এ স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য এক ঐশী উপহার। এ আলোর অবয়ব খুব শিগগির আল্লাহ তোমাকে দান করবেন। সবকিছু আল্লাহই ভালো জানেন, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো–এ আলো কেবল একজন নবির হতে পারে। এ আলোক বিচ্ছুরণ একজন নবির আগমনকে ইশারা করে।'

www.pathagar.com

ওয়ারাকার উল্লাসধ্বনি থামতে খাদিজা খানিকটা কেঁপে উঠলেন। যতটা খুশি হলেন, তার চেয়ে বেশি বিহ্বল হলেন। চাচাতো ভাই ওয়ারাকার কথার মধ্যে কিছুটা প্রচ্ছন্নতা জড়িয়ে আছে। তিনি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, কোনো কথা বললেন না।

খাদিজাকে চুপ করে থাকতে দেখে ওয়ারাকা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে এবার বলে উঠলেন, 'আমার কথা বিশ্বাস করো খাদিজা, শেষ নবি ইতিমধ্যে পৃথিবীতে আগমন করেছেন আর তুমি তাঁর স্ত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন করবে। এমনকি তোমার জীবদ্দশাতেই তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হবেন। তাঁর আনীত ধর্ম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। তুমি হবে তাঁর ধর্মের প্রথম অনুসারী। আমি যদি আরও স্পষ্ট করে বলতে চাই–তিনি হবেন এ কুরাইশ বংশের হাশেম গোত্রের একজন পুরুষ।'

খাদিজা আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না, তাঁর হাত-পা কাঁপছে। মনে হচ্ছে, তিনি এখনই পড়ে যাবেন। হৃদয়ের সকল তন্ত্রীতে যেন বয়ে যাচ্ছে অপার্থিব কোনো শোণিত ফোয়ারা। শরীরের প্রতিটি বিন্দু থেকে উচ্চারিত হচ্ছে আনন্দের গীতিকবিতা।

খাদিজা এত আনন্দ সহ্য করতে পারছিলেন না, জলদি নিজের বাড়ি চলে এলেন।

এত দিন তিনি কেবল স্বপ্ন আর কল্পনার অলীক কুসুমে প্রতিপালিত করেছেন তাঁর অনাগত নবিকে, কিন্তু এখন যে তিনি বাস্তবতার খুব কাছে। তিনি যেন চোখ বন্ধ করলেই তাঁকে দেখতে পান চোখের আয়নায়। শেষ নবির সান্নিধ্যধন্য হওয়ার আনন্দ জড়িয়ে রাখে তাঁকে।

কিন্তু আবার নিজের দিকে তাকালে অনিচ্ছুক ভয় এসে জাপটে ধরে তাঁকে। তাঁর বয়স চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই, যৌবনের পড়ন্তবেলায় এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। ভাগ্য কি তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন হবে?

খাদিজার মাথায় নিদারুণ চিন্তার ঝড় বইতে লাগল। স্বপ্নপুরুষ এত দিন কল্পনায় ছিল, সেই তো ভালো ছিল। কিন্তু এখন যে তাঁর আগমন অত্যাসন্ন! তিনি প্রভুর দরবারে হাত পাতলেন–হে আল্লাহ! তুমিই বলে দাও, কোথায় গেলে পাব তাঁকে!

খাদিজা অপেক্ষা করছিলেন। পৃথিবী অপেক্ষা করছিল। সমগ্র সৃষ্টি প্রতীক্ষমাণ ছিল খাদিজা ও মুহাম্মদের শুভ পরিণয়ের জন্য। রাব্বুল আলামিন ধীরে ধীরে সাজিয়ে তুলছিলেন এই যুগলের ভালোবাসার অমর কাহিনিকাব্য। খাদিজা তাঁর কাঙ্ক্ষিত মানুষের আরেকটু কাছে আসার সুযোগ পেলেন।

www.pathagar.com

চার

মক্কায় এ বছর বেশ খরা চলছে। আশপাশের চারণভূমিগুলো বিরানপ্রায়। উট ও মেষ চরানোর মতো পর্যাপ্ত ঘাস পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। অগত্যা মক্কার সামর্থ্যবান সবাই গ্রীষ্মের এ মৌসুমে সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যবসার জন্য দামেস্ক যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সেখানে গেলে সবারই কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কুরাইশনেতা আবু তালিব বংশমর্যাদায় যথেষ্ট প্রভাবশালী হলেও তাঁর সাংসারিক অবস্থা ততটা সচ্ছল নয়। আর তাঁর ছেলেসন্তানদের কেউ এখনো এতটা শক্ত সামর্থ্যবান হয়ে ওঠেনি যে তাদের মেষ চরানো বা ব্যবসার কাজে লাগাবেন। তাঁর পরিবারে প্রতিপালিত ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদই তাঁর পরিবারের রোজগারের অনেকখানি বহন করেন। তাঁর সঙ্গে ব্যবসার কাজে দামেস্ক যান বা মেষপাল নিয়ে চারণভূমিতে যান, এটা তাঁর জন্য অনেক সন্তোষের।

আবু তালিবের বয়স হয়েছে। বয়সের ভারে এখন বড় একটা এদিক-সেদিক যেতে পারেন না। কিন্তু এ বছর ব্যবসার জন্য দামেস্ক না গেলেই নয়, সংসারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আবার তাঁর নিজেরও তেমন কোনো অর্থ-সম্পদ নেই, যার দ্বারা ভাতিজা মুহাম্মদকে পুঁজি দিয়ে ব্যবসায় পাঠাবেন। কয়েক দিন দুশ্চিন্তার দোলাচলে রইলেন তিনি।

ওদিকে খাদিজার ব্যবসায়িক অর্থ-সম্পদ বা কাজের লোকজনের অভাব নেই। নিজস্ব পণ্য ছাড়াও তিনি লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে অন্য ব্যবসায়ীদের ব্যবসার জন্য মূলধন প্রদান করে থাকেন। তাঁরা ব্যবসা শেষে চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত মুনাফা খাদিজাকে বুঝিয়ে দেন।

এসব কাজে খাদিজার নিয়োগপ্রাপ্ত লোক আছে। তা ছাড়া তাঁর ভাগনে হাকিম ইবনে হিজামও ব্যবসার অনেক কিছু দেখভাল করেন। কিন্তু তবু এবারকার গ্রীষ্ম মৌসুমে ব্যবসা পরিচালনার জন্য নতুন একজন লোক চেয়ে মক্কায় ঘোষণা দিলেন, যাকে তিনি ব্যবসার দায়িত্ব দিয়ে দামেস্কে পাঠাবেন।

খাদিজার নতুন লোকের প্রয়োজন ছিল না। আর প্রয়োজন হলেও সেটা ঘোষণা করে বলার দরকার ছিল না। তিনি ইচ্ছা করলে যেকোনো একজন ভালো ব্যবসায়ীকে ডেকে এ দায়িত্ব তাঁর কাঁধে তুলে দিতে পারতেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি তাঁর ঘোষণার মধ্যে শর্ত জুড়ে দিলেন—আগ্রহী ব্যক্তিকে অবশ্যই বিশ্বস্ত এবং আমানতদার হতে হবে। তাঁর চারিত্রিক নিষ্কলুষতাও তাঁর নিয়োগের অন্যতম শর্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

www.pathagar.com

মূলত খাদিজা ব্যবসার জন্য লোক খুঁজছিলেন না, তিনি খুঁজছিলেন সত্যিকারের মহামানবকে। তিনি জানতেন, তাঁর চাচাতো ভাইয়ের কথামতো অনাগত নবি যদি সত্যি আরবে আগমন করে থাকেন, তবে তাঁর চারিত্রিক নিষ্কলুষতা এবং বিশ্বস্ততা হবে সবার চেয়ে নিখুঁত। যাঁর চরিত্রে কখনো স্পর্শ করেনি সামান্য পঙ্কিলতা।

কিন্তু এমন লোক তিনি কীভাবে খুঁজে বের করবেন? মক্কা ও এর আশপাশের এলাকায় হাজারখানেক কুরাইশি লোকের বসবাস। তাদের মধ্য থেকে কেবল চারিত্রিক বিদূষিতা গুণ ধরে খুঁজতে গেলে সেটা অত্যন্ত কঠিনসাধ্য কাজ হয়ে যাবে। এ কারণেই তিনি ব্যবসার কথা বলে নিজের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে খোঁজার পদ্ধতি অবলম্বন করলেন।

আবু তালিব লোকমুখে শুনতে পেলেন খাদিজার ঘোষণা। এমন দুর্দিনে তিনি কিছুটা আশার আলো দেখতে পেলেন। খাদিজার শর্তগুলো তাঁকে আরও আশান্বিত করল। কেননা তিনি ভালো করেই জানেন, বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতায় তাঁর ভাতিজার তুল্য নেই সারা আরবে। তা ছাড়া ব্যবসায়ী হিসেবেও তাঁর ভাতিজা ফেলনা নন, তিনি নিজে দুবার তাঁকে দামেস্কে নিয়ে গিয়েছিলেন ব্যবসার সঙ্গী করে। সে হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতাও কম নয়। খাদিজার এমন ঘোষণা শুনে তাই তিনি দেরি করলেন না, ভাতিজা মুহাম্মদকে জানালেন বিষয়টি।

আবু তালিব মুহাম্মদকে ডেকে বললেন, 'ভাতিজা, তুমি তো জানোই আমি বিত্তহীন একজন মানুষ। এ বছর দুর্ভিক্ষের ফলে দারুণ অভাবে পড়েছি আমরা। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ব্যবসা বা অন্য কোনো উপায়, উপকরণ এ মুহূর্তে আমার হাতে নেই। আজ শুনলাম আমাদের গোত্রের একটি বাণিজ্য কাফেলা শিগগির দামেস্ক যাচ্ছে। এ কাফেলায় ধনাঢ্য খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদের অনেক পণ্যও যাবে। সে তার বাণিজ্যবহর পরিচালনার জন্য একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি তালাশ করছে। নানা কারণে যদিও আমি তোমাকে আমার চোখের আড়াল করতে চাই না এবং সংগত কারণে ইহুদিদের থেকে আমি তোমার ক্ষতিসাধনের শঙ্কা করি; কিন্তু বুঝতেই পারছ, এ ছাড়া আমার আর কোনো গত্যন্তর নেই। যদি তুমি তার কাছে যাও, তবে আমি নিশ্চিত যে সে তোমাকে তার ব্যবসার জন্য নির্বাচন করবে। তোমার সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষের ব্যাপারে তার সম্যক অবগতি থাকার কথা।'

www.pathagar.com

মুহাম্মদ চাচার কথা শুনে তাঁর সম্মতি প্রকাশ করলেন। তিনি চাচাকে এ বিষয়ে কথা বলতে বললেন। কিন্তু আবু তালিবের যে বংশমর্যাদা এবং জাত্যাভিমান, তাতে ভাতিজার পক্ষে স্বপ্রণোদিত হয়ে খাদিজার কাছে গিয়ে কাজের ব্যাপারে আগ্রহ দেখানোটা শোভন দেখায় না। কিন্তু না গেলেও যে নয়। একটা দোটানায় পড়ে গেলেন তিনি।

এ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এলেন আবু তালিবের বোন ও মুহাম্মদের ফুফু আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিব। ফুফু আতিকার বিয়ে হয়েছে খাদিজার ভাই আওয়ামের সঙ্গে। ভাবি হিসেবে খাদিজার সঙ্গে আতিকার সুসম্পর্ক রয়েছে। মুহাম্মদের সম্মানের কথা ভেবে তিনিও তাঁর ভাই আবু তালিবকে নিষেধ করলেন তাঁকে খাদিজার কাছে পাঠানোর জন্য। বরং তিনি নিজে গিয়ে প্রথমে আলাপ করলেন মুহাম্মদের আমানতদারি এবং তাঁর নিষ্কলুষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে।

আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিব খাদিজার কাছে মুহাম্মদের ব্যাপারে বলার আগে আরও বেশ কয়েকজন কুরাইশি ব্যক্তি খাদিজার কাছে এসেছে এ কাজে নিয়োগ পাওয়ার জন্য। কিন্তু খাদিজা তাদের সবার জীবনবৃত্তান্ত ঘেঁটে দেখেছেন–এরা কোনোভাবেই নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী নয়। কেউ হয়তো পরনারীতে আসক্ত, কেউবা শরাবে আসক্ত, কেউ জুয়া-পাশার দানে পারঙ্গম, কারও বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলাটা বৃথা, কেউ আবার ব্যবসার আদর্শলিপি সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ। তিনি প্রতিদিন এ রকম লোকদের সাক্ষাৎ পাচ্ছিলেন আর দু-এক কথা বলে তাদের বিদায় করে দিচ্ছিলেন। মনের ছাঁচে যার ছবি আঁকা, সে ছবির সঙ্গে মিলছিল না কারও কায়া।

ভ্রাতৃবধূ আতিকার কাছে মুহাম্মদের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে খাদিজার ভেতরে অন্য রকম এক কম্পন শুরু হয়ে গেল। মুহাম্মদ! আহমদ! আল-আমিন! এই কি সেই ব্যক্তি? এই কি সেই সত্যধারা প্রবাহের শেষ সমীরণ? ওয়ারকার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেই নাম, সেই বংশ, চারিত্রিক উৎকর্ষে সেই রাজটীকা, ভদ্রতা আর মানবতায় যিনি তুলনাহীন, যাঁর সত্যবাদিতা আর বিশ্বস্ততার কাহিনি সুবিদিত পুরো মক্কায়! এ মুহাম্মদ কি সেই তিনি নন? আহা! কোথায় খুঁজেছি এত দিন তাঁকে আমি? অধীর হয়ে তাঁর অপেক্ষায় প্রতীক্ষমাণ থেকেছি। হৃদয় থেকে উৎসারিত হতে লাগল–এত দিন কোথায় ছিলেন?

খাদিজা দেরি না করে খবর পাঠালেন আবু তালিবের কাছে। আবু তালিব মুহাম্মদকে না পাঠিয়ে নিজে এলেন। মুহাম্মদকে পাঠানোর আগে কিছু বিষয়ে আলোচনা করে নেওয়া দরকার। তিনি খাদিজার কাছে এসে তাঁর ভাতিজার

www.pathagar.com

উত্তম গুণাবলি বর্ণনা করলেন। এটা করলেন যতটা না খাজিদাকে বোঝাতে, তাঁর চেয়ে নিজের হৃদয়ের দুশ্চিন্তা ও শঙ্কা প্রশমন করতে। কেননা তিনি এর আগে মুহাম্মদকে নিয়ে যখন দামেস্ক সফর করেছিলেন, তখন এক ইহুদি পাদরির মুখে ভাতিজার ব্যাপারে অস্বাভাবিক কিছু কথা শুনেছিলেন। সে কথাগুলো এখনও তাঁর মনে পাথরের মতো ভারী হয়ে আছে। তিনি কারও কাছে তা প্রকাশ করতে পারেননি। কেননা এ সময়ের ইহুদিরা যদি মুহাম্মদের এমন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানতে পারে, তবে তাঁকে হত্যা করতে কসুর করবে না মোটেও। হিংসার বশবর্তী হয়ে এর আগে তারা নবি ঈসা (আ.)-কে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। তারও আগে তারা হত্যা করেছে শত শত নবিকে। এই ভয়ে ভাতিজাকে তিনি সব সময় নিজের কাছে আগলে রাখেন।

খাদিজার কাছে মুহাম্মদের ব্যাপারে বলার পর তিনি দাবি করলেন–অন্যদের আপনি আপনার ব্যবসা পরিচালনার জন্য যে পারিশ্রমিক প্রদান করেন, মুহাম্মদকে তার দ্বিগুণ দিতে হবে। কেননা তাঁর ব্যক্তিত্ব অন্য সবার চেয়ে আলাদা, ব্যবসায়িক হিসেবে তাঁর সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততাও অন্যদের থেকে তুলনাহীন। সুতরাং একটি নয়, পারিশ্রমিক হিসেবে তাঁকে দুটি উট প্রদান করতে হবে।

খাদিজা আবু তালিবের কথা মন দিয়ে শুনছিলেন। তিনি কি সত্যিই আবু তালিবের কথা শুনছিলেন? তাঁর শারীরিক অবয়ব উপবিষ্ট ছিল আবু তালিবের সামনে, কিন্তু সমগ্র অন্তরাত্মা ভেসে বেড়াচ্ছিল অন্য কোথাও। তাঁর চোখ খোলা, কিন্তু তাঁর চোখের তারায় ঝিকমিক করছিল অন্যলোকের অপার্থিব ছায়াছবি।

খাদিজা আবু তালিবের কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। আবু তালিব যা দাবি করলেন, সব বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিলেন। যাঁর পায়ের সামনে লুটিয়ে দিতে পারেন তাঁর সমস্ত সর্বস্ব, সেখানে দুটি উট তো তাঁর কাছে তুচ্ছ। তিনি আবু তালিবকে শুধু বলতে পারলেন, 'হে আবু তালিব! আপনি আপনার ভাতিজার জন্য যা দাবি করেছেন তা অসাধ্য নয় এবং তা সন্তোষজনক পারিশ্রমিক। আমি শপথ করে বলছি, আপনি যদি এর চেয়ে অধিক কিছু দাবি করতেন, তবে আমি তা দিতেও প্রস্তুত।'

যুবক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম খাদিজার কাছে এলেন ব্যবসার যাবতীয় নির্দেশনা বুঝে নেওয়ার জন্য। খাদিজা নির্ণয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন এ যুবকের দিকে। আগে যদিও দু-একবার তাঁদের দেখা হয়েছে, কিন্তু এবারকার সাক্ষাৎ একেবারেই অন্য রকম। বিশেষত খাদিজার

www.pathagar.com

কাছে তো এ চন্দ্রাভিযানের সমতুল্য। তাঁর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ঘুরে বেড়াতে লাগল মুহাম্মদের মুখাবয়ব, তাঁর চাহনি, কথা বলার ভঙ্গি, অঙ্গচালনা, তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিটি সূক্ষ্ম প্রকাশে।

খাদিজার চোখজুড়ে মুগ্ধতা ছড়িয়ে আছে। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সেই মানব। সত্যিই কি তিনি? হৃদয় অলিন্দে এখনো কয়েক বিন্দু দোলাচল জমে আছে। না, তিনি কোনো সন্দেহের দোলাচলে দুলতে রাজি নন। তিনি তাঁকে তুলে ধরতে চান সকল সন্দিগ্ধতার ঊর্ধ্বে। হৃদয় থেকে যখন মুছে যাবে সন্দেহের সকল তমসা, তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন।

খাদিজা তাঁর বিশ্বস্ত ক্রীতদাস মায়সারাকে একান্তে ডাকলেন। প্রথমেই তাঁকে জানালেন, এই বাণিজ্য সফরে তাঁকে মুহাম্মদের ভৃত্য হয়ে যেতে হবে। কিন্তু এটা তাঁর মূল দায়িত্ব নয়, তাঁর কাজ হচ্ছে মুহাম্মদের ছায়াসঙ্গী হয়ে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করা। তাঁর প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথা, অন্যদের সঙ্গে আলাপচারিতা, ব্যবসায়িক আলোচনা সব যেন তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেন। শুধু তা-ই নয়, যাওয়া-আসার পথে প্রতিটি ঘটনা তাঁকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখতে হবে। মুহাম্মদের একটি কদমও যেন তাঁর অগোচরে কোথাও না পড়ে।

নির্দিষ্ট সময়ে প্রস্তুতি সম্পন্ন করে কাফেলা রওনা হলো সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের পথে।

পাঁচ

বাণিজ্য কাফেলা পৌঁছে গেল দামেস্কে। দামেস্কের বিরাট বাজার। রোম-পারস্য, আরব, আফ্রিকা আর হিন্দুস্তানের বড় বড় ব্যবসায়ীরা নানা রকম পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসেছেন। চারদিকে ব্যবসায়ী আর বাজারিদের হাঁকডাক। মানুষের পদচারণে মুখর চারপাশ। ঘোড়া, উট, গাধার হ্রেষা যেন নরক গুলজার করে রেখেছে পুরো দামেস্ক বাজার।

মুহাম্মদ তার বাণিজ্যবহর নিয়ে বাজারের নির্দিষ্ট জায়গায় তাঁবু গাড়লেন। পণ্য সাজিয়ে বসে গেলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। মায়সারা চোখে চোখে রাখছেন মুহাম্মদকে। মুহাম্মদের প্রতিটি কাজ দেখতে দেখতে নিজেই যেন মুহাম্মদের ব্যক্তিত্বের প্রেমে পড়ে যাচ্ছেন। এমন নিষ্কলুষ আর কোমল হৃদয়ের মানুষও হয় এ পৃথিবীতে!

www.pathagar.com

মায়সারা কোনো এক কাজে একটু অন্যদিকে গিয়েছিলেন। হঠাৎ শুনলেন মুহাম্মদের সামনে দাঁড়িয়ে এক ইহুদি ব্যক্তি তর্ক করছেন। লোকটি উচ্চস্বরে বলছিলেন, 'তোমার কথার ব্যাপারে সত্যবাদী হলে তুমি লাত ও উজ্জা দেবতার নামে শপথ করো।'

মুহাম্মদ মাথা নাড়লেন। যাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে ভরে দেওয়া হয়েছে একত্ববাদের সুদৃঢ় সিলমোহর, যাঁর হৃদয়কে আলোকিত করা হয়েছে আল্লাহর আসমাউল হুসনা দিয়ে, তিনি কীভাবে শপথ করবেন ভস্মীভূত মাটির তৈরি দেবতার নামে? লোকটি যতবার মুহাম্মদকে বলছেন শপথ করতে, মুহাম্মদ ততবারই অস্বীকার করে বলছেন, 'অসম্ভব! আমি কখনো এসবের নামে শপথ করব না। বরং আমি তো এগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমার মুখ ফিরিয়ে নিই।'

মায়সারা মুহাম্মদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। কয়েকবার বলার পরও মুহাম্মদ যখন লাত-উজ্জার নামে শপথ করলেন না, তখন লোকটি পিছু হটে মায়সারাকে টেনে একদিকে নিয়ে গেলেন। মুহাম্মদকে দেখিয়ে বললেন, 'কখনো তাঁর সঙ্গ ত্যাগ কোরো না। কোনো সন্দেহ নেই, তিনি একজন নবি। শেষ নবি।'

মায়সারা আরেকবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন যুবক মুহাম্মদের দিকে। খাদিজার কাছে বলার মতো দারুণ একটা তথ্য এইমাত্র তিনি আত্মস্থ করলেন।

মায়সারা জানেন না, তাঁর মুগ্ধতা কেবল শুরু হয়েছে। ভবিষ্যৎ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে আরও বিস্ময় নিয়ে।

সুচারুভাবে দামেস্কের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড শেষ হলো। মুহাম্মদ যে পণ্য নিয়ে এসেছিলেন দামেস্কের বাজারে, বেশ ভালো দামে বিক্রি করেছেন সেগুলো। পুঁজিগত মূলধন দিয়ে এখান থেকে নতুন করে আবার পণ্য কিনে নিয়ে যেতে হবে মক্কায়। বাজার ঘুরে সুবিধাজনক দামেই কিনতে পারলেন কাঙ্ক্ষিত পণ্য।

এবার ফেরার পালা। সব পণ্য উট ও গাধার পিঠে সাজিয়ে মক্কার পথ ধরলেন যুবক ব্যবসায়ী মুহাম্মদ। দীর্ঘ পথ। একদিন দুপুরবেলা পথক্লান্তিতে বুসরা নামক এক জায়গায় এসে যাত্রাবিরতি করলেন তিনি। কাফেলা থামিয়ে একটি গাছের নিচে গিয়ে বসলেন। দুপুর রোদে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা করবেন মক্কার পথে।

www.pathagar.com

মায়সারা কাছেই বসে পড়লেন। দুপুরের খাবারের আয়োজনটা সেরে ফেলবেন এই ফাঁকে। এমন সময় দেখলেন, দূর থেকে অপরিচিত এক বৃদ্ধলোক হন্তদন্ত হয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। লোকটি তাঁর দিকে এগিয়ে এলেও গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বিশ্রামরত মুহাম্মদের দিকে। মায়সারা লোকটির দৃষ্টির গভীরতা দেখে সচকিত হয়ে উঠলেন।

লোকটিকে দেখেই মায়সারা চিনলেন–তিনি খ্রিষ্টবিশ্বাসী নেস্তরিয়ান একজন পাদরি। নেস্তরিয়ান পাদরিটি হাঁপাতে হাঁপাতে মায়সারার কাছে এসে মুহাম্মদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'ওই যে গাছের নিচে যে লোকটি বিশ্রাম নিচ্ছেন, কে তিনি? চেনো তাঁকে?'

মায়াসারা কৌতূহলী হলেন। কেননা এর আগে তিনি দামেস্কের বাজারে নতুন কিছু শুনেছেন মুহাম্মদের ব্যাপারে। এ পাদরিও কি তেমন কোনো কথা বলবেন? তিনি বেশ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন, 'তিনি মুহাম্মদ। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ। মক্কার হাশিম গোত্রের একজন যুবক।'

পাদরির ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল। তিনি মায়সারার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি যা জানি, তুমি তা জানো না। শুনে রাখো–আমি শপথ করে বলছি, এই গাছের নিচে যিনি বসে আছেন, তিনি একজন নবি ছাড়া আর কেউ নন!'

মায়সারা আবার বিস্মিত হলেন। খাদিজা কি এ কারণেই তাঁকে মুহাম্মদের ছায়াসঙ্গী করে পাঠিয়েছেন? এ কারণেই কি তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করতে বলেছেন? খাদিজা কি মুহাম্মদের ব্যাপারে এই ভবিষ্যদ্বাণী আগে থেকেই জানেন?

পাদরির প্রশ্নে মায়সারার চিন্তায় ছেদ পড়ল। পাদরি তাঁর কাছে মুহাম্মদের ব্যাপারে আরও প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। মুহাম্মদের জন্ম, বেড়ে ওঠা, তাঁর বংশ, তাঁর চারিত্রিক বলয়, তাঁর প্রভাব ও স্বভাব, তাঁর লেনদেন–সব বিষয়ে তিনি মায়সারাকে প্রশ্ন করতে লাগলেন। মায়সারা একে একে তাঁর সব কথার উত্তর দিলেন। সেই সঙ্গে সদ্য দামেস্ক বাজারে সংঘটিত বিতর্কের কথাটি বলতেও ভুললেন না।

মায়সারার কথা শুনে নেস্তারিয়ান পাদরি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি ছুটে গেলেন বিশ্রামরত মুহাম্মদের কাছে। তিনি তাঁর কপালে চুমু খেয়ে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে পায়ের কাছে বসে পড়লেন। মুহাম্মদ খ্রিষ্টান পাদরির এমন অকস্মাৎ প্রগলভতায় খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু পাদরির সেদিকে খেয়াল নেই। তিনি মুহাম্মদের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের

www.pathagar.com

সঙ্গে ঘোষণা করলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি সেই প্রতিশ্রুত নবি, যাঁর ব্যাপারে তাওরাত ও ইঞ্জিলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।'

মায়সারা কাছ থেকে পাদরির কথা শুনলেন এবং তাঁর চলে যাওয়া প্রত্যক্ষ করলেন। এবার তাঁর দায়িত্ব যেন আরও বেড়ে গেল। নতুন নতুন প্রতিটি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর তিনি আরও মনোযোগী হয়ে মুহাম্মদের সর্বদিকে খেয়াল দেওয়া শুরু করলেন। প্রতিটি ঘটনা খাদিজার কাছে পেশ করার উত্তেজনায় তিনি অস্থির হয়ে আছেন।

খানিক বিশ্রামের পর কাফেলা আবার রওনা হলো। মায়সারার অভ্রভেদী চোখ সারাক্ষণ মুহাম্মদের ওপর। এক মুহূর্তের জন্যও আর তাঁকে আড়াল করা চলবে না।

দুপুরের তেজি রোদ বেশ তাতানো এখনো। দুরন্ত সূর্য যেন আগুনের হলকা ছোটাচ্ছে পথজুড়ে। মরুর চিকচিক মরীচিকায় চোখ রাখা দায় হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মায়সারা দেখলেন, মুহাম্মদ যেখান দিয়ে উট নিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে সূর্যের আলো ম্রিয়মাণ। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। অবাক কাণ্ড! আকাশের নীলিমায় এক খণ্ড ধূসর মেঘ মুহাম্মদের মাথার ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। তিনি নিরীক্ষণের জন্য মেঘখণ্ডের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সত্যি, মুহাম্মদ যে পথ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, মেঘও ঠিক তাঁর মাথার ওপর দিয়ে সেদিকেই যাচ্ছে। দীর্ঘ কাফেলার আর সবখানে সূর্য ঝরাচ্ছে মধ্যাহ্নের গনগনে কিরণ, শুধু মুহাম্মদের মাথার ওপর এক খণ্ড মেঘ তাঁকে শীতল ছায়া দিয়ে যাচ্ছে নিরলসভাবে। মায়সারার চোখ এ দৃশ্য দেখে ছানাবড়া হয়ে গেল। মনে মনে আওড়ালেন–ধন্য তুমি মুহাম্মদ! ধন্য কুরাইশ রাজকুমারী খাদিজা!

ছয়

খাদিজার দিন যেন ফুরোয় না। প্রতিদিন তিনি মুহাম্মদের কাফেলার জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনছেন। কাফেলার জন্য, নাকি মুহাম্মদের জন্য? হয়তো তা-ই হবে। হয়তো অপেক্ষা করছেন মায়সারার জন্য, মুহাম্মদ সম্পর্কে সবকিছু জানার ব্যাপারে তিনি উদ্গ্রীব। প্রতিদিন বাড়ির দোতলা থেকে তিনি চেয়ে থাকেন সিরিয়ার পথপানে, কখন আসবে দামেস্কি কাফেলা!

অবশেষে কাফেলার আগমনী পদধ্বনি শোনা গেল মক্কার উপকণ্ঠে। খাদিজার বুকের স্পন্দন তীব্র থেকে তীব্র হতে লাগল–কী খবর নিয়ে এসেছেন মায়সারা? কেমন আছেন মুহাম্মদ? পথে কোনো বিপদ হয়নি তো? ব্যবসায়িক

www.pathagar.com

পণ্যের ব্যাপারে তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই। ব্যবসা যা হওয়ার হোক, সবার আগে তাঁকে মুহাম্মদের খবর শুনতে হবে!

মুহাম্মদ বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে সরাসরি চলে গেলেন মক্কার বাজারে। সেটাই নিয়ম। দামেস্ক থেকে আমদানি করা সমুদয় পণ্য মক্কার বাজারে বিক্রি করে যাবতীয় হিসাব দাখিল করতে হয় নিয়োগদাতার কাছে। তাই তিনি খাদিজার বাড়িতে না এসে পণ্য নিয়ে মক্কার বাজারে গিয়ে সওদাগরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যত দ্রুত সম্ভব তিনি এ কাজ সমাপ্ত করতে আগ্রহী।

মায়সারার সে দায় নেই। ব্যবসায়িক কাজের কোনো ফিরিস্তি তাঁকে দিতে হবে না। তাঁর কাজ ছিল সফরে মুহাম্মদের দেখভাল করা এবং তাঁর ছায়াসঙ্গী হয়ে সবকিছু অবলোকন করা। এখন তাঁর দায়িত্ব শেষ, আর দেরি না করে তিনি চলে এলেন খাদিজার কাছে। মুহাম্মদের ব্যাপারে চমকপ্রদ সব সংবাদ জমা করে নিয়ে এসেছেন খাদিজার জন্য। যে পর্যন্ত সেগুলো তাঁকে না জানাবেন, সে পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই। এত দিন পর্যন্ত অনেক কষ্টে বুকের ভেতর আটকে রেখেছেন অবিশ্বাস্য কথামালা।

খাদিজা মায়সারার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আসতেই তাঁকে একান্তে ডেকে পাঠালেন। কৌতূহল বেশিক্ষণ চাপা দিয়ে রাখতে পারলেন না, জানতে চাইলেন তাঁর প্রতিবেদন। মায়সারাও অপেক্ষা করতে করতে পেরেশান। তাঁর চোখে-মুখে উত্তেজনার ছাপ। তিনি সবিস্তারে বলতে শুরু করলেন একদম প্রথম থেকে–দামেস্ক যাওয়ার পথে যা ঘটেছে, যা ঘটেছে দামেস্কের বাজারে ইহুদি ব্যক্তির সঙ্গে তর্ক করার সময়, ফেরার পথে নেস্তরিয়ান খ্রিষ্ট পাদরি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, আকাশ থেকে ছায়া দানকারী সেই মেঘখণ্ড, মুহাম্মদের ব্যবসায়িক সততা, ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে তাঁর স্বচ্ছতা, অন্য আর সবার সঙ্গে চারিত্রিক আচরণ–সব তিনি খুলে বললেন খাদিজার কাছে। এ কদিনের জমানো সব কথা একনাগাড়ে বলে গেলেন।

খাদিজার হৃদয় খুশিতে আত্মহারা হওয়ার জোগাড়। কিন্তু মায়সারার সামনে সেটা প্রকাশ করলেন না। তাঁর সঙ্গে আরও কিছু কথা বলে তাঁকে বিদায় করে দিলেন। এবার তাঁর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা। খাদিজা মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন।

খাদিজার চোখে-মুখে বেহেশতি দ্যুতি খেলা করছে। তাঁর হেঁটে চলার ছান্দসিক গতি দেখে মনে হচ্ছে, তাঁর যেন আজ দুটো ডানা গজিয়েছে। পাখির মতো ফুরফুরে হালকা হয়ে উড়ে যাচ্ছেন ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের বাড়ির দিকে। আজ তিনি ভয়হীন, নিঃশঙ্ক তাঁর হৃদয়। সন্দেহের সকল জড়তা উধাও

www.pathagar.com

হয়ে গেছে তাঁর অন্তর থেকে। অবশেষে তাঁর অপেক্ষার দীর্ঘ প্রহর শেষ হতে চলেছে। আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষের জন্য তাঁর ভালোবাসা পূর্ণতা পেতে চলেছে আজ।

খাদিজা খুশির আবাহন নিয়ে এলেন ওয়ারাকার কাছে। মায়সারার কাছে যা শুনেছেন মুহাম্মদের ব্যাপারে, সব খুলে বললেন। সব শুনে ওয়ারাকার দৃষ্টিহীন চোখেও চিকচিক করে উঠল আনন্দাশ্রু। তাঁর এত দিনের প্রতীক্ষা তবে শেষ হলো! সেই সে মহামানবকে তিনি নিজ চোখে দেখতে না পারলেও তাঁকে স্পর্শ করতে পারবেন, তাঁর কথা শুনতে পাবেন। সুযোগ হলে হয়তো তিনি তাঁর নবুওয়াতের রোশনিতেও বিভাসিত হতে পারবেন। বরিত হতে পারবেন শেষ নবির সম্মানিত উম্মত হিসেবে।

ওয়ারাকা খাদিজার কথা শুনে বলে উঠলেন, 'খাদিজা, বোন আমার! তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে মুহাম্মদই এ যুগের নবি। আমি বিশ্বাস করি, এই সেই সময়, যখন নবির আগমন অবশ্যম্ভাবী। সময় সমাগত, এখন কেবল অপেক্ষার পালা।'

সবকিছুই মুহাম্মদের নবি হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছিল। সব নিদর্শন খাদিজার অনুকূলে। কিন্তু খাদিজা কী করবেন এখন? যদি সত্যিকার অর্থেই মুহাম্মদ নবি হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি হন, তাহলে খাদিজা কীভাবে মুহাম্মদের সঙ্গে নিজেকে জড়াবেন? এমন প্রশ্ন এবার বাসা বাঁধল খাদিজার মনে।

মুহাম্মদের পণ্য বিকিকিনি শেষ হলো একসময়। তিনি সব হিসাব বুঝিয়ে দিতে এলেন খাদিজার কাছে। অন্যান্যবার যে পরিমাণ মুনাফা হয়, এবার তার চেয়ে দ্বিগুণ মুনাফা হয়েছে খাদিজার আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়। কিন্তু ব্যবসার মুনাফার দিকে খাদিজার তাকিয়ে দেখার আগ্রহ নেই। তিনি কেবল তাঁর সামনে উপবিষ্ট মুহাম্মদের দিকে তাকিয়ে আছেন। এ যেন এক মহাকালের পরিচয়। অনন্তকাল থেকেই যেন খাদিজা চেনেন মুহাম্মদের এ মুখশ্রী। কী প্রশান্ত, কী প্রাণোচ্ছল! ঐশ্বরিক দ্যুতিতে ঝলমল করছে তাঁর মানব অবয়ব।

কিন্তু খাদিজা কীভাবে বলবেন তাঁর হৃদয়ের অভিব্যক্তি? নিজের অপারগতায় মুষড়ে যেতে থাকেন তিনি। এত দিন মুখে বলাটা যত সহজ ছিল, এখন কাজে পরিণত করাটা তার চেয়ে অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

বয়সের তারতম্যের বিষয়টি তো রয়েছেই, তা ছাড়া খাদিজা এত দিন মক্কার সব বড় বড় ব্যবসায়ী, গোত্রপতি, বীরদের বিয়ের প্রস্তাব না করে দিয়েছেন। এ বয়সে আর বিয়ে করবেন না বলে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

কিন্তু মুহাম্মদের প্রতি মুগ্ধতা তাঁর সকল প্রতিজ্ঞা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আল্লাহর প্রেরিত পুরুষের সহধর্মিণী হওয়ার সৌভাগ্যের পরশমণি তাঁর হৃদয়কে ব্যাকুল করে তুলেছে। কী করবেন কিছুই বুঝতে পারছিলেন না।

খাদিজা সারা দিন মনমরা হয়ে বসে থাকেন। মুহাম্মদের কথা ভেবে ভেবে পেরেশান হন। এত কাছে পেয়েও তিনি তাঁকে হারাবেন? আল্লাহর এত বড় উপহার করতলে আসার পরও তিনি গ্রহণ করতে পারবেন না? তাঁর চোখজুড়ে জমা হয় বেদনার অশ্রু।

মাঝেমধ্যে তিনি ওয়ারাকার কাছে গিয়ে বিষণ্ন মন নিয়ে বসে থাকেন। পণ্ডিত ওয়ারাকা তাঁর বোনের এমন বেকারারি দেখে অস্থির হয়ে ওঠেন। তাঁকে পরামর্শ দেন আর কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরার। আল্লাহ যেহেতু একবার মুহাম্মদের ভালোবাসায় খাদিজার হৃদয় আলোকিত করেছেন, নিশ্চয় তিনি এ আলোকে অন্ধকারে হারাতে দেবেন না।

সাত

দামেস্কের বাণিজ্য কাফেলা মক্কায় আসার পর তিন মাস গত হয়েছে। এর মধ্যে খাদিজা কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। একবার ভেবেছেন–সবকিছু পেছনে ফেলে এখনই গিয়ে মুহাম্মদের পাণিপ্রার্থী হবেন। আবার চিন্তা করেছেন–লোকজন কী বলবে? এ এমন এক ভাবনা, কারও কাছে মন খুলে বলা যায় না। তিনি ছোট্ট কিশোরীটি নন যে, যার তার কাছে হৃদয়ের ভালো লাগা প্রকাশ করবেন। তিনি পরিণীতা, নিজের মনোবেদনা নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন।

এরই মধ্যে একদিন খাদিজার অন্তরঙ্গ বান্ধবী নাফিসা এলেন তাঁর বাড়িতে। নাফিসা বিনতে মুনিয়া সময়-সুযোগ পেলেই খাদিজার বাড়িতে আসেন। এবার আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে, বেশ কিছুদিন তিনি বান্ধবীকে দেখতে আসেননি। কিন্তু এবার এসে খাদিজাকে কিছুটা অন্য রকম দেখতে পেলেন। এ খাদিজা আগের সেই ব্যক্তিত্বময়ী দৃঢ়প্রত্যয়ী খাদিজা নন। তাঁর মধ্যে একধরনের অস্থিরতা বিরাজমান। তাঁর কথার মধ্যে কেমন যেন অসংলগ্নতা। কী হয়েছে খাদিজার? মনে মনে ভাবতে লাগলেন নাফিসা।

খাদিজার অস্থিরতা লক্ষ করে একসময় নাফিসা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে তোমার, খাদিজা? কোনো সমস্যা হয়নি তো? আমি তো অনেক দিন থেকে তোমাকে জানি, কিন্তু এমন অস্থির তো তোমাকে কখনো দেখিনি?'

www.pathagar.com

নাফিসার কথায় খাদিজা কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না, চুপ করে রইলেন। আবার ভাবলেন, নাফিসা তো তাঁর অন্তরঙ্গ বান্ধবী। কারও না কারও কাছে তো বিষয়টি বলতেই হবে। না বললে সমস্যার সমাধান হবে না। অগত্যা শেষমেশ মুখ খুললেন, 'নাফিসা, সখী আমার! আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদকে তো তুমি জানো। তিনি চারিত্রিক উৎকর্ষে প্রতিপালিত একজন যুবক। তাঁর মতো চারিত্রিক নিষ্কলুষতাসম্পন্ন যুবক এর আগে আমি আর দেখিনি। তিনি সৎ, বিশ্বস্ত এবং পবিত্র একজন মানুষ। এমন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আগ্রহ যে কাউকে আকর্ষণ করবে। শুধু তা-ই নয়; তাঁর ব্যাপারে অনেক ঐশ্বরিক ও অলৌকিক ঘটনাও প্রকাশ পেয়েছে। অদ্ভুত সব বিষয় আমি জেনেছি। আমার ক্রীতদাস মায়সারা আমাকে তাঁর সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো বলেছে। এক খ্রিষ্টান পাদরি ভবিষ্যদ্বাণী করেছে তাঁর ব্যাপারে। দামেস্ক থেকে কাফেলা নিয়ে ফেরার পথে মেঘ তাঁকে ছায়াদান করেছে। এসব কথা যখন আমি শুনছিলাম, তখন আমার আমি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। আমি বিশ্বাস করি, মুহাম্মদ সেই নবি, যাঁর জন্য যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করা হচ্ছে।'

বলতে বলতে খাদিজার চোখ-মুখ আগ্রহে জ্বলজ্বল করতে লাগল। মুহাম্মদের কথা বলতে গিয়ে কখন যে তাঁর মুখাবয়বে রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে, তিনি খেয়াল করেননি।

ও আচ্ছা, ঘটনা তাহলে এই! নাফিসা বান্ধবীর রক্তিম মুখ দেখে বিষয়টির আদ্যোপান্ত আন্দাজ করতে পারলেন। ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমির হাসি লুকিয়ে আগ বাড়িয়ে বললেন, 'হলোই-বা তিনি বিশেষ কেউ! কিন্তু তাঁর সঙ্গে তোমার এই দীর্ঘ দিন-রজনীর অস্থিরতার কী সম্পর্ক?'

খাদিজা এবার আর কোনো বক্তব্যে গেলেন না। সরাসরি নাফিসার কাছে নিজের মনোবাসনা মুক্ত করলেন, 'আমি তাঁর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চাই। কিন্তু জানি না এ কাজে আমি কীভাবে এগোব।'

বান্ধবীর এমন উদার আত্মসমর্পণে খুশিতে ভরে গেল নাফিসার হৃদয়। এমন শুভকাজে নাফিসা এগিয়ে না এসে পারেন না। তিনি নিজে এ কাজের দায়িত্ব নিলেন, 'তোমার যদি সম্মতি হয়, তাহলে এ ব্যাপারে আমি অগ্রসর হতে পারি।'

খাদিজা বান্ধবীর সহসা সহযোগিতার কথা শুনে আপ্লুত হলেন, 'তুমি অগ্রসর হও, বাদবাকি আল্লাহর হাতে।'

www.pathagar.com

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন চাচা আবু তালিবের বাড়িতে ছিলেন। বাড়িতে আবু তালিব এবং তাঁর স্ত্রীও ছিলেন। এমন সময় সেখানে নাফিসা এলেন। আবু তালিবের স্ত্রীকে সালাম দিয়ে নাফিসা বসে গেলেন সেখানে। এ কথা সে কথা জিজ্ঞেস করলেন কিছুক্ষণ। একটু পর মুহাম্মদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, আপনি এখনো বিয়ে করছেন না যে?'

প্রশ্নটা হঠাৎ হয়ে গেল, মুহাম্মদ এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তিনি সহজভাবে জবাব দিলেন, 'বিয়ে করার মতো প্রয়োজনীয় সম্পদ নেই আমার! তেমন অবস্থা হলেই বিয়ে করে ফেলব।'

নাফিসা কথা বাড়াতে লাগলেন, 'অর্থ-সম্পদ বিয়ের জন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়। অর্থ-সম্পদ খুব সহজেই ফুরিয়ে যেতে পারে, ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সততা, বিশ্বস্ততা, সচ্চরিত্র চিরকালীন; আপনার এ বিষয়টিও ভেবে দেখা দরকার!'

মুহাম্মদের আগ্রহ দেখে তিনি কথা সামনে নিয়ে চললেন, 'অর্থ-সম্পদের বিষয়টি বাদ দিন। এমন কেউ যদি আপনাকে প্রস্তাব দেয়, যার পর্যাপ্ত অর্থ-সম্পদ ও সম্মান-প্রতিপত্তি রয়েছে এবং বংশমর্যাদায়ও যিনি অভিজাত, তাহলে কি আপনি বিয়ের জন্য রাজি হবেন?'

নাফিসা প্রকারান্তরে বোঝাতে চাইলেন, এমন একজন রয়েছেন, যিনি আপনার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে ইচ্ছুক। মুহাম্মদের মনে স্বাভাবিক কৌতূহল জেগে উঠল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এ রকম মেয়ে...কে তিনি?'

নাফিসা এক মুহূর্ত দেরি করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে নামটি উচ্চারণ করলেন, 'খাদিজা।'

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম খাদিজার নামটি শুনে কিছুটা অবাক হলেন হয়তো। কিছুদিন আগেই মাত্র তিনি তাঁর ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে দামেস্ক থেকে ব্যবসা করে এলেন। খুব সংক্ষিপ্ত সময় তাঁরা কিছু কথাও বলেছেন। কিন্তু তাই বলে খাদিজার মতো সম্পদশালী নারী তাঁকে বিয়ে করার ব্যাপারে আগ্রহী? মক্কার ধনী আর প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাঁকে বিয়ে করার জন্য উদ্‌গ্রীব। সেখানে তাঁর মতো চাল-চুলোহীন এতিমকে খাদিজা সম্মানিত করতে চাচ্ছেন? তিনি একটু আশ্চর্য হয়ে নাফিসাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কীভাবে সম্ভব?'

নাফিসা মুহাম্মদের চেহারায় সম্মতির নীরব আলোড়ন দেখতে পেয়ে আরেকটু সাহসী হলেন। মুহাম্মদকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'কীভাবে সম্ভব সেটি আমার ওপর ছেড়ে দিন। এ বিষয়টি আমি দেখব।'

www.pathagar.com

নাফিসা আর কথা বাড়ালেন না। বান্ধবীর জন্য এটুকু করতে পারা তাঁর জন্য অনেক সৌভাগ্যের। বান্ধবীকে এখনই খুশির সংবাদটা জানাতে হবে।

খাদিজা নাফিসার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। নাফিসা আসতেই তিনি জানতে চাইলেন কী ঘটল আবু তালিবের বাড়িতে। নাফিসা সবিস্তারে তাঁকে জানালেন মুহাম্মদের মনোভাবের কথা। নাফিসার আশ্বস্তবাণী শুনে খাদিজা চোখ বন্ধ করে ফেললেন। অদৃশ্য প্রভুর দরবারে শোকরিয়া আদায় করলেন মনে মনে। একই সঙ্গে তিনি এটাও ভাবলেন, মুহাম্মদ যেহেতু এ বিয়েতে সম্মত, সুতরাং আর দেরি করা উচিত নয়। তিনি মুহাম্মদের নামে এক বার্তা পাঠালেন–

'হে মুহাম্মদ! আমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল আমি আপনার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হব। কারণ, আমরা একই বংশের। আপনার বিশ্বস্ততা, সততা, চারিত্রিক উৎকর্ষ আমাকে মুগ্ধ করেছে। এ কারণে আমি আপনার প্রতি আগ্রহী হয়েছি। আপনি আপনার চাচাকে বিয়ের সকল বন্দোবস্ত করতে বলুন।'

মুহাম্মদ খাদিজার সম্মতিসূচক বার্তা জানালেন চাচা আবু তালিবকে। আবু তালিব এ সংবাদ শুনে খুশি হলেন। তিনি খাদিজার বাড়িতে গিয়ে তাঁকে এ বিয়ের জন্য মোবারকবাদ জানাতে ভুললেন না। খাদিজার পরে এ বিয়ে উপলক্ষে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন যিনি, তিনি আবু তালিব। তিনি তাঁর এ ভাতিজাকে অত্যধিক ভালোবাসেন এবং অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেন। তিনি জানতেন, তাঁর ভাতিজার মতো চরিত্রবান ও ভালো মানুষ এ পৃথিবীতে আর একজনও নেই। তাই খাদিজার মতো বিদূষী নারী যখন মুহাম্মদকে বিয়ে করার ব্যাপারে আগ্রহী হলেন, তখন তিনি অন্য আর সবার চেয়ে বেশি খুশি হবেন, এটাই স্বাভাবিক। প্রাণভরে দোয়া করলেন এ অনাগত দম্পতির জন্য।

আট

মক্কায় বিয়ের বিয়ের আয়োজন চলতে লাগল। কুরাইশ ছাড়াও অন্যান্য গোত্রের লোকজন জেনে গেল মুহাম্মদ ও খাদিজার শুভ পরিণয়ের কথা। সবাই এ যুগলবন্ধনকে আশীর্বাদ দিতে লাগল। তবে যারা এর আগে খাদিজাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছিল, তাদের অনেকে এমন সংবাদ শুনে রুষ্ট হলো। বিশেষত, আবু জেহেল খাদিজার সঙ্গে মুহাম্মদের বিয়ের কথা শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল, 'খাদিজা কি বিয়ে করার জন্য আবু তালিবের ঘরে আশ্রিত এক এতিম যুবক ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পেল না?'

www.pathagar.com

আবু জেহেলের কথায় কারও কিছু যায় আসে না। বর-কনে দুই পক্ষের আলোচনা সাপেক্ষে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল।

বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো খাদিজার বাড়িতে। বরপক্ষ থেকে মুহাম্মদের চাচা আবু তালিব ছাড়াও চাচা হামজা, আব্বাস এবং প্রাণপ্রিয় বন্ধু আবু বকর উপস্থিত হলেন। খাদিজার পক্ষ থেকে তাঁর পিতৃব্য উমর ইবনে আসাদ, ভাই আমর ইবনে খুয়াইলিদ এবং বন্ধুসম চাচাতো ভাই ওয়ারাকা উপস্থিত হয়ে বিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজনকে মহিমান্বিত করলেন।

আরবের রীতি অনুযায়ী বিয়ের অনুষ্ঠানে বর-কনে উভয়ের একজন করে অভিভাবক নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। অভিভাবকদ্বয় নিজেদের বক্তব্য পেশ করার পর আনুষ্ঠানিকভাবে বর-কনেকে পরস্পরের জীবনসঙ্গী হিসেবে ঘোষণা করেন এবং কনেকে বরের হাতে সোপর্দ করে দেন।

রীতি অনুযায়ী বরপক্ষের অভিভাবক হিসেবে মুহাম্মদের চাচা আবু তালিব উঠে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের ইবরাহিম ও ইসমাইল (আ.)-এর ঔরসে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সেই সত্তা, যিনি আমাদের এ জাতির নেতা বানিয়েছেন এবং পবিত্র ঘরের সেবা করার মধ্য দিয়ে আমাদের মানবতার সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন।'

ভূমিকার পর তিনি তাঁর ভাতিজার প্রশংসাবাক্য পাঠ করলেন, 'যখন আমার ভাই আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদের প্রসঙ্গ আসে, তখন স্বভাবতই তার সমকক্ষ কাউকে পাওয়া যাবে না। অর্থ-সম্পদের দিক থেকে যদিও সে নিঃস্বপ্রায়, কিন্তু তাঁর সততা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, সাহসিকতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সবার চেয়ে উন্নত। সম্পদ-বিত্ত একদিন শেষ হয়ে যাবে। এগুলো ক্ষণিকের উপকরণ মাত্র, মানুষকে ধোঁকায় ফেলে রাখে। সুতরাং, এখন আমি আপনাদের যে সংবাদ শোনাতে চাই, তা তার প্রতি আপনাদের ভালোবাসা আরও বাড়িয়ে দেবে। তিনি আপনাদের কন্যা খাদিজাকে বিয়ে করতে আগ্রহী। বিয়ের দেনমোহর হিসেবে ৫০০ দিরহাম ধার্য করা হলো। দেনমোহরের অর্ধেক বিয়ের আগে পরিশোধ করা হবে এবং বাকি অংশ বিয়ের পর পরিশোধ করা হবে।'

আবু তালিব এটুকু বলে বসে পড়লেন। এবার কনেপক্ষের অভিভাবকের বলার পালা। খাদিজার পিতা খুয়াইলিদ ইবনে আসাদ বেশ আগেই ফিজার যুদ্ধের সময় পরলোকগমন করেন। মুহাম্মদের মতো খাদিজাও এতিম। তাঁর সার্বিক অভিভাবকত্ব তাই তাঁর চাচা উমর ইবনে আসাদের হাতে সোপর্দ। চাচা উমর ইবনে আসাদ এবার উঠে দাঁড়ালেন। সমবেত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দিকে তাকিয়ে বক্তব্য শুরু করলেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের সৃষ্টি

www.pathagar.com

করেছেন। আমাদের আরবের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরিয়েছেন, যেমনটি আপনি বলছিলেন। আমরা আরবের মধ্যে তেজোদীপ্ত গোত্র। আপনারাও তা-ই। কেউই আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করতে পারবে না। সুতরাং, হে কুরাইশ বংশের সম্মানিত উপস্থিতি! আপনাদের সাক্ষী রেখে সেই সম্মানিত সত্তার নামে আমি খুয়াইলিদের কন্যা খাদিজাকে আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদের হাতে তুলে দিলাম এবং দেনমোহর হিসেবে প্রস্তাবিত পরিমাণ কবুল করে নিলাম।'

দুই অভিভাবকের বক্তব্যকে উপস্থিত অতিথিরা স্বাগত জানালেন। তবে আবু তালিব এমন বরকতময় বিয়েতে তাঁর ভাইদেরও শামিল করতে চাইলেন। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত তাঁর ভাইদের উদ্দেশ করে বললেন, 'মুহাম্মদের চাচারাও এ বিয়েতে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করুক।'

তাঁর কথায় চাচারা একে একে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়! মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ এবং খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদের বিয়েতে আমিও একজন সাক্ষী হলাম।'

বিয়ের আনুষ্ঠানিক কার্যাদি সম্পন্ন হলো। এবার বিয়ের ওলিমা ও উৎসবের পালা। খাদিজা কোনো কিছুর কমতি রাখেননি। আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য উট ও দুম্বা জবাই করা হয়েছে। মক্কার গণ্যমান্য অনেককেই দাওয়াত করা হয়েছে বিয়েতে। নানা পদের সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হলো সবাইকে।

মক্কার ছোট ছোট বাচ্চারা দফ ও তাম্বুরি বাজিয়ে নেচে-গেয়ে উৎফুল্লতা প্রকাশ করছিল। আরবের গোত্রীয় সংগীত গাইছিল মেয়েরা। সারা দিন উৎসবে রঙিন হয়ে রইল খাদিজার বাড়িটি।

তবে এত আনন্দ-উৎসবের মাঝেও খাদিজা স্বামী মুহাম্মদের উপস্থিতির ব্যাপারে সামান্য ঔৎসুক্য হারাননি। সবকিছুর বাইরে একটা চোখ তিনি সব সময় মুহাম্মদের দেখভালের ওপর রেখে দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, মুহাম্মদের স্বজন সম্বন্ধীয় যাঁকে যাঁকে পেয়েছেন, তাঁকেই দাওয়াত করে নিয়ে এসেছেন বিয়ে উৎসবে। এমনকি মুহাম্মদের দুধমাতা হালিমা সাদিয়াকেও দাওয়াত করে নিয়ে আসতে ভুল করেননি।

খাদিজা ভোলেননি, এই হালিমার দুধপান করে মুহাম্মদ বড় হয়েছেন। তাঁর শৈশবের পাঁচটি বছর কেটেছে হালিমার কোলে। মুহাম্মদকে ভালোবাসার প্রতিদানস্বরূপ তিনি হালিমাকে ৪০টি ভেড়া উপহার দিলেন এবং মুহাম্মদকে প্রতিপালন করার জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। বিদায়বেলায় সম্মানার্থে খাদিজা হালিমাকে বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে দিয়ে এলেন।

www.pathagar.com

নয়

খাদিজা ভুলে যাননি বারাকাহকেও, যিনি উম্মে আয়মান নামেই প্রসিদ্ধ। উম্মে আয়মান ছিলেন মুহাম্মদের পিতা আবদুল্লাহর ক্রীতদাসী। ক্রীতদাসী হলেও মুহাম্মদের পালকমাতা হিসেবে খাদিজা তাঁকে পরম মমতায় নিজের পরিবারভুক্ত করে নেন।

উম্মে আয়মানের জীবনকাহিনি একদিকে যেমন বেদনাবিধুর, তেমনি ঈর্ষণীয়। উম্মে আয়মানের বাড়ি ছিল ইথিওপিয়ায়, সেখান থেকে দুর্ভাগ্যক্রমে দাসী হিসেবে বিক্রি হয়ে যান দাসবাজারে। আবদুল্লাহ সদয় হয়ে তাঁকে নিজের ক্রীতদাসী হিসেবে কিনে আনেন। উম্মে আয়মান এ সময় নিতান্ত বালিকা।

উম্মে আয়মানকে কিনে আনার দুই সপ্তাহ পর আবদুল্লাহ বিয়ে করেন ইয়াসরিব নিবাসী আবদুল ওয়াহাবের কন্যা আমিনাকে। বিয়ের পর তিনি ক্রীতদাসী উম্মে আয়মানকে নববধূ আমিনার হাতে তুলে দেন। চমৎকার একটি জুটি এবং দারুণ প্রেমময় ছিল তাঁদের নতুন সংসার। কিন্তু অচিরেই এ সংসারে নেমে আসে বেদনার রাশি রাশি কালো মখমল। উম্মে আয়মান নিজেই বর্ণনা করেন, 'বিয়ের দুই সপ্তাহ পর আবদুল্লাহর পিতা আবদুল মুত্তালিব ছেলের ঘরে এসে তাঁকে ব্যবসা উপলক্ষে সত্বর দামেস্ক অভিমুখী কাফেলার সঙ্গী হতে বলেন।'

আবদুল্লাহ তাঁর পিতার একান্ত বাধ্যগত সন্তান। তাঁর পক্ষে পিতার কথার অবাধ্য হওয়া সম্ভব নয়। তিনি ব্যবসাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। কিন্তু নবপরিণীতা আমিনা এটা কিছুতেই মানতে পারলেন না। উম্মে আয়মান বলেন, 'পিতা আবদুল মুত্তালিবের এমন আদেশ শুনে আমিনা কেঁদে ওঠেন এবং বলতে থাকেন, 'কী আশ্চর্য, এমন হবে কেন? আমার স্বামী কীভাবে আমাকে রেখে ব্যবসার জন্য সিরিয়া যেতে পারে? আমি এখনো নতুন বধূ, আমার হাতের মেহেদি পর্যন্ত শুকায়নি।'

কিন্তু আবদুল্লাহকে যেতেই হবে। এটা তাদের পারিবারিক মৌসুমী ব্যবসা। আবদুল্লাহর বাণিজ্যযাত্রা আমিনার হৃদয়টা ভেঙে চুরমার করে দেয়। তিনি কাঁদতে কাঁদতে ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়তেন। উম্মে আয়মান বলেন, 'আমি যখন আমিনাকে এমন অবস্থায় বিরহে কাতর দেখতাম, তাঁর কাছে গিয়ে বলতাম, "হে আমার মালিকা!" আমিনা বেদনাহত চোখ তুলে আমার দিকে তাকাতেন। কান্নার গোঙানি নিয়ে আমাকে বলতেন, বারাকাহ, আমাকে বিছানায় নিয়ে যাও। আমি আর পারছি না।'

www.pathagar.com

বালিকা উম্মে আয়মান এ সময় নবপরিণীতা আমিনার সর্বসঙ্গী হয়ে ওঠেন। বিষণ্ণতায় বিহ্বল আমিনা অধিকাংশ সময় নিজের ঘরে একাকী থাকতেন। কারও সঙ্গে দেখা করতেন না, কথা বলতেন না। একমাত্র আবদুল মুত্তালিব এলে কেবল তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন।

উম্মে আয়মান বলেন, 'আবদুল্লাহর দামেস্কযাত্রার দুই মাস পর এক বিমুগ্ধ সকালে আমিনা আমাকে ডেকে বললেন, 'বারাকাহ, আমি তো এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি!'

আমি বললাম, 'নিশ্চয় ভালো কিছু, আমার মালিকা?'

আমিনা বললেন, 'আমি দেখলাম, আমার গর্ভ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অলৌকিক আলো। সে আলো মক্কার চারপাশের পাহাড়, জনপদ ও মরুভূমিকে আলোকিত করে তুলছে।'

আমি হয়রান হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি গর্ভবতী, মালিকা?'

তিনি লজ্জারাঙা হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, বারাকাহ। কিন্তু আমি তেমন কোনো অস্বস্তি অনুভব করছি না, যেমনটি অন্য গর্ভবতী মায়েরা করে থাকে।'

আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে বললাম, 'আপনি এক বরকতময় শিশুর জন্ম দেবেন, যে আলোকিত করবে সমাজকে।'

আবদুল্লাহর বিরহে আমিনা কাতর। গর্ভকালীন এ সময়টাতেও তিনি নিজেকে অন্য সবার কাছ থেকে গুটিয়ে রাখতেন। উম্মে আয়মান কথার ফুলঝুরি এবং নানা ধরনের হাস্যাত্মক গল্প-কবিতা শুনিয়ে চেষ্টা করতেন তাঁর মালিকাকে উৎফুল্ল রাখতে।

এরই মধ্যে একদিন হন্তদন্ত হয়ে আবদুল মুত্তালিব এলেন আমিনার ঘরে। জানালেন, এখনই তাঁকে মক্কার পাশের পাহাড়চূড়ায় আশ্রয় নিতে হবে। আবরাহা নামে ইয়েমেনের এক বাদশাহ তার বিশাল হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছে। সে আল্লাহর ঘর কাবাকে ধূলিসাৎ করার অভিপ্রায় নিয়ে আসছে। মক্কার কাউকে সে ছাড়বে না। নিরাপত্তার জন্য মক্কার সবাই পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

আমিনা শ্বশুরের কথায় বিন্দুমাত্র ভীত হলেন না। তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন, স্বামীর ঘর ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না। আর আল্লাহর ঘর কাবাকে ধ্বংস করার ক্ষমতা আবরাহার নেই।

আবদুল মুত্তালিব আমিনার চেহারায় এমন আত্মবিশ্বাসের ছায়া দেখে বিচলিত হয়ে পড়লেন। অগত্যা তিনি তাঁকে মক্কায় রেখেই অন্যান্য মক্কাবাসীকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের আশ্রয়ে চলে গেলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমিনার কথাই

www.pathagar.com

সত্য হলো, আবরাহার সেনা ও হস্তীবাহিনী ক্ষুদ্র পাখির ঝাঁকের ছুড়ে দেওয়া প্রস্তারাঘাতে কর্তৃত তৃণের মতো মক্কার উপকণ্ঠে মরে পড়ে রইল।

দিন-রাতের পুরোটা সময় উম্মে আয়মান আমিনার পাশেই থাকতেন। তিনি বলেন, 'আমি তাঁর পায়ের কাছে ঘুমোতাম এবং তিনি যখন ঘুমঘোরে দূরপ্রবাসী স্বামীর নাম ধরে ডাকতেন, আমি সহজেই শুনতে পেতাম। তাঁর গোঙানিতে অনেক সময় আমার ঘুম ভেঙে যেত। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতাম।'

কিছুদিন পর দামেস্কের অগ্রবর্তী বাণিজ্য কাফেলা ফিরে এল। আবদুল্লাহ এসেছেন কি না এটা জানতে বালিকা উম্মে আয়মান গোপনে আবদুল মুত্তালিবের বাড়ির ভেতরে গিয়ে কান পাতলেন। কিন্তু সেখানে আবদুল্লাহর ফিরে আসার কোনো সংবাদ পেলেন না। তিনি ফিরে এলেন, তবে আমিনার দুশ্চিন্তার ভয়ে তিনি তাঁকে এ ব্যাপারে কিছুই জানালেন না। একসময় পুরো কাফেলাই মক্কায় ফিরে এল, কিন্তু আবদুল্লাহ এলেন না।

স্বামীর প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষমাণ আমিনার অস্থিরতা উম্মে আয়মানকে বারবার দংশন করছিল। তিনি আবার গেলেন আবদুল মুত্তালিবের বাড়িতে। এবার তিনি শুনতে পেলেন এমন এক সংবাদ, যার জন্য তিনি তো বটেই, মক্কার কেউ প্রস্তুত ছিল না। শুনলেন, মক্কায় ফেরার পথে আবদুল্লাহ মদিনার কাছাকাছি এসে পথিমধ্যে রোগে ভুগে মারা গেছেন। উম্মে আয়মান বলেন, 'এ সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। আমি ভাবতে পারলাম না আমিনাকে এ সংবাদ আমি কীভাবে দেব–আবদুল্লাহ আর কখনো ফিরে আসবেন না প্রিয়তমার বুকে। যাঁর জন্য মক্কার এক কুটিরে প্রতীক্ষমাণ তাঁর প্রিয়তমা ও অনাগত সন্তান। যিনি সৌন্দর্যের কারণে বরিত হতেন কুরাইশদের অহংকার বলে; তিনি আর কখনো ফিরে আসবেন না।

আমিনা যখন এ সংবাদ শুনলেন, চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। জীবন-মৃত্যুর এ সন্ধিক্ষণে আমি তাঁর পাশেই ছিলাম, ঘরে আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। আমি তাঁর শুশ্রূষায় লেগে গেলাম। সেই দিনগুলোতে আমিই হয়ে উঠেছিলাম তাঁর বান্ধবী, তাঁর অভিভাবক, তাঁর চিকিৎসকও; সেদিন পর্যন্ত যেদিন মুহাম্মদ বেহেশত থেকে সিরাজাম মুনিরের আলো নিয়ে ধূলির ধরায় জন্ম নিয়েছিলেন আমিনার কোলে।'

মুহাম্মদ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সর্বপ্রথম তাঁকে বুকে জড়িয়ে নিলেন বারাকাহ, উম্মে আয়মান। একটু পর তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব এসে নাতিকে কোলে করে নিয়ে গেলেন কাবাচত্বরে। সেখানে তিনি সকল মক্কাবাসীকে নিয়ে নতুন

www.pathagar.com

শিশুর আগমনে উৎসব পালন করলেন। মুহাম্মদ তখনো উম্মে আয়মানের কোলে ছিলেন, যখন হালিমা সাদিয়া তাঁর মাতৃত্ব গ্রহণ করে তাঁকে মক্কার বাইরে ঊষর স্বাধীন মরুর তাঁবু-জীবনে নিয়ে যান।

পাঁচ বছর পর যখন মুহাম্মদ ফিরে আসেন আমিনার কোলে, তখন আমিনার সঙ্গে উম্মে আয়মানও তাঁকে বুকে জড়িয়ে নেন। মুহাম্মদের বয়স যখন ছয় বছর, তখন আমিনা তাঁর শিশুসন্তানকে নিয়ে ইয়াসরিবে স্বামীর কবর জিয়ারতের আগ্রহ প্রকাশ করেন। আবদুল মুত্তালিব এবং উম্মে আয়মান যদিও তাঁকে সেখানে যেতে নিষেধ করেন কিন্তু আমিনা তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। একদিন সকালবেলা আমিনা, উম্মে আয়মান এবং শিশু মুহাম্মদ সিরিয়াগামী এক কাফেলার সঙ্গে ইয়াসরিবের পথে যাত্রা করলেন। একই উটের হাওদায় চড়ে তাঁরা তিনজন চললেন ইয়াসরিবের পথে।

১০ দিনের সফর শেষে তাঁরা ইয়াসরিবে পৌঁছালেন। আমিনা পুত্র মুহাম্মদকে তাঁর মামাদের কাছে রেখে স্বামীর সমাধি জিয়ারত করতে গেলেন। ভালোবাসা আর বেদনার নোনাজলে ভিজিয়ে দিলেন প্রিয়তম আবদুল্লাহর কবরের শুষ্ক মাটি। ইয়াসরিবে কয়েক সপ্তাহ অবস্থানকালে প্রায় দিনই তিনি স্বামীর কবরের পাশে বসে অঝোরে কাঁদতেন।

ইয়াসরিবে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করে আমিনা মক্কায় ফেরার সফর শুরু করলেন। ইয়াসরিব থেকে মক্কার পথে রওনা হয়ে আবওয়া নামক স্থানে আসার পর আমিনা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর অসুস্থতা দ্রুত অবনতির দিকে যেতে লাগল। তাঁর শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছিল, ঠিকমতো কথা বলতে পারছিলেন না। তাঁর অসুস্থতার দরুন তিন সদস্যের এ কাফেলা সেখানেই যাত্রাবিরতি করতে বাধ্য হলো।

এ সময় আমিনা উম্মে আয়মানকে নিজের কাছে ডাকলেন। উম্মে আয়মান বর্ণনা করেন, 'আমিনা আমাকে ডেকে বললেন, 'বারাকাহ, শোনো! আমার জীবনের মঞ্জিল হয়তো শেষ হয়ে এসেছে। জীবন থেকে আমারও হয়ে গেছে সময়, বিদায় নেওয়ার। আমার বুকের ধন মুহাম্মদকে তোমার বুকে রেখে গেলাম। আজ থেকে তুমি তার মা, তুমিই তার সব। সে যখন আমার গর্ভে ছিল, তখন হারিয়েছে পিতাকে। এখন চোখের সামনে নিজের মাকেও চলে যেতে দেখছে। তুমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এতিম মুহাম্মদের মা হয়ে থেকো। কখনো তাকে ছেড়ে যেয়ো না। আলবিদা!'

আমিনা, মুহাম্মদের মা আমিনা! নিজ শহর মক্কা থেকে বহুদূরে, বাবার বাড়ি ইয়াসরিব থেকে অনেক দূরে আবওয়ার এক জনশূন্য মরু বিয়াবানে

www.pathagar.com

জীবনের শেষ সফরের পাট চুকিয়ে বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে। প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে পরমপ্রিয় স্বামী আবদুল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন বড় অবেলায়।

মা হারিয়ে ছয় বছরের বালক মুহাম্মদ কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লেন তাঁবুর নিচে। ক্রীতদাসী উম্মে আয়মান নিজ হাতে কবর খুঁড়লেন আমিনার জন্য। কোথাও কেউ নেই। উম্মে আয়মান নিজেই কবরে শোয়ালেন তাঁর মালকিনকে। তাঁর হৃদয়ে রক্ষিত সবটুকু ভালোবাসা মাটিচাপা দিলেন বুকে পাথর বেঁধে। জনমানবহীন আবওয়ার প্রান্তরে অবিরত কান্নাঝরা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে অলৌকিক প্রভুর কাছে আরতি করলেন, 'তোমার আমিনাকে তোমার কাছেই রেখে গেলাম, হে অবিনশ্বর!'

চিৎকার করে কাঁদতে থাকা ছোট্ট মুহাম্মদকে বুকের পাঁজরে জড়িয়ে উম্মে আয়মান অবিন্যস্ত পায়ে হাঁটতে লাগলেন মক্কার পথে।

না, বারাকাহ কখনো মুহাম্মদকে ছেড়ে যাননি। ছোট্ট শিশুটি থেকে তাঁকে বুকের অপার ভালোবাসা দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন তিলতিল করে। মায়ের মমতার চাদরে জড়িয়ে রেখেছিলেন জীবনভর। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। আমিনাকে দেওয়া তাঁর কথার বিন্দুমাত্র বরখেলাপ করেননি তিনি।

বারাকাহ, উম্মে আয়মান। মুহাম্মদের মা।

উম্মে আয়মান সদ্য মা-হারানো এতিম বালক মুহাম্মদকে বুকে আগলে মক্কায় চলে এলেন। তাঁকে অর্পণ করলেন তাঁর দাদার কাছে। তিনি নিজেও রয়ে গেলেন মুহাম্মদের মা হয়ে। দুই বছর পর আবদুল মুত্তালিবও মুহাম্মদকে একাকী করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। চাচা আবু তালিব বুকে টেনে নিলেন ভাতিজাকে। উম্মে আয়মান তাঁর সঙ্গেই রইলেন। বালক মুহাম্মদকে ভালোবাসার আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখলেন। তাঁকে বালক থেকে কিশোর, কিশোর থেকে গড়ে তুললেন পরিপূর্ণ এক যুবকে।

মুহাম্মদ যখন খাদিজাকে বিয়ে করেন, বিয়ে উপলক্ষে মুহাম্মদ তাঁর মা-তুল্য এই ক্রীতদাসীকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে স্বাধীন করে দিলেন। উম্মে আয়মান স্বাধীন হওয়ার পরও মুহাম্মদকে ছেড়ে গেলেন না। মুহাম্মদের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'আমি কখনো তাকে ছেড়ে যাব না, সে-ও কখনো আমাকে ছেড়ে থাকবে না।'

মুহাম্মদ বড় ভালোবাসতেন তাঁর এ মাকে। বড় সম্মান করতেন উম্মে আয়মানকে। বিয়ের পর একদিন মুহাম্মদ উম্মে আয়মানকে ডেকে বললেন, 'ও মা (তিনি সব সময় তাঁকে মা বলে ডাকতেন), এখন তো আমি বিয়ে করে

www.pathagar.com

ফেললাম, কিন্তু তুমি তো এখনো অবিবাহিতা। কেউ যদি এখন তোমাকে বিয়ে করতে চায়, তাহলে তোমার কী মতামত?'

উম্মে আয়মান মুহাম্মদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি কখনোই তোমাকে ছেড়ে যেতে পারব না। কোনো মা কি তার সন্তানকে ছেড়ে থাকতে পারে?'

মুহাম্মদ অশ্রুভেজা চোখে হাসলেন এবং চুমু খেলেন তাঁর মাথায়। এরপর তিনি সদ্যপরিণীতা খাদিজার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ হচ্ছে বারাকাহ। আমার মায়ের মৃত্যুর পর সে-ই আমার মা হিসেবে আমাকে বড় করেছে। সে-ই আমার পরিবারের একমাত্র সদস্য।'

খাদিজা ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকালেন উম্মে আয়মানের দিকে। তাঁকে কাছে টেনে বললেন, 'বারাকাহ, মুহাম্মদের জন্য এত আত্মত্যাগ করেছ, যা তুলনাহীন। এখন মুহাম্মদ সে আত্মত্যাগের সামান্য কিছু বিনিময় তোমাকে ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছেন। আমি এবং মুহাম্মদ দুজনই অনুরোধ করছি–বয়স পেরিয়ে যাওয়ার আগে বিয়েটা করে ফেলো।'

উম্মে আয়মান লজ্জিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে আমাকে বিয়ে করবে?'

খাদিজা বললেন, 'ইয়াসরিব থেকে উবায়েদ ইবনে জায়েদ এসেছেন তোমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। তিনি তোমাকে বিয়ে করতে চান। তাঁকে বিমুখ কোরো না।'

উম্মে আয়মান এ প্রস্তাব মেনে নিয়ে উবায়েদ ইবনে জায়েদকে বিয়ে করলেন। বিয়ের পর তিনি স্বামীর সঙ্গে ইয়াসরিবে চলে যান। কিছুদিন পর তিনি সেখানে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন, যার নাম রাখা হয় আয়মান। এ আয়মানের নামানুসারেই তাঁকে উম্মে আয়মান, 'আয়মানের মা' বলে ডাকা হতো।

উম্মে আয়মানের এ স্বামী-সংসার বেশি দিন স্থায়ী হলো না। পুত্র আয়মানের জন্মের কিছুদিন পর তাঁর স্বামী উবায়েদ ইবনে জায়েদ মৃত্যুবরণ করেন এবং তিনি পুনরায় মক্কায় তাঁর ছেলে মুহাম্মদের কাছে চলে আসেন।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন, তখন উম্মে আয়মান ইসলাম গ্রহণ করে প্রথম সারির মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ইসলামের জন্য তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করেন। নবুওয়াতের কাজে নানাভাবে তিনি রাসুল মুহাম্মদকে সাহায্য করতেন। বিশেষত, মক্কার পৌত্তলিকেরা কোথাও কোনো মুসলিমকে নির্যাতন করলে বা রাসুলের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

কোনো ষড়যন্ত্র করলে তিনি এবং জায়েদ ইবনে হারিসা সেসব সংবাদ সংগ্রহ করে রাসুলকে জানাতেন।

নবুওয়াতের প্রথম দিকে এক রাতে মক্কার পৌত্তলিকেরা দারুল আরকামের চারপাশ ঘিরে ফেলে, যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবিদের নিয়ে পরামর্শ করছিলেন এবং তাঁদের ইসলামের বিষয়াবলি শিক্ষা দিচ্ছিলেন। এ সময় রাসুলের স্ত্রী খাদিজা জরুরি একটা সংবাদ দিয়ে উম্মে আয়মানকে রাসুলের কাছে পাঠান। তিনি বহু কষ্টে পৌত্তলিকদের চোখ ফাঁকি দিয়ে দারুল আরকামে গিয়ে রাসুলের কাছে খাদিজার সংবাদটি পৌঁছান।

তাঁর কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি শুনে রাসুল অত্যন্ত খুশি হন এবং বলে ওঠেন, 'তোমার আগমন শুভ হোক। এর বিনিময়ে তোমার জন্য বেহেশতে একটি প্রাসাদ পাওনা রইল।' উম্মে আয়মান খুশি হলেন। যখন তিনি দারুল আরকাম থেকে চলে এলেন, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যদি তোমরা কেউ বেহেশতি কোনো রমণীকে বিয়ে করতে চাও, তবে সে যেন উম্মে আয়মানকে বিয়ে করে।'

উম্মে আয়মানের বয়স তখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। তিনি তেমন সুন্দরীও ছিলেন না এবং আকর্ষণীয়ও নন। রাসুলের পালক পুত্র জায়েদ ইবনে হারিসা দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি উম্মে আয়মানকে বিয়ে করতে চাই। তিনি রূপবতী অনেক রমণীর চেয়েও উত্তম।'

জায়েদ এবং উম্মে আয়মানের বিয়ে হয়ে গেল। কিছুদিন পর তাঁদের ঘর আলো করে এল এক পুত্রসন্তান। তার নাম রাখা হলো উসামা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত স্নেহ করতেন উসামাকে। তিনি তাকে কোলে নিয়ে ঘুরতেন, তার সঙ্গে খেলা করতেন, নিজ হাতে খাওয়াতেন। রাসুলের সাহাবিরা বলতেন, সে ভালোবাসায় পরিপূর্ণ এক শিশু।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন, তখন উম্মে আয়মানকে মক্কায় রেখে যান। কেননা রাসুলের বাড়িতে তখন তাঁর মেয়ে ও পরিবারের অন্য সদস্যরা অবস্থান করছিলেন। তাঁদের দেখাশোনার জন্য উম্মে আয়মান মক্কায় রয়ে যান। হিজরতের তিন মাস পর তাঁদের নেওয়ার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জায়েদ ইবনে হারিসা এবং ক্রীতদাস আবু রাফেকে পাঠান। উম্মে আয়মান রাসুলের দুই কন্যা উম্মে কুলসুম ও ফাতেমা, আবু বকরের পরিবার এবং নিজের সন্তান উসামাকে নিয়ে মদিনার পথে যাত্রা করেন।

www.pathagar.com

যাত্রাপথে বাহনের স্বল্পতার কারণে উম্মে আয়মান দীর্ঘ পথ হেঁটে পাড়ি দেন। মরুভূমির তপ্ত বালিয়াড়ি পাড়ি দেওয়ার ফলে তাঁর পায়ে ফোসকা পড়ে যায়। গনগনে রোদের নিচে হাঁটার ফলে তাঁর চামড়া পুড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। দীর্ঘ যাত্রার পর যখন তিনি মদিনায় পৌঁছান, তখন তাঁর পা ছিল ক্ষত-বিক্ষত, তাঁর শরীরজুড়ে ধুলো-বালি, মুখাবয়ব হয়ে গিয়েছিল রৌদ্রতামাটে। তাঁকে এ অবস্থায় দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দৌড়ে আসেন তাঁর কাছে। তাঁর পাশে বসে বলতে থাকেন, 'ও উম্মে আয়মান, ও আমার মা! তোমার প্রতিদান তো কেবল বেহেশত ছাড়া আর কিছু নয়।'

রাসুল পরম মমতায় উম্মে আয়মানের মুখ ও চোখ থেকে সকল ক্লান্তি মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেন। নিজ হাতে তাঁর ক্ষত-বিক্ষত পা মালিশ করে দেন, দীর্ঘ সময় তাঁর শুশ্রূষা করতে থাকেন।

মদিনায় উম্মে আয়মান নতুন করে তাঁর সংসার শুরু করলেন। এ সময় ইসলামের জন্য নিজেকে আত্মনিবেদিত করে দেন। উহুদের যুদ্ধে শত্রুর তিরবৃষ্টি উপেক্ষা করে তিনি মুসলিম যোদ্ধাদের পানি পান করান এবং আহতদের চিকিৎসা করেন। খায়বার ও হুনাইনের যুদ্ধেও তিনি রাসুলের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর প্রথম ছেলে আয়মান হিজরতের অষ্টম বছরে হুনাইনের যুদ্ধে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে শহিদ হন। তাঁর দ্বিতীয় স্বামী, রাসুলের ভালোবাসার পালক পুত্র জায়েদ ইবনে হারিসা সিরিয়ায় মুতার যুদ্ধে সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধ করে শহিদ হন। এ সময় উম্মে আয়মানের বয়স হয়েছিল সত্তরের কাছাকাছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই তাঁর দুই বন্ধু আবু বকর ও উমরকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তাকে জিজ্ঞেস করতেন, 'ও আমার মা, কেমন আছো তুমি?'

উত্তরে উম্মে আয়মান বলতেন, 'বেটা, আমি ভালো আছি। ইসলাম আমাকে অনেক দামি করেছে।'

রাসুলের ইন্তেকালের পর তিনি প্রায়ই কাঁদতেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করত, 'কেন আপনি কাঁদছেন?'

তিনি বলতেন, 'আল্লাহর কসম! আমি জানতাম একদিন আল্লাহর রাসুল ইন্তেকাল করবেন। কিন্তু আমি এখন কাঁদছি কারণ, আরশ থেকে নেমে আসা ঐশীবাণী আমাদের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য।'

বারাকাহ, উম্মে আয়মানই একমাত্র মানুষ, যিনি রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবচেয়ে কাছ থেকে

www.pathagar.com

দেখেছেন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন রাসুলের ভালোবাসায়। রাসুল এবং ইসলামের জন্য তাঁর আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ইসলামের ইতিহাসে।

এই মহীয়সী নারী হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের সময় ইন্তেকাল করেন।

দশ

মুহাম্মদের সঙ্গে বিয়ের কিছুদিন পর খাদিজা নিজের পুরোনো বাড়ি ছেড়ে তাঁর ভাতিজা হাকিম ইবনে হিজামের উপহার দেওয়া বাড়িতে উঠে আসেন। বাড়িটি বড় ছিল এবং মুহাম্মদ ও খাদিজা ছাড়াও এ বাড়িতে আরও কয়েকজন সদস্য একসঙ্গে থাকতেন। খাদিজাকে এমনিতেই 'কুরাইশ রাজকুমারী' বলে ডাকা হতো না, সত্যিকার অর্থেই তিনি সকলের জন্য ছিলেন উদারহস্ত। এ কারণে তাঁর বাড়ি সব সময় সরগরম হয়ে থাকত আত্মীয়স্বজনের পদভারে।

সংক্ষেপে বাড়ির সদস্যদের পরিচয় জেনে নেওয়া যাক।

খাদিজার প্রথম স্বামী আবু হালার ঔরসজাত ছেলে হিন্দ থাকতেন তাঁর সঙ্গে। দ্বিতীয় স্বামী আতিক ইবনে আইয়াদের ঔরসজাত মেয়ে হিন্দাও থাকতেন তাঁদের পরিবারে।

বিয়ের কিছুদিন পর মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আবু তালিব তাঁর ছেলে আলিকে মুহাম্মদ ও খাদিজার পরিবারে প্রতিপালনের অনুরোধ করেন। মুহাম্মদ খুশিমনে চাচাতো ভাই আলিকে তাঁর পরিবারে শামিল করে নেন। কেননা কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি এ চাচার পরিবারেই মানুষ হয়েছেন।

জুবায়ের ইবনে আওয়াম। জুবায়েরের পিতা আওয়াম একদিক থেকে খাদিজার বড় ভাই এবং অন্যদিকে তাঁর মা ছিলেন মুহাম্মদের ফুফু। দুদিক থেকেই তিনি এ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন বিধায় তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি এ পরিবারেই বেড়ে ওঠেন।

রাসুলের নবুওয়াত ঘোষণার পর একদম প্রথম দিকে মুসলিম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন যে গুটিকয়েক সৌভাগ্যবান, জুবায়ের ইবনে আওয়াম তাঁদের একজন। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বেড়ে ওঠেন সরাসরি রাসুলের তত্ত্বাবধানে। ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের সঙ্গী ছিলেন তিনি। সেখান থেকে পরবর্তী সময়ে তিনি মদিনায় হিজরত করেন। কাফেরদের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলে বদর প্রান্তরে ইসলামের পক্ষে সর্বপ্রথম তাঁর তরবারি কোষমুক্ত হয়। এ যুদ্ধে ফেরেশতারা তাঁর আকৃতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'প্রত্যেক নবিরই একজন প্রতিচ্ছায়া থাকে। আমার প্রতিচ্ছায়া জুবায়ের।'

পৃথিবীতে থাকতেই যে ১০ জন সাহাবি বেহেশতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন, জুবায়ের তাঁদের একজন। রাসুলের ইন্তেকালের পর তিনি মুসলিম জাতির অন্যতম নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের পর খলিফা নির্বাচনের ছয় সদস্যের পর্ষদের একজন ছিলেন তিনি।

হাকিম ইবনে হিজাম ছিলেন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভাতিজা। ফুফু খাদিজার সার্বক্ষণিক ব্যবসায়িক সহযোগী ছিলেন তিনি। খাদিজাকে তিনি মায়ের মতো ভালোবাসতেন। খাদিজার যেকোনো আপদ-বিপদে তিনি এগিয়ে আসতেন। হাকিমকে বিশেষ একটা কারণে 'কাবার সন্তান' বলে ডাকা হতো।

ইসলামপূর্ব যুগে বিশেষ বিশেষ সময়ে কাবা শরিফের দরজা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হতো। 'হাতির বছর'-এর তিন বছর আগে যখন তিনি মায়ের গর্ভে, তখন তাঁর মা কাবা শরিফের ভেতর ঢোকেন গর্ভস্থিত সন্তানের জন্য প্রার্থনা করতে। প্রার্থনা করতে করতে হঠাৎ সেখানে তাঁর প্রসবব্যথা শুরু হয়ে যায়। প্রবল বেদনায় তিনি কাবার মেঝেতে শুয়ে পড়তে বাধ্য হন এবং সেখানেই ভূমিষ্ঠ হয় এক সৌভাগ্যবান শিশু। তার নাম রাখা হয় হাকিম।

অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও সচ্ছল পরিবারে বেড়ে ওঠেন হাকিম। তিনি নিজেও ছিলেন বুদ্ধিমান, ভদ্র ও জ্ঞানী ব্যক্তি। তাই গোত্রের লোকজন তাঁকে নিজেদের নেতা বানিয়ে 'রিফাদাহ'-এর মতো সম্মানজনক পদে ভূষিত করেছিল।

রাসুলের নবুওয়াতপ্রাপ্তির অনেক আগে থেকেই হাকিম তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। রাসুলের চেয়ে বয়সে তিন বছরের বড় হলেও তিনি তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করতেন নিয়মিত।

যখন রাসুলের সঙ্গে খাদিজার বিয়ে হয়, তখন আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে হাকিমের সেই অন্তরঙ্গতা আরও সুদৃঢ় হয়। নবুওয়াতের পরও খাদিজার বাড়িতে তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। মক্কার পৌত্তলিকরা যখন মুসলিমদের আবু তালিব গিরিখাদে বয়কট করে রাখে, তখন হাকিম গোপনে মুসলিমদের সাহায্য করতেন। প্রয়োজনীয় খাবার ও রসদ পৌঁছে দিতেন তাঁদের কাছে। নিজের ফুফুর সামান্য কষ্টও তিনি সহ্য করতেন না।

www.pathagar.com

মক্কার পৌত্তলিকদের সঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত হুনাইনের যুদ্ধের পর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে হাকিমকে ১০০ উট উপহার দেন। এর মাধ্যমে তিনি হাকিমের মনে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা উদ্গাত করতে চেয়েছিলেন।

মুহাম্মদ ও খাদিজার সঙ্গে এত চমৎকার সম্পর্কের পরও আশ্চর্যের কথা হলো, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন মক্কা বিজয়ের পর! অথচ ততদিনে রাসুলের নবুওয়াতপ্রাপ্তির প্রায় ২০টি বছর কেটে গেছে! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন ঘোষণা করেন–যারা হাকিম ইবনে হিজামের ঘরে আশ্রয় নেবে, তাদের ক্ষমা করা হবে। অথচ তখনো হাকিম মুসলিম হননি।

মক্কা বিজয়ের পর যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'মুসলমান হওয়ার পর নিশ্চয় তুমি পূর্বের অনেক শুভকাজ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ।'

খাদিজা-মুহাম্মদ পরিবারে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন জায়েদ ইবনে হারিসা। এ ক্রীতদাস বালকের জীবনকাহিনি যেন এক রূপকথা। মুহাম্মদ-পরিবারে তাঁর অন্তর্ভুক্তি থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি ছিলেন রাসুলের স্নেহছায়ায় ধন্য এক পুরুষ। ইতিহাস তাঁকে স্মরণ করেছে বড় সম্মান দিয়ে।

জায়েদের পরিচয়টা জানতে হলে আরেকটু পেছনে ফিরে যেতে হবে। চলে যেতে হবে আরব থেকে আরেকটু দূরে, লোহিত সাগরের পারে।

লোহিত সাগরের তীরঘেঁষা দক্ষিণ আরবের ইয়েমেন অঞ্চল। আরব উপদ্বীপের স্বভাবজাত রুক্ষ প্রকৃতির মাঝে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম এ উর্বর এলাকাটি ইতিহাসের নানা উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে থেকে সব সময় নিজেকে সমৃদ্ধ রেখেছে। গ্রিক দার্শনিক টলেমি এর নাম দিয়েছিলেন 'অ্যারাবিয়া ফেলিক্স' বা 'উর্বর আরব'। কৃষি কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যে এ অঞ্চল সমৃদ্ধিশালী ঐতিহ্যগতভাবেই।

ইয়েমেনের এ অঞ্চলেই প্রভাবশালী গোত্র বনু কুজায়ার বাস। গোত্রপতি হারিসা ইবনে শুরাহবিল। স্ত্রী সুদা বিনতে সালাবাহও আরবের আরেক বিখ্যাত তায়ি গোত্রের কন্যা। ইতিহাসখ্যাত হাতিম তায়ি এ গোত্রেই জন্মেছিলেন। এ দম্পতির আদরের পুত্র জায়েদ।

জায়েদের মা সুদা বেশ কিছুদিন ধরে বাবার বাড়ি যেতে পারছিলেন না। সময়টা ছিল নিরাপত্তাহীনতার। হত্যা-লুটতরাজ যে জনপদের মানুষের জীবনের নৈমিত্তিক অনুষঙ্গ, সেখানে এত দূরের পথ নিরাপদে পাড়ি দেওয়াটা কঠিন

www.pathagar.com

বৈকি! হারিসা ব্যস্ততার ফাঁকে সময় দিতে পারেন না, তাই আট বছরের বালক জায়েদকে নিয়ে মা সুদা একদিন এক কাফেলার সঙ্গে বাবার বাড়ির পথ ধরেন। স্ত্রী-সন্তানকে উটের পিঠে বসিয়ে বিদায় দেওয়ার সময় হারিসার বুক কেমন যেন অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। ঠিকমতো পৌঁছাতে পারবে তো? ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকেন হারিসা।

পথে কোনো সমস্যা হলো না। নিরাপদে মা-ছেলে পৌঁছে গেলেন গন্তব্যে। খবর পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন হারিসা। কিন্তু বিধির বিধান না যায় খণ্ডন। পথের বিপদ বাড়িতে এসে পড়ল। এক রাতে বনু তায়ি বসতির ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বনু কাইনের দুর্বৃত্তরা। অন্য অনেকের সঙ্গে অপহৃত হন জায়েদ। তাঁকে তুলে নিয়ে যায় হামলাকারীরা। সন্তান হারিয়ে বুকফাটা আর্তনাদে ফেটে পড়েন সুদা।

এই সেই উকাজ বাজার। আরবের সবচেয়ে বিখ্যাত বাজার। সাধু আর শয়তান সমানভাবে সমাদৃত হয় এখানে। আজ এখানে মেলা হচ্ছে। উকাজের মেলা আরবের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বার্ষিক মেলা। সারা উপদ্বীপ এবং উপদ্বীপের বাইরে থেকে হাজারো ব্যবসায়ী পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসে তায়েফ শহরের সন্নিকটের এই মেলায়।

আরবে দাস ব্যবসার সে সময়ে রমরমা অবস্থা, আর উকাজ হচ্ছে সে ব্যবসার এক লোভনীয় বাজার। দেদার বিক্রি হয় দাস-দাসী, কারও কোনো বাছবিচার নেই।

খাদিজার ভাগনে হাকিম ইবনে হিজাম এসেছেন উকাজ বাজারে। ফুফু খাদিজার বিয়ে উপলক্ষে একটি ভালো উপহার কিনতে এসেছেন। ফুফু অল্প কদিন হয় স্বনামধন্য যুবক মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহকে বিয়ে করেছেন। ফলে দুই কারণে হাকিম খুশি হয়েছেন–ফুফু অনেক দিন বিধবা ছিলেন, শেষ পর্যন্ত তিনি বিয়ে করেছেন। দ্বিতীয় কারণ হলো, তাঁর স্বামী মুহাম্মদ অসম্ভব ভালো একজন মানুষ। এমন লোককে বিয়ে করেছেন বলে ফুফুকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না। মুহাম্মদকে তিনি আগে থেকেই চিনতেন।

হাকিম সেই খুশিতে ফুফুকে উপহার দেওয়ার জন্য কিছু একটা কিনতে এসেছেন উকাজের বাজারে। অনেকক্ষণ ঘুরে ভালো দেখে তিনি কিছু ক্রীতদাস কিনে নিলেন। মক্কায় ফুফুর বাড়িতে নিয়ে এলেন সব ক্রীতদাসকে। ফুফুর সামনে হাজির করে বললেন–যাকে পছন্দ হয় নিয়ে নিন। আপনার জন্য এ আমার সামান্য তোহফা। ফুফু খাদিজা বেছে নিলেন নিষ্পাপ চেহারার এক

www.pathagar.com

দাসবালক। সে বালককে প্রিয়তম স্বামীর সেবার জন্য নিয়োজিত করলেন। এ বালকটিই জায়েদ। রাসুলের পালক পুত্র জায়েদ। একদিন যিনি ইসলামের ইতিহাসের বহুলাংশে মিশে যান জায়েদ ইবনে হারিসা নামে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখনো নবুওয়াতপ্রাপ্ত হননি। নবি হিসেবে তখনো আবির্ভাব ঘটেনি তাঁর। সে সময়ে তিনি সমাজের মানুষের উপকারে ব্যস্ত, ব্যস্ত আত্মানুসন্ধানে। একদিকে 'হিলফুল ফুজুল'-এর মাধ্যমে সমাজের দুঃখী-অত্যাচারিতের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন, অন্যদিকে এর স্থায়ী সমাধানের পথ অনুসন্ধানে একটু একটু করে খোদার ধ্যানে মগ্ন হয়ে উঠছেন।

এমন সময়টাতেই জায়েদ এলেন খাদিজার পরিবারে। এসে মুনিব হিসেবে পেলেন মুহাম্মদকে। কয়েক দিনেই কিশোর জায়েদ এই ব্যক্তির ভালোবাসা আর স্নেহে তাঁর ভক্ত হয়ে গেলেন। আকর্ষণীয় এক মুনিব পেয়ে নতুন জীবন শুরু হলো জায়েদের। আরবের অন্য মুনিবরা যেখানে ক্রীতদাসদের পশুরও অধম মনে করে, সেখানে জায়েদ তাঁর মালিকের ঘরে পুত্রস্নেহে লালিত হতে লাগলেন। শৈশবে হারানো পিতা-মাতার অভাব একপ্রকার ভুলতেই বসেন তিনি।

জায়েদ ছোট ছিলেন। তাঁর মনটাও ছোট, নরম। সেখানে যে দৃশ্য রাখা হয় সেটা স্থায়ী হয় না খুব বেশি। শিশুরা অতীত ভুলে যায় দ্রুত। এ কারণে মা-বাবার কথা খুব একটা মনে পড়ত না জায়েদের।

সন্তান মা-বাবাকে ভুলে থাকতে পারে, কিন্তু মা-বাবা কি পারেন সন্তানকে ভুলতে? পিতা হারিসা প্রতি মুহূর্তে হারানো সন্তানের খোঁজ চালিয়ে যেতে থাকেন। মা সুদা বুকের ধনকে হারিয়ে অশ্রু বিসর্জন দেন একাকী ঘরে।

এভাবেই প্রায় এক যুগের অনুসন্ধান শেষে একসময় হারিসা জানতে পারলেন, তাঁর ছেলে জায়েদ এখন মক্কায়। আছে ক্রীতদাস হিসেবে। হারিসা ছুটলেন মক্কাপানে। ছেলেকে খুঁজতে খুঁজতে চলে এলেন মক্কায়। মক্কার লোকদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, জায়েদ নামের একটি ছেলে থাকে মুহাম্মদের বাড়িতে। হারিসা তাঁর ভাই কাবকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। তাঁকে নিয়ে সোজা চলে এলেন খাদিজার বাড়ির দোরগোড়ায়। আরজি একটাই–যত অর্থ লাগে লাগুক, তাঁরা আপন সন্তানকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে চান, পরিবারের মাঝে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান।

জায়েদ কে? জায়েদ একজন ক্রীতদাস মাত্র। তাঁকে উকাজের বাজার থেকে কিনে আনা হয়েছিল বাড়ির কাজ করার জন্য। কিন্তু বাস্তবিকই জায়েদ কি একজন ক্রীতদাস কেবল? জায়েদ নিজেকে কি তা-ই মনে করেন? আল্লাহর

www.pathagar.com

রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কি তাঁকে ক্রীতদাস হিসেবে দেখেন? নাকি আপন সন্তানের মতোই বুকে আগলে রাখেন তাঁকে?

সন্তানসম স্নেহ দিয়ে এত বছর ধরে লালন-পালন করা জায়েদকে হারানোর বেদনায় নবির হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু সত্য পথের অগ্রপথিক তিনি, মানবতার মুক্তির জন্য খোদার মনোনীত ব্যক্তি, তিনি কি ক্ষণিক আবেগের বশে অন্যায় করতে পারেন? না, তিনি তা করেননি।

যখন ছোট্ট জায়েদ নবিগৃহে প্রথম এসেছিলেন, তখন তিনি বালকমাত্র। এখন তিনি টগবগে তরুণ। নিজের ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে সক্ষম। তাই রাসুলের স্পষ্ট বক্তব্য, 'জায়েদকে অধিকার দেওয়া হোক! সে যদি আপনাদের সঙ্গে চলে যেতে সম্মত হয়, তাহলে আমার পক্ষ থেকে সে মুক্ত। এর জন্য মুক্তিপণেরও প্রয়োজন নেই। আর যদি সে যেতে অসম্মত হয়, তাহলে আমি তার সম্মতির বিপক্ষে নই।'

এমন সহজ শর্তে রাজি না হয়ে হারিসার উপায় ছিল না। এ তো অত্যন্ত চমৎকার বিচার, ইনসাফপূর্ণ ফয়সালা। ছেলে যদি তার পিতার কাছে চলে যেতে চায়, তাহলে তার পূর্ণ এখতিয়ার রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তাকে মুক্ত স্বাধীন করে দেওয়া হবে দাসত্ব থেকে। তা-ও কোনো প্রকার বিনিময় ব্যতীত। হারিসা অপেক্ষা করতে লাগলেন পুত্রের জন্য।

জায়েদকে ভেতর হতে ডেকে আনা হলো। এত বছর পরে পিতা-পুত্রের অশ্রুসিক্ত মিলন উপস্থিত অন্যদের হৃদয়ও আর্দ্র করে তুলল। জায়েদ পিতা ও পিতৃব্য হিসেবে হারিসা ও কাবকে শনাক্ত করলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সামনে মুক্তির দরজা খুলে দিলেন। আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে স্বাধীন জীবনযাপন অথবা তাঁর সান্নিধ্য, যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিলেন।

জায়েদের চোখভরা জল। শব্দহীন অশ্রুসিক্ত নতশির জায়েদ। কান্নায় চোখ তুলে তাকাতে পারছেন না। একদিকে অনেক আশায় বুক বেঁধে দুই হাত বাড়িয়ে থাকা পিতা হারিসা। অন্যদিকে প্রশান্তচিত্তে অপেক্ষমাণ মুহাম্মদ। মহাকালের পৃথিবীতে ক্ষণিক স্থির যেন সময়ের ঘড়ি।

জায়েদ কোনো কথা বলতে পারছেন না। এ ছিল জায়েদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা। পিতা-মাতা সন্তানের সুদীর্ঘ সময়ের বিচ্ছেদ বেদনার পর আনন্দের মিলন আর পিতৃ-মাতৃহীন জীবনে সদয় আশ্রয়দাতা এবং নতুন

www.pathagar.com

আদর্শের দীক্ষাগুরুর সার্বক্ষণিক সাহচর্যের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়া দুরূহ বৈকি! সবাই তাকিয়ে আছেন জায়েদের দিকে।

কিছুক্ষণ পর মাথা তুললেন ক্রীতদাস জায়েদ। দুই চোখে তখনো অশ্রুর ঢল। কিন্তু ভাষা সংযত, কণ্ঠ স্থির, 'হে মক্কার শ্রেষ্ঠ মানব! আমি আপনার পরিবর্তে অন্য কাউকে প্রাধান্য দিতে পারি না। আমার মাতা-পিতা এবং আত্মীয়স্বজনের তুলনায় আপনি আমার কাছে অধিক কাম্য। তাই আমি আপনার সান্নিধ্যে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম।'

কী বললেন তরুণ জায়েদ! এ কি সেই জায়েদ নয়, যে একদিন মাতৃক্রোড় থেকে অপহৃত হয়েছিল? এ কি সেই জায়েদ নয়, যে পিতার কাঁধে চড়ে হেসেখেলে বড় হয়েছিল? পিতা হারিসা বাকরুদ্ধ, চাচা কাব কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আর মুহাম্মদ পূর্ববৎ প্রশান্ত।

এ কেমন ভালোবাসার বন্ধন, কেমন স্নেহের ডোরে বাঁধা মমতার মায়াজাল–পিতার ভাবনায় আসে না! নাকি এত বছরের দাসত্বের জীবনে জায়েদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে! পরিবার-পরিজন, পিতা-মাতার নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে কে আবার দাসত্বের জীবনকে বরণ করে নেয়, প্রশ্ন করেন পুত্রকে।

ভালোবাসার আলোয় আলোকিত জায়েদ রক্তের সম্পর্কের ওপরে মুনিব মুহাম্মদের সঙ্গে সম্পর্ককে প্রাধান্য দিলেন আর জানিয়ে দিলেন–এ সিদ্ধান্ত তিনি স্থির মস্তিষ্কেই গ্রহণ করেছেন।

জায়েদের বক্তব্যকে পিতা-পিতৃব্য বুকে কষ্ট চেপে মেনে নিলেও এবার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অশান্ত হয়ে উঠলেন। ক্রীতদাস জায়েদের হাত চেপে ধরে সোজা চলে এলেন কাবাপ্রাঙ্গণে।

বেলা দ্বিপ্রহর। আরবের ধু ধু মরুর মাঝে ছোট্ট নগরী মক্কা। অন্ধ বংশগৌরব আর গোত্রকৌলিন্যে মত্ত কুরাইশ নেতারা কাবার পাদদেশে উপস্থিত। সারা দিন তারা এখানে বসেই অলস সময় কাটায়। বিশেষত কুরাইশরা। কাবা সে সময় কুরাইশদের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। আরব উপদ্বীপে প্রশ্নাতীত নেতৃত্বের চাবিকাঠি তাদের হাতেই। কাবার ধারক-বাহক হিসেবে তাদের রয়েছে আলাদা আভিজাত্যের গৌরব।

তাদের আলোচনা চলছিল আরবের কিংবদন্তি কবি ইমরাউল কায়েসকে নিয়ে। তার কাব্যপ্রতিভা আর নারীদেহের উপমা কতটা জুতসইভাবে সংবেদন তৈরি করেছে তার কাব্যে, সেটাই ছিল তর্কের বিষয়।

www.pathagar.com

এমন সময় কাবাপ্রাঙ্গনে মুহাম্মদের উপস্থিতি দেখা গেল। সঙ্গে তাঁর তরুণ ক্রীতদাস জায়েদ। কুরাইশদের আলোচনা তখন তুঙ্গে। একজন আরেকজনের দিকে ছুড়ে দিচ্ছে পঙ্ক্তির পর পঙ্ক্তির শেল। গলা চড়িয়ে আবৃত্তি করছিল কেউ কেউ। সৌম্যকান্তি মানুষটি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না! কোনো রকম ভণিতায় না গিয়ে সঙ্গে থাকা ক্রীতদাস তরুণটির দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, 'এ হচ্ছে জায়েদ। আজ হতে সে মুক্ত এবং আমার পুত্র। সে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং আমি তার উত্তরাধিকারী হব।'

কী আশ্চর্য কথা!

তাঁকে কাবা চত্বরে আসতে দেখেই কুরাইশদের আলোচনা থেমে গিয়েছিল। যখন তিনি কথা বলে উঠলেন, কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করার সাহস পেল না। সকলে রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল সে ঘোষণা। এ কী করে সম্ভব! বলা নেই কওয়া নেই উকাজের বাজার হতে কিনে আনা দাসকে মুক্ত করে দিয়েছে! সেটা না হয় মেনে নেওয়া গেল, তাই বলে তাকে নিজের উত্তরাধিকারী বানাতে হবে? সে কি এ সমাজের রীতিনীতি সব উল্টে দিতে চায়? গোত্রের কৌলিন্য আর আরবের ঐতিহ্যকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চায়?

তখনকার আরব ছিল পৃথিবীর অন্যান্য সকল অঞ্চলের চেয়ে অনেক পিছিয়ে, অনেক অন্ধকার। শিক্ষা আর আত্মশুদ্ধির পথের ব্যাপারে তারা ছিল একেবারেই বেখবর। এ ছিল এমন এক পৃথিবী, যেখানে মানুষের সংখ্যা কম ছিল না, কিন্তু মানবতার অভাব ছিল প্রকট। সাধারণ মানুষের জীবন-সম্মান-সম্পদ সবকিছু যেখানে ক্ষমতাবানের খেলার পুতুল মাত্র, সেখানে একজন ক্রীতদাসের অধিকার বলে কোনো কিছু থাকার প্রশ্নই ওঠে না। বাজারের ক্রীতদাস আর বনের পশুর মাঝে তেমন পার্থক্য করা হতো না সে সমাজে। এমন সমাজে একজন 'নিকৃষ্ট' ক্রীতদাসকে শুধু মুক্ত করে দেওয়াই নয়, নিজের পুত্র বলে স্বীকৃতি প্রদান–একটা প্রবল ভূকম্পন ছাড়া আর কী!

সেদিন হতে মুক্ত ক্রীতদাস জায়েদ, তত দিন পর্যন্ত জায়েদ ইবনে মুহাম্মদ (মোহাম্মদের পুত্র জায়েদ) নামে সমাজে পরিচিত হলেন, যত দিন না কোরআনের আমোঘ বাণী রক্তের সম্পর্কিত পিতা ব্যতীত অন্য কাউকে পিতৃপরিচয় দানের রীতি রহিত করে।

এর পরের ঘটনা তো ইতিহাস। ইতিহাস ভালোবেসে এ ঘটনা বিবৃত করেছে নিজের কালো হরফে, যেখানে ইতিহাসের সকল উপমা স্থবির।

www.pathagar.com

স্থিরচিত্তে দাসত্বকে বরণ করে নেওয়া জায়েদ মুক্তি তো পেলেনই, সেই সঙ্গে মক্কার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির পুত্র হিসেবে গৃহীত হলেন। খাদিজার ঘরেই তিনি প্রতিপালিত হতে লাগলেন। রাসুলের সাহাবিদের মাঝেও সম্মান ও মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

তিনি পরিচিত হলেন জায়েদ ইবনে হারিসা নামে। ইতিহাসে অঙ্কিত হয়ে রইল তাঁর নাম।

দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে তিনি জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র উসামা ইবনে জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর রাষ্ট্রীয় ভাতা স্বীয় পুত্র প্রখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের চাইতে বেশি নির্ধারণ করেন। এতে আবদুল্লাহ আপত্তি জানান। উমর তাঁকে এই বলে চুপ করিয়ে দেন, 'উসামা আল্লাহর রাসুলের কাছে তোমার চেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন, আর তাঁর পিতাও আল্লাহর রাসুলের কাছে তোমার পিতার চেয়ে প্রিয় ছিলেন।'

এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু চুপ করে যান।

এগারো

খাদিজা-মুহাম্মদের বিয়ের প্রথম রাত। আজ খাদিজা প্রশান্ত। পৃথিবী নির্বাক। আজ সমগ্র সৃষ্টি বিমুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে খাদিজার বাড়িটির দিকে। ধরণির সকল সুখ যেন আজ গলে গলে পড়ছে খাদিজার বাড়ির চাতালে। আজ তিনি পূর্ণ। তাঁর হৃদয় আজ ভালোবাসায় তৃপ্ত। তৃপ্ত নয়নে তিনি মুহাম্মদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এ কেবল প্রেমের মুগ্ধতা নয়, এ যেন অনন্ত বিস্ময়ের এক আবিষ্কার। বহু সাধনা আর পরম আরাধ্যের পর এমন পরশপাথর মেলে এ মাটির পৃথিবীতে।

খাদিজার সঙ্গে মুহাম্মদের বিয়ে হয়েছে কিছুদিন হলো। সুখে-শান্তিতে কেটে যাচ্ছে তাঁদের দিন। খাদিজা সব সময় মুহাম্মদকে আগলে রাখেন নিজের কাছে। মুহাম্মদ কখনো কোনো কাজে বাইরে গেলে তিনি বেচইন হয়ে থাকেন ঘরের ভেতর। মুহাম্মদের ফেরার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে বসে থাকেন। তা ছাড়া তিনিও চাচা আবু তালিবের মতো ইহুদি বা অন্য কোনো গোত্রের দ্বারা মুহাম্মদের জীবনশঙ্কার ভয় করেন। এ কারণে সব সময় তাঁকে চোখে চোখে রাখতে চান। তিনি বাইরে থেকে ফিরে এলেই যেন তাঁর অন্তরে স্বস্তি আসে। নয়তো সারাক্ষণ তাঁর মন উচাটন হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

এরই মধ্যে একদিন আবু তালিব তাঁর ক্রীতদাস নাবাকে ডেকে বললেন, 'যাও তো খাদিজার বাড়িতে, সেখানে নতুন বর-বধূ কীভাবে সংসার করছে একটু দেখে আসো।' মূলত আবু তালিব তাঁর প্রিয় ভাতিজার ব্যাপারে সব সময় একটু বেশি খেয়াল রাখতেন। খাদিজা মুহাম্মদকে কীভাবে বরণ করে নিয়েছেন, সেটাই তিনি দেখতে চাইছিলেন।

নাবা নবপরিণয়া সংসার থেকে ফিরে এসে আবু তালিবকে বলতে লাগলেন, 'আমি যা দেখেছি তা এককথায় অসাধারণ। খাদিজা যখন মুহাম্মদকে বাড়ির দিকে আসতে দেখেন, তখন তিনি দৌড়ে দরজার কাছে গিয়ে তাঁকে সম্ভাষণ জানান। তাঁর হাত দুটো ধরে তাঁকে ঘরের ভেতর এনে বসান এবং বলতে থাকেন, 'আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক। আপনার জন্য এই যে অস্থিরতা, পৃথিবীর আর কারও জন্য আমার এমন অস্থিরতা হয় না। আমি জানি, আপনিই সেই প্রতিশ্রুত পুরুষ। কথা দিন, আপনি যখন নবি হবেন, তখন আমাকে ভুলে যাবেন না! আপনার অন্তর থেকে আমাকে মুছে ফেলবেন না। আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যিনি আপনাকে এ পৃথ্বীলোকে প্রেরণ করেছেন।'

খাদিজা এমন অস্থিরতা প্রায়ই দেখাতেন। তাঁর এমন কান্নাভেজা আরতি শুনে মুহাম্মদ তাঁকে কাছে টেনে আশ্বস্ত করে বলতেন, 'আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি যদি সত্যিই সেই প্রতিশ্রুত নবি হয়ে থাকি, তবে কোনো দিন তোমাকে ভুলে যাব না। তোমাকে ভোলা সম্ভব নয়। কেননা তুমি আমার জন্য নিবেদন করেছ অপরিশোধযোগ্য ভালোবাসা, যার কোনো প্রতিদান হয় না।'

নিয়মমাফিক যেতে লাগল পৃথিবীর দিন। শীত গিয়ে বসন্ত, আবার গ্রীষ্ম আসত মক্কায়, মরুঝড়ের দিন শেষ হয়ে আবার আসত পুবালি সমীরণের দিন। খাদিজার সংসারেও দিনকে দিন খুশির মাতোয়ারা মিছিল হতে লাগল। বেহেশতি ফল্গুধারায় আচ্ছাদিত এ সংসারে সুখ কখনো ফিকে হতে দিতেন না তিনি। সামান্য কোনো দুঃখ-কষ্ট এলেও তিনি সযতনে তা মুছে নিতেন, মুহাম্মদের হৃদয়ে কষ্টের বিন্দুমাত্র স্পর্শ লাগতে দিতেন না। পৃথিবীর সকল অনিষ্ট থেকে তাঁকে আগলে রাখতেন।

খাদিজার বিয়ের দুই বছর পর তাঁর কোলজুড়ে আগমন করে এক পুত্রসন্তান। নাম রাখা হয় কাসিম। তাঁর নামানুসারে মুহাম্মদকে আবুল কাসিম ডাকা হতো। যদিও এ পুত্র হাঁটাচলার বয়সেই ইন্তেকাল করেন। প্রথম সন্তানের মৃত্যুতে দারুণ ব্যথিত হন মুহাম্মদ ও খাদিজা। তবু খাদিজা ভেঙে পড়েননি,

www.pathagar.com

ব্যথাতুর মুহাম্মদকে সান্ত্বনা দিয়ে বলিষ্ঠ করেছেন। এটা বিয়ের পঞ্চম বছরের ঘটনা।

৬০০ ঈসায়ি সাল, যে বছর কাসিম ইন্তেকাল করেন, সে বছরই খাদিজার প্রথম কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম কন্যার নাম রাখা হয় জয়নব।

৬০৩ ঈসায়ি সালে জন্মগ্রহণ করেন দ্বিতীয় কন্যা রোকাইয়া।

৬০৫ ঈসায়ি সালে জন্মগ্রহণ করেন তৃতীয় কন্যা উম্মে কুলসুম।

৬০৮ ঈসায়ি সালে জন্মগ্রহণ করেন চতুর্থ কন্যা ফাতেমা।

৬১২ ঈসায়ি সালে নবুওয়াতপ্রাপ্তির তৃতীয় বছর জন্মগ্রহণ করেন খাদিজার শেষ সন্তান আবদুল্লাহ। তিনিও দুধপান বয়সেই ইন্তেকাল করেন।

বারো

চারদিকে নিকষ আঁধার। এক টুকরো আলো নেই কোথাও। চারদিকে জাহেলিয়াত। মানুষের মাঝে মানবতার নাম-নিশানারও অস্তিত্ব নেই। পাপের সয়লাবে ভেসে যাচ্ছে পৃথিবীর সফেদ জমিন। পঙ্কিলতার অতল তমসায় ছেয়ে আছে সমগ্র ভূগোল। একত্ববাদের শিক্ষা বিলীন হয়ে গেছে অনেক আগেই। অদ্ভুত সব ধর্মবিশ্বাস আর দেবতায় ভরে গেছে মানুষের মনমন্দির। যে যার মতো নিজস্ব ধর্ম বানিয়ে নিচ্ছে। যাকে ইচ্ছা তাকে খোদা বলে স্বীকার করছে। যে জিনিসকে ভালো লাগছে সেটারই পূজা শুরু করছে। কোথাও একেশ্বরবাদী ধর্মের কোনো আলো নেই।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর থেকে ব্যতিক্রম। আরবের মানুষের মাঝে পালিত সকল ধর্মবিশ্বাস থেকে তিনি পবিত্র। কোনো মানবনির্মিত দেবতার পূজায় তিনি কখনো হৃদয়ের অর্ঘ্য দান করেননি। তিনি অসাড়, অন্তঃসারশূন্য মাটির প্রতিমার সামনে কোনো দিন মাথানত করেননি। তিনি ছিলেন সবার চেয়ে আলাদা, সবার চেয়ে পবিত্র।

তিনি ধীমান ছিলেন, ছিলেন তাঁর বংশীয় আদি পিতা নবি ইবরাহিম (আ.)-এর রেখে যাওয়া একেশ্বরবাদী ধর্মের অনুসারী। সে সময় পৃথিবীতে এ ধর্মের নির্দিষ্ট কোনো জনগোষ্ঠী ছিল না যদিও, তবু কিছু মানুষ আল্লাহকে একনিষ্ঠভাবে পাওয়ার ইচ্ছায় পালন করত ইবরাহিমীয় ইবাদত ও রীতিনীতি।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নির্জনে ইবরাহিমীয় ইবাদতের ধ্যান করতেন। ইবরাহিম আদিষ্ট একক ও অবিনশ্বর আল্লাহর আরাধনা করতেন

www.pathagar.com

নিভৃতে। লোকচক্ষুর আড়ালে গিয়ে তিনি নীত হতেন আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশে। তিনি জানতেন, যদি তিনি ইবরাহিমের এ ধর্মবিশ্বাস মানুষের মাঝে থেকে পালন করেন, তাহলে লোকজন তাঁকে গালমন্দ করবে, তাঁকে পথভ্রষ্ট বলে হেয় করবে। এ কারণে তিনি নিজের ধর্ম পালনের জন্য বেছে নিলেন নির্জনতা। মক্কার প্রায় আড়াই মাইল দূরবর্তী জাবালে নুরের চূড়াদেশে একটি নির্জন গুহা হয়ে ওঠল তাঁর ধ্যানমগ্নতার প্রধান কেন্দ্র।

তা ছাড়া তিনি নবুওয়াতি বয়সের যত নিকটবর্তী হতে লাগলেন, ততই আশ্চর্য সব বিষয়াবলি তাঁর সামনে উদ্ভাসিত হতে থাকে।

একদিন তিনি রাতে ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলেন–তাঁর ঘরের ছাদের কড়িকাঠ খুলে ফেলা হলো। কাঠ খুলে ফেলার কারণে ছাদের খোলা অংশ দিয়ে ওপরের আকাশ দেখা যাচ্ছে। একটু পর সে খোলা ছাদ দিয়ে রুপার একটি তশতরি নেমে এল। রুপার তশতরির ওপর ভর করে দুজন লোকও নেমে আসছে ঘরের মধ্যে। এটি ছিল এক অভাবনীয় দৃশ্য। রুপার তশতরিতে ভর করে দুজন অপরিচিত শ্বেত-শুভ্র পোশাকপরা মানুষ ভেসে আসছে, যারপরনাই ভয় পাওয়ার মতো দৃশ্য। মুহাম্মদ ভয় পেলেন। তিনি সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকতে চাইলেন কিন্তু ডাকার মতো কোনো শব্দ জোগাল না তাঁর মুখে। আশপাশে কাউকে দেখতেও পেলেন না। অগত্যা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বিছানায় পড়ে রইলেন।

রুপার তশতরিতে ভেসে আসা লোক দুজনের একজন মুহাম্মদের বুকের পাশে বসে পড়ল। সে তাঁর হাত দুটোকে দুদিকে ধরে রাখল। অন্যজন বিশেষ প্রক্রিয়ায় তাঁর বাঁ পাঁজরের দুটো হাড় আলগা করে ফেলল সন্তর্পণে। লোকটি পাঁজরের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে তুলে আনল তাঁর জীবন্ত হৃৎপিণ্ড।

অস্ত্রোপচার তখনো চলছিল। মুহাম্মদ লোকটির হাতে ধরা নিজের হৃৎপিণ্ডের চাপ অনুভব করতে পারছিলেন। তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন না, লোক দুজন মানুষ নাকি ফেরেশতা। হৃৎপিণ্ড হাতে ধরা লোকটি কথা বলে উঠল, 'এ মহান মানুষটির হৃৎপিণ্ড অসম্ভব সুন্দর!'

এরপর লোকটি সঙ্গে নিয়ে আসা একটি পাত্রে হৃৎপিণ্ডটি রেখে বিশেষ প্রক্রিয়ায় শোধন করল। পরিশোধিত হৃৎপিণ্ডটি পুনরায় পাঁজরের অভ্যন্তরে প্রতিস্থাপন করে লোক দুজন ছাদের ফোকর গলে বেরিয়ে গেল। ছাদের কড়িকাঠ আবার আগের মতোই নিশ্ছিদ্র হয়ে রইল।

মুহাম্মদ এ স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেন। তিনি ভীতসন্ত্রস্ত। পাশে শুয়ে থাকা খাদিজাকে ডেকে সদ্যসমাপ্ত স্বপ্নদৃশ্য বর্ণনা করলেন। খাদিজা পেরেশান হলেন

www.pathagar.com

না মোটেও। তিনি ভয় পেলেন না স্বামীর বিচলিত হওয়াতে। কেন ভয় পাবেন? তিনি নিজেও তো এমন স্বপ্নের সাক্ষী। স্বর্গীয় আলোকবিভা একসময় তাঁকেও আলোকিত করেছিল স্বপ্নমহিমায়। তিনি তো তাঁর স্বামীর এমন অলৌকিক স্বপ্নেরই প্রত্যাশা করেন। তাঁর স্বামীর এ স্বপ্ন কি তাঁর স্বপ্নেরই নবরূপায়ণ নয়?

খাদিজা স্বামী মুহাম্মদকে নিজের দিকে টেনে নিলেন। তাঁকে ভালোবাসার বাহুডোরে আগলে নিয়ে অভয় দিয়ে বললেন, 'আপনি ভয় পাবেন না। এ তো আপনার জন্য সুসংবাদ। এ স্বপ্নের বাস্তবতা শিগগির প্রতিফলিত হবে। দুশ্চিন্তা করবেন না, আল্লাহ কখনো আপনাকে মন্দ প্রতিদান দেবেন না। আপনি সত্যবাদী, আপনি আরবের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি, আপনি আত্মীয়তা রক্ষায় অগ্রগামী। আল্লাহ আপনাকে বিপদে ফেলবেন না। তিনি আপনাকে সুসংবাদ দেবেন সত্বর।'

কখনো এমন হতো–তিনি জাবালে নুরের সাধনাকেন্দ্রে যাওয়া বা আসার পথে পথপাশের বৃক্ষ, তরুলতা, এমনকি পাথরের ফিসফিসানি শুনতে পেতেন। সেগুলো তাঁর নাম ধরে সম্ভাষণ জানাত। তিনি অদৃশ্যের এমন সম্ভাষণে বিচলিত হয়ে পড়তেন। জলদি এসে নিজেকে সমর্পণ করতেন খাদিজার অভয়াশ্রয়ে। খাদিজা তাঁকে সান্ত্বনার পরশে আশ্বস্ত করতেন। মুহাম্মদ তবু শান্ত হতেন না। খাদিজাকে প্রশ্ন করতেন, 'আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি?'

বস্তুত যিনি বৃক্ষ, তরুলতা, পাথরের গুঞ্জরিত সম্ভাষণ শুনতে পান, লোকে শুনলে তাঁকে তো পাগলই ভাববে। রাত্রিঘুমে যাঁর বুকে অস্ত্রোপচার করে অন্তঃকরণ পরিশোধন করা হয়, এমন কথা জানাজানি হলে লোকজন তাঁকে পাগল ছাড়া আর কী বলবে! কিন্তু খাদিজা একবারের জন্যও মুহাম্মদকে পাগল ভাবেননি। বরং তিনি এই অতিলৌকিক প্রতিটি কাজকে সাদরে বরণ করে নিলেন। তিনি প্রতীক্ষা করলেন–এ প্রতিটি ঘটনাই মুহাম্মদের প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার স্বপ্নসিঁড়ির ধাপমাত্র।

মক্কা থেকে জাবালে নুর দুই মাইল দূরত্বে। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে হেরা গুহায় উঠতে আরও আধা মাইল। খাদিজা প্রায়ই আসেন এখানে। কখনো-বা মুহাম্মদকে সঙ্গ দিতে, কখনো তাঁর খবর নিতে, কখনো মুহাম্মদের খাবার শেষ হয়ে গেলে নিজেই আড়াই মাইল দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এ গুহায় আসেন। তিনি কখনো নিঃসঙ্গ অনুভব করলে এ গুহাবাসে মুহাম্মদের সঙ্গে রাত্রিযাপন করেন। গুহার সঙ্গিন পাথরে মাথা রেখে সারা রাত কথা বলেন দুজনে, রাতের আকাশে তাকিয়ে দেখেন তারাদের ঝিলমিল শামিয়ানা। কথা

www.pathagar.com

বলেন মুহাম্মদের ধ্যান-সাধনা কিংবা নতুন কোনো অলৌকিক ঘটনার ব্যাপারে। বরাবরের মতো খাদিজা নিজের অভিভাবকত্ব দিয়ে তুলার মতো মুহাম্মদের মন থেকে উড়িয়ে দেন দুশ্চিন্তার কালো মেঘ।

ভোর হলে দুজন একসঙ্গে চলে যান মক্কা নগরীতে। কখনো পাহাড়ের পাদদেশে কেবল একটা বড় কাপড় টাঙিয়ে রাত্রিবাস করেন দুজন। খাদিজা মুহাম্মদের জন্য শুকনো খাবার আর পানীয় নিয়ে আসেন। সকাল হলে খাদিজাকে বিদায় দিয়ে মুহাম্মদ আবার চলে যান তাঁর সাধনাকেন্দ্রে, আর খাদিজা পথ ধরেন মক্কার।

এত সবের পরও মুহাম্মদকে নিয়ে খাদিজার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। সর্বদা মুহাম্মদের খবর রাখার জন্য একজন ক্রীতদাস নিযুক্ত করলেন তিনি। এ ক্রীতদাস জাবালে নুরের পাদদেশে বকরি চরাত এবং মাঝেমধ্যে মুহাম্মদের সার্বিক দেখভাল করে আসত।

এক রাতে মুহাম্মদ ধ্যানমগ্ন ছিলেন। হঠাৎ শুনতে পেলেন এক অপার্থিব সম্বোধন : 'হে মুহাম্মদ! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।' মুহাম্মদ শব্দের উৎসের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, অতিকায় এক অবয়ব ভেসে আছে শূন্য ইথারে। তিনি জিবরাইল।

কিন্তু মুহাম্মদ বাস্তবে কখনো কোনো ফেরেশতাকে তাঁর স্বমূর্তিতে দেখেননি। জিবরাইলকে দেখে তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। কেননা এই দৃশ্য মোটেও স্বাভাবিক কোনো দৃশ্য ছিল না। অস্বাভাবিকতার ভয়ালদর্শন তাঁকে মুহূর্তে ভীত করে তুলল।

তিনি সাধনাকেন্দ্র থেকে দ্রুত নিচে নেমে এলেন এবং দৌড়ে মক্কায় গিয়ে খাদিজার আশ্রয়ে নিজেকে সমর্পণ করলেন। খাদিজাকে খুলে বললেন, যা তিনি এইমাত্র দেখে এসেছেন। ভয়ে তাঁর শরীর কাঁপছিল। খাদিজা তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁকে নিজের বুকে রেখে সাহস জোগালেন, তাঁকে নবুওয়াতের জন্য একজন মহামানব হিসেবে প্রস্তুত করতে লাগলেন। অভয় দিয়ে বললেন, 'আপনার কিচ্ছুটি হবে না। এ আপনার জন্য এক কল্যাণ সংবাদ। কারও জন্য শান্তি কামনা অবশ্যই মহৎ কিছুর ইঙ্গিতবহ।'

এমন ঘটনা আরেক রাতে ঘটল। জিবরাইল সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, 'হে মুহাম্মদ! ভয় পাবেন না, আমি জিবরাইল।'

কিন্তু সাধারণ নিরক্ষর একজন মানুষ হিসেবে মুহাম্মদের ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি আবার হেরাকেন্দ্র থেকে ছুটে এসে নিজেকে সমর্পণ

www.pathagar.com

করলেন খাদিজার আঁচলতলে। বারবার আওড়াচ্ছিলেন, 'আমার ভয় হচ্ছে, আমি অস্থির হয়ে আছি। জানি না, আমি সম্ভবত পাগল হয়ে যাচ্ছি!'

খাদিজা বুঝতে পারছিলেন, সময় সমাগত। ঐশী কিছু একটা ঘটার জন্য সময় উন্মুখ হয়ে আছে। মুহাম্মদকে নবি হিসেবে বরণ করে নেওয়ার জন্য পুরো ধরিত্রী অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ। এভাবে মুহাম্মদ যখন প্রতিবার ভয় পেয়ে আসতেন, তখন তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘটনার বিবরণ শুনতেন। তিনি বুঝতে চেষ্টা করতেন, নবুওয়াতের নুরঝলক মুহাম্মদকে চমকিত করেছে কি না। তিনি তাঁকে প্রবোধ দিতেন, ভালোবাসা আর মমতার চাদরে ঢেকে নিয়ে তাঁকে শক্তি-সাহসে বলীয়ান করতেন। আবার স্বামীর জীবনশঙ্কার ভয়ও করতেন।

বস্তুত মুহাম্মদকে জিবরাইলের অলৌকিক দর্শন ও শব্দের সঙ্গে পূর্বপরিচয়ের জন্যই এমনটি করা হয়েছিল, যাতে পরম মুহূর্তে তিনি সীমাহীন বিচলিত হয়ে না পড়েন। জিবরাইলের কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে তাঁকে সাহসী করে তোলা হচ্ছিল। আর ঘরে খাদিজা ছিলেন তাঁর মানসিক ভরসার অন্যতম শক্তিকেন্দ্র। সকল শঙ্কা, ভয়, দুশ্চিন্তা থেকে তিনি তাঁকে মুক্ত করে আনতেন মানবীয় ভালোবাসায়। কখনো তাঁকে ভীত হতে দিতেন না।

এর পর থেকে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটতে লাগল। কখনো তিনি অপার্থিব আলো দেখতে পান, কখনো অদৃশ্যের সম্বোধন শুনতে পান, কখনো প্রকৃতির অস্বাভাবিক কোনো দৃশ্য দেখতে পান। খাদিজাকে তিনি প্রতিটি ঘটনা বর্ণনা করতেন। এসব শুনে খাদিজা মুহাম্মদকে চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে নিয়ে গেলেন।

ওয়ারাকা ঘটনাগুলো শুনেই বুঝতে পারলেন, মুহাম্মদের সময় অত্যাসন্ন। তিনি মুহাম্মদকে অভয় দিয়ে বললেন, 'আপনার বর্ণিত এসব ঘটনা যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি তো সে ফেরেশতা, যিনি মুসা নবির কাছে পয়গাম নিয়ে আসতেন। ভয়ের কিছু নেই, আমার জীবদ্দশায় যদি আপনি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন, তাহলে আমি আপনাকে পূর্ণ সমর্থন জানাব। আপনার নবুওয়াতি কাজে সব ধরনের সহযোগিতা করব এবং আপনার ওপর প্রেরিত ধর্মের প্রতি ঈমান এনে সম্মানিত হব। হায়, যদি আমি তত দিন বেঁচে থাকতাম!'

মুহাম্মদ মূলত খাদিজা, ওয়ারাকা এবং পূর্বেকার অনেক অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে যদিও এমন কিছু আশা করছিলেন–হতে পারে আবার না-ও হতে পারে; কিন্তু তিনি আসলে জানতেন না নবুওয়াতের সত্যিকারের প্রত্যাদেশ কেমন হয় বা কীভাবে আল্লাহর প্রত্যাদেশ ধরার বুকে আগমন করে। কারণ

www.pathagar.com

তিনি নিরক্ষর ছিলেন, পড়তে জানতেন না। পূর্বেকার কিতাবের বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল সামান্য। তিনি আরবের আর সবার থেকে আলাদা ছিলেন, সবার চেয়ে উন্নত মানসিকতা এবং চারিত্রিক নিষ্কলুষতায় তাঁকে নিয়ে বাজি ধরা যেত।

তেরো

১০ আগস্ট ৬১০ ঈসায়ি মোতাবেক রমজানের ২১ তারিখ।

রমজান মাসে মুহাম্মদ সাধারণত অন্যান্য মাসের তুলনায় একটু বেশি ধ্যানমগ্ন হন। কখনো পুরো মাস তিনি জাবালে নুরের হেরা গুহায় কাটিয়ে দিতেন। এবারও তিনি পুরো মাস হেরাকেন্দ্রে নির্জনবাসের জন্য মাসের শুরুতে প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন। মাঝে খাদিজা এসে বার কয়েক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গেছেন। খাবারের প্রয়োজনে ক্রীতদাস এসে খাবার দিয়ে যায়। তিনি পূর্ণ রমজান মাস এখানে অবস্থানের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

রাত্রিবেলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ কোনো আলোর ঝলকানিতে তিনি জেগে উঠলেন। জেগে দেখলেন, আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা জিবরাইল তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে একখণ্ড রেশমের টুকরো, তাতে আরবিতে কিছু লেখা আছে। জিবরাইল বললেন, 'পড়ুন'!

সদ্য ঘুম থেকে জেগে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতবিহ্বল অবস্থায় ছিলেন। চোখের সামনে চমকিত জিবরাইলকে দেখে তিনি কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। ভয় পাওয়া তাঁর হৃদয় থেকে আপনাআপনিই বেরিয়ে এল, 'আমি তো পড়তে জানি না।'

জিবরাইল এগিয়ে এসে মুহাম্মদকে নিজের বুকের সঙ্গে চেপে ধরলেন। মুহাম্মদের মনে হতে লাগল, তাঁর বুকের হাড়গোড় না ভেঙে যায়। তাঁকে ছেড়ে দিয়ে জিবরাইল আবার বললেন, 'পড়ুন'! বিহ্বল মুহাম্মদ আগের মতোই বললেন, 'আমি তো পড়তে জানি না।' জিবরাইল আবার তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। ছেড়ে দিয়ে আবার পড়তে বললেন। তিনি একই উত্তর দিলেন।

এবার জিবরাইল তাঁকে আরও দীর্ঘক্ষণ বুকের সঙ্গে ধরে রাখলেন। মুহাম্মদের নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার জোগাড় হলো। একসময় জিবরাইল তাঁকে ছেড়ে দিয়ে নিজেই আবৃত্তি করলেন–

> 'পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ো এবং তোমার প্রভু নিয়ত

www.pathagar.com

দয়াপরবশ। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষাদান করেন। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।'

এবার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পড়তে পারলেন। তিনি জিবরাইলের উচ্চারিত বাণীগুলো পুনরাবৃত্তি করলেন। মনে হচ্ছিল, এ বাণীগুলোর প্রতিটি শব্দ-অক্ষর তাঁর অন্তঃকরণে খোদাই করে দেওয়া হচ্ছে। তিনি তা বারবার আওড়াতে লাগলেন।

মুহাম্মদ কি জানতেন, এই এক 'ইকরা' শব্দ বদলে দেবে আগামী পৃথিবীর মানচিত্র? বদলে দেবে মানবজাতির প্রলয়ংকরী গতিপথ, বদলে দেবে কোটি মানুষের বিশ্বাস, ধর্ম, ভালোবাসা, যুদ্ধ এবং সকল জীবনাচার। এই 'ইকরা' ধ্বনির মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে সূচিত হলো নতুন এক পৃথিবীর, নতুন এক সভ্যতার। যে সভ্যতা কেয়ামত পর্যন্ত আলোকিত করে রাখবে এ ধুলোর ধরণি।

আয়াতগুলো মুহাম্মদকে শিখিয়ে জিবরাইল গুহার বাইরে চলে গেলেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাধনাকেন্দ্রের ভেতরে বসে থরথর করে কাঁপছিলেন। মনে হচ্ছে, পুরো পৃথিবীর ভর তাঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। গুহার ভেতর তিনি বেশিক্ষণ থাকতে পারলেন না, অসংলগ্ন পায়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। এখনই তাঁকে খাদিজার অভয়াশ্রয়ে যেতে হবে।

কম্পিত শরীর এবং অসংলগ্ন পায়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন পর্বতচূড়া থেকে নিচে নেমে আসছেন, তখন ইথার থেকে আবারও জিবরাইলের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। জিবরাইলের কণ্ঠ শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, জিবরাইল তাঁর দুই ডানায় ভর করে শূন্যে ভেসে আছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে বলছেন, 'হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহর রাসুল এবং আমি আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা জিবরাইল।'

সদ্যসমাপ্ত ওহির ভারে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন এমনিতেই ন্যুব্জ, নতুন করে তিনি আর জিবরাইলের সম্মুখীন হতে চাচ্ছিলেন না। তিনি অন্যদিকে ফিরে তাকালেন। কিন্তু আকাশের যেদিকে তাকান সেদিকেই একই মূর্তিতে জিবরাইলের ডানাবিশিষ্ট কায়া দেখতে পেলেন। জিবরাইল বারবার উচ্চারণ করছিলেন, 'হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহর রাসুল এবং আমি আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা জিবরাইল।'

www.pathagar.com

এ সময় মুহাম্মদ দেখতে পেলেন, তাকে খোঁজার জন্য খাদিজা লোক পাঠিয়েছেন। তারা গুহায় মুহাম্মদকে না পেয়ে আবার ফিরে গেল। পর্বত মাঝে দাঁড়ানো মুহাম্মদ কিংবা আকাশে উড্ডীন জিবরাইলকে তারা দেখতে পেল না। এ দৃশ্য তাঁকে আরও বিস্মিত করল।

মুহাম্মদের বুকে নবুওয়াতের সিলমোহর এঁটে দিয়ে একসময় জিবরাইল ঊর্ধ্বাকাশে লীন হয়ে গেলেন।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এতক্ষণ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। জিবরাইল চলে যেতেই তিনি যেন সংবিৎ ফিরে পেলেন। আবার তাঁর শরীরে কাঁপুনি দেখা দিল। নিজের পা স্থির রাখতে পারছেন না। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে মক্কার পথ ধরলেন। পথ দিয়ে চলার সময় তিনি শুনতে পেলেন প্রতিটি গাছ, পাতা, তরু-লতা, পাথরসহ সমগ্র সৃষ্টি তাঁর নাম ধরে সম্ভাষণ জানাচ্ছে নবুওয়াতের : 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, সালাম আলায়কা–হে আল্লাহর রাসুল, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক!'

সৃষ্টির এ সম্ভাষণ মুহাম্মদকে আরও ভীত করে তুলল। তিনি তাঁর হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলেন। দ্রুত দৌড়ে চলে এলেন খাদিজার কাছে।

মুহাম্মদকে এভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে ঘরে ফিরতে দেখেই খাদিজা এগিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'আবুল কাসিম! কোথায় ছিলেন আপনি? আপনাকে খোঁজার জন্য আমি লোক পাঠিয়েছিলাম, তারা আপনাকে খুঁজে পায়নি। কী হয়েছে আপনার? আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?'

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথার কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি কথা বলার মতো অবস্থায় ছিলেন না তখন। তাঁর শরীর তখনো কাঁপছে, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর চলে এসেছে। নিজেকে কোনো রকম বিছানায় তুলে দিয়ে খাদিজাকে বললেন, 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।'

খাদিজা দ্রুত তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। মমতার পরশে জড়িয়ে ধরলেন নিজের মাঝে। তাঁকে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে লাগলেন, সাহস দিতে লাগলেন বারবার। খাদিজার অভয়বাণী শোনার কিছুক্ষণ পর মুহাম্মদ কিছুটা সুস্থির হলেন। ভয়ার্ত গলায় খাদিজাকে বললেন, 'আমি আমার জীবনের আশঙ্কায় ভীত। ভয়ংকর কিছু ঘটে গেছে আমার জীবনে।'

না, খাদিজা তা বিশ্বাস করেন না। একবারের জন্যও খাদিজা মনে করেন না তাঁর স্বামীর জন্য ভয়ানক কিছু অপেক্ষা করছে। মক্কার সবচেয়ে ভালো মানুষটির জীবনে এমন কিছু ঘটা সম্ভব নয় যার কারণে তিনি জীবননাশের আশঙ্কা করবেন। তিনি মুহাম্মদকে আরও নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরলেন।

www.pathagar.com

পৃথিবীতে এই বাহুডোর মুহাম্মদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ অভয়াশ্রয়। এই ভালোবাসার দুটো হাত মুহাম্মদের সাহস আর শক্তিমত্তার প্রতীক। তাঁর জন্য খাদিজার হৃদয়ের অস্থিরতা তাঁর প্রেমের অনন্ত সরোবর। এ কারণে খাদিজা কেবল তাঁর স্ত্রী নন, তাঁর সবচেয়ে কাছের বন্ধু। তাঁর জীবনের সবচেয়ে নিকট মানবী। মুহাম্মদ খাদিজার বুকে মাথা রেখে সুস্থির হলেন।

মুহাম্মদ বললেন। মুহাম্মদের মুখ থেকে পৃথিবীর প্রথম মানুষ হিসেবে খাদিজা শুনলেন নবুওয়াতের মহাসত্য পয়গাম। পৃথিবীর প্রথম মুসলিম হওয়ার গৌরব অর্জন করলেন তিনি।

মুহাম্মদ ভীত ছিলেন এমন অকস্মাৎ দৈবদর্শনে। কিন্তু খাদিজা ভয় পেলেন না। খাদিজা ভয় পাবেন কেন? এই দিনটির জন্যই তো তিনি বছরের পর বছর অপেক্ষা করে আছেন। এই মহত্তম মুহূর্তটির জন্যই তো তিনি নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন মুহাম্মদের চরণতলে। তাঁর হৃদয়ে এক বিন্দু শঙ্কা নেই, তিল পরিমাণ দ্বিধা নেই। শুধু পৃথিবীবাসী কেন, তিনি জিবরাইলের আগমনের আগেও বিশ্বাসী মুহাম্মদের নবুওয়াতের ওপর। তিনি ইসলাম আগমনের পূর্ব থেকেই মুহাম্মদি ধর্মে বিশ্বাসী। মুহাম্মদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা তাঁকে যেন ইসলাম আগমনের আগেই মুসলিম বানিয়ে দিয়েছিল তাঁর ভালোবাসায়, তাঁর বিশ্বাসে। তাঁর জন্যই হয়েছে এই নবুওয়াতে মুহাম্মদের জন্য, মুহাম্মদকে এভাবে বুকে আগলে রাখার জন্য, পৃথিবীর সকল জিঘাংসা থেকে মুহাম্মদের আত্মাকে স্বচ্ছ, পবিত্র রাখার জন্য।

উম্মুল মুমিনিন খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা। মুহাম্মদকে নবিরূপে প্রত্যয়ন করতে যে দৃঢ়তা এবং সাহস দেখিয়েছেন, তা এককথায় অনন্য। স্বামীর এমন সঙ্গিন মুহূর্তে যেকোনো স্ত্রী ভয়ে ভীত হয়ে পড়ত। কিন্তু তিনি কেবল ঘটনার সম্মুখই করলেন না, মুহাম্মদের নবুওয়াতের সত্যতার প্রথম প্রত্যয়ন করলেন–

> 'আপনি মোটেও ভয় পাবেন না। আল্লাহর কসম! তিনি কখনোই আপনাকে অপদস্থ করবেন না। আপনি আত্মীয়দের সঙ্গে সদাচরণ করেন, দুস্থদের বোঝা বহন করেন, নিঃস্বদের কর্মসংস্থান করেন, অতিথিদের আপ্যায়ন করেন এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন। হে মুহাম্মদ! অবিচল থাকুন। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি–আপনি এ যুগের মানবজাতির জন্য নবি হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। এ আমার বিশ্বাস, আমার স্বীকারোক্তি।'

www.pathagar.com

মুহাম্মদ এখনো অপ্রকৃতিস্থ। কিন্তু খাদিজা দেরি করলেন না, মুহাম্মদকে ঘরে শুইয়ে রেখে তখনই বেরিয়ে পড়লেন। চলে এলেন চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের বাড়িতে। ওয়ারাকার কাছে গিয়ে খাদিজা নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলেন এবং ঘটে যাওয়া ঘটনার সত্যনিষ্ঠতার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে চাচ্ছিলেন। বস্তুত তিনি জানতে চাচ্ছিলেন, নবুওয়াতের প্রত্যাদেশ কি এভাবেই ঘোষিত হয় মানবমনে? মুহাম্মদ নবি হবেন বা হয়েছেন–এর সত্যায়ন প্রয়োজন ছিল না তাঁর, তাঁর প্রয়োজন ছিল–নবুওয়াত কি সত্যিই প্রত্যাগমন করেছে?

খাদিজা হন্তদন্ত হয়ে ওয়ারাকার কাছে গিয়ে বললেন যা তিনি সদ্য শুনেছেন মুহাম্মদের মুখ থেকে। ওয়ারাকা খাদিজার মুখ থেকে এমন সংবাদ শোনার জন্য বহুদিন থেকে অপেক্ষা করছিলেন। নিজের কানে নবুওয়াতের আগমনী সংবাদ শোনা–এ ছিল তাঁর কাছে এক পরম সৌভাগ্যের বিষয়। ওয়ারাকা মুহাম্মদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা শুনে চিৎকার করে উঠলেন, 'শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে ওয়ারাকার প্রাণ! তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয়ে থাকে হে খাদিজা, তাঁর কাছে যে অলৌকিক ব্যক্তি এসেছিলেন, তিনি তো আল্লাহর ফেরেশতা 'নামুস' (প্রাচীন আরবে ওহি অবতীর্ণের ফেরেশতাকে নামুস বলা হতো)। যিনি পূর্ববর্তী নবি মুসা এবং ঈসার কাছেও আল্লাহর প্রত্যাদেশ নিয়ে এসেছিলেন। তুমি শুনে রাখো–নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ এ যুগের নবি। তাঁকে গিয়ে জলদি জানাও এ কথা। তাঁর নবুওয়াতের সত্যায়ন করো। আর তাঁকে অবিচল থাকতে বলো, ভেঙে পড়তে দিয়ো না।'

খাদিজা বাড়ি ফিরে এলেন। মুহাম্মদকে বুকে আগলে ধরে পার করলেন নবুওয়াতের প্রথম রাত্রি।

পরদিন সকাল হতেই খাদিজা মুহাম্মদকে নিয়ে আবার এলেন ওয়ারাকার বাড়িতে। দৃষ্টিহীন ওয়ারাকার সামনে মুহাম্মদকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ভাইজান, এবার আপনার ভাতিজার মুখ থেকেই শুনুন সে কী বলে!'

বৃদ্ধ ওয়ারাকা এগিয়ে এসে সসম্মানে মুহাম্মদের কপালে চুমু খেলেন। তারপর তাঁর কাছে গত রাতে ঘটে যাওয়া ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনতে চাইলেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলে গেলেন যা কিছু তিনি শুনেছেন, যা তিনি দেখেছেন দৈবদর্শন, যা কিছু অনুধাবন করেছেন নিজের অন্তঃকরণ দিয়ে। ওয়ারাকা শুনছিলেন আর তাঁর চেহারার অভিব্যক্তি বদলে যাচ্ছিল মুহূর্তে মুহূর্তে। বছরের পর বছর ধরে যে ঘটনার জন্য তিনি প্রতীক্ষমাণ, যে নবির দর্শনে তিনি অপেক্ষা করে আছেন, যে নবুওয়াতের সুসংবাদ শোনার জন্য তিনি

www.pathagar.com

অধ্যয়ন করেছেন নিবিষ্টচিত্তে, আজ সে নবি ও নবুওয়াত তাঁর সামনে উপবিষ্ট। ওয়ারাকার চোখজুড়ে কৃতজ্ঞতার অশ্রু টলমল করছে। এক জীবনে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি তাঁর কাছে আর কিছুই নয়। তাঁর মানবজন্ম আজ সার্থক হলো।

ওয়ারাকা ইবনে নওফেল মুহাম্মদের জীবনে প্রত্যাগত নবুওয়াতের সত্যায়ন করলেন। তিনি মুহাম্মদকে আল্লাহর নবি হিসেবে পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতিই শুধু দিলেন না, তাঁকে তাঁর অনাগত জীবনের জন্য প্রস্তুত থাকতে বললেন। ওয়ারাকা অভয় দিয়ে বললেন, 'আফসোস! আমি ভয় করছি সেদিনের, যেদিন তোমার দেশবাসী তোমাকে এ দেশ থেকে বের করে দেবে। হায়! যদি আমি সেদিন সুস্থাবস্থায় জীবিত থাকতাম, তবে অবশ্যই সময়ের এমন নির্দয়তা থেকে বাঁচাতে তোমাকে সাহায্য করতাম।'

সদ্য নবুওয়াতপ্রাপ্ত হতবিহ্বল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওয়ারাকার এ কথা শুনে আরও বিচলিত হয়ে পড়লেন, 'সত্যিই আমার দেশবাসী আমাকে এ দেশ থেকে বের করে দেবে?'

ওয়ারাকা সত্য গোপন রাখতে চাইলেন না। তিনি মুহাম্মদকে দৃঢ়পদ করতে চাচ্ছিলেন। ভবিষ্যতের সকল জিঘাংসা যাতে তিনি সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করেন, তার প্রথম সবক তাঁকে দীক্ষা দিয়ে অভয়চিত্তে বললেন, 'হ্যাঁ, তারা তোমাকে তোমার দেশ থেকে বিতাড়িত করবে। যুগে যুগে যাঁরাই তোমার মতো সত্য ধর্ম নিয়ে আগমন করেছিলেন, সবাইকে তাঁদের স্বজাতি লোকসকল দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিল।'

চৌদ্দ

ওহি এল মাত্র পাঁচটি আয়াত। কিন্তু এ পঞ্চ আয়াতে কোনো নির্দেশনা ছিল না, কোনো আদেশ-নিষেধ ছিল না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা করতে লাগলেন, কিন্তু নতুন কোনো ওহি সত্বর এল না। খাদিজা এ সময়ও মুহাম্মদকে সান্ত্বনা দিয়ে বলীয়ান রাখলেন, যাতে তিনি ওহির বিরতিতে ভেঙে না পড়েন।

কিন্তু মুহাম্মদের জন্য এই ওহি-বিরতি ছিল যাতনার। নবি হিসেবে তাঁকে সত্যায়নের পর তাঁর করণীয় কী–এমন প্রত্যাদেশ তাঁর জন্য প্রয়োজন ছিল। একদিন গেল, দুই দিন গেল, তবু নতুন কোনো প্রত্যাদেশ এল না। মুহাম্মদের দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল। স্ত্রী খাদিজার পরামর্শে তিনি রমজানের এতেকাফ পূর্ণ করতে আবার হেরা গুহার সাধনাকেন্দ্রে চলে এলেন।

www.pathagar.com

এখানে এসে কয়েকদিন একাগ্রতায় নিমগ্ন হয়ে রইলেন। এখানে অবস্থান করলে হয়তো নতুন করে আবার ঐশী প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হবে–এ আশায়। কিন্তু ঐশ্বরিক কোনো নির্দেশনা না আসায় তাঁর অন্তর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। তিনি পেরেশান হয়ে গেলেন। মাঝে ইচ্ছে হতে লাগল, পর্বতচূড়া থেকে নিচে লাফিয়ে পড়বেন। কিন্তু যখনই তিনি পর্বতশীর্ষে আরোহণ করেন তখনই শূন্য ইথারে জিবরাইলের কায়া দেখতে পান। জিবরাইল তাঁকে সম্বোধন করে বলতেন, 'হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহর রাসুল।'

মুহাম্মদ শান্ত হয়ে ফিরে আসতেন এবং মনে মনে ভাবতেন, হয়তো এবার নতুন প্রত্যাদেশ আসবে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। দিন যেতে লাগল, তিনি আবার অস্থির হয়ে পড়লেন। আবার নিজেকে পর্বতশীর্ষে নিয়ে গেলেন নিচে লাফিয়ে পড়ার জন্য। আবার জিবরাইল এলেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে আগের মতোই বললেন, 'হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহর রাসুল।'

রাসুল মুহাম্মদের জীবনের এমন সংকট মুহূর্তে স্ত্রী খাদিজা তাঁকে সঙ্গ দিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করতেন। অবশেষে রমজান মাস পূর্ণ হওয়ার পর যখন তিনি এতেকাফ শেষে মক্কা ফিরে আসছিলেন, এমন সময় আকাশ-শূন্যে জিবরাইলকে দেখতে পেলেন বিশাল ঐশী আসনে উপবিষ্ট। জিবরাইল দ্বিতীয়বার তাঁকে আল্লাহর প্রত্যাদেশ শোনালেন। কোনো কোনো সিরাত রচয়িতা বলেছেন, এ প্রত্যাদেশ ছিল 'সুরা দুহা'র প্রথম পাঁচ আয়াত, আর কোনো কোনো সিরাত রচয়িতা বলেছেন, এটি ছিল 'সুরা মুদ্দাসসির'-এর প্রথম পাঁচ আয়াত।

এর পর থেকে ধারাবাহিক বিরতিতে আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও সুরা অবতীর্ণ হতে থাকে।

ওহি অবতীর্ণের প্রথম সময়কালটা মুহাম্মদের জন্য ছিল খানিকটা অস্থিরতা ও পেরেশানির। এমন অস্থিরতা সকল নবির বেলায়ই ঘটেছিল। নবুওয়াতের যে গুরুদায়িত্ব, সেটা আঞ্জাম দেওয়ার ব্যাপারে সকল নবি-রাসুল ওহি প্রাক্কালিন সময়ে ভীত থাকতেন। মুহাম্মদও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। কিন্তু তাঁর স্ত্রী খাদিজা সর্ববিধ তাঁকে অভয় দেওয়ার প্রেরণায় নিয়োজিত ছিলেন। এত দিন যেমন তিনি নবুওয়াত-পূর্ববর্তী মুহাম্মদকে নবুওয়াতের জন্য তৈরি করেছিলেন, নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর তাঁর দায়িত্ব শত গুণ বেড়ে গেল। মুহাম্মদের নবুওয়াতকে পরিপুষ্ট করার জন্য বটবৃক্ষের মতো তাঁকে আশ্রয় দিলেন নিজের ছায়ায়।

'ইসলামপূর্ব যুগে আমি একজন ব্যবসায়ী হিসেবে প্রায়ই মক্কায় যেতাম। ইসলামের আবির্ভাবের পর একবার আমার মক্কা যাওয়ার সুযোগ ঘটে। সেখানে

www.pathagar.com

আমি কুরাইশনেতা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আরও অনেকের সঙ্গে আমরা যখন মিনায় পৌঁছাই, তখন সেখানে এক ব্যক্তিকে আসতে দেখলাম। সেখানে এসে তিনি ডুবন্তপ্রায় সূর্যের দিকে তাকালেন এবং নিজেকে প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত করলেন। এ সময় তাঁর পেছনে একজন নারীকে তাঁর অনুসরণ করতে দেখা গেল। তারপর একজন কিশোর এল, সে-ও বাকি দুজনকে অনুসরণ করল। তাঁরা তিনজন সমবেত হয়ে নামাজ আদায় করলেন।

আমি কিছুটা অবাক হয়ে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আব্বাস! এই ব্যক্তি কে?'

আব্বাস উত্তর দিলেন, 'তিনি আমার ভাই আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদ, আবদুল মুত্তালিবের নাতি। তিনি নিজেকে নবি দাবি করেন। যদিও এ নারী এবং এই বালক ছাড়া আর কেউ তাঁর ওপর ঈমান আনেনি। তবে তিনি দাবি করেন, খুব শিগগির তাঁকে পারস্য, মিসর ও রোম সাম্রাজ্যের শাসনভার প্রদান করা হবে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তাঁর সঙ্গে এ নারীটি কে?'

আব্বাস বললেন, 'নারীটি তাঁর স্ত্রী, খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ।'

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'বালকটির পরিচয় কী?'

আব্বাস বললেন, 'বালকটি তাঁর চাচাতো ভাই, আলি ইবনে আবু তালিব।'

আমি ফের জিজ্ঞেস করলাম, 'তাঁরা সমবেত হয়ে কী করছেন?'

আব্বাস বললেন, 'তাঁরা তাঁদের কথা অনুযায়ী নামাজ আদায় করছে।'

বর্ণনাকারী পরবর্তী জীবনে আফসোসের সঙ্গে বলতেন, 'হায় আফসোস! আমি যদি সেদিন মুসলমান হয়ে চতুর্থ ব্যক্তি হিসেবে তাঁদের সঙ্গে নামাজ পড়তে পারতাম।'

এ বর্ণনাকারীর নাম আফিফ ইবনে উমর আল-কিন্দি। তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্তির একেবারে প্রথম দিকে মক্কায় আগমন করে ইসলামের প্রাথমিক দৃশ্যাবলি অবলোকন করেছিলেন বটে, কিন্তু তখন তাঁর ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়নি। পরবর্তী সময়ে মুসলমান হয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব হওয়ার জন্য সারা জীবন তিনি আফসোস করেন।

আফিফ আল-কিন্দি এবং আব্বাস ইবনে মুত্তালিবের কথোপকথন থেকে নবুওয়াতের প্রাথমিক দৃশ্য যতটা স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে, বাস্তব অবস্থা ততটা স্বাভাবিক ছিল না। গোপনে ইসলামের দাওয়াতি অভিযান চললেও মুহাম্মদ যে নতুন এক ধর্মের কথা প্রচার করছেন, এ কথা মক্কার মানুষের মুখে

www.pathagar.com

মুখে রটে যেতে দেরি হলো না। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি এক ঐশী গ্রন্থের কথা মানুষকে শোনান, তাঁর কাছে আল্লাহপ্রেরিত ফেরেশতা আসেন; এসব বিষয় নিয়ে মক্কার লোকজন কানাঘুষা করতে লাগল। এমনকি ভরা মজলিসে তাঁর নবুওয়াতপ্রাপ্তি নিয়ে হাসাহাসিও হতে লাগল। কেউ কেউ তো বলেই বসল, 'তার কাছে ফেরেশতা আসে না ছাই, গিয়ে দেখো কোনো শয়তান বা জিন ভর করেছে তার ওপর।'

আরবে তখন প্রচুর পরিমাণে জিন ও শয়তানের প্রভাব ছিল। বিশেষত, অনেক গুনিন ও জ্যোতিষী ছিল, যারা জিন ও শয়তানের মাধ্যমে মানুষের ভবিষ্যৎ বলত এবং নানা রকম জাদু-টোনা করত। তা ছাড়া নবুওয়াত-পূর্ববর্তী আরবের ইতিহাসে জিনবিষয়ক অনেক রূপকথা, কাহিনিকাব্য এবং লোককথার প্রচলন ছিল। এসব কারণে মক্কার লোকজন মুহাম্মদের নবুওয়াতকে জিন বা শয়তানের আছর বলে উপহাস করার একটা সুযোগ পেয়েছিল।

এমন টিপ্পনীর জন্য মুহাম্মদ অবশ্য নিজেকে আগে থেকেই প্রস্তুত করেছিলেন, যখন ওয়ারাকা তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু খাদিজার জন্য এমন উপহাস সহ্য করা ছিল মনোবেদনার। রাসুল ও নবুওয়াতের ব্যাপারে মক্কার লোকজনের বাঁকা কথাবার্তা তাঁকে ব্যথিত করত।

একদিন খাদিজা মুহাম্মদকে বললেন, 'আমার চাচাতো ভাই, আবার আপনার কাছে যখন আল্লাহপ্রেরিত ফেরেশতা জিবরাইল আসবেন, তখন আপনি আমাকে জানাবেন।'

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্মতি জানালেন। এরপর যখন জিবরাইল এলেন, তখন তিনি খাদিজাকে ডেকে সামনের একটি স্থান দেখিয়ে বললেন, 'এই যে আমার সামনেই জিবরাইল বসে আছেন।'

খাদিজা রাসুলের দেখানো স্থানটি একবার দেখে নিয়ে তাঁকে বললেন, 'আপনি আমার ডান উরুতে বসে পড়ুন।' রাসুল খাদিজার ডান উরুতে বসলেন।

খাদিজা জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কি আপনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন?'

রাসুল জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আগের মতোই দেখতে পাচ্ছি।'

এবার খাদিজা রাসুলকে তাঁর বাঁ উরুতে বসালেন। বললেন, 'এখনো কি দেখতে পাচ্ছেন?'

রাসুল বললেন, 'হ্যাঁ, এখনো দেখতে পাচ্ছি।'

এরপর খাদিজা অভিনব এক কাজ করলেন। তিনি তার বুক থেকে সম্ভ্রমের উড়না ফেলে দিলেন এবং মুহাম্মদকে নিজের বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন?'

www.pathagar.com

রাসুল হয়রান হয়ে জবাব দিলেন, 'না, এখন তাঁকে দেখা যাচ্ছে না।'

খাদিজা এবার রাসুলকে নিজের কোল থেকে নামিয়ে আশ্বস্ত করে বললেন, 'আপনার জন্য সুসংবাদ! আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি অবশ্যই আল্লাহর প্রেরিত সম্মানিত ফেরেশতা, কোনো শয়তান বা জিন নয়। যদি শয়তান হতো, তবে সে আমাদের এ অবস্থায় দেখে লজ্জা পেত না এবং চলেও যেত না। আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না, তিনি অবশ্যই আল্লাহপ্রেরিত মহান দূত।'

আল্লাহর রাসুল এবং খাদিজা উভয়ের জন্য এ নিরীক্ষণ ছিল প্রশান্তিদায়ক। কিন্তু এখানে প্রণিধানযোগ্য একজন যোগ্য স্ত্রী হিসেবে খাদিজার বুদ্ধিমত্তার। তিনি স্বামীকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য নিজে উৎসাহী হয়ে ফেরেশতা ও শয়তানের তফাতটা পরখ করে দেখালেন। বিশ্বজয়ের পথে সকল বাধা এভাবেই তিনি নিজ হাতে সরিয়ে মুহাম্মদের জন্য অনাগত পৃথিবী করে গিয়েছিলেন সুশোভিত।

আরেক দিন। ওহি অবতীর্ণ শুরু হওয়ার পরও মুহাম্মদ মাঝেমধ্যে লোকালয় থেকে দূরবর্তী হেরাকেন্দ্রে সাধনায় মগ্ন হতেন। নবুওয়াত-পূর্ববর্তী সময়ে খাদিজা হেরা গুহার সাধনাকেন্দ্রে সব সময় স্বামীর দেখভাল করতে আসতে পারেননি, কিন্তু নবুওয়াত-পরবর্তী সময়ে খাদিজা কখনো মুহাম্মদকে একা একা বেশিক্ষণ সেখানে থাকতে দিতেন না। মক্কার দুষ্ট লোকদের কূটকৌশলের ভয় তো আছেই, আছে দুর্বৃত্তচারী ইহুদি আর খ্রিষ্টানদেরও ভয়। মুহাম্মদের নবুওয়াতের সংবাদ শুনে বিদ্বেষবশত তারা যেকোনো কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলতে পারে। আর সর্বোপরি ফেরেশতার আগমন তো রয়েছেই। মুহাম্মদ এখনো জিবরাইলের আগমন স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। প্রথম দর্শনের ভয় এখনো তাঁকে জেরবার করে রেখেছে।

এ সময়কালে একদিন খাদিজা মুহাম্মদের জন্য খাবার নিয়ে মক্কা থেকে হেরাকেন্দ্রের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। লোকটিকে খাদিজা এর আগে দেখেননি কখনো। দেখা হতেই লোকটি মুহাম্মদ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করল। খাদিজা ভয় পেয়ে গেলেন। লোকটি আমার স্বামীর ব্যাপারে এত কিছু জিজ্ঞেস করছে কেন? সে কি মুহাম্মদের কোনো ক্ষতি করতে চায়? কে এই লোক?

খাদিজা লোকটির দু-চারটে প্রশ্নের জবাব দিয়ে জলদি পায়ে হেরাকেন্দ্রে রাসুলের কাছে চলে এলেন। এসেই রাসুলকে জানালেন সদ্য পথে দেখা হওয়া লোকটির ব্যাপারে। তাঁর চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা, গলার স্বরে ভীতসন্ত্রস্ততা। কিন্তু

www.pathagar.com

মুহাম্মদের চেহারায় দুশ্চিন্তার কোনো আভাস নেই, বরং তিনি খাদিজার উৎকণ্ঠা দেখে মিটি মিটি হাসছেন। খাদিজা ধন্দে পড়ে গেলেন। অবশেষে রাসুল জানালেন, মূলত লোকটি ছিলেন জিবরাইল। খাদিজার সঙ্গে কথা বলে একটু পরখ করে দেখার জন্য তিনি এমন মানুষের বেশে তাঁর সামনে এসেছিলেন।

মাঝেমধ্যে এরকম হতো, মুহাম্মদ হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন, এমন সময় জিবরাইল আসতেন। রাসুলকে ঐশী বাণী শোনাতেন এবং পরবর্তী করণীয় ঠিক করে দিতেন। এর মধ্যে খাদিজার আসার সময় হয়ে যেত।

একদিন এমনই হলো। দূর থেকে খাদিজাকে আসতে দেখে জিবরাইল রাসুলকে জানালেন, 'ওই যে খাদিজা আসছেন। তাঁর হাতে আপনার জন্য খাবার ও পানীয়। যখন তিনি আপনার কাছে আসবেন, তখন তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন এবং আমার পক্ষ থেকেও সালাম জানাবেন। আর জান্নাতে তাঁর জন্য একটি মণি-মুক্তোর প্রাসাদের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেখানে তিনি পার্থিব সকল দুঃখ-কষ্ট ব্যতীত বসবাস করতে পারবেন।'

জিবরাইল চলে গেলেন। একটু পর খাদিজা এলেন হেরাকেন্দ্রে। তিনি আসতেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিবরাইল বর্ণিত সুসংবাদ শোনালেন। খাদিজা আনন্দিত হয়ে বললেন, 'আল্লাহ হলেন পরম শান্তি এবং তিনিই সকল শান্তির উৎস। হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি তো আপনার ওপর বর্ষিত হোক। আর যারা এমন অভিবাদন শুনবে তাদের সকলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, তবে বিতাড়িত শয়তান নয়। এবং শান্তি বর্ষিত হোক ফেরেশতা জিবরাইলের ওপরও।'

পনেরো

নবুওয়াতের প্রথম তিন বছর ইসলামের দাওয়াত প্রকাশ্যে ছিল না। ইসলামের প্রাথমিক ইবাদত-উপাসনা পালন করা হতো গোপনে গোপনে। রাসুল মুহাম্মদ তাঁর একান্ত পরিচিত ও বিশ্বস্ত লোকজনের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতেন। কেউ কেউ তাঁর নতুন ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁকে নবি হিসেবে মেনে নিত, আবার অনেকে তাঁকে গালমন্দ করে তাড়িয়ে দিত। তখনো মক্কার কুরাইশরা রাসুল ও তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে বিরোধিতা শুরু করেনি।

সমস্যা তখনই শুরু হলো, যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন। প্রথম দিকে মুহাম্মদ কুরাইশদের সমবেত করে তাঁর নতুন ধর্মের সত্য

www.pathagar.com

বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। প্রথম ধাপে তারা এর বিরোধিতা করল। এরপর তিনি সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন। হজের মৌসুমে বিভিন্ন গোত্রের মানুষকে সম্বোধন করে ইসলামের বাণী প্রচার করলেন। নানাভাবে তিনি আল্লাহপ্রেরিত ধর্মের ব্যাপারে মানুষকে আহ্বান করতে লাগলেন এবং তাঁর এ আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতেই মক্কার কুরাইশদের মাঝে তাঁর এক বিরাট শত্রুদল তৈরি হয়ে গেল।

রাসুলের সঙ্গে কুরাইশদের শত্রুতার মূল কারণ ছিল দুটো। একটি ধর্মীয়, অপরটি ব্যবসায়িক। ধর্মীয় কারণ তো স্বাভাবিক দৃষ্টিতেই বিবেচ্য–পূর্বপুরুষদের ধর্মীয় গোঁড়ামি, মূর্তিপূজার প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা, বহুশ্বরবাদী ধর্মের নামে ধর্মীয় সুবিধাবাদিতার প্রতি আকর্ষণ। এসব ছিল প্রধান ধর্মীয় কারণ। ব্যবসায়িক কারণের অন্যতম ছিল হজ মৌসুমের উপার্জনকেন্দ্রিক বিষয়। মূলত এর সঙ্গেও তাদের ধর্মীয় দেবতাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে।

হজ মৌসুমে যখন আরবসহ আশপাশের দেশ থেকে তীর্থকামীরা কাবাঘর তাওয়াফ করতে আসত, তখন কুরাইশ গোত্রের নেতারা এসব তীর্থযাত্রীর কাছ থেকে নানা রকম চাঁদা ও খাজনা আদায় করত। এ ছাড়া হজের মৌসুমে কাবাকে কেন্দ্র করে মক্কায় বিরাট মেলা ও বাজার বসত। এসব বাজারের একচ্ছত্র অধিকার ছিল কুরাইশদের হাতে। তারা আগত আরবীয়, পারসিক, সিরিয়ান, মিসরি, ব্যাবিলনীয়, ভারতীয় মৌসুমি ব্যবসায়ীদের থেকে মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায় করত। অনেক কুরাইশনেতার নিজেদেরও ব্যবসা ছিল, তারা বিপুল হারে পণ্য বিক্রি করত এ মৌসুমে। এ ছাড়া কাবাঘরে স্থাপিত বিভিন্ন দেব-দেবীর জন্য ভক্ত-উপাসকেরা যেসব অর্ঘ্য ও নজরানা পেশ করত, তা-ও উদরস্থ হতো কাবার কথিত রক্ষক কুরাইশনেতাদের হাত দিয়ে।

কিন্তু মুহাম্মদ যখন নতুন এক ধর্মের কথা বললেন, যে ধর্মে কোনো দেবতা নেই, বহু ঈশ্বর নেই, বলি বা অর্ঘ্য দেওয়ার অনুশাসন নেই–তখন তাদের স্ফীত উদরে টান পড়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কুরাইশনেতারা যে খুব বেশি দেবতাভক্ত ছিল, ব্যাপারটি এমন নয়। প্রথমত ব্যবসায়িকভাবে নিজেদের উদরপূর্তিতে বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা, দ্বিতীয়ত ধর্মীয় গোঁড়ামির জাত্যাভিমান।

এসব কারণে কিছুদিনের মধ্যে মুহাম্মদ মক্কার লোকদের চক্ষুশূলে পরিণত হলেন। শুধু তিনিই নন, তাঁর নতুন ধর্মের দীক্ষা নিয়ে যাঁরা নিজেদের আলোকিত মানুষ হিসেবে বিভাসিত করার প্রত্যয় নিয়েছিলেন, তাঁরাও শিকার

www.pathagar.com

হলেন নানা রকম নিপীড়ন ও নির্যাতনের। বাদ গেলেন না মুহাম্মদের পরিবারের সদস্যরাও। তাঁদের ওপরও নেমে আসতে লাগল বিভিন্ন প্রকার অপমান ও লাঞ্ছনার সুতীক্ষ্ণ শেল।

খাদিজা এত দিন তাঁর সংসারে এক হাতে সুখের সরোবর সঞ্জীবিত করে রেখেছিলেন, এবার আরেক হাতে তুলে নিলেন কষ্ট ও যাতনার গভীর নদী।

দিন যেতে লাগল আর মক্কার কুরাইশদের নির্যাতন-উৎপীড়ন বাড়তে লাগল। কখনো আবু বকরকে জুতা দিয়ে পিটিয়ে অজ্ঞান করা হলো, খাব্বাবকে কয়লার আগুনে ছুড়ে মারা হলো, ইয়াসির ও সুমাইয়াকে শহিদ করে দেওয়া হলো, বেলালকে তপ্ত রোদে শুইয়ে রাখা হলো। আরও যাঁরা আছেন, যাঁরা আল্লাহর নামে শপথ করেছিলেন একত্ববাদের, তাঁদের সবাইকে নানাভাবে নানা গঞ্জনা সহ্য করতে হলো। কিন্তু কেউ ইসলাম ভিন্ন পৌত্তলিক ধর্মে ফিরে গেলেন না। সকল নির্যাতন, উৎপীড়ন সহ্য করে সদর্পে ঘোষণা করে যেতে লাগলেন আহাদ-আহাদ ধ্বনি।

রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বড় তিন মেয়ে তখন বয়োপ্রাপ্ত হয়েছেন–জয়নব, রোকাইয়া, উম্মে কুলসুম। তিনজনই বিবাহিতা। বড় মেয়ে জয়নব ইতিমধ্যেই স্বামীর ঘরে সংসার শুরু করেছেন। তাঁর স্বামী খাদিজার বোন হালা বিনতে খুয়াইলিদের ছেলে আবুল আস ইবনে রবিয়া। ছোট মেয়ে দুজনের সংসার শুরু না হলেও তাঁদের বাগদান সম্পন্ন হয়ে আছে মুহাম্মদের চাচা আবু লাহাবের দুই ছেলে উতবা ও উতায়বার সঙ্গে। আরেকটু বয়স হলে তাঁরাও স্বামীর ঘরে চলে যাবেন।

কিন্তু সময় বদলে গেছে। যে মুহাম্মদকে আল-আমিন জেনে তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক করতে উৎসুক ছিল মক্কার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা, তারা এখন মুহাম্মদের ধ্বংস সাধনে ব্যস্ত। মুহাম্মদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে একজন আরেকজনের চেয়ে অগ্রগামী।

এরই মধ্যে কুরাইশনেতারা সিদ্ধান্ত নিল, মুহাম্মদ তাঁর মেয়েদের যাদের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন তাদের সকলকে তালাক দিতে বলবে। দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলো। আবু লাহাব তার দুই ছেলের জন্য নির্বাচিত কনে রোকাইয়া ও উম্মে কুলসুমের সঙ্গে তার ছেলেদের বিয়ে ভেঙে দিল। কুরাইশনেতারা একই দাবি নিয়ে গেল আবুল আস ইবনে রবিয়ার কাছেও। কিন্তু আবুল আস নেতাদের সরাসরি জানিয়ে দিলেন, আমি কিছুতেই আমার স্ত্রীকে তালাক দেব না। আমি

www.pathagar.com

আমার স্ত্রীকে ভালোবাসি এবং আমার সংসারে শান্তির অভাব নেই। বাইরের কারও কথায় আমি আমার সংসারের শান্তি বিনষ্ট হতে দিতে পারি না।

দুই মেয়ের বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় খাদিজা কষ্ট পেলেন। আল্লাহর রাসুলও মনোবেদনায় কুঁকড়ে যান। রাসুলের মনোকষ্ট দূর করতে এগিয়ে এলেন মক্কার বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি এবং সদ্য মুসলিম হওয়া উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি রাসুলের মেয়ে রোকাইয়াকে সসম্মানে বিয়ে করলেন। কিছুদিন পর মক্কার কাফেররা নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলে রাসুলের কন্যার নিরাপত্তার কথা ভেবে তিনি তাঁকে নিয়ে সর্বপ্রথম মক্কা থেকে হিজরত করে ইথিওপিয়া চলে যান।

মুহাম্মদের ওপরও চলতে লাগল নানা অকথ্য নির্যাতন। কখনো তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখা হতো, তাঁর দিকে ছুড়ে মারা হতো পাথর, নামাজরত অবস্থায় পিঠের ওপর তুলে দেওয়া হতো উটের গলিত নাড়ি-ভুঁড়ি, রাস্তায় হাঁটার সময় দুষ্ট ছেলেদের খেপিয়ে দেওয়া হতো তাঁর পেছনে, পথিমধ্যে তাঁকে পেলে অকথ্য অপমান করা হতো। নির্যাতনের এমন কোনো পদ্ধতি নেই যা তাঁর ওপর প্রয়োগ করা হয়নি। শারীরিক, মানসিক, সামাজিক সকল প্রকারে তাঁকে হেনস্থা করার চেষ্টা করা হতে লাগল। এমনকি তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রও শুরু করল পাষণ্ড কুরাইশ পৌত্তলিকরা।

এত সব অত্যাচার সয়ে যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘরে ফিরতেন, তখন খাদিজা পরম মমতায় তাঁকে জড়িয়ে ধরতেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন, কান্না এলে অশ্রু মুছে দিতেন। প্রেরণা দিতেন নতুন দিনের, আল্লাহর পথে আবার অবিচল হয়ে চলার। সব যাতনা একদিন শেষ হয়ে যাবে, আরবের মানুষ ঠিকই একদিন আল্লাহর মনোনীত ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করবে–এমন প্রবোধ দিয়ে তাঁর অন্তরকে আরও পোক্ত করতেন।

সকালে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে যেতেন। মক্কার অলিগলিতে ঘুরে মানুষকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করতেন। তাদের মূর্তিপূজা থেকে বিরত হয়ে এক আল্লাহর উপাসনায় ব্রতী হওয়ার দাওয়াত দিতেন। কেউ কেউ তাঁর কথা শুনত, কেউ কেউ শুনত না। কেউ আবার তাঁর কথা শুনেই তেড়েফুঁড়ে আসত। আক্রমণ করত তাঁকে, অপমান করত লোকসম্মুখে, ভর্ৎসনা করে তাড়িয়ে দিত। মুহাম্মদ সন্ধেবেলা রিক্ত বদনে ঘরে ফিরতেন। মুহাম্মদের যাতনাবিদ্ধ মুখটা দেখে খাদিজার হৃদয় বেদনায় হু হু করে উঠত। যাঁকে তিনি বছরের পর বছর বুকে আগলে

www.pathagar.com

রেখেছেন, যাঁর নবুওয়াতকে সুরক্ষিত করতে একটা ফুলের আঘাতও লাগতে দেননি, সেই মুহাম্মদ আজ মানুষের নির্দয় ঘাত-আঘাতে জর্জর হয়ে ঘরে ফিরে আসেন, ক্লিষ্ট মুখে কাটান সারাটা দিন। এমন দৃশ্য খাদিজার সহ্য হয় না। সন্ধ্যায় মুহাম্মদকে বেদনাহত মুখ নিয়ে ঘরে ফিরতে দেখলেই তাঁর বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চায়। নিজেকে শত প্রবোধ দিয়েও শান্ত করতে পারেন না। সব সময় অস্থির হয়ে থাকতেন–মুহাম্মদের জন্য আমি আর কী করতে পারি!

স্বামী মুহাম্মদের ধর্মপ্রসার ও তাঁর অনুসারীদের সাহায্যার্থে খাদিজা নিজের সর্বস্ব অকাতরে বিলিয়ে দিতে লাগলেন। কোনো দীন-দুঃখী সাহাবির বাড়িতে আগুন না জ্বললে খাদিজার ঘর থেকে তাঁর খাবারের বন্দোবস্ত হতো। কেউ হিজরতের ইচ্ছা পোষণ করার পরও দারিদ্র্যের কারণে যেতে না পারলে পথখরচ জুগিয়ে দিতেন খাদিজা। ইসলামের জন্য নিজের ব্যবসায়িক মূলধন খরচ করতে মোটেও দ্বিধা করলেন না তিনি। এ যেন 'সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম'!

ষোলো

কুরাইশদের শত অত্যাচার সত্ত্বেও মক্কায় মুসলিমদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এরই মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করলেন মক্কার অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব উমর ইবনে খাত্তাব। রাসুলের চাচা হামজাও সমসময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। কুরাইশদের নানা রকম বাধা-বিঘ্নতা পাড়ি দিয়ে প্রায় ৯০ জন মুসলিম পার্শ্ববর্তী খ্রিষ্টান দেশ ইথিওপিয়ায় হিজরত করেছেন। কুরাইশরা তাঁদের ফিরিয়ে আনতে মক্কা থেকে প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল, কিন্তু প্রতিনিধিদল ব্যর্থ ও অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছে। সব দিক থেকে মক্কার কুরাইশরা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের প্রত্যয়দীপ্ত অগ্রযাত্রায় শঙ্কিত বোধ করতে লাগল।

এবার কুরাইশদের একতাবদ্ধ হওয়ার পালা। যেকোনোভাবেই হোক মুহাম্মদের নতুন ধর্মকে রুখতে হবে। আবু জেহেল, আবু লাহাব, আবু সুফিয়ান এবং মক্কার অন্যান্য গোত্রীয় নেতারা সিদ্ধান্তে উপনীত হলো–মুহাম্মদ ও তাঁর ধর্মমত অনুসারী এবং তাঁকে অভয়াশ্রয় দেওয়া কুরাইশি হাশিম গোত্রকে মক্কার বাইরে নির্বাসন দেওয়া হবে। শিআবে আবু তালিব নামে মক্কা নগরীর বাইরে

www.pathagar.com

একটি গিরিপথ রয়েছে, গোত্রীয় পঞ্চায়েতে মুহাম্মদসহ তাঁর সকল অনুগামীকে সেখানে নির্বাসনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

ধর্ম রক্ষার জন্য মুহাম্মদ কুরাইশদের প্রস্তাব মেনে নিলেন। এ প্রস্তাব একটি চুক্তিনামা আকারে লিখে কাবাঘরের দেয়ালে টানিয়ে দেওয়া হলো। মুহাম্মদ তাঁর একান্ত অনুসারীদের নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়ে আবু তালিব গিরিপথে চলে গেলেন। সেখানে তাঁবু টানিয়ে সবাইকে নিয়ে দুঃসহ এক জীবন শুরু করলেন।

খাদিজার জন্য এ সময়টা ভীষণ দুর্বিষহ হয়ে দেখা দিল। এ সময় তাঁর শিশুপুত্র আবদুল্লাহ রোগে ভুগে মারা যান। মাত্রই হাঁটতে-চলতে শিখেছিলেন তিনি, তাঁর প্রয়াণে খাদিজা ভেঙে পড়লেন। বড় মেয়ে জয়নব স্বামী আবুল আসের সঙ্গে বসবাস করলেও আবুল আস তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি, এ নিয়ে খাদিজার মনে সব সময় দুশ্চিন্তা বিরাজ করত। দ্বিতীয় মেয়ে রোকাইয়া তাঁর স্বামী উসমান ইবনে আফফানের সঙ্গে সুদূর ইথিওপিয়ায় দেশান্তরি হয়েছেন, তাঁর জন্যও চিন্তার অন্ত ছিল না। ছোট দুই মেয়ে উম্মে কুলসুম ও ফাতেমাকে বুকে আগলে তিনি নির্বাসনের সাজা মাথা পেতে নিলেন।

স্বামী মুহাম্মদকে ভালোবেসে নির্বাসনের জীর্ণ তাঁবুই তাঁর জন্য সুরম্য প্রাসাদতুল্য। তিনি ইচ্ছে করলে পারতেন নির্বাসনের আওতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে। কেননা তিনি হাশিম গোত্রের আওতাভুক্ত ছিলেন না। তিনি কুরাইশের ভিন্ন গোত্রের লোক ছিলেন। ইচ্ছা করলে মক্কার নিরুপদ্রব বাসগৃহে নিজেকে নিরাপদ রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি বেছে নিলেন ধুলোর পৃথিবী। গিরিপথের কঠিন পাথরদেয়ালের মাঝে নিজেকে বন্দী করে রাখলেন মুহাম্মদের ভালোবাসার পিঞ্জিরায়। মুহাম্মদকে ভালোবাসার জন্যই তাঁর জন্ম, কীভাবে তিনি মুহাম্মদের থেকে জুদা হবেন? মুহাম্মদকে এক মুহূর্তের জন্যও নিজের চোখের আড়াল হতে দিতে চান না। মুহাম্মদের রক্ত আর তাঁর রক্তধারা একই স্রোতে মিশে লীন হয়ে গেছে, তাঁদের আর জুদা করার কোনো সুযোগ নেই। জন্ম-জন্মান্তরের জন্য একে অন্যের মাঝে বিলীন হয়ে গেছেন। তাঁদের প্রেম চিরঞ্জীব। তাঁদের ভালোবাসা অবিনশ্বর।

খাদিজার ব্যবসা আর আগের মতো নেই। ব্যবসায়িক সকল দায়দায়িত্ব আগেই তুলে দিয়েছেন ভাতিজা হাকিম ইবনে হিজামের হাতে। তিনি প্রায় নিঃস্ব হয়ে গিরিপথে মুহাম্মদের সঙ্গী হয়েছেন। নির্বাসনের চুক্তিপত্রের শর্ত অনুযায়ী নির্বাসিত লোকজন মক্কার কারও সঙ্গে কোনো ব্যবসায়িক কার্যাদি সম্পন্ন করতে পারবে না। এমনকি কোনো কেনাবেচা, লেনদেন, উপহার-দানও তারা গ্রহণ

www.pathagar.com

করতে পারবে না। মক্কাবাসীর জন্যও একই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, তারাও নির্বাসিত কোনো ব্যক্তির কাছে কিছু বিক্রি করতে পারবে না বা তাদের থেকে কিছু কিনতে পারবে না।

নির্বাসিত মুসলিমদের মাঝে চরম মানবিক সংকট দেখা দিল। পর্যাপ্ত খাবার নেই, শিশুদের জন্য শিশুখাদ্যের ব্যবস্থা নেই, বসবাসের জন্য বাসস্থানের অপর্যাপ্ততা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ–সব মিলিয়ে গিরিপথের জীবন একপ্রকার মানবেতর জীবনে রূপ নিল। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল–সাহাবিরা ক্ষুধার যন্ত্রণায় গাছের বাকল পানিতে সেদ্ধ করে খাওয়া শুরু করলেন। কেউ কেউ উপত্যকা থেকে তুলে আনা ঘাস সেদ্ধ করে খেতে লাগলেন। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস একদিন এক খণ্ড চামড়া পেলেন, ক্ষুধার তাড়নায় সেটাই সেদ্ধ করে খাওয়া শুরু করলেন। অনাহারে-অর্ধাহারে স্তন্যদাত্রী মায়েদের বুক শুকিয়ে গেল। শিশুরা দুধের তৃষ্ণায় গলা ছেড়ে চিৎকার করতে লাগল। দূর থেকে কুরাইশনেতারা তাদের চিৎকার শুনে অট্টহাসি হাসত। সাহাবিদের মরণাপন্ন অবস্থা দেখে নির্লজ্জভাবে তাদের নিয়ে হাসি-তামাশা করত।

এত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও অকুতোভয় খাদিজা দমলেন না। তিনি তাঁর ভাগনে হাকিম ইবনে হিজামের মাধ্যমে নির্বাসিত লোকজনের জন্য গোপনে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনার ব্যবস্থা করলেন। যদিও সে ত্রাণসামগ্রী ছিল অপ্রতুল এবং সব সময় কুরাইশদের চোখ ফাঁকি দিয়ে তা আনার ব্যবস্থাও ছিল দুঃসাধ্য, তবু তিনি নিজের সবটুকু উজাড় করে দিলেন মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের সেবায়।

নির্বাসনের পীড়নে দিন দিন খাদিজার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে লাগল। তাঁর বয়স তখন পঁয়ষট্টি। জীবনগাঙের স্রোতে লেগেছে ভাটার টান। দীর্ঘদিনের নির্বাসনে তাঁর শরীরে নানা প্রকার রোগ বাসা বাঁধতে থাকে। অনাহার-অর্ধাহারের ফলে শারীরিক শক্তি নিঃশেষ প্রায়। জীর্ণতা জেঁকে ধরেছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। তবু স্বামী মুহাম্মদকে একটুখানি ভালো রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতে লাগলেন। রোগ-জর্জরিত বুকের ক্ষয়িষ্ণু আওয়াজটুকু দিয়েও প্রার্থনা করতেন মুহাম্মদের সর্বাঙ্গীণ সফলতার। মুহাম্মদের মুখের একচিলতে হাসি প্রবল অসুস্থতার মাঝেও তাঁকে দিত বেহেশতি সৌরভ। তাঁর শয্যাপাশে মুহাম্মদ যখন বসে থাকেন, মনে হয় এর চেয়ে বড় সুখ পৃথিবীতে কিছু নেই আর। মুহাম্মদের মুখের দিকে তাকালে এখনো তাঁর চোখে ভেসে ওঠে দামেস্কের বাজার থেকে ফেরা যুবক মুহাম্মদের সেই যৌবনদীপ্ত ছায়াছবি। খাদিজার চোখ জলে ভরে ওঠে।

www.pathagar.com

সতেরো

নির্বাসনের মেয়াদ রইল প্রায় তিন বছর। তিন বছর পর কাবার ভণ্ড রক্ষকেরা একদিন কাবার মাঝে গিয়ে দেখে, কাবার দেয়ালে লটকে দেয়া নির্বাসনের চুক্তিনামা উইপোকায় খেয়ে তছনছ করে ফেলেছে। লিখিত ধারাগুলো আর পাঠ করা যাচ্ছে না।

এরই মধ্যে মক্কার অনেক মানুষ এমন ন্যক্কারজনক নির্বাসনের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছিল। যখন তারা চুক্তিপত্রের নাজেহাল অবস্থার কথা শুনল, তখন সমবেত হয়ে আওয়াজ তুলল নির্বাসন তুলে নেওয়ার। অগত্যা নবুওয়াতের দশম বছর আবু তালিব গিরিপথ থেকে রাসুল ও তাঁর সাহাবিরা তিন বছরের দীর্ঘ নির্বাসন শেষে মক্কায় যাঁর যাঁর ঘরে ফিরে আসার সুযোগ পেলেন।

নির্বাসন থেকে ফেরার কয়েক দিন পরই অত্যন্ত বেদনাদায়ক একটি ঘটনা ঘটল। রাসুল মুহাম্মদের জীবনের সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল, তাঁকে কুরাইশদের তলোয়ার আর পাথরবৃষ্টি থেকে আড়াল দেওয়ার অভয়াশ্রয়, তাঁর পালক পিতা পিতৃব্য আবু তালিব অসুস্থাবস্থায় শয্যাশায়ী হয়ে মারা গেলেন।

গিরিপথের নির্বাসনে আবু তালিবও ছিলেন। এমনিতেই বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, বয়স নব্বইয়ের কাছাকাছি। দীর্ঘ নির্বাসনের ধকল তাঁর শরীর কুলিয়ে উঠতে পারেনি। রোগে-শোকে একদম শীর্ণ হয়ে পড়েছিলেন। নির্বাসন শেষ করে ঘরে ফেরার পরও তিনি আর সুস্থ হয়ে ওঠেননি। প্রিয়তম ভাতিজার কোলে মাথা রেখে নবুওয়াতের দশম বছরের ৭ রমজান পরলোকগমন করলেন।

প্রিয় চাচা আবু তালিবের তিরোধানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দিশেহারা হয়ে পড়লেন। তিনি কেবল তাঁর চাচাই ছিলেন না, সেই ছোট্টবেলা থেকে তিনি তাঁকে ছেলের মতো করে বড় করেছেন। কোনো কোনো বিষয়ে তিনি মুহাম্মদকে তাঁর ছেলেদের চাইতেও অগ্রাধিকার দিতেন। বড় ভালোবাসতেন তিনি মুহাম্মদকে। নবুওয়াতের পরও তিনি কখনো তাঁর কাজে সামান্য বিরোধিতা করেননি, বরং তাঁর কাজ যেন নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে পারে, এ জন্য বিরুদ্ধবাদী কুরাইশদের সামনে রক্ষাপ্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। কুরাইশরা যে যা-ই বলুক, তিনি ভালো করেই জানতেন–তাঁর ভাতিজার মতো ভালো মানুষ এ আরব কেন, সারা দুনিয়ায় আর একটা খুঁজে পাওয়া যাবে না। মুহাম্মদ ছিলেন তাঁর গর্বের ধন।

সেই চাচা আবু তালিব মুহাম্মদকে আবার এতিম করে চলে গেলেন সকলের অন্তরালে। নির্বাসনের আনন্দ তাঁর পরিণত হলো বিষাদের অভয়ারণ্যে।

www.pathagar.com

কষ্টের নিষ্পেষণ তাঁকে দলে পিষে একাকার করে দিতে লাগল সঙ্গোপনে। মুহাম্মদ যেন আজ নিঃস্ব হয়ে গেলেন।

এখন রইলেন কেবল খাদিজা। মুহাম্মদের জীবনের শেষ রক্ষাপ্রাচীর। পার্থিব সকল জিঘাংসা থেকে বাঁচার শেষ অভয়াশ্রয়।

নির্বাসন থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরে এলেও খাদিজার স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপ হচ্ছিল। তবু মুহাম্মদের সঙ্গে নির্বাসনে কাটানো এ তিনটি বছরের অবর্ণনীয় দুঃখ-যাতনা সহ্য করে খাদিজা নিজের জীবনকে করে তুলেছিলেন সৌভাগ্যের পরশমণির মতো।

কষ্টের নির্মম জাঁতাকল এ তিনটি বছর নির্মমভাবে তাঁকে পিষে ফেলতে চেয়েছে। কিন্তু তিনি প্রবল প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবন করে মুহাম্মদের মাথার ওপর বটবৃক্ষের মত ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সকল ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে মুহাম্মদকে নিরাপদ রাখতে নিজের ভালোবাসা আর মমতার ডানা ছড়িয়ে তার নিচে তাঁকে আগলে রাখতেন।

অবশেষে মুক্তি এসেছে। নিজের বাড়ি যাওয়ার ছুটি মিলেছে। বাকি জীবনটা তিনি মুহাম্মদকে এভাবেই ছায়া দিয়ে, মায়া দিয়ে, ভালোবাসার পরশ দিয়ে ভরিয়ে রাখতে চান। মুহাম্মদের নবুওয়াতকে বিশ্ববাসীর কাছে উড্ডীন করতে চান সগৌরবে। কিন্তু দীর্ঘ নির্বাসন শুষে নিয়েছিল তাঁর শরীরের শেষ প্রাণশক্তিটুকু। বাড়ি ফিরে বেশ কয়েক দিন অসুস্থ হয়ে পড়ে রইলেন নিবিড় শয্যায়।

৬২০ খ্রিষ্টাব্দ। নবুওয়াতের দশম বছরের ১০ রমজান।

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বাড়ি। দীর্ঘদিন বসবাস না করার ফলে বাড়িটি এখন শ্রীহীন। এখানে-সেখানে মাকড়সার ঝুল। দেয়াল থেকে খসে পড়েছে পোড়ামাটির পলেস্তারা। টিমটিমে একটা বাতি জ্বলছে এ সন্ধ্যারাতে।

রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বসে আছেন প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজার পাশে। খাদিজার শরীরটা শুকিয়ে কেমন এতটুকুন হয়ে গেছে। চোখ দুটো কোটরাগত। সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে অসংখ্য বলিরেখা। শ্বাস নিতে দারুণ কষ্ট হচ্ছে। প্রতিটি শ্বাস যেন রাসুলের বুকে প্রবল হাতুড়পেটা হয়ে আঘাত করছে।

শিআবে আবু তালিবে মক্কার মুসলমানদের নির্বাসন শেষ হয়েছে এই তো কদিন হলো। রাসুলের চোখের সামনে জ্বলজ্বলে হয়ে আছে দুঃখদিনের প্রতিটি

www.pathagar.com

স্মৃতি। কী করে ভুলবেন তিনি সেসব দুঃখময় প্রতিটি প্রহর! অভুক্ত-অর্ধাহারী হয়ে কাটাতে হয়েছে কত দিন!

এখন নির্বাসন থেকে মানবিক মুক্তি মিলেছে ঠিকই, কিন্তু রাসুলের হৃদয়ের মুক্তি যেন তমসায় হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। তিন দিন আগে পরলোকগমন করেছেন প্রিয় চাচা আবু তালিব। রাসুলের সবচেয়ে বিশ্বস্তজন, সবচেয়ে অভয়দাতা। ব্যথায় মুষড়ে পড়েছিলেন তিনি। অব্যক্ত কান্নায় হু হু করে ভেঙেছে হৃদয়ের ভালোবাসার প্রতিটি মর্মরসৌধ। মক্কার প্রতিটি পাথর আর ধূলিকণা সাক্ষী আছে সে বেদনার। প্রতিটি সৃষ্টি স্তব্ধ হয়েছিল বেদনার অলৌকিক নোনাজলে।

হায়! আজ প্রিয়তমা খাদিজাও মৃত্যুশয্যায়!

মাঝরাত। পরম কাঙ্ক্ষিত প্রেম মুহাম্মদের কোলে মাথা রেখে তাঁর ২৫ বছরের একান্ত সহধর্মিণী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিভৃতে চলে গেলেন আল্লাহর কাছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বোবাকান্নায় আছড়ে পড়লেন প্রিয়তমার শয্যাপাশে।

কোথাও কেউ নেই! চারদিকে কী নিস্তব্ধ আজ মক্কার নিকষ আঁধার রাত্রি। হায় বেদনা! হায় যাতনা! হায়, অশ্রুর বিয়াবানে বুঝি সমাধি হলো এ ভালোবাসার যুগলবেদনার!

এই সেই খাদিজা–যিনি মক্কার সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলে মুহাম্মদকে স্বীকৃতি দিয়ে নিজের সর্বস্ব সঁপে দিয়েছিলেন তাঁর চরণতলে।

এই সেই খাদিজা–হেরার গুহায় ধ্বনিত 'ইকরা' যখন ভীতবিহ্বল করেছিল ধ্যানমগ্ন মুহাম্মদকে, দৌড়াতে দৌড়াতে মুহাম্মদ আড়াই মাইল পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছেছিলেন যাঁর ঘরে, তিনি এই অতল প্রেমময়ী খাদিজা। এই খাদিজার কাছে এসেই সদ্য নবি হওয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নির্ভাবনায় বলেছিলেন, 'আমাকে চাদরাবৃত করে দাও, চাদরাবৃত করো আমার পুরো সত্ত্বা!' খাদিজা বুক দিয়ে আগলে ধরেছিলেন নবুওয়াতের আলোকবিভায় সদ্যস্নাত নবিয়্যুল মুরসালিনকে। তাঁর বুক থেকেই তো আলো পেয়েছিল নুরে মুহাম্মদ!

এই সেই খাদিজা–মক্কার মুশরিকদের আঘাত, গালি আর গলাধাক্কা খেয়ে মুহাম্মদ যখন আঘাতশ্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরতেন, তিনি বুকভরা মমতায় সারা রাত্রি জেগে মুহাম্মদের শরীর থেকে তুলার মতো তুলে নিতেন সমস্ত অবসাদ, যাবতীয়

www.pathagar.com

দুঃখ-ক্লেশ, ব্যথার দান। পরদিন মুহাম্মদ দীনের পয়গাম হাতে পথে নামতেন নতুন এক রাসুল হয়ে, নতুন এক পয়গাম্বর হয়ে।

এই সেই খাদিজা—মক্কার অন্যতম বিত্তশালী বলে যাঁর খ্যাতি ছিল, নিজের প্রিয়তম স্বামী নবি মুহাম্মদের জন্য সমস্ত বিত্ত-বৈভব তুচ্ছ করে, সকল পিছুটান ছিন্ন করে নিঃস্ব-রিক্ত হাতে গিরিপথে বরণ করেছিলেন দীর্ঘ বন্দীনিবাস।

আজ সেই খাদিজা তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁকে হাহাকারের অথইয়ে ভাসিয়ে গেলেন।

হায় আল্লাহ! তোমার দেওয়া এই শ্রেষ্ঠ উপহারের ওপর আমি খুশি, তুমিও তার ওপর খুশি হয়ে যাও!

আঠারো

১০ বছর পর।

প্রিয়তমা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যুর তিন বছর পর রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাতের আঁধারে মাতৃভূমি মক্কা থেকে হিজরত করে চলে গিয়েছিলেন ইয়াসরিবে। হিজরতের সাত বছর পর আবার তিনি ফিরে এলেন মক্কায়। তবে এবার রাতের আঁধারে নয়, ফিরে এলেন সূর্যদিনের ঝলমলে রোদ্দুর হাতে নিয়ে। বিজয়ীর বেশে মাথা উঁচু করে। হিজরত করেছিলেন সঙ্গে কেবল আবু বকরকে নিয়ে, আজ ফিরে এসেছেন ১০ হাজার প্রদীপ্ত সেনানী নিয়ে। তিনি তাঁর সেনানীদের নিয়ে বীরদর্পে পা রাখলেন প্রিয় মাতৃভূমি মক্কার বালিয়াড়ি আঙিনায়।

তিনি মক্কা শহরে প্রবেশ করলেন। তাঁর মক্কা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে গেল। এক অর্থে এখন তিনি সমগ্র আরবের মুকুটহীন সম্রাট। যদিও তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য প্রেরিত হননি, তিনি পৃথিবীর বুকে আগমন করেছিলেন কেবলই মানবজাতির আলোকিত ভবিষ্যতের জন্য, কিন্তু তাঁর হেদায়েতের আলোকবিভায় মাথানত করেছে আরবের সকল বিভূতি। সকল সিংহাসন পদানত হয়েছে তাঁর চরণতলে।

শহরে প্রবেশ করে তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। শহরের এ-গলি ও-গলি ঘুরে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ সাহাবিরা তাঁকে অনুসরণ করছিলেন। তাঁদের মুখে ধ্বনিত হচ্ছিল বিজয়ের

www.pathagar.com

নাড়া। আল্লাহু আকবারের প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছিল মক্কার পৌত্তলিক ইথারে। রাসুল এগিয়ে যাচ্ছিলেন সবার আগে আগে। তিনি কোথাও থামছেন না। রাসুলের পেছন পেছন আগত সাহাবি এবং মক্কার বিজিত অধিবাসীরা উৎসুক হয়ে আছে–মুহাম্মদ কোথায় যাচ্ছেন?

একসময় তিনি এসে থামলেন হাজুন নামক স্থানের জান্নাতুল মুয়াল্লা কবরগাহে। এখানেই শুয়ে আছেন তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজাতুল কুবরা। ২৫ বছরের দাম্পত্যজীবনের এক বেহেশতি বন্ধন চাপা পড়ে আছে এই জান্নাতুল মুয়াল্লার শুকনো মাটির তলে। প্রেম আর ভালোবাসার এক অতল আধার নিভৃতে ঘুমিয়ে আছে মুয়াল্লার নির্জন প্রান্তরে। ১০ বছর পর মক্কায় প্রবেশ করে তিনি সর্বপ্রথম হাজিরা দিতে এলেন তাঁর প্রিয়তমার কবরগাহে। খাদিজার সেই অতলান্ত প্রেম এখনও ধূপশিখার মতো নিরবধি জ্বলে আছে মুহাম্মদের মনমুকুরে। কী করে ভুলবেন তিনি তার প্রথম প্রেম, প্রথম প্রিয়তমাকে!

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রিয়তমার কবরের পাশে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত। বোবাকান্নায় অশ্রুত হৃদয়ের আহাজারি। এত দিন পর, এতগুলো বছর পর আবার তিনি অশ্রুসজল হয়ে দাঁড়াতে পারলেন খাদিজার কবরের পাশে। দূর মদিনায় কত দিন তিনি খাদিজার বিরহে ব্যথিত হয়েছেন, কত দিন তিনি খাদিজার বেদনায় একা কেঁদেছেন, সে কথা তিনি আর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আজ ব্যথাতুর। খাদিজা তো সেই কবেই চলে গিয়েছেন। তারপর চলে গেছেন এক-এক করে তিন কন্যাও–রোকাইয়া, উম্মে কুলসুম, জয়নব। সবাই তাঁদের মায়ের সঙ্গে গিয়ে শরিক হয়েছেন। দুই ছেলে তো আগেই চলে গিয়েছিলেন। এখন কেবল ফাতেমা জীবিত আছেন। আজ এখানে দাঁড়িয়ে তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যথায় আবার মুষড়ে পড়লেন। তবু আজ তিনি খাদিজার পাশে এসে দাঁড়াতে পেরেছেন, ভালোবেসে অশ্রু বিগলিত হতে পেরেছেন। তিনি রবের শোকরিয়া জানালেন।

আল্লাহর দরবারে হাত তুললেন। প্রিয়তমা খাদিজার জন্য দোয়া করলেন আল্লাহর কাছে। সকল সাহাবির কণ্ঠে বারবার ধ্বনিত হতে লাগল– আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন!

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা বলতেন, 'আমি কখনো খাদিজাকে দেখিনি। না দেখার পরও তাঁকে যে পরিমাণ ঈর্ষা করতাম, রাসুলের আর কোনো স্ত্রীর প্রতি

www.pathagar.com

এতটা ঈর্ষা হতো না। রাসুল তাঁকে অনেক বেশি স্মরণ করতেন। কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে যখনই কোনো বকরি জবাই হতো, তার কিছু অংশ সবার আগে খাদিজার আত্মীয় ও বান্ধবীদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন।'

পরবর্তী স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা ছিলেন রাসুলের সবচেয়ে প্রিয়তমা। সেই আয়েশা খাদিজার প্রতি রাসুলের ভালোবাসা দেখে ঈর্ষান্বিত হতেন। অনেক সময় তো কিশোরী আয়েশা রাসুলের মুখে খাদিজার এত এত প্রশংসা শুনে গোস্বাও করে উঠতেন। একদিন মুখ ফসকে বলেই ফেললেন, 'কেন ওই লাল ঠোঁটওয়ালি মহিলাকে এত স্মরণ করতে হবে, যিনি বেশ কয়েক বছর আগেই পরলোকগমন করেছেন। মনে হয় তিনি ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো নারী নেই! আল্লাহ তো তাঁর পরিবর্তে আপনাকে আরও উত্তম নারী দান করেছেন!'

এটা একদিকে যেমন আয়েশার ঈর্ষাকে প্রকাশ করেছে, তেমনি প্রকাশ করেছে খাদিজার প্রতি রাসুলের ভালোবাসা কতটা গভীর, সেটা পরিমাপ করার একটি গোপন অভীপ্সাও। আয়েশার মতো অনুসন্ধিৎসু শিক্ষানবিশের জন্য এটা জানা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আয়েশার কথায় আল্লাহর রাসুল ব্যথিত হলেন। তিনি আয়েশার সামনে তুলে ধরলেন খাদিজার অনন্যতা। যে অনন্যতার অতল স্পর্শ করতে পারেননি রাসুলের আর কোনো স্ত্রী। তিনি বেদনাহত কণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'তার মতো আর কে হতে পারবে? না, তার চেয়ে উত্তম নারী আল্লাহ আমাকে দান করেননি। মক্কার মানুষেরা যখন আমার কথা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, তখন সে সবার আগে আমার প্রতি ঈমান এনেছে। আমার নবুওয়াত নিয়ে মানুষ যখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, তখন সে আমার নবুওয়াতের সত্যায়ন করেছে। মানুষ যখন আমাকে বঞ্চনায় তাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন সে আমাকে তার সম্পদ দিয়ে ভরসা দিয়েছে। আল্লাহ তার মাধ্যমে আমাকে সন্তান দান করেছেন। না, তার মতো আর কেউ নেই।'

সত্যি, তাঁর মতো আর কেউ নেই। তিনি অনন্যা। তিনি তুলনাহীনা।

www.pathagar.com

এক নজরে

জন্ম: ৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দ।

বিয়ে: বিয়ের সময় খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স ছিল ৪০ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ২৫।

বিবাহ সন: ৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দ।

দাম্পত্যজীবন: রাসুলের সাথে তাঁর দাম্পত্যকাল ২৪ বছর ৬ মাস বা প্রায় ২৫ বছর। তিনি বেঁচে থাকা অবধি রাসুল দ্বিতীয় বিয়ে করেননি।

মৃত্যুসন: ৬২০ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল/মে মোতাবেক নবুওয়াতের দশম বর্ষের রমজান মাসের ১০ তারিখ।

দাফন: মক্কার 'হাজুনে'; মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

www.pathagar.com

উম্মুল মুমিনিন

সাওদা বিনতে জামআ অধ্যায়

রাদিয়াল্লাহু আনহা

এক

সাওদা বিনতে জামআর পরিবারে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করলেন। নানাজনে নানা কথা বলল, নানাভাবে তাঁকে হেয় করার চেষ্টা করল, তবু তিনি দমলেন না। তিনি বিবাহিতা। স্বামী সাকরান ইবনে আমর প্রথম প্রথম তাঁর নতুন ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারটি ভালো চোখে না দেখলেও কয়েক দিন পর স্ত্রীর প্রণোদনায় তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলেন।

ইসলাম গ্রহণের বিষয় মক্কায় তখন সহজ ছিল না। নবুওয়াতের প্রথম কাল অতিবাহিত হচ্ছিল। যারাই নতুন নবি মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করছিল, তারা মক্কার বিধর্মী পৌত্তলিকদের দ্বারা নানাভাবে হেনস্থার শিকার হচ্ছিল। সাওদা ও সাকরানও তাদের রক্তচক্ষু এড়াতে পারলেন না। অপমান ও নির্যাতনের জাঁতাকল তাঁদেরও নিষ্পেষণ করতে লাগল।

বেশ কিছুদিন মুখ বুজে সহ্য করলেন তাঁরা। আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদের ধৈর্য ধরতে বললেন। কিন্তু এমন অত্যাচার আর কত দিন সহ্য করা যায়? পথে-ঘাটে, বাড়িতে-বাজারে, আড়ালে-জনসম্মুখে তাঁদের ওপর অকথ্য গঞ্জনা নিপতিত হতে লাগল। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হলো তাঁরাসহ অধিকাংশ সাহাবির।

এমন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুলের কাছে হিজরতের নির্দেশ এল। তিনি যেন তাঁর অনুসারীদের লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ ইথিওপিয়ায় (হাবশা) চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। রাসুল তাঁর অনুসারীদের আল্লাহর এ পয়গাম শোনালেন–যাঁদের সামর্থ্য আছে, তাঁরা যেন কিছুদিনের

www.pathagar.com

জন্য ইথিওপিয়ায় চলে যান। মক্কার অবস্থা স্বাভাবিক হলে বা ভিন্ন কোনো উপায়ে মুসলিমদের অবস্থার উন্নতি হলে তাঁদের ডেকে আনা হবে। এভাবে নির্যাতন সহ্য করে জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার কোনো মানে হয় না।

কিছুদিন আগেই আম্মার ইবনে ইয়াসিরের মা সুমাইয়া এবং পিতা ইয়াসিরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে কুরাইশনেতা আবু জেহেল ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা। তাঁরা দুজন ইসলামের প্রথম শহিদ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। কিন্তু এ হত্যাকাণ্ডের পর রাসুলের মনে সাহাবিদের নিয়ে ভয় সঞ্চার হয়। কাফেরদের নির্যাতনে আর একজন সাহাবির প্রাণ যাক, এটা তিনি হতে দিতে পারেন না। এ কারণেই অপারগ সাহাবিদের মক্কা থেকে ভিন্ন কোনো দেশে হিজরত করার ব্যাপারে জোর দেন।

সাওদা ও সাকরান দুজনই হিজরতের সিদ্ধান্ত নিলেন। সাহাবিদের একটি দল এরই মধ্যে কুরাইশদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ইথিওপিয়ায় চলে গেছেন। সাওদা ও সাকরান হিজরতকারী প্রথম দলের সঙ্গে যেতে না পারলেও সঙ্গোপনে দ্বিতীয় মুহাজির দলের সঙ্গী হয়ে গেলেন। কুরাইশদের অজ্ঞাতসারে রাতের আঁধারে মক্কা থেকে পালিয়ে কয়েক দিনের পথ পাড়ি দিয়ে উপকূলে এসে চড়ে বসলেন ইথিওপিয়াগামী জাহাজে।

একসময় পৌঁছে গেলেন ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ ইথিওপিয়ায়। কিন্তু সেখানে অবস্থানও খুব একটা সুখের ছিল না। একে তো ভিন দেশ, সবকিছু মাতৃভূমির মতো আপন নয়; অন্যদিকে মক্কার কুরাইশরা লোক পাঠিয়ে ইথিওপিয়ার শাসক নাজ্জাশির কাছে তাঁর রাজ্যে আশ্রিত মুসলিমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকে। নাজ্জাশি যদিও কুরাইশদের দূতিয়ালিতে প্রভাবিত হলেন না, কিন্তু আশ্রিত মুসলিমরা সব সময় নিরাপত্তার অভাব বোধ করতেন।

সাওদা ও সাকরান ইথিওপিয়ার উদ্বাস্তু শিবিরের একটি ঘরে শুয়ে আছেন। ঘুমঘোরে সাওদা স্বপ্নে দেখলেন–আকাশে ভরা পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। তিনি চাঁদের দিকে তাকাতেই চাঁদটি আকাশ থেকে ছুটে এসে তাঁর কোলে পড়ল। তিনি ঘুম থেকে জেগে ওঠে স্বামী সাকরানকে স্বপ্নের কথা বললেন। সাকরান স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খুব সম্ভব আমার মৃত্যুর পর তুমি আমাদের রাসুল মুহাম্মদের স্ত্রী হবে।'

এমন অকপট স্বীকারোক্তি সাওদাকে বিহ্বল করে তুলল। এ কীভাবে সম্ভব! তিনি তাঁর স্বামীর বাহু আঁকড়ে ধরলেন।

www.pathagar.com

ইথিওপিয়ার পরিবেশ নানা প্রতিকূলতায় ভরা। তবু সবকিছু সহ্য করে বেশ কিছুদিন সেখানে স্বামীর সঙ্গে রইলেন সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা। মাতৃভূমির জন্য মন কেঁদে ওঠে প্রায়ই। কিন্তু মনকে প্রবোধ দিয়ে রাখেন–সবকিছু একদিন ঠিক হয়ে যাবে!

নবুওয়াতের দশম বছরে হঠাৎ খবর এল, মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে রাসুলের সদ্ভাব হয়ে গেছে এবং মক্কায় এখন আর কোনো সমস্যা নেই। সকল মুসলিম সেখানে সুখে-শান্তিতে বসবাস শুরু করেছে।

এটা যদিও অসমর্থিত সূত্রের সংবাদ ছিল কিন্তু উদ্বাস্তু জীবন থেকে নিজেদের মুক্ত করতে সাওদাসহ অন্য অনেকে নিজেদের মনকে আর প্রবোধ দিতে পারলেন না। ফলে খুব সংক্ষিপ্ত প্রস্তুতিতে এক কাফেলার সঙ্গে মক্কার পথে রওনা হয়ে গেলেন স্বামী-স্ত্রী দুজনই।

পথিমধ্যে এক করুণ ঘটনা ঘটল। সাওদার স্বামী সাকরান রাদিয়াল্লাহু আনহু সফরাবস্থায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং অসুস্থতার প্রকোপে তিনি মক্কায় পৌঁছার আগে অজ্ঞাতনামা এক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন।

সাওদার জন্য এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়াটা সহজ ছিল না। একে তো তিনি কেবলই দেশান্তর থেকে নিজ দেশে ফিরছিলেন, সঙ্গে অভিভাবক হিসেবে তাঁর স্বামী ছাড়া আর কেউ ছিল না; অপরদিকে মক্কায় ফিরে তাঁর অবস্থা আরও শোচনীয় হওয়ার আশঙ্কা করছিলেন। মক্কার কুরাইশদের বিরুদ্ধাচরণ তো আছেই, তা ছাড়া জীবনধারণের জন্য তাঁর তেমন কোনো সম্পদের ব্যবস্থা ছিল না।

যা-ই হোক, বিধবা অবস্থায় একপ্রকার নিঃস্ব হয়ে তিনি ইথিওপিয়া থেকে মক্কায় ফিরে এলেন। মক্কায় এসে আল্লাহর রাসুলের নির্দেশনা অনুযায়ী ধৈর্যধারণ করে নিজগৃহে বসবাস করতে লাগলেন।

দুই

কুরাইশ গোত্র কর্তৃক রাসুল মুহাম্মদ ও সাহাবিদের ওপর আরোপিত আবু তালিব গিরিপথে নির্বাসনের নিষেধাজ্ঞা তখন কেবল শেষ হয়েছে। নির্বাসনের যাতনাময় দিনগুলো শেষে রাসুল যখন মক্কার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলেন, সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল আরও বেদনার পারাবার। মক্কায় ফিরে আসার কয়েক দিন পরই তাঁর অন্যতম অভিভাবক ও ভরসাস্থল চাচা আবু তালিব দীর্ঘ রোগে ভুগে মৃত্যুবরণ করলেন। সঙ্গিন এ মুহূর্তে আবু তালিবের

www.pathagar.com

মৃত্যু রাসুলকে বিহ্বল করে তোলে। এমন বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই তাঁর প্রাণপ্রিয় স্ত্রী খাদিজাও রোগ-শোকে পরকালের পথে পাড়ি জমান।

খাদিজার মৃত্যু মুহাম্মদকে একেবারে গুঁড়িয়ে দিল। দীর্ঘ ২৫ বছর এই খাদিজা তাঁকে পাখির ছানার মতো আগলে রেখেছিলেন নিজের ভরসার চাদরের নিচে। মক্কার মানুষের সকল জিঘাংসা থেকে তিনি তাঁকে সযতনে আড়াল করতে প্রাণপণে সচেষ্ট ছিলেন। খাদিজা ছিলেন তাঁর জন্য এক মহিরুহতুল্য বৃক্ষের মতো, যে কেবল ফল আর ছায়াই দেয়নি, প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকেও রেখেছিল নিরাপদ।

আবু তালিব ও খাদিজার মৃত্যু রাসুলকে ম্রিয়মাণ করে তোলে। তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। অপরদিকে এ দুই প্রভাবশালী ব্যক্তির মৃত্যুর পর মক্কার পৌত্তলিক কুরাইশদের নির্যাতনের মাত্রাও বেড়ে যেতে থাকে। রাসুল এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর নিপীড়নের নানা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে শুরু করে তারা। সবদিক থেকে তিনি অকূলপাথারে পড়ে গেলেন।

খাওলা বিনতে হাকিমের কথা বলতে হয়। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবি উসমান ইবনে মাজউনের স্ত্রী। স্বামী-স্ত্রী দুজনই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ইসলাম আগমনের প্রাথমিক সময়ে। রাসুলকে বড় সম্মান করতেন তিনি। খাদিজার সঙ্গেও ছিল তাঁর সদ্ভাব, অন্তরঙ্গ বান্ধবী ছিলেন দুজন। খাদিজা মারা যাওয়ার পর তাঁর জন্য রাসুলের বিরহ তিনি সইতে পারলেন না। প্রায়ই দেখতেন আল্লাহর রাসুল বিষণ্ন মন নিয়ে কাজে বেরোচ্ছেন। ঘরে এসেও সেই বিষণ্নতা অক্ষুণ্ন থাকত। রাসুলের এমন বিষণ্নতা তাঁর ভালো লাগত না।

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা গত হওয়ার কিছুদিন পর একদিন তিনি এলেন রাসুলের কাছে। উদ্দেশ্য–রাসুলের বিয়ের পয়গাম। কিন্তু আবার ভয়ও হচ্ছে, রাসুল আবার কিছু মনে করেন কি না! কিছুক্ষণ রাসুলের সঙ্গে এটা-সেটা নিয়ে কথা বলার এক ফাঁকে সাহস করে বলেই ফেললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আরেকটা বিয়ে করুন না!'

খাওলার কথায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রথমে হ্যাঁ বা না কিছু বললেন না। বরং তিনি খাওলাকে তাঁর নিজের অবস্থাটা বোঝালেন। তিনি বর্তমানে মক্কার সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত ব্যক্তি। নতুন ধর্ম ইসলামের পথে আরবের মানুষকে আহ্বান করার ফলে কুরাইশসহ অধিকাংশ গোত্রের লোকজন তাঁকে দেখতে পারে না। অধিকাংশ নেতা তাঁর বিরুদ্ধবাদী। এই তো কিছুদিন আগে তিন বছরের নির্বাসন জীবন পার করে এসেছেন আবু তালিব

www.pathagar.com

গিরিপথের বিক্ষুব্ধ পাদদেশে। কুরাইশরা পারলে তাঁকে হত্যা পর্যন্ত করতে দ্বিধা করবে না। এমন একজন লোককে কোন মেয়ে বিয়ে করতে চাইবে? আর কোন পিতাই-বা তার মেয়েকে এমন একজন বিতর্কিত লোকের হাতে সোপর্দ করতে চাইবে? মক্কার সবাই তো আর খাদিজা নয় যে মুহাম্মদের হৃদয়ের আলোকরশ্মি দেখে অভিভূত হয়ে নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দেবে! আর তা ছাড়া তাঁর বর্তমান সংসারে দুটো মেয়ে আছে। তাঁদের দেখভাল করার মতো স্ত্রী পাওয়া তো সুকঠিন ব্যাপার। এত সব দায় নিয়ে কেই-বা তাঁকে বিয়ে করতে চাইবে!

খাওলা রাসুলের মনোবেদনা বুঝতে পারলেন। রাসুলের মনোভাবটাও পড়তে পারলেন খুব ভালো করে। তিনি নিজের চাইতে অনাগত সহধর্মিণীর ভবিষ্যৎটা বড় করে দেখছেন। কেননা তিনি তো রহমাতুল্লিল আলামিন, নিজের সুবিধার জন্য অন্য কারও সামান্য কষ্ট হোক, এমন কাজ করতে তিনি কখনো রাজি হবেন না।

খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুলকে অভয় দিয়ে বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না, যদি রাজি থাকেন তাহলে ইচ্ছা করলে কুমারীও বিয়ে করতে পারেন আবার বিধবাও বিয়ে করতে পারেন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'এমন মেয়ে কে আছে?'

খাওলা রাসুলের আগ্রহ লক্ষ করে বললেন, 'আপনি কি কুমারী বিয়ে করতে চান নাকি বিধবা?'

'বলো দেখি তাদের বৃত্তান্ত।'

'কুমারী আছে আপনার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু আবু বকরের কন্যা আয়েশা।'

তিনি মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর বিধবা?'

'বিধবা আছে সাওদা বিনতে জামআ, যিনি অনেক আগেই মুসলমান হয়েছেন।'

আল্লাহর রাসুল একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি দুজনের ব্যাপারেই কথা বলো।'

খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মনটা আনন্দে নেচে উঠল। যাক, অবশেষে কিছুটা হলেও তিনি রাসুলের মনোবেদনা দূর করার একটা উপায় করতে পারছেন। একজন স্ত্রী থাকলে তাঁর সাংসারিক আর মানসিক জীবনে কিছুটা হলেও প্রশান্তি আসবে।

খাওলা আর দেরি করলেন না, রাসুলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তখনই সাওদার বাড়ির দিকে গেলেন। কেননা প্রথমে রাসুলের একজন সার্বক্ষণিক সঙ্গী

www.pathagar.com

এবং একজন সংসারী নারীর প্রয়োজন, যিনি রাসুলের সেবা তো করবেনই আবার তাঁর সংসারের হালও ধরতে পারবেন শক্ত হাতে। এ কারণে সাওদার কাছে আগে প্রস্তাব পাঠানোকে তিনি আবশ্যিক মনে করলেন।

খাওলা সাওদার কাছে রাসুলের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেলে তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। সাওদা যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং বয়স্ক ছিলেন, সুতরাং রাসুলের সঙ্গে সম্বন্ধকে মেনে না নেওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পাননি। অন্যদিকে তাঁর বৈষয়িক তেমন কোনো সম্পদ ছিল না, যার দ্বারা তিনি বৈধব্যের নিদারুণ দিনগুলো অতিবাহিত করবেন। তাঁর এমন দৈন্যদশা জেনেই রাসুল তাঁকে বিয়ের ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করেন এবং তিনিও বিনা বাক্যব্যয়ে এ প্রস্তাব কবুল করেন।

তবে শুধু সাওদার সম্মতিই যথেষ্ট ছিল না, তাঁর পিতা জামআ ইবনে কায়েস তখনো জীবিত ছিলেন। খাওলা যখন তাঁর পিতার কাছে গিয়ে আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিয়ের ব্যাপারে বললেন, তখন তিনি উল্লসিত হয়ে উঠলেন, 'এ তো খুব চমৎকার ও মানানসই সম্বন্ধ। তোমার বান্ধবী এ ব্যাপারে কী বলে?'

খাওলা বললেন, 'সে এ প্রস্তাবে রাজি আছে।'

যদিও সাওদার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জামআ (যিনি তখনো অমুসলিম ছিলেন, পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন) এবং তাঁর এক চাচা এ বিয়েতে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের মতামত ধোপে টেকেনি। আবদুল্লাহ ইবনে জামআ বোনের এ বিয়ের কথা শুনে রাগে-দুঃখে কপালে-মুখে ধুলো মেখে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। পরবর্তী সময়ে যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন এ ঘটনা স্মরণ করে বলতেন, 'পৃথিবীতে এর চেয়ে অপমানজনক আর কোনো স্মৃতি অবশিষ্ট নেই আমার।'

হিজরতের তিন বছর আগে রমজান মাসের কোনো এক দিন উম্মুল মুমিনিন সাওদার সঙ্গে আল্লাহর রাসুলের বিয়ে হয়ে গেল। এ সময় রাসুলের বয়স ছিল ৫০ এবং সাওদার ৫০।

তিন

উম্মুল মুমিনিন সাওদা বিনতে জামআ রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুলের সংসারে খাদিজার স্থলাভিষিক্ত হলেন। রাসুলের অবিবাহিত দুই কন্যা–উম্মে কুলসুম ও ফাতেমা তখন রাসুলের সংসারে। তাঁদের দেখভাল এবং সাংসারিক দায়িত্ব

www.pathagar.com

পালনের জন্য তিনি রাসুলের ঘরে এলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামও সাওদার হাতে সংসারের দায়িত্ব তুলে দিয়ে ইসলাম প্রচারের কাজে পূর্ণোদ্যমে আত্মনিয়োগ করলেন।

এ সময়কালে তিনি তায়েফের শাকিক গোত্রের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যান এবং সেখান থেকে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে আসেন। ২৬ দিনের দীর্ঘ সফর ছিল। ২৬ দিন পরে যখন তিনি বিক্ষত অবস্থায় ফিরে আসেন, তখন সাওদা তাঁর শুশ্রূষায় নিজেকে বিলিয়ে দেন। মমতা নিয়ে রাসুলের বিক্ষত শরীর থেকে আঘাতের ব্যথা উপশমে অস্থির হয়ে পড়েন।

গিরিপথে নির্বাসনের নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর ইথিওপিয়ায় রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকা অনেক মুসলিম মক্কায় ফিরে আসেন। দিন দিন মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ছিল এবং কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রাও বেড়ে যাচ্ছিল। এ সময় ইয়াসরিব থেকে একদল লোক এসে রাসুলকে মক্কা ছেড়ে তাদের লোকালয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল। সে সঙ্গিন সময়ে রাসুলের জন্য এটা ছিল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক সংবাদ। রাসুল তাদের প্রস্তাব ভেবে দেখবেন বলে কথা দেন এবং আগামী বছর হজের মৌসুমে ইয়াসরিবের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে তিনি বিস্তারিত আলাপ করবেন বলে আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

এভাবেই ইয়াসরিব তথা মদিনায় হিজরতের পটভূমি তৈরি হলো। পরবর্তী বছরগুলোতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদিনার নেতৃস্থানীয় লোকজনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় নানা বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছান এবং তিনিসহ তাঁর সকল সাহাবির মদিনায় যাওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানান।

২২ সফর মোতাবেক ১২ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ।

সাওদার সঙ্গে বিয়ের তিন বছর পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর জিম্মায় নিজের কন্যাদের এবং সাংসারিক সকল দায়দায়িত্ব অর্পণ করে রাতের আঁধারে মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনার পথে হিজরত করলেন। সাওদার জন্য এ ছিল এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষা। কুরাইশদের পক্ষ থেকে অনেক কিছুই ঘটার আশঙ্কা ছিল, আবার রাসুলের বিদায়-পরবর্তী দুশ্চিন্তা তো ছিলই। তবু তিনি অকুতোভয় হয়ে সবকিছু সামলে নিলেন এবং রাসুলের পরবর্তী নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কুরাইশদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে রাসুলের কন্যাদের নিজের বুকে আগলে রাখলেন তিনি। খাদিজার রেখে যাওয়া বুকের ধনকে তিনি মায়ের মমতায় নিজের বুকে স্থান দিলেন।

রাসুল মদিনায় যাওয়ার তিন মাস পর স্ত্রী-কন্যা এবং পরিবারের অপরাপর সদস্যদের নেওয়ার জন্য তাঁর পালক পুত্র জায়েদ ইবনে হারিসা এবং আবু

www.pathagar.com

বকরের পরিবারের জন্য তাঁর ভৃত্য আবু রাফে ও আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকিতকে মক্কায় পাঠান। তাঁদের সঙ্গে সাওদাসহ রাসুলের পরিবার ও আবু বকরের পরিবার রাতের আঁধারে মক্কা ছেড়ে মদিনার পথ ধরেন। কয়েক দিনের দীর্ঘ মরুপথ পাড়ি দিয়ে সকলে মদিনায় এসে পৌঁছান।

চার

দীর্ঘ ১৩ বছর উম্মুল মুমিনিন সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুলের সঙ্গে সংসার করেছেন। খাদিজার পর তিনিই সবচেয়ে বেশি দিন রাসুলের সান্নিধ্যলাভে ধন্য হয়েছেন। রাসুলের ঘর, পরিবার, কন্যাদের তিনি আপন ভালোবাসায় আগলে রেখেছিলেন। মদিনায়ও এর ব্যত্যয় হলো না। যদিও বয়স হয়ে গিয়েছিল, তবু তিনি সর্বদা নিজের দায়িত্ব পালন করে গেছেন নিবিষ্টচিত্তে।

মদিনায় আসার কিছুদিন পর রাসুলের কিশোরী স্ত্রী আয়েশা রাসুলের ঘরে আসেন। আয়েশা অল্পবয়স্কা ছিলেন বলে সাওদা ঘরকন্নার যাবতীয় বিষয় আয়েশাকে শিখিয়ে দিতেন। নিজের সতিন হলেও আয়েশাকে তিনি নিজের মেয়ের মতো গড়ে তুলেছিলেন। উম্মুল মুমিনিনদের মধ্যে আয়েশার সঙ্গে সবচেয়ে সদ্ভাব ছিল সাওদার। আয়েশাও যথেষ্ট সম্মান করতেন সাওদাকে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সাওদার ব্যাপারে বলতেন– 'সাওদা ছাড়া আর কোনো নারীকে দেখে আমার এমন মনে হয়নি–আহা! যদি তাঁর দেহে আমার হৃদয় ফুঁকে দেওয়া হতো। তবে তিনি কিছুটা মেজাজি ছিলেন। মুহূর্তেই রেগে যেতেন আবার মুহূর্তেই তাঁর রাগ পড়ে যেত।'

তখনো পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়নি। মদিনার অন্য নারীদের মতো সাওদাও প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য পার্শ্ববর্তী জঙ্গলের নির্দিষ্ট স্থানে যেতেন। এ বিষয়টি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পছন্দ হতো না। তিনি এ বিষয়ে রাসুলের কাছে অভিযোগ করলেন–উম্মুল মুমিনিনগণ কেন সাধারণ নারীদের মতো বাইরে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে যাবেন? সমাজে ভালো-মন্দ সব প্রকার লোকই আছে, তাই এটা তাঁদের জন্য শোভনীয় নয়।

যেহেতু তখনো পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়নি, তাই রাসুল এ ব্যাপারে তখনই কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করলেন না, বরং তিনি নীরবতা অবলম্বন করলেন। কিন্তু উমর বিষয়টি নিয়ে নিজেই উদ্যোগী হলেন।

সাওদা দীর্ঘাঙ্গী এবং খানিকটা মোটা ছিলেন। বাইরে বেরোলে তাঁর অবয়ব দেখে সহজেই তাঁকে চিনে ফেলা যেত। এক রাতে তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন

www.pathagar.com

সারার জন্য বাইরে বের হয়েছেন, এমন সময় উমর সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সাওদাকে দেখে আঁতকে উঠে বললেন, 'হে সাওদা, আমি তো আপনাকে চিনে ফেলেছি!'

সাওদার জন্য এটা ছিল আত্মসম্মানে আঘাত লাগার মতো বিষয়। আবার উমরও সংশোধনের জন্যই এমন অনভিপ্রেত কাজ করেছিলেন। যা হোক, সাওদা রাসুলের কাছে উমরের ব্যাপারে নালিশ করলেন।

এর কিছুদিন পরই পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়।

রাসুলের সঙ্গে তাঁর প্রেমময় জীবনের খুব সংক্ষিপ্ত অংশই সিরাত ও ইতিহাসে বিবৃত হয়েছে। যেহেতু তিনি নিজে অত্যন্ত অল্পসংখ্যক হাদিস বর্ণনা করেছেন, এ কারণে তাঁর জীবনের এ অধ্যায় মুসলিম উম্মাহর কাছে অধরাই রয়ে গেছে। রাসুলের সঙ্গে তাঁর একটি হাস্যরসাত্মক ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে।

এক রাতে সাওদা রাসুলের সঙ্গে নামাজ পড়ছিলেন। নামাজের মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ রুকু-সেজদা করছিলেন। রুকু-সেজদা এতই দীর্ঘ হচ্ছিল যে, দীর্ঘাঙ্গী ও ভারী শরীরের সাওদার জন্য দীর্ঘক্ষণ রুকু-সেজদা করা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

সকালবেলা তিনি রাসুলের কাছে অভিযোগের সুরে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! কাল রাতে আপনি এত দীর্ঘ দীর্ঘ রুকু-সেজদা করছিলেন, মনে হচ্ছিল আমার নাক ফেটে রক্তই পড়ে কি না!'

তাঁর এমন সহজ-সরল কথায় রাসুল হেসে ওঠেন।

শেষ বয়সে বার্ধক্যের দরুন তিনি কানে কিছুটা কম শুনতেন। এটা নিয়ে অন্য উম্মুল মুমিনিনরা অনেক সময় টিপ্পনী কাটতেন তাঁর সঙ্গে। তিনিও তাঁদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতেন।

সাওদার বয়স তখন মধ্য ষাটে।

রাসুল মুহাম্মদের সাম্য, সমতা ও ন্যায়বিচারের কথা সবাই জ্ঞাত। বিশেষত মদিনায় তখন রাসুলের একাধিক স্ত্রী বিদ্যমান, তাঁদের মধ্যে সমতা বিধানের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অসমতার ব্যাপারে কারও কাছ থেকে কোনো অভিযোগ আসুক, এ ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকতেন। কাজে-কর্মে, সঙ্গ-ভালোবাসায় তিনি চেষ্টা করতেন সকলের অধিকার সমান রাখতে। কখনো এর ব্যত্যয় হোক, এ তিনি মোটেও চাইতেন না।

www.pathagar.com

এই সচেতনতার পরিপ্রেক্ষিতেই একদিন তিনি সাওদার মুখোমুখি হলেন। তাঁকে জানালেন, তুমি ইচ্ছে করলে বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে নিতে পারো। কেননা আমার মনে হচ্ছে, তোমার বয়োবৃদ্ধতার দরুন অনেক ক্ষেত্রেই আমি অন্য স্ত্রীদের সঙ্গে তোমার সমতা বিধান করতে পারছি না। এমন অসাম্য আমার জন্য মনোবেদনার।

মধ্য ষাটের সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা ভয় পেয়ে গেলেন। দুশ্চিন্তাহত হলেন। রাসুলের মুখে 'বিবাহবিচ্ছেদ' শব্দটি তাঁর হৃদয়ে যেন শেল হয়ে বিদ্ধ হলো। তিনি জলদি জবাব দিলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! স্বামীর জন্য নতুন বউয়ের যে অনুভূতি ও প্রেম, তা তো আমার থেকে অনেক আগেই বিদায় নিয়ে গেছে। আমি এখন শুধু এটুকু চাই–আমাকে আপনার স্ত্রী হিসেবে আমৃত্যু স্বীকৃত রাখুন এবং এ পরিচয় নিয়েই রোজ হাশরে আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে চাই।'

সাওদার এমন প্রস্তাবে রাসুলের দুশ্চিন্তা অনেকটা প্রশমিত হলো। তিনি প্রশান্ত হৃদয়ে সাওদার প্রস্তাব মেনে নিলেন। রাসুলের এমন দিল-দরাজ আচরণের পর সাওদা রাসুলকে কিছু একটা উপহার দেওয়ার কথা ভাবলেন। কী হতে পারে উপহার? তিনি রাসুলকে জানালেন, স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বিধানের জন্য তাঁর ভাগে যে দিনটা পড়বে, অর্থাৎ যেদিন তাঁর ঘরে রাসুলের রাত্রিবাসের পালা থাকবে, সে দিনটা তিনি তাঁর বান্ধবী আয়েশাকে দিয়ে দিতে চান। যেহেতু আয়েশা কেবলই কিশোরী এবং রাসুলকে কাছে পাওয়ার জন্য তাঁর মনের অস্থিরতা অন্য আর সবার চেয়ে বেশি, এ কারণে সাওদা নিজের পালার দিনটি আয়েশাকে উপহার দিয়ে দিলেন।

সাওদার এমন বুদ্ধিমত্তায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অভিভূত হলেন। তবে তাঁর এমন সুযোগদানের পরও রাসুল কখনো তাঁর অন্যান্য অধিকারের ব্যাপারে অসমতা করেননি। সকল ক্ষেত্রে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য অধিকার দিতে সচেষ্ট থাকতেন।

একবার উম্মুল মুমিনিনদের অনেকেই রাসুলের সঙ্গে একত্রে বসে ছিলেন। কোনো এক স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনার পরলোকগমনের পর স্ত্রীদের মধ্যে কে সবার আগে আপনার সঙ্গে মিলিত হবে?'

রাসুল উত্তর দিলেন, 'তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে বড়, সে আমার সঙ্গে সবার আগে মিলিত হবে।'

রাসুলের এমন উত্তরের পর সবাই যার যার হাত মাপতে লাগলেন। দেখা গেল, সাওদার হাত সবার চেয়ে বড়। কিন্তু উম্মুল মুমিনিনদের মধ্যে রাসুলের

www.pathagar.com

ইন্তেকালের পর সবার আগে পরলোকগমন করেন জয়নব বিনতে জাহাশ। তখন অন্য উম্মুল মুমিনিনরা বুঝতে পারেন, 'বড় হাত' দিয়ে রাসুল মূলত দানশীলতায় যার হাত অধিক বড়, এটা বোঝাতে চেয়েছিলেন। জয়নব বিনতে জাহাশের দানশীলতার কথা মক্কা-মদিনায় মশহুর হয়ে ছিল।

বিদায় হজের সময় রাসুলের সঙ্গে তাঁর সকল স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। সবাই একসঙ্গে তাওয়াফ এবং হজের অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করেন। কিন্তু দীর্ঘদেহী এবং মোটা হওয়ার কারণে ভিড়ের মধ্যে চলতে কষ্ট হতো সাওদার। এ জন্য রাসুল তাঁকে রাতের বেলা অন্যদের আগেই মুজদালিফার কার্যাদি সম্পন্ন করার পরামর্শ দেন, যাতে ভিড় হওয়ার আগেই তিনি কার্যাদি শেষ করতে পারেন।

এ হজের সফরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের বলেন, 'এটাই হয়তো শেষ হজ। এ হজের পর তোমাদের হয়তো ঘরে বসে থাকতে হবে।'

এ কথার দ্বারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মূলত বোঝাতে চেয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে স্ত্রীদের এটাই শেষ হজ হতে পারে। এরপর তিনি আর হজ করার সুযোগ না-ও পেতে পারেন। কিন্তু রাসুলের কথাকে মান্য করার অভিপ্রায়ে তাঁর মৃত্যুর পরও সাওদা ও জয়নব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা কখনো হজ পালন করেননি। তাঁরা সর্বদা তাঁদের ঘরেই থাকতেন।

খোদাভীতি ও ইবাদত-বন্দেগিতে সাওদার আগ্রহ সবাইকে চমকিত করত। তিনি নিজেই উপার্জন করতেন। তায়েফ থেকে প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়া এনে তিনি বিভিন্ন গৃহস্থালি জিনিস বানিয়ে বিক্রি করতেন এবং উপার্জিত অধিকাংশ অর্থই গরিব-দুঃখীদের মাঝে বিতরণ করে দিতেন।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে একবার খলিফা উমর এক থলে দিরহাম সাওদার কাছে হাদিয়াস্বরূপ পাঠালেন। সেবিকা দিরহামের থলেটি তাঁর সামনে রাখলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী এটা? তাঁকে জানানো হলো, খলিফা তাঁর জন্য এক হাজার দিরহাম হাদিয়া পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, এ দিরহামের থলে তো খেজুরের থলের মতোই। (এগুলো আমার কাছে খেজুরের চেয়ে বেশি মূল্যবান নয়) এ কথা বলে তিনি সব দিরহাম গরিব-দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দিলেন।

রাসুলের ১৩ বছরের অর্ধাঙ্গিনী উম্মুল মুমিনিন সাওদা বিনতে জামআ রাদিয়াল্লাহু আনহা খলিফা উমরের খেলাফতকালের শেষ দিকে ২০ অথবা ২২

www.pathagar.com

হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। অনেক ইতিহাসবেত্তা তাঁর ইন্তেকাল হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে ৫৪ হিজরিতে হয় বলে মত দিয়েছেন।

তাঁর প্রথম স্বামী সাকরান ইবনে আমরের ঘরে আবদুর রহমান নামের এক সন্তান ছিলেন। তিনি মুসলমান হয়েছিলেন এবং পারস্যে জালুলার যুদ্ধে শহিদ হন।

সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা সর্বমোট পাঁচটি হাদিস বর্ণনা করেন।

এক নজরে

জন্ম: ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ।

বিয়ে: বিয়ের সময় সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স ছিল ৫০ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ৫০।

বিবাহ সন: ৬২০ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক নবুওয়াতের দশম বর্ষের রমজান মাসের শেষের দিকে।

দাম্পত্যজীবন: রাসুলের সাথে তাঁর দাম্পত্যকাল ১৩ বছর।

মৃত্যুসন: হিজরি ১৯/২০/২২ সনে।

দাফন: মদিনার জান্নাতুল বাকিতে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২/৭৩/৭৫ বছর।

www.pathagar.com

উম্মুল মুমিনিন
আয়েশা বিনতে আবু বকর অধ্যায়
রাদিয়াল্লাহু আনহা

এক

খাদিজা নেই। উম্মুল মুমিনিন খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা। আরবের সেই পুণ্যনারী। সবর আর শোকরের সেই অতল আধার। মক্কার মানুষের প্রিয়তম মহীয়সী নারী খাদিজা। তিনি নেই।

রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের 'জাম্মিলুনি' চাদরের সাথি। হেরা গুহায় প্রতিধ্বনিত জিবরাইলের 'ইকরা' পাঠের সহ-শিক্ষার্থী। কাবাচত্বরে 'আহাদ' ঘোষণার দৃঢ়পদ সহযাত্রী। আবু তালিব গিরিপথে কাটানো 'আমুল হুজন'-এর দুঃখ সমব্যথী। মুহাম্মদের প্রেমে, মুহাম্মদের ভালোবাসায় মাতোয়ারা হৃদয়। প্রিয়তমের জন্য সর্বসত্ত্বাত্যাগী খাদিজা।

সেই খাদিজা আর নেই। রাসুলকে অবিনশ্বরের পথে উড্ডীন করে তিনি চলে গেছেন নশ্বর এ পৃথিবী ছেড়ে। ইসলামের অত্যুজ্জ্বল আলোক রোশনিকে মহাকালের সাক্ষী করে তিনি আজ শুয়ে আছেন আলোহীন, বন্ধুহীন কবরমৃত্তিকায়। নবুওয়াতের সিলমোহরে মাটির ধরিত্রীকে মোহরাঙ্কিত করে তিনি চলে গেছেন প্রভুর সান্নিধ্যে।

আল্লাহর নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মন বিষাদে আচ্ছন্ন। ব্যথায় ক্লিষ্ট হৃদয়। প্রিয়তম স্ত্রী খাদিজার অন্তিম প্রয়াণের শোক এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। যেখানেই যান, মনের মধ্যে হাহাকার বেজে ওঠে। যেদিকে তাকান কেবল খাদিজার প্রেমময় মুখটা ভেসে ওঠে।

একদিকে নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব, অপরদিকে একা সামলাতে হচ্ছে সংসারের হাল; রাসুলের প্রাণ দুঃখ ভারাক্রান্ত। কীভাবে তিনি সামলাবেন এত কিছু?

www.pathagar.com

তবু তিনি প্রতিদিন নিয়ম করে দাওয়াত দেন মক্কার মানুষকে। তাদের ডাকেন হেদায়েতের রাজতোরণের দিকে। শত অসম্মান, অপমান, যাতনা সয়ে তবু ধৈর্যহারা হন না। সকল ব্যথা-বেদনা বুকের মধ্যে সঙ্গোপনে লুকিয়ে রেখে প্রতিদিন ঘোরেন মক্কার পথে পথে। আর মানুষের দ্বারে দ্বারে আওয়াজ দেন—হায়্যা আলাল ফালাহ! এসো লোকসকল, কল্যাণের দিকে এসো!

তিনি যে রাসুল। সমগ্র মানবসভ্যতার নবি। রহমাতুল্লিল আলামিন।

রাত অনেক। ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়েছেন পৃথিবীর সবচেয়ে কোমলপ্রাণ মানুষটি। দুই চোখের কোণে একটুখানি বেদনার নোনাজল। কেউ দেখেনি। সবার অলক্ষ্যে গড়িয়ে পড়েছে কখন যেন।

ঘুমিয়ে আছেন রহমতের নবি। ঘুমঘোরে স্বপ্নে এলেন এক ফেরেশতা। তাঁর হাতে এক খণ্ড রেশমি রুমাল। ধরে আছেন রাসুলের চোখের সামনে। ফেরেশতার চোখে হাসির ঝিলিক।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী এটা?'

ফেরেশতা মুচকি হেসে অভয় দিয়ে বললেন, 'নিজ হাতে সরিয়ে ফেলুন রেশমি কাপড়ের দোপাট্টা।'

রাসুল হাত বাড়ালেন। রেশমখণ্ড সরালেন। পর্দা সরাতেই পেছনে দেখতে পেলেন একটা মুখাবয়ব অঙ্কিত। ছোট্ট এক বালিকার মুখচ্ছবি। চেনা চেনা লাগছে...এ তো তাঁর প্রিয় বন্ধু আবু বকর-তনয়া আয়েশার মুখচ্ছবি। এ ছবি...! তাঁর মুখাবয়ব আমাকে দেখানো হচ্ছে কেন?

বলা হলো, 'এ-ই সেই সৌভাগ্যবতী মেয়ের মুখচ্ছবি, যে এ জনম এবং পরজনমেও আপনার স্ত্রী হবে। হবে প্রিয়দের মাঝে আপনার প্রিয়তমা।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। কী দেখলেন তিনি আজ স্বপ্নে? এ কি প্রত্যাদিষ্ট ওহির সত্যদর্শন নাকি ঘুমঘোরে দেখা অলীক স্বপ্ন? না না...তাই বা কী করে হয়! তিনি স্পষ্ট দেখেছেন ফেরেশতাকে। দেখেছেন ফেরেশতার হাতের রেশমি বায়োস্কোপ। রেশমের ঝালর সরিয়ে দেখেছেন ছোট্ট এক বালিকার মুখ। সে যে আয়েশা!

কিন্তু আয়েশা...! মনের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব—এ কী করে সম্ভব!

দ্বিতীয় রাতে স্বপ্নে আবার এলেন সেই ফেরেশতা। রাসুলকে নিশ্চয়তা দিতে। রাসুলকে সকল প্রকার দুশ্চিন্তা থেকে নিবৃত্তি দিতে। আজ তিনি আবার রাসুলের চোখের সামনে মেলে ধরলেন রেশমি রুমাল। সেই একই মুখচ্ছবি। একই সে কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হলো স্বপন মাঝার, 'আপনি চিন্তা করবেন না, এ-ই হবে আপনার

www.pathagar.com

আগামী জীবনের সুখ-দুঃখের সাথি। আপনার প্রিয়তমা খাদিজাবিহীন জীবনে এ মেয়েকেই নির্বাচন করা হয়েছে আপনার প্রিয়তমা হিসেবে। খাদিজার শোক-যাতনা-বিরহ ভুলিয়ে দিতে সে-ই হবে মমতার শীতল পরশ।'

স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠলেন আবার। মনের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। বালিকা আয়েশার মুখটা ভেসে ওঠে চোখের পর্দায়। দুই দিন আগেও তিনি তাঁকে দেখেছেন আবু বকরের বাড়িতে। ছোট্ট এইটুকুন মেয়ে, বান্ধবীদের সঙ্গে পুতুল খেলছিল। সারা দিন হইচই, ছোটাছুটি করে বেড়ায়। তার মা উম্মে রুমান তো মেয়েকে ঘরেই রাখতে পারেন না। এই নাবালিকা কীভাবে তাঁর স্ত্রী হবে? আবার সে তার ভালোবাসা দিয়ে ভুলিয়ে দেবে খাদিজার বিরহব্যথা! এই বয়সী একটা মেয়ে ভালোবাসারই-বা কী বুঝবে!

হে আল্লাহ, তুমি তোমার ভালোবাসার অদৃশ্য রহস্যে সামলে নাও সবকিছু!

তৃতীয় রাতে আবার সে একই স্বপ্ন। একই ফেরেশতা নিয়ে এলেন তাঁর আর আয়েশার বিয়ের পয়গাম। তাঁকে আবারও দেখালেন তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের জীবনসাথিকে। তাঁর ভালোবাসার মর্মমূলে প্রোথিত করার মুখচ্ছবি।

আজ আর রাসুলের মনে দ্বিধা নেই। তাঁর হৃদয়ে সৃষ্টিগত কোনো শঙ্কা নেই। তিনি বুক পেতে দিলেন, 'এ ফয়সালা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে, তাহলে আমি সাদরে গ্রহণ করে নিলাম এ পয়গামের নজরানা।'

এ আনন্দ সংবাদ ধরিত্রীর বুকে বেজে ওঠার পর–

রাতের আকাশের তারারা মুহূর্তে যেন তাদের কক্ষপথ ভুলে ছোটাছুটি করতে লাগল মহাকাশময়। আরবের মরুতে বেজে উঠল সাইমুম-সানাই! বৃক্ষ আর পাখিরা সঙ্গোপনে কানাকানি করল–খুব শিগগির পৃথিবীতে দেখতে পাব ভালোবাসার এক অমর প্রেমকাহিনি। যে প্রেমকাহিনি শত-সহস্র বছর ধরে পৃথিবীর বুকে আগত প্রতিটি মানুষকে শেখাবে ভালোবাসার প্রথম ও শেষ সবক। যে প্রেমের উপমা দিয়ে রচিত হবে অনাগত লাখো বর-বধূয়ার প্রেমজীবন। যে মহব্বতের দাস্তান থেকে রচিত হবে ইশকের ইশতেহার–

ভালোবাসো তোমার হৃদয়েশ্বর স্বামীকে এইভাবে, যেভাবে প্রিয়তমা আয়েশা অন্তরের তড়প দিয়ে উষ্ণতা দিয়ে গেছেন মুহাম্মদকে...।

ভালোবাসো তোমার দিলরুবা স্ত্রীকে এইভাবে, যেভাবে রাসুল মুহাম্মদ ভালোবেসে গেছেন তাঁর প্রিয়তমা আয়েশাকে...।

www.pathagar.com

পৃথিবী সেদিন থেকে সে প্রেমকাহিনিরই অপেক্ষা করতে লাগল প্রতি লহমায়।

তিন রজনী স্বপ্নে দেখা, তোমার আমার
ঘুমিয়েছিলাম ক্লান্ত নিশির পেখম তলে
এক সে এল স্বর্গদূত, স্বপন মাঝার
রেশমি রুমাল দুলিয়ে গেল চোখ সম্মুখে
বলল হেসে, এই দেখে নাও প্রেয়সী তোমার
রেশম মাঝে রেশমপ্রেমে তোমার কোমল ছবি আঁকা
সেই তো হলো তোমার আমার দিল পরিচয়, প্রেম পরিণয়
রব কা শুকরানা

দুই

কয়েক দিন গত হলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কাউকে কিছু বললেন না। স্বাভাবিক নিয়মেই দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। বুকে চেপে রাখা বোবাকান্না নিয়ে সামলে নিচ্ছেন ঘর-সংসার। স্বপ্নে দেখা সে বধূবেশী আয়েশার কথা নিজের মনে লুকিয়ে রাখলেন। আল্লাহ নিজেই যদি এ বিয়ের ব্যাপারে ফয়সালা করে থাকেন, তবে তিনিই এর ব্যবস্থা করে দেবেন। এ মুহূর্তে রাসুলের আগ বাড়িয়ে কিছু করার মানসিকতা নেই, আর তিনি তা করতে চাচ্ছেনও না।

ছোট্ট আয়েশা বাড়ির আঙিনায় খেলছিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর আরও কয়েকজন সখী। সবার হাতেই একটা দুটো পুতুল। কোনোটা কাপড়ের, কোনোটা মাটির, কোনোটা-বা কাঠের তৈরি। আয়েশার হাতেও একটি কাঠের তৈরি ঘোড়ার পুতুল ছিল। তিনি নিবিষ্টমনে কাঠের পুতুলটি নিয়ে টগবগ টগবগ খেলছিলেন।

এমন সময় বাড়ির দহলিজে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এলেন। তিনি প্রতিদিন দু-একবারের জন্য বন্ধু আবু বকরের বাড়িতে আসেন। এটা তাঁর চিরাচরিত নিয়ম। বিশেষ করে, খাদিজা মারা যাওয়ার পর রাসুল আরও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। এ কারণে অনেকটা সময় কাটান আবু বকরের সঙ্গে। আবু বকর রাসুলকে সমাদর করতে কখনো কসুর করেন না। তিনি তাঁর পরমপ্রিয় বন্ধুই কেবল নন, তিনি তাঁর মুর্শিদও। যুগ যুগ ধরে একে অন্যের হৃদয়ের সবচেয়ে কাছাকাছি বসবাস করেন দুজন।

www.pathagar.com

রাসুল বাড়ির আঙিনায় এসেই দেখলেন আয়েশা তাঁর বান্ধবীদের নিয়ে খলবল করে পুতুল খেলছেন। কোনো দিকে তাঁর কোনো মনোযোগ নেই। একমাত্র মনোযোগ পুতুলের দিকে। তাঁকে এভাবে খেলতে দেখে রাসুলের মনে খানিকটা কৌতূহল হলো। তিনি এগিয়ে এলেন ছোট্ট আয়েশার দিকে।

তাঁর কাছে এসে বললেন, 'কী করো আয়েশা? তোমার হাতে ওটা কী?'

আয়েশা তো আয়েশাই, শিশুর মতোই তাঁর উত্তর, 'এটা তো ঘোড়া।'

রাসুল অবাক হওয়ার ভান করে বললেন, 'আচ্ছা, কিন্তু তোমার ঘোড়ার যে পাখা আছে দেখছি। ঘোড়ার পাখা হয় বুঝি?'

আয়েশাও ছেড়ে কথা বললেন না। বুদ্ধিমতী আর প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছয় বছর বয়সী আয়েশা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'কেন থাকবে না? আল্লাহর নবি সুলায়মান (আ.)-এর ঘোড়ার তো পাখা ছিল!'

তাঁর এমন জবাব শুনে রাসুল দারুণভাবে হেসে উঠলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা পরবর্তী সময়ে বর্ণনা করেন, 'সেদিন আমার কথায় রাসুল এমনভাবে হাসছিলেন যে, আমি তাঁর মুখের উজ্জ্বল মাড়ি পর্যন্ত দেখতে পেয়েছিলাম।'

রাসুল আয়েশার দুরন্ত মেধা আর প্রখর স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে আগে থেকেই জানতেন। কিন্তু আজকের ঘটনাটি যেন তাঁর মনে নতুন করে দাগ কেটে গেল। তিনি আয়েশার দিকে তাকিয়ে ভাবলেন—এ কারণেই কি আল্লাহ এই মেয়েকে আমার সহধর্মিণী হিসেবে নির্বাচন করেছেন? তাঁর প্রতিভা আর স্মৃতিশক্তির মাঝেই কি নিহিত আছে আমার উম্মতের ভবিষ্যৎ কোনো অন্তর্নিহিত সফলতা?

বস্তুত পরবর্তী জীবনে সেটাই হয়েছিল। সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাতজন সাহাবির মধ্যে হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা অন্যতম। তিনি এককভাবে প্রায় ২ হাজার ২১০টি হাদিস বর্ণনা করেন।

রাসুলের ইন্তেকালের পর তিনি যখন কোনো মাসআলার ব্যাপারে মতামত পেশ করতেন, তখন সমগ্র মুসলিম সালতানাতে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস কেউ পেত না। হজরত আবু হুরায়রা, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, আবু সায়িদ খুদরি, আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতো বিজ্ঞ সাহাবিগণও তাঁর রায়কে বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতেন। তাঁর অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কাছে সকলেই ছিলেন নতজানু। একজন উম্মুল মুমিনিন হওয়ার পাশাপাশি তিনি হয়ে উঠেছিলেন সে সময়কার সবচেয়ে বিজ্ঞ ধর্মবেত্তা।

www.pathagar.com

তিন

খাওলা বিনতে হাকিমের কথা আগেই জানানো হয়েছে। প্রখ্যাত সাহাবি উসমান ইবনে মাজউনের স্ত্রী। স্বামী-স্ত্রী দুজনই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ইসলাম আগমনের প্রাথমিক সময়ে। খাদিজার অন্তরঙ্গ বান্ধবী ছিলেন তিনি। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা মারা যাওয়ার পর রাসুলের জন্য সাওদা ও আয়েশার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন তিনি এবং সাওদার সঙ্গে রাসুলের পরিণয়সূত্রের মালা গাঁথতে সক্ষম হন।

তবে সাওদার সঙ্গে রাসুলের পরিণয়ের পরও খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেমে থাকলেন না, তিনি তাঁর দ্বিতীয় কার্যক্রম শুরু করলেন। রাসুলের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তিনি চলে গেলেন সোজা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে। আবু বকর বাড়িতে ছিলেন না। অগত্যা তিনি আবু বকরের স্ত্রী উম্মে রুমানের সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন।

খাওলা বললেন, 'উম্মে রুমান! আল্লাহ তোমার ঘরে প্রশান্তি ও বরকতের বার্তা বয়ে আনুক।'

উম্মে রুমান খাওলার কথার মর্ম বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, কিসের ব্যাপারে বলছেন?'

খাওলা বললেন, 'আল্লাহর রাসুল আয়েশার ব্যাপারে বিয়ের পয়গাম দিয়ে পাঠিয়েছেন আমায়।'

এ কথা শুনে উম্মে রুমান আনন্দে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। আবু বকর বাড়ি ছিলেন না বিধায় তিনি বললেন, 'তিনি বাড়িতে এলেই এ ব্যাপারে কথা বলব।'

দুজনের কথা চলতে লাগল। খাওলা থাকতে থাকতেই আবু বকর বাড়িতে চলে এলেন। খাওলা আবু বকরকে দেখে রাসুলের প্রস্তাব তাঁর সামনে পেশ করে বললেন, 'আবু বকর! আল্লাহ আপনার ঘরে নিয়ে এসেছেন বরকত ও সৌভাগ্যের পরশমণি। আল্লাহর রাসুল আপনার মেয়ে আয়েশার জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।'

খাওলার প্রস্তাব শোনার পর আবু বকর খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তিনি অনেক দিন থেকেই রাসুলের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইছিলেন, কিন্তু কোনোদিন মুখ ফুটে বলতে পারেননি। আজ খোদ রাসুলই তাঁর কাছে আত্মীয়তার পয়গাম পাঠিয়েছেন। এ তো আল্লাহরই ইশারা!

আবু বকর এ প্রস্তাব শুনে প্রথমে আনন্দ প্রকাশ করলেও পরক্ষণেই তাঁর মনের কোণে মেঘ জমে ওঠে। তাঁর মনে গভীর চিন্তা রেখাপাত করে যায়। তিনি খাওলার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কিন্তু এ বিয়ে কীভাবে হতে পারে? আল্লাহর

www.pathagar.com

রাসুল তো আমার ভাই, সে অর্থে আয়েশা তাঁর ভাতিজি। ভাতিজির সঙ্গে বিয়ে তো আমাদের সমাজে সিদ্ধ নয়।'

এ কথা শুনে খাওলা এবং উম্মে রুমান দুজনই খানিকটা চুপসে গেলেন। আসলেই তো, ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে তো বিয়ে হতে পারে না।

আবু বকরের এমন প্রশ্ন শুনে খাওলা আবু বকরকে বলেন, 'আমি এখনই রাসুলের কাছে গিয়ে বিষয়টি জানাচ্ছি তাঁকে। দেখি তিনি কী বলেন এ ব্যাপারে।'

খাওলা রাসুলের কাছে এসে বিষয়টি খোলাসা করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম খাওলার কথা শুনে মুচকি হেসে বলে দেন, 'আবু বকর আমার ধর্মীয় ভাই, রক্ত-সম্পর্কীয় বা আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ভাই নয়। এমন ভাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করাতে আমাদের ধর্মে কোনো সমস্যা নেই।'

এই নির্দেশনা ইসলামের এক বিপ্লবী পদক্ষেপ। আরবে যেসব কুসংস্কার এবং মূর্খতার রসম-রেওয়াজ প্রচলিত ছিল, ইসলাম এভাবেই একের পর এক সেগুলোর মূলোৎপাটন করেছিল। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজে ছিলেন এই বিপ্লবের মহানায়ক। নিজে করে সমগ্র উম্মতের সামনে সংস্কারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

রাসুলের অভয়বাণী শুনে খাওলা আনন্দচিত্তে আবু বকরের বাড়িতে ফিরে এলেন। আবু বকর খাওলার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি এসে হাসিমুখে আল্লাহর রাসুলের নির্দেশনা শোনালেন তাঁকে। আবু বকর এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলেও তাঁর মুখটা এখনো কেন যেন অন্ধকার হয়ে আছে। মনে কোনো দুশ্চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। তিনি খাওলার সামনে সহজ, স্বাভাবিক হতে পারছেন না।

খাওলা বিষয়টি ধরতে পারলেন। তিনি আবু বকরকে কিছু বলতে যাবেন এমন সময় আবু বকর কথা বলে উঠলেন, 'আপনি একটু বসুন, আমি এখনই একটা কাজ সেরে আসছি।'

এ কথা বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। খাওলা উম্মে রুমানের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। উম্মে রুমান ঘটনা খুলে বললেন, 'বেশ কিছুদিন আগে মুতইম ইবনে আদি তাঁর ছেলে জুবায়ের ইবনে মুতইমের জন্য আয়েশাকে নিজের পুত্রবধূ করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। আবু বকর তাঁর সে প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। আর আপনি তো জানেনেই, আবু বকর একবার যাঁকে কথা দেন, সে কথার বরখেলাপ কখনো করেন না। এখন তিনি সে বিষয়ে কথা বলতেই মুতইম ইবনে আদির বাড়িতে গেছেন।'

www.pathagar.com

আরবে তখন প্রচলন ছিল, নাবালেগ কোনো মেয়ে বা ছেলের অভিভাবক যদি পরস্পরের সন্তানদের বিয়ের ব্যাপারে কথা পাকা করে ফেলে, তবে সেটা বিয়ের বাগদান হিসেবে গণ্য হতো। সে হিসেবে আয়েশার বাগদান জুবায়ের ইবনে মুতইমের সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে আবু বকর জলদি মুতইম ইবনে আদির কাছে চলে যান পূর্বে সম্পাদিত বাগদানের ব্যাপারে কথা বলতে।

মুতইম ইবনে আদি বাড়িতেই ছিলেন। আবু বকরকে আসতে দেখে তাঁর স্ত্রী উম্মে ফাতাও এসে ঘরের বারান্দায় বসলেন। আবু বকর কোনো ভূমিকা ছাড়াই মুতইমকে বললেন, 'আয়েশাকে যে তোমার পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলেছিলে, সে ব্যাপারে এখন তোমার কী মত?'

আবু বকরের কথা শুনে স্বামী-স্ত্রী দুজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। মুতইম চুপ থাকলেও মুতইমের স্ত্রী উম্মে ফাতা কথা বলে উঠলেন, 'ইবনে কুহাফা! এখন আমরা তোমার মেয়েকে আমাদের ছেলের বউ করে আনতে পারব না। তুমি আর তোমার মেয়ে তো ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করেছ। সে আমাদের ঘরে এলে আমাদের ছেলেকেও মুসলিম বানিয়ে ফেলবে। সেটা আমি কখনো হতে দিতে পারি না।'

আবু বকর এ মহিলার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে মুতইমের দিকে তাকালেন। কেননা বিবাহ বিষয়ে তাঁর কথা হয়েছিল মুতইমের সঙ্গে। তিনি মুতইমকে বললেন, 'স্ত্রীর কথা বাদ দাও, এ ব্যাপারে তোমার কী বলার আছে?'

মুতইম ইবনে আদি বললেন, 'যা বলার তা তো তুমি শুনলেই।'

মুতইম ইবনে আদি হয়তো ভেবেছিলেন তাঁদের অস্বীকৃতি শুনে আবু বকর নিদারুণ কষ্ট পাবেন, ব্যথাতুর মন নিয়ে ফিরে যাবেন। কিন্তু তাঁরা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেননি, তাঁদের না-সূচক জবাব শুনে আবু বকরের মনের মধ্যে কেমন আনন্দের ফল্গুধারা বইছে। খুশিতে তাঁর হৃদয়টা যেন আকাশের সমান বড় হয়ে গেছে। তিনি সেখানে আর দেরি করলেন না এক মুহূর্ত, মুতইমের জবাব শুনে বাড়ির পথ ধরলেন।

যে বিয়ের সানাই বেজেছে লওহে মাহফুজে, যে বর-বধূর বাগদানে খোশকিসমতির গীতবিতান খুলে বসেছেন আরশের ফেরেশতারা–সে বিয়েতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, এমন সাধ্য কার? এ তো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রিয় বন্ধুর জন্য এক অনন্য উপহার। অনাগত পৃথিবীর মানুষের জন্য ভালোবাসার এক অমর উপাখ্যান।

www.pathagar.com

খাওলা তখনো অপেক্ষা করছিলেন আবু বকরের জন্য। আবু বকরের আনন্দিত মুখ দেখে কিছু একটা আঁচ করে ফেললেন। আবু বকর এসে তাঁকে বললেন, 'আপনি দয়া করে আল্লাহর রাসুলকে এখনই নিয়ে আসুন এখানে।'

চার

ছোট্ট আয়েশা তখন সখীদের সঙ্গে কোথায় যেন খেলছিলেন। তাঁকে ডাকতে তাঁর দুধমা ওয়াইলা এদিক-সেদিক খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁকে প্রতিবেশী এক বাড়ির পেছনে সখীদের সঙ্গে খেলায় মত্ত পাওয়া গেল। ওয়াইলা সেখান থেকেই তাঁকে তুলে আনলেন। বাড়িতে এনে তাঁর হাত-পা সাফসুতরো করে ধুয়ে দিলেন। চুলগুলো বেঁধে দিলেন। এরপর নিয়ে যাওয়া হলো বাগদান অনুষ্ঠানে।

অনুষ্ঠান বলতে অনুষ্ঠান, মূলত সে ঘরোয়া বাগদানে খাওলা, উম্মে রুমান, আবু বকরসহ দু-তিনজন সাহাবি এবং আল্লাহর রাসুল ছাড়া আর তেমন কেউ ছিলেন না। আবু বকর নিজেই মেয়ের বিয়ের বাগদানে সংক্ষিপ্ত একটু খুতবা পাঠ করে তাঁকে রাসুলের বাগদত্তা হিসেবে বরণ করে নিলেন। বাগদানে কনের জন্য মোহর নির্ধারণ করা হলো ৫০০ দিরহাম।

ব্যস এটুকুই! বাগদানের কোনো হল্লা নেই, কোনো আড়ম্বরতা নেই। একদম সাদাসিধেভাবে হয়ে গেল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের বিবাহপূর্ব অনুষ্ঠান।

এটা নবুওয়াতের দশম বছরের রমজান বা শাওয়াল মাসের ঘটনা।

বিয়ের পর মক্কায় এ বর-বধূর জীবন নিজেদের মতোই চলতে লাগল। আল্লাহর রাসুল ইসলামের দাওয়াত নিয়ে ফিরছেন মানুষের দ্বারে দ্বারে, সাহাবিদের দুর্দশায় তাঁদের পাশে থাকছেন, সমাজের বঞ্চিত মানুষের সাহায্যার্থে এগিয়ে যাচ্ছেন। ওদিকে ইয়াসরিব থেকে প্রতিনিধিদল আসছে, তাদের সঙ্গে গোপনে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা চলছে। আবার নিজের সংসারের দেখভাল করছেন।

আর এদিকে আয়েশা আছেন তাঁর খেলাধুলায় মগ্ন। কিসের বিয়ে আর কিসের বাগদান, ওসব তো তাঁর মনেই নেই। সারা দিন সখীদের সঙ্গে মক্কার অলিগলিতে পুতুলখেলার রচনা সাজিয়ে বসেন। এমন মেয়েকে রুখতে উম্মে রুমানের হিমশিম খেতে হয় প্রতিদিন।

www.pathagar.com

এত দিন যা হওয়ার হয়েছে, কিন্তু এখন তো সে আল্লাহর রাসুলের বাগদত্তা স্ত্রী। তাকে অনেক কিছু জানতে হবে, অনেক কিছু শিখতে হবে। ঘর-সংসার, আদবকেতা, বিধিনিষেধগুলো বুঝতে হবে। এগুলো না বুঝলে রাসুলের সংসার কীভাবে সামলাবে সে? মেয়েকে নিয়ে উম্মে রুমানের চিন্তার যেন শেষ নেই। উম্মে রুমান তাই মাঝেমধ্যে জোর করে তাকে ঘরে আটকে রাখেন, বাইরে বেরোতে দেন না।

এমনই একদিন। সম্ভবত একটু বেশিই বকেছিলেন সেদিন। মায়ের বকা খেয়ে আয়েশা গাল ফুলিয়ে ঘরের দরজার কপাট ধরে কাঁদছিলেন। এমন সময় বাড়ির দহলিজে প্রবেশ করেন আল্লাহর রাসুল। আয়েশাকে কাঁদতে দেখে রাসুলের মনটা খারাপ হয়ে গেল। এইটুকুন মেয়েকে উম্মে রুমান কেন যে বকতে যায়! তিনি আগেও উম্মে রুমানকে বলে দিয়েছেন—অন্তত আমার খাতিরে হলেও ওকে বকো না। ওকে ওর মতো থাকতে দাও।

আজ আয়েশাকে কাঁদতে দেখে তিনি উম্মে রুমানকে বললেন, 'তুমি আমার কথাটা রাখলে না, উম্মে রুমান।'

রাসুলের এমন কথায় দারুণ বিব্রত বোধ করলেন উম্মে রুমান। তিনি সলাজ মুখ লুকিয়ে বললেন, 'কী করব হে আল্লাহর রাসুল! তাকে একটু শাসন করলেই সে আমার নামে তার বাপের কাছে নালিশ করে।'

রাসুল বললেন, 'যা-ই করুক, ওকে আর বকো না তুমি।'

ছোট্ট বধূয়ার জন্য এমনই ছিল রাসুলের উদারতা, তাঁর প্রেম।

পাঁচ

মক্কার মূর্তিপূজক কুরাইশদের অত্যাচার আর কত দিন সহ্য করা যায়? এক দিন নয়, দুই দিন নয়; দুই বছর নয়, পাঁচ বছর নয়—একে একে নবুওয়াতের ১২টি বছর কেটে গেছে। ১২ বছর ধরে ইসলামের ভ্রাতৃত্বের বাণী বারবার ডাক দিয়ে গেছে মক্কার মানুষদের। আল্লাহর রাসুল ইনসাফ ও সাম্যের সংবিধান ঘোষণা করেছেন কাবাচত্বরে দাঁড়িয়ে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ কেবল ইসলামের পরশপাথরে নিজেদের গড়েছেন সৌভাগ্যশীল পরশমণিরূপে।

কিন্তু তাঁদেরও নিস্তার নেই। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে তাঁদের ওপর চলছে অকথ্য নির্যাতন, অত্যাচার, অপমান, অসম্মান। ঘরে-বাইরে, রাস্তায়, বাজারে, হজের লোকসমাগমে সবার সামনে তাঁদের হেনস্থা

www.pathagar.com

করা হয়। একটু দুর্বল কোনো মুসলমানকে পেলেই তাঁর ওপর নেমে আসে অত্যাচারের পাষণ্ড চাবুক।

কখনো বেলালকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর ওপর ফেলে রাখা হয়, আর তাঁর হৃদয় থেকে উচ্চারিত হয় 'আহাদ' 'আহাদ' ধ্বনি।

কখনো খাব্বাবকে কয়লার আগুনে ছুড়ে মারা হয়, তাঁর রক্ত-মাংস, অস্থি-মজ্জা গলে গলে কয়লার ধিকি ধিকি আগুন নিভে যায়। তবু তাঁর হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়–রাসুল মুহাম্মদ সত্য! ইসলাম সত্য! এক আল্লাহ সত্য।

কখনো ইয়াসির আর সুমাইয়া দম্পতিকে শেকল দিয়ে বেঁধে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করা হয় তাঁদের শরীর। তারপর তীক্ষ্ণ ধারালো বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তবু তাঁরা মৃত্যুর মঞ্চে দাঁড়িয়ে গেয়ে যান–আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়।

এমন অসংখ্য নির্যাতনে যখন মুসলিমদের জীবন সংকটাপন্ন, তখন রাসুলের পরামর্শে সাহাবিরা পার্শ্ববর্তী দেশ ইথিওপিয়ায় হিজরত শুরু করলেন। কিন্তু সেখানেও বেশি দিন থাকা গেল না মক্কার মুশরিকদের চক্রান্তে। কুরাইশিদের চক্রান্তের ফলে অনেককে ফিরে আসতে হলো মক্কায়। তবে এবার আশার আলো ফুটল।

ইয়াসরিবের (মদিনা) কিছু লোক আল্লাহর নবিকে আহ্বান করলেন তাঁদের লোকালয়ে গিয়ে বসবাস করতে। তাঁরা সেখানে নবি ও তাঁর সাহাবিদের পূর্ণ নিরাপত্তা দেবেন এবং তাঁরাও ইসলামের দীক্ষায় দীক্ষিত হবেন।

ইয়াসরিববাসীর সঙ্গে গোপনে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের নির্দেশ দিলেন, দু-একজন করে মদিনায় চলে যেতে। যেতে হবে গোপনে, যাতে করে মক্কার কাফেররা জানতে না পারে।

কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হলো না। মক্কার মূর্তিপূজক কাফেররা জেনে গেল মুসলিমদের মক্কাত্যাগের অভিপ্রায় ও প্রচেষ্টা। তারা তাঁদের দমিয়ে রাখতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করল। অনেককে হত্যার হুমকি দিল, কাউকে হিজরতের সময় পথ থেকে ধরে নিয়ে আসা হলো, কাউকে ঘর থেকে বের হতেই দিল না, কারও সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কাউকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হলো। তবু গোপনে গোপনে অনেক সাহাবি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে চলে গেলেন।

রাসুলও মদিনায় চলে যাওয়ার মনস্থির করে ফেলেছেন। যেকোনো দিন তিনিও রওনা হবেন নতুন শহর ইয়াসরিবের দিকে। শুধু আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা। যেদিন নির্দেশ আসবে, সেদিনই রওনা হয়ে যাবেন মদিনার পথে।

www.pathagar.com

একদিন দুপুরবেলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবু বকরের বাড়িতে এলেন। সাহাবিরা মদিনায় হিজরত শুরু করার পর থেকে রাসুল প্রায় প্রতিদিনই সকাল বা সন্ধ্যায় একবার করে আবু বকরের বাড়িতে আসতেন। কখনো দিনে দুবারও আসতেন। মদিনায় মুসলমানদের হিজরত এবং সেখানে তাঁদের কর্মপরিকল্পনা কী হবে, মদিনার আউস এবং খাজরাজ গোত্র তাঁদের সঙ্গে কেমন আচরণ করবে, কীভাবে সামলে নেবেন নতুন স্থানের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা—এসব বিষয় নিয়ে আলাপ করতেন দুজনে।

কিন্তু আজ দুপুরের আগমনটা অন্য রকম। তিনি সাধারণত এ সময়টাতে আসেন না। দুপুরে মক্কার লোকেরা বিশ্রাম নেয় অথবা ঘরোয়া কার্যাদি সারে। এ সময় কেউ কারও বাড়িতে যায় না। রাসুল অন্যের অধিকার এবং ব্যক্তিগত বিষয়ের প্রতি সব সময় খেয়াল রাখতেন। আজ আবার কী কারণে যেন রাসুল তাঁর মুখটা চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। এই ভরদুপুরে রাসুল কেন চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে আসবেন? তিনি তো কখনো এভাবে মুখ ঢেকে রাখেন না! আজ কি তবে বিশেষ কোনো কারণ ঘটল?

আবু বকরের দুই কন্যা আয়েশা ও আসমা বাবার কাছে বসে ছিলেন। বাড়িতে আবু বকর ও তাঁর দুই কন্যা ছাড়া আর কেউ ছিল না। রাসুলকে এমন সময় তাঁর বাড়ির দিকে আসতে দেখে আবু বকর সচকিত হয়ে বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটেছে। নয়তো অসময়ে রাসুলের আসার কথা নয়।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘরের বাইরে থেকে সালাম দিয়ে ঘরে ঢোকার অনুমতি চাইলেন। আবু বকর রাসুলকে ভেতরে আসতে বলে খাটের একদিকে সরে বসলেন যাতে রাসুল বসতে পারেন। আয়েশা ও আসমা রাসুলকে ভেতরে আসতে দেখে ঘরের একদিকে সরে গেলেন। আল্লাহর রাসুল ঘরে ঢুকে কারও দিকে না তাকিয়ে সন্তর্পণে আবু বকরের পাশে বসলেন। তিনি বুঝতে পারলেন ঘরে আবু বকর ছাড়াও অন্য কেউ আছে। তবে তারা যে আয়েশা ও আসমা, এটা তিনি খেয়াল করেননি।

রাসুলের মুখ চাদরাবৃত এবং সম্ভবত তিনি কিছুটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন। কেননা একটু আগেই আল্লাহর তরফ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক প্রত্যাদেশ পেয়েছেন তিনি। প্রত্যাদেশ পাওয়ার পর সরাসরি আবু বকরের কাছে চলে এসেছেন। কিন্তু এ আদেশ অত্যন্ত গোপনীয় এবং দ্রুত কার্যকর করতে হবে। তাই তিনি আবু বকরকে বললেন, 'ঘরে কেউ থেকে থাকলে তাদের বাইরে যেতে বলো।'

www.pathagar.com

আবু বকর হয়রান হয়ে রাসুলকে অভয় দিতে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনার জন্য আমার মা-বাবা উৎসর্গিত হোক! এখানে তো আমার মেয়েরা ছাড়া আর কেউ নেই। তারা তো আপনারই পরিবার।'

এবার আল্লাহর রাসুল শান্ত হয়ে বললেন, 'আমাকে মক্কা থেকে হিজরত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।'

আবু বকর এ কথা শোনার পর জিজ্ঞেস করলেন না কখন-কীভাবে যেতে হবে। বরং সবার আগে ব্যগ্রকণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'আমি কি আপনার সঙ্গী হতে পারব, হে আল্লাহর রাসুল?'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, তুমিও আমার সঙ্গী হবে।'

হিজরতের সঙ্গিন সময়ে রাসুলের সঙ্গী হতে পারার আনন্দে, রাসুলকে সকল বিপৎসংকুল পরিস্থিতিতে সঙ্গ দেওয়ার সৌভাগ্যসাথি হওয়ার খুশিতে আবু বকর শিশুর মতো কেঁদে ফেললেন।

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বহুদিন পর যখন হিজরতের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন অন্যদের কাছে, তখন বলেন, 'মানুষ যে আনন্দের আতিশয্যে কাঁদতে পারে, আমার পিতা আবু বকরের কান্না দেখে সেদিনই প্রথম জেনেছিলাম আমি।'

আবু বকর চোখ মুছতে মুছতে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনার জন্য আমার মা-বাবা উৎসর্গিত হোক! আপনি যেদিন মদিনায় হিজরতের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, সেদিন থেকে আমি দুটো উট কিনে প্রতিপালন করছি।'

রাসুল আবু বকরের বন্ধুত্বের কথা কোনো দিন ভোলেননি। তিনি যে সিদ্দিক! মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি স্মরণ করে গেছেন আবু বকরের বন্ধুত্বের ভালোবাসা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সারা দিন আবু বকরের বাড়িতে বসে রাত নামার অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে সফরের প্রস্তুতির ব্যাপার আছে। কৌশলী আবু বকর সব দিক সামলে পরিকল্পনা সাজাতে লাগলেন।

দিনের বাকি সময়টাতে যাত্রার প্রস্তুতি চলল। প্রস্তুতি শুধু সফরের সামানাপত্রের নয়, মূল প্রস্তুতি ছিল সঠিক পরিকল্পনার। মক্কা থেকে পালিয়ে মদিনায় যাওয়াটা মোটেও সহজসাধ্য ছিল না। চারদিকে কাফেররা ওত পেতে আছে। সর্বোপরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম গোপনসূত্রে জানতে পেরেছেন, আজ রাতে তাঁকে হত্যা করার জন্য আবু জেহেলসহ অন্য কুরাইশনেতারা কুরাইশদের মন্ত্রণাগৃহ 'দারুন নাদওয়া'য় মিলিত হয়েছে। রাতের

www.pathagar.com

আঁধারে তারা মুহাম্মদকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র প্রায় পাকা করে ফেলেছে। এ জন্য সব গোত্র থেকে একজন করে হত্যাকারী নির্বাচন করা হয়েছে। যেকোনো সময় তারা হামলা করবে রাসুলের বাড়িতে।

এসব শঙ্কার কারণে পালানোর জন্য প্রয়োজন ছিল চুলচেরা পরিকল্পনা। রাসুল তাঁর বাড়িতে প্রতিপালিত হওয়া চাচাতো ভাই আলিকে ডেকে আনলেন আবু বকরের বাড়িতে। তাঁকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজের ভার দিয়ে যাচ্ছেন। রাসুলের সততা ও বিশ্বস্ততার কথা জানা ছিল মক্কার সবার। এ কারণে কাফের-মুশরিকরাও তাদের অনেক মূল্যবান সম্পদ তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখত। যেহেতু তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে আজ রাতেই চলে যাচ্ছেন মক্কা ছেড়ে, তাই সে সম্পদের দায়িত্ব আলিকে বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। যাতে করে তিনি আরও কয়েক দিন মক্কায় অবস্থান করে সকলের সম্পদ সঠিকভাবে ফিরিয়ে দিতে পারেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকিতকে সংবাদ পাঠানো হলো। আবু বকর দুটো উট কিনে তাঁর কাছে পরিচর্যার জন্য রেখেছিলেন। তাঁকে জানিয়ে দিলেন, তিনি যেন উট দুটোকে আগামী দুই দিন সফরের জন্য প্রস্তুত করেন। তিন দিন পর নির্দিষ্ট সময়ে উট দুটো নিয়ে মক্কার পেছনে নিম্নভূমির নির্দিষ্ট স্থান 'সাওর' পর্বতের পাদদেশে চলে আসেন। পরিস্থিতি শান্ত হলে সেখান থেকেই তাঁরা মদিনার পথে রওনা হবেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকিতকে তাঁর যাবতীয় বকেয়া পরিশোধ করে দেওয়া হলো। তিনি একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক ছিলেন। মদিনার পথ সম্পর্কে তাঁর ভালো ধারণা ছিল। তিনিই রাসুল ও আবু বকরকে পথ দেখিয়ে মদিনায় নিয়ে যাবেন। তিনি যদিও বিধর্মী ছিলেন, কিন্তু আবু বকরের প্রতি ছিলেন একান্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত।

পরিকল্পনামাফিক আবু বকরের ছেলে আবদুল্লাহকে ডাকা হলো। তাঁকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হলো–তাঁরা মক্কা থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর সে সারা দিন মক্কার কুরাইশনেতাদের আশপাশে ঘোরাঘুরি করবে। তারা রাসুলকে নিয়ে কী বলে সেগুলো শুনবে এবং সন্ধেবেলা সাওর পর্বতের গুহায় গিয়ে তাঁদের জানাবে। সেই সঙ্গে আবু বকরের অবর্তমানে পরিবারের দেখভালের দায়িত্বও দেওয়া হলো তাঁকে।

এরপর ডাকা হলো আবু বকরের মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস আমের ইবনে ফুহাইরাকে। তাঁকে দাসত্বের জিঞ্জির থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন আবু বকর।

www.pathagar.com

পরবর্তী সময়ে তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আবু বকরের কাজ করে দিতেন। তাঁকে বলা হলো, তিনি যেন তাঁর বকরির পাল সারা দিন সাওর পর্বতের আশপাশে চরিয়ে বেড়ান। মক্কা থেকে কাউকে আসতে দেখলে নির্দিষ্ট সংকেতের মাধ্যমে গুহায় অন্তরীণ রাসুল ও আবু বকরকে সতর্ক করে দেবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। একই সঙ্গে তাঁর বকরির পাল থেকে যেন তাঁরা পর্যাপ্ত দুধ দোহন করতে পারেন তৃষ্ণা নিবারণের জন্য, সেদিকটাতে খেয়াল রাখতে হবে।

আসমাকেও দায়িত্ব দেওয়া হলো। আসমা যদিও ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, তবু রাসুল ও পিতার এমন দুঃসময়ে তিনি সাহসিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। তাঁকে বলা হলো–তিনি যেন প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে খাবার প্রস্তুত করে আবদুল্লাহর সঙ্গে সাওর পর্বতের গুহায় নিয়ে যান।

রাত ঘনিয়ে এল মক্কা পল্লিতে। রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম চোখের জলে সিক্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন। ইসলামকে দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার যে মহান ব্রত দিয়ে তিনি নবিকে পাঠিয়েছিলেন মক্কায়, সে মক্কা থেকে আজ তিনি বিতাড়িত। যে দীনের জন্য তিনি নির্বাচন করেছিলেন মক্কার আলো-বাতাসকে, সেই মক্কা ইসলামের আলোকরশ্মিকে নিজের বুকে ধারণ করতে পারল না অবশেষে।

ঘরের ভেতরে আয়েশা ও আসমা দুই হিজরতপ্রত্যাশীর জন্য খাবারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় রসদের বন্দোবস্ত করছিলেন। দুজনেরই মন ভারী হয়ে আছে। রাসুল চলে যাচ্ছেন মক্কা ছেড়ে। চলে যাচ্ছেন তাঁদের পিতা আবু বকরও। মক্কায় তাঁরা একপ্রকার নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছেন। মক্কার কাফেরদের আতঙ্কও মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। তাঁদের এমন নিঃস্ব ভেবে কাফেররা কী যে করবে, সে ভবিষ্যৎ কেবল আল্লাহই ভালো জানেন!

আল্লাহর রাসুল ও আবু বকর যাত্রার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম শেষ একবার তাকালেন আয়েশার দিকে। প্রায় তিন বছর আগে স্বপ্নে দেখা রেশমি গিলাফের আড়ালে সেই অমলিন মুখটার সঙ্গে মিলিয়ে নিলেন ক্ষীয়মান চাঁদের আলোয় আলোকিত আয়েশার মুখাবয়ব। পরক্ষণেই মুচকি হেসে ঘরের পেছনের দরজা গলে বেরিয়ে গেলেন আবু বকরের সঙ্গে।

আয়েশার বয়স তখন নয় বছর। হয়তো একটু একটু করে বুঝতে শিখছিলেন রাসুলের প্রেম। হয়তো রাসুলকে দেখলে লজ্জায় রাঙা হয়ে

www.pathagar.com

উঠতেন। হয়তো ভালো লাগার মিহি একটা অনুভূতি কখনো কখনো ছুঁয়ে যেত হৃদয়ের অতলে কোথাও। হয়তো মনের গহিন কোনো কোণে কেবল কুঁড়ি হয়ে ফুটছিল ভালোবাসার নাম না-জানা অচিন কোনো বুনোফুল।

মদিনার যাত্রীরা মক্কা ছেড়ে যাওয়ার আগে বাড়ির সবাইকে ভিন্ন ভিন্ন কাজ দিয়ে গেলেও কিশোরী আয়েশাকে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। সেটা সংগত কারণেই। আয়েশা তখন কেবলই কিশোরীমাত্র। এ বয়সে দায়িত্ব পালন করার মতো শক্তি-সামর্থ্য তাঁর হয়নি।

মুসলমানদের নিয়ে, বিশেষ করে রাসুল ও আবু বকরের ব্যাপারে মক্কার পরিবেশ উত্তপ্ত থাকার দরুন আয়েশার মা উম্মে রুমান তাঁকে বাইরে বেরোতে দিতেন না। এ কারণে মায়ের সঙ্গে তিনি ঘরে বসে গম পিষতেন। কিন্তু বাড়িতে এভাবে একা একা থাকতে তাঁর ভালো লাগত না। তিনি নিজেই পরবর্তী সময়ে বর্ণনা করেন, 'তখনকার একেকটা দিন আমার কাছে একেকটা মাস বা একেকটা বছরের চেয়ে দীর্ঘ মনে হতো।'

আয়েশা সারা দিন মক্কার এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করতেন। বিশেষ করে, কাবার আশপাশে থাকত তাঁর সতর্ক পদচারণ। মক্কার নেতা কে কী বলছে, সেগুলো খুব খেয়াল করে শুনতেন। শুনে বাড়িতে এসে বড় বোন আসমার কাছে বলতেন। আসমা বিকেলবেলা সেসব খবর নিয়ে যেতেন সাওর পর্বতের গুহাবাসীর কাছে।

এরপর আয়েশা অপেক্ষায় থাকতেন রাতের জন্য। কেননা বিকেল হলেই তাঁর বোন আসমা রাসুল ও তাঁর পিতার জন্য খাবার নিয়ে যেতেন। তাঁদের খাবার-দাবার ও মক্কার সংবাদ দিয়ে যখন তিনি বাড়িতে ফিরে আসতেন, তখন আয়েশা আগ্রহভরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইতেন–সেখানের খবর কী? তাঁরা কেমন আছেন? তাঁদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? আসমা তাঁকে বলতেন মদিনার যাত্রীরা কেমন কষ্টে আছেন, কীভাবে রাত-দিন কাটাচ্ছেন গুহার ভেতর, কীভাবে প্রতিকূল পরিবেশেও সয়ে যাচ্ছেন অবর্ণনীয় কষ্ট...।

দ্বিতীয় দিন আসমা গুহা থেকে ফিরে চোখ বড় বড় করে বলতে থাকেন, আজকে কীভাবে একটি কবুতর ও একটি মাকড়সা আল্লাহর রাসুল ও তাঁদের পিতার জীবন বাঁচিয়েছিল কাফেরদের হামলা থেকে। এসব শুনে আয়েশার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠত।

তৃতীয় রাতে আয়েশা অপেক্ষা করছিলেন আসমার জন্য। আসমা আজ আসতে দেরি করছেন। আগের দুই দিন যে সময়ে চলে এসেছিলে, সেই সময়

www.pathagar.com

পার হয়ে গেছে অনেক আগেই। এখনো আসমার দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। ঘরের মধ্যে আয়েশা ছটফট করছেন। কেন এত দেরি হচ্ছে তাঁর? কোনো বিপদ-আপদ ঘটল না তো?

তিনি ঘরে থাকতে পারলেন না, বাইরে বেরিয়ে এসে দেয়ালের পাশে দাঁড়ালেন। রাত আরেকটু গভীর হলো। এমন সময় দূরে আসমার অবয়ব ফুটে উঠল। আয়েশার বুক থেকে যেন ভারী একটা পাথর নেমে গেল।

আসমা এসে খুশির সঙ্গে জানালেন, মদিনার যাত্রীরা গুহা থেকে বেরিয়ে উটে চড়ে মদিনার দিকে রওনা হয়ে গেছেন। তাঁদের সফরের জন্য প্রস্তুত করতে গিয়েই তাঁর এত দেরি হয়েছে। তিনি তাঁদের বিদায় দিয়ে তারপর বাড়ির পথ ধরেছেন।

আসমা আরও জানালেন, খাবার নিয়ে যাওয়ার সময় ভুল করে খাবারের থলের রশি নিয়ে যাওয়া হয়নি। অগত্যা আসমা তাঁর কোমরবন্ধনী খুলে খাবারের পুঁটলি ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বেঁধে দেন। এটা দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আসমাকে বলেছেন, 'তুমি তো জাতুন্নাতাকাইন (দুই কোমর বন্ধনীওয়ালি)।'

কথা বলতে বলতে প্রায় মাঝরাত হয়ে গেছে। এমন সময় আচমকা তাঁদের ঘরের দরজায় কে যেন জোরে কড়া নাড়ল। আসমা দরজা খুললেন। খুলেই দেখেন দরজার বাইরে কুরাইশরা দাঁড়িয়ে। সবার সামনে আবু জেহেল। সে আসমাকে লক্ষ করে হুংকার ছেড়ে বলে উঠল, 'আবু বকরের মেয়ে! তোমার আব্বা কোথায়?'

আসমা সোজাসাপ্টা জবাব দিলেন, 'আব্বা ঘরে নেই। তিনি এ মুহূর্তে কোথায় আছেন, সেটাও আমি জানি না।'

তাঁর কথা শুনে আবু জেহেলের যেন পিত্তি জ্বলে ওঠল। এ পাপিষ্ঠ রাগে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে প্রচণ্ড জোরে আসমার গালে চড় মারল। মারের চোটে আসমা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং তাঁর কানের মাকড়ি পর্যন্ত খুলে গেল। এরপর রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে আবু জেহেল তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে চলে যায়।

আসমা মিথ্যা বলেননি। কেননা তিনি সত্যিই জানেন না এ মুহূর্তে তাঁর পিতা মদিনার পথে ঠিক কোথায় আছেন।

www.pathagar.com

ছয়

উম্মে রুমান বিষণ্ন মনে তাকিয়ে আছেন দূরের পাহাড়সারির দিকে। মরুর বালিয়াড়ি গিয়ে মিশেছে পাহাড়ের পাদদেশে। সেখান থেকে মরু পাহাড়ের সারিগুলো যেন দিগন্তে হারিয়ে গেছে।

প্রতিদিন সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকেন উম্মে রুমান। বড় আশা আর আগ্রহ নিয়ে চেয়ে থাকেন মদিনার পথপানে–এই বুঝি এল আবু বকরের বার্তাবাহক! কেউ হয়তো এখনই চলে আসবে রাসুলের বার্তা নিয়ে। এ নরকপুরি থেকে তাঁদের নিয়ে যাবে ইয়াসরিবে, মদিনাতুন্নবি!

কিন্তু না, কেউ এল না। এক দিন গেল, দুই দিন গেল, হিজরতের পর তিনটি মাস চলে গেল; কেউ এল না মদিনা থেকে। উম্মে রুমান মদিনার পথপানে চেয়ে চেয়ে একা অশ্রুপাত করেন।

ঘরে তাঁর দুটো ছেলে, দু-দুটো মেয়ে। বড় মেয়ে আসমা সন্তানসম্ভবা। প্রসবের দিন ঘনিয়ে আসছে, যেকোনো দিন কিছু একটা ঘটে যেতে পারে।

রাসুলের পুরো পরিবারও রয়ে গেছে মক্কায়। স্ত্রী সাওদা বিনতে জামআ এবং দুই কন্যা–ফাতেমা ও উম্মে কুলসুম তাঁর অবর্তমানে দারুণ শঙ্কায় কাটাচ্ছেন দিন। কখন যে কী হয়ে যায়, কেই-বা বলতে পারে!

উম্মে রুমানের ছোট মেয়ে আয়েশাও কেমন যেন হয়ে গেছেন। সেই দুরন্ত আয়েশাটি আর নেই তিনি। তাঁর বাবা আর বাগদত্তা স্বামী মক্কা থেকে মদিনায় যাওয়ার পর থেকে নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছেন তিনি। বান্ধবীদের সঙ্গে মন খুলে খেলতে যান না। খেজুর বাগানে লুকোচুরি খেলায় অনিয়মিত। ঘরের কোণে থাকা তাঁর পুতুলগুলোও অযত্ন, অবহেলায় পড়ে আছে। সকল চঞ্চলতা ছেড়ে তিনি সারা দিন কেমন যেন মনমরা হয়ে থাকেন। বাবার স্নেহময় আদরের অনুপস্থিতি, রাসুলের নিঃসঙ্গতা ছোট্ট আয়েশাকে যেন কুরে কুরে খাচ্ছে।

উম্মে রুমান মেয়ের এমন বিষাদক্লিষ্টতা সহ্য করতে পারেন না। দিনে বার কয়েক গিয়ে দেখেন মদিনা থেকে কোনো বার্তাবাহক এল কি না। কেউ আসে না। মনে মনে ভাবেন, তাঁরা কি আমাদের কথা ভুলেই গেল? মদিনার উর্বর জমি, পাতায় ছাওয়া খেজুর বাগান আর সুমিষ্ট পানির স্বাদ কি তাদের মক্কার কথা ভুলিয়ে দিল? মক্কায় যে তাদের পথপানে চেয়ে আছে কয়েক জোড়া ভরসাহীন চোখ, সে কথা কি তারা ভুলেই গেছে? মক্কা থেকে যাওয়ার পর মানুষ দুটোর একটা খবর পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কীভাবে এত ভুলে থাকেন তাঁরা মক্কার এই বিষবাষ্পে বেঁচে থাকা কয়েকজন অবলা নারীকে?

www.pathagar.com

উম্মে রুমানের চোখ জলে ভিজে ওঠে। পরক্ষণেই তিনি আবার ভাবেন, না না...তা কী করে হয়! এ হওয়া অসম্ভব। আবু বকর সে রকম পুরুষই নন। দায়িত্বজ্ঞানহীনতার সংজ্ঞায় তাঁকে কখনো সংজ্ঞায়িত করা যাবে না। তাঁর মতো কর্তব্যপরায়ণ মানুষ সারা মক্কা তো বটেই, সারা আরবেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া আল্লাহর নবির সঙ্গে আছেন তিনি। এ নিখিল ধরার সবচেয়ে উত্তম পুরুষটির সার্বক্ষণিক সঙ্গী তিনি। তিনি সেই সে মানুষ, জাবালে নুরকে যদি স্বর্ণে পরিণত করে দেওয়া হয়, তবু তিনি তাঁর দায়িত্ব থেকে চুল পরিমাণ পিছু হটবেন না। নিজের পরিবার এবং আত্মীয়স্বজনদের মর্যাদার বিন্দু পরিমাণ অসম্মানও তিনি সহ্য করবেন না, তিনি সেই সে পুরুষ।

উম্মে রুমান নিজেকে প্রবোধ দেন। কিন্তু মন তো মনই, সে কি আর প্রবোধে মানে? যখন-তখন যাচ্ছেতাই চিন্তায় মশগুল হয়ে যায়। নানা দুশ্চিন্তা এসে ভর করে মনের মধ্যে। তা ছাড়া মক্কার প্রতিমাপূজারি কুরাইশরা তো আছেই। সারাক্ষণ তারা চোখে চোখে রাখে মুহাম্মদ ও আবু বকরের পরিবারকে। তাঁদের বাড়ির সামনে দিয়ে কুরাইশনেতারা আসতে-যেতে দুকথা শুনিয়ে দিয়ে যায়। অনেকে এমন ক্রুদ্ধচোখে তাকায়, যেন চোখের আগুন দিয়ে দুই পরিবারের সবাইকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবে। নানা ধরনের অশ্রাব্য গালাগাল তো হরহামেশা চলছে। সাধারণ সামাজিক ভদ্রতাটুকু দেখাতেও তারা নারাজ এখন।

তিন মাস হয়ে গেছে। এক বিকেলবেলা।

উম্মে রুমান ঘরের কাজ করছিলেন। আয়েশা তাঁর সন্তানসম্ভবা বড় বোন আসমার পাশে বসা। এমন সময় দেখলেন–পাহাড়ের দিক থেকে তাঁদের ভাই আবদুল্লাহ দৌড়ে এদিকে আসছেন আর চিৎকার করে কী যেন বলছেন। তাঁর আনন্দমুখর চিৎকারধ্বনি শুনে কিশোরী আয়েশা এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে। আসমাও গেলেন পিছু পিছু।

আবদুল্লাহ এমনিতে শান্তশিষ্ট ছেলে। মক্কার অন্য ছেলেদের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ যেমন নেই, তেমনি কারও সঙ্গে খুব একটা সদ্ভাবও নেই। তিনি নিজের মতো চলতেই ভালোবাসেন। মাস তিনেক আগে যখন রাসুলের সঙ্গে তাঁর বাবা হিজরত করে মদিনায় চলে যান, তখন থেকে তাঁর চালচলন আরও বদলে গেছে। তিনি সারা দিন মক্কার বিভিন্ন কুরাইশনেতার জলসার পাশে গোয়েন্দার মতো হেঁটে বেড়ান এবং তারা ইসলাম ও রাসুলকে নিয়ে কী বলে সেগুলো মুখস্ত করে আসেন। আর দিনের একটা সময় কাটে তাঁর ওই দূরের

www.pathagar.com

পাহাড়সারির সামনে একটা বাবলাগাছের ডালে বসে। মদিনার পথপানে তাকিয়ে প্রতীক্ষায় থাকেন–কখন এ পথ দিয়ে আসবে মদিনার মুসাফিরের পয়গাম। বাবাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে তাঁর। মদিনায় তাঁরা ভালো আছেন তো!

আজও তিনি সেই গাছের কাছে ছিলেন এতক্ষণ। দূর থেকে তিনজন মানুষের এক ছোট্ট কাফেলা দেখে তাঁর চোখে আশার দীপ্তি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে ভালোভাবে তাকান অরেকবার। মরুভূমির মরীচিকা নয়তো! কাফেলা আরেকটু কাছে আসতেই তিনি রাসুলের পালক পুত্র কৃষ্ণকান্তি মায়াময় চেহারার জায়েদ ইবনে হারিসাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেললেন। আর দেরি করেননি, তাঁকে চেনামাত্রই বাড়ির দিকে দৌড় দিয়েছেন।

আবদুল্লাহ বাড়ির কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগলেন, 'মা, মদিনা থেকে জায়েদ ভাইয়া এসেছেন। সঙ্গে আবু রাফে আর আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকিতও আছেন। অনেকগুলো উট নিয়ে এসেছেন তারা। আমি এইমাত্র দেখে এলাম। তোমরা জলদি সামানাপত্র গোছগাছ করে নাও।'

আয়েশা খুশিতে লাফিয়ে উঠলেন। আবার তিনি তাঁর আব্বাকে দেখতে পাবেন, রাসুলকে দেখতে পাবেন, পরিবারের সবাই আবার একসঙ্গে থাকতে পারবেন। মুক্তি পাবেন মক্কার মূর্তিপূজারিদের হিংসাত্মক নির্যাতন থেকে। রাসুলকে আর কেউ কষ্ট দিতে পারবে না কোনো দিন।

কিশোরী আয়েশার বিয়ে হয়েছে তা-ও প্রায় আড়াই বছর হয়ে গেল। বয়স নয় হয়ে গেছে। কিন্তু হলে কী হবে, বিয়ের আলিফ-বা-তা কি তিনি কিছু বোঝেন? এ বয়সে কোন মেয়েই বা তা বুঝে? স্বামী যে তাঁর রাহমাতুল্লিল আলামিন, এ ধরণির সবচেয়ে মহামহিম মহামানব–এ বিষয়ে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না এত দিন। স্বামীর সেবা, তাঁর ঘর-সংসার, তাঁকে সঙ্গ দেওয়া–এসব বিষয়ের কিছুই তাঁর মনে আসেনি কখনো। মা উম্মে রুমান তবু জোর করে করে শিখিয়েছেন বিয়ে আর ঘর-সংসারের আদবকেতা।

কিন্তু রাসুলের মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত এবং এই দীর্ঘ অনুপস্থিতি সামান্য সামান্য করে আয়েশার মনে তাঁর প্রতি ভালোবাসার সরোবর পুঞ্জীভূত করছিল। কয়েকটি উন্মাতাল খুশবুদার ফুল কলি হয়ে ফুটছিল হৃদয়ের দিলবাগিচায়। দূরত্ব কখনো কখনো ভালোবাসাকে বাড়িয়ে তোলে।

হাজার হলেও কালেমাপোক্ত সহধর্মিণী তো! হৃদয়ের কোথায় যেন একটা বিনিসুতার মালার টানে হৃদয়টা হঠাৎ চিনচিন করে ওঠে। আর তা ছাড়া কিশোরী মেয়েদের বিয়ে আরবে মোটেও অপ্রচলিত কিছু নয়। তখনকার দিনে

www.pathagar.com

আরবের আকসার মেয়ের বিয়েই আট-দশ বা ওই বারো-তেরোতে হয়ে যেত। তাই আয়েশার কাছে এ অভিজ্ঞতা মোটেও অভিনব কিছু ছিল না।

মদিনা থেকে কারও আগমনের কথা শুনে উম্মে রুমানের চোখেও ঝিলিক দিচ্ছে আনন্দাশ্রু। তিনি মেয়েদের তাড়া দিলেন জলদি গোছগাছ করতে। অবশ্য সব জিনিসপত্র আগেই গোছগাছ করে রেখেছেন তাঁরা। রাসুল ও আবু বকর যেদিন মক্কা ত্যাগ করেছেন, সে রাতে তাঁরাও নেওয়ার মতো সব জিনিসপত্র বেঁধেছেঁদে রেখেছেন। এখন শুধু যাত্রা করার পালা।

মদিনায় হিজরতের কথা শুনে আসমার মুখে খুশির আভা একবার ছড়িয়েই আবার মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। শঙ্কাচোখে একবার নিজের শরীরটার দিকে তাকালেন তিনি, এই শরীর নিয়ে কীভাবে যাবেন এ দূরের পথ! খোদা না করুন, পথিমধ্যে মরুভূমিতেই যদি তার প্রসবব্যথা শুরু হয়ে যায়, তখন কী উপায় হবে তাঁর? এদিকে মন তো মানে না! তাঁর পিতা, তাঁর স্বামী, তাঁর প্রিয় রাসুল যে চলে গেছেন মদিনায়। তাঁদের বিরহ আর সহ্য হচ্ছে না!

একটু পরই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন রাসুলের পালক পুত্র জায়েদ ইবনে হারিসা, ক্রীতদাস আবু রাফে এবং আবু বকরের নিযুক্ত পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকিত রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জায়েদ ইবনে হারিসাকে দুটি উট এবং ৫০০ দিরহাম দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে করে তিনি রাসুলের স্ত্রী সাওদা বিনতে জামআ, দুই কন্যা ফাতেমা ও উম্মে কুলসুম এবং জায়েদের স্ত্রী উম্মে আয়মান ও পুত্র উসামাকে নিয়ে দ্রুত মক্কা থেকে মদিনা অভিমুখে রওনা হতে পারেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকিতের সঙ্গে তিনটি উট প্রেরণ করেছেন তাঁর স্ত্রী উম্মে রুমান, পুত্র আবদুল্লাহ এবং দুই কন্যা আসমা ও আয়েশাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সঙ্গে তিনি একটি পত্রও প্রেরণ করেছেন পুত্র আবদুল্লাহর জন্য, যেখানে মা ও বোনদের নিয়ে মদিনাপানে যাত্রার নির্দেশ এবং নির্দেশনা লিপিবদ্ধ আছে।

রাসুলের নির্দেশ এবং আবু বকরের নির্দেশনা অনুযায়ী এ দুটি পরিবার সবার অলক্ষ্যেই যাত্রার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলল। প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হচ্ছিল খুব সঙ্গোপনে। কেননা মক্কার কুরাইশরা যদি একবার জেনে ফেলে এ দেশত্যাগের খবর, তবে একটা না একটা বাগড়া বাধাবেই। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যাত্রা শুরু করতে হলো।

www.pathagar.com

সাত

রাতের প্রথম প্রহর। সন্ধ্যাতারা মিলিয়ে যেতেই আল্লাহর রাহে নিজেদের জীবন সমর্পণ করে এ ছোট্ট কাফেলাটি পথে নামল। চারদিকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। দূরে কোথাও একটা দুটো শিয়াল বা হায়েনা ডেকে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। ওটুকু শব্দেই ধক করে উঠছে কাফেলার সবার অন্তরাত্মা। খুব সন্তর্পণে মক্কার সীমানা পাড়ি দিয়ে উটের গতি এবার বাড়িয়ে দিলেন কাফেলার যাত্রীরা। ভোর হতে হতে মক্কার কুরাইশদের নাগালের বাইরে চলে যেতে চান তাঁরা।

সকলের মনে শঙ্কা, একই সঙ্গে বুকচাপা আনন্দ। এবার তাঁরা যাচ্ছেন মুক্ত পৃথিবীর দিকে, এক নয়া দুনিয়ার পথে। যেখানে ইসলামের নাম শুনে কেউ ধিক্কার দেবে না, মুসলমান হওয়ার দরুন কারও পিঠে নেমে আসবে না হিংস্র চাবুক, কালেমা উচ্চারণের অপরাধে কারও দেহ থেকে ঝরবে না এক ফোঁটা খুন। তাঁরা আজ যাচ্ছেন সেই জনপদে, যে জনপদের বাসিন্দাদের নাম স্বয়ং আল্লাহ ঘোষণা করছেন 'আনসার' নামে।

পথে জায়েদ ও আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকিত কাফেলার সবাইকে শোনাচ্ছিলেন ইয়াসরিবের কথা। ইয়াসরিব থেকে যে শহর আজ হয়ে গেছে মদিনাতুন্নবি-নবির শহর। তিনি তাঁদের বলছিলেন মদিনার কথা, মদিনার মানুষের কথা। মদিনার খেজুর বাগান, সেখানকার আউস ও খাজরাজ গোত্রের আনসার সাহাবি, সেখানে রাসুলের সাদর সম্ভাষণ, তাঁকে একবার নিজের বাড়িতে নিতে মদিনার মানুষের সে কী প্রতিযোগিতা-জায়েদ বড় আবেগ নিয়ে বলছিলেন সেসব কথা। সেসব শুনতে শুনতে সবার চোখ বড় বড় হয়ে যাচ্ছিল। এমনও হয়! এমন মানুষও তবে আছে আল্লাহর দুনিয়ায়? সবাই প্রাণভরে দোয়া করলেন অদেখা সেইসব প্রাণোৎসর্গকারী মানুষের জন্য।

আয়েশা ও উম্মে রুমান একই উটের হাওদায় বসেছেন। আয়েশা নিবিষ্টমনে শুনছিলেন জায়েদের কথা। তাঁর কথার ফাঁকে আয়েশা শেষ একবার তাকালেন পেছনে ফেলে আসা মক্কার ম্রিয়মাণ বসতির দিকে। এখনো কিছু আলোর ক্ষীণ রশ্মি জ্বলছে মক্কার বালিয়াড়ি শহরে। আয়েশার চোখ জলে ভরে গেল-আর কোনো দিন কি আসা হবে এই শুষ্ক লু-হাওয়ার শহরে? আবার কি দেখতে পাব এই বালিয়াড়ি, এই মরু উপত্যকা, এই প্রাণচঞ্চল কাবার শহর? যেখানে কেটেছে আমার শৈশব, আমার পুতুলখেলার দিনগুলো, আমার হুড়োহুড়ি আর ছোটাছুটির দুরন্ত বয়স...। আবার কি দেখব তোমাদের হে আমার প্রাণের সখী-বান্ধবীরা? ফের কি দেখা হবে হে আমার প্রিয়তম মাতৃভূমি মক্কা?

www.pathagar.com

পরদিন পথে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে। তিনিও মদিনার যাত্রী। মক্কায় রাসুলের আহ্বান শুনে শুরুতেই ঈমানের রোশনিতে স্নাত হয়েছিলেন যেসব সাহাবি, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ তাঁদের অন্যতম। তাঁর মতো একজন কর্তব্যপরায়ণ সাহাবিকে দেখে কাফেলার সবার মনের আনন্দ ও সাহস কয়েক গুণ বেড়ে গেল। কাফেলা নবোদ্যমে এগিয়ে যেতে লাগল মদিনার দিকে।

চলার পথে একটু পর দেখা দিল এক বিপত্তি। আয়েশা আর তাঁর মা উম্মে রুমান যে উটটিতে চড়ে যাচ্ছিলেন, আচমকা বলা নেই কওয়া নেই উটটি কাফেলা ছেড়ে দিগ্বিদিক ছুটতে শুরু করল। ছুটতে ছুটতে সেটি কাফেলা থেকে দলছুট হয়ে গেল।

আয়েশা উটের হাওদার সামনে বসা ছিলেন এবং উম্মে রুমান পেছনে। কাফেলা ছেড়ে উটটি এমনভাবে লাফালাফি করছিল, উম্মে রুমান ভয় পেয়ে গেলেন–আয়েশাকে ফেলে দেবে না তো! আয়েশা যদি হাওদা থেকে পড়ে যান, তাহলে তাঁর ছোট্ট শরীরের হাড় আর একটাও আস্ত থাকবে না। তাঁর কিছু হয়ে গেলে আল্লাহর রাসুলের কাছে, স্বামী আবু বকরের কাছে কী জবাব দেবেন তিনি? এ তো শুধু তাঁর আদরের মেয়ে নয়, সে রাসুলের সহধর্মিণী! তিনি ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'হায় আমার ছোট্ট মেয়েটা! হায় আমার ছোট্ট দুলহানটা...!'

হতবিহ্বল আয়েশা তখনো হাওদার সামনে বসে উটের লাগাম ধরে টানাটানি করছিলেন সেটিকে থামানোর জন্য। উম্মে রুমান পেছন থেকে তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, 'উটের রশি ছেড়ে দাও, উটের রশি ছেড়ে দাও...।'

তিনি আশা করছিলেন, উটের রশি ছেড়ে দিলে সেটা কোনো গাছের গুড়ি বা ডালের সঙ্গে আটকে যাবে। আটকে গেলে উটও থেমে যাবে। আয়েশা মায়ের কথামতো উটের লাগাম ছেড়ে দিলেন। খানিক দিগ্বিদিক চলার পর উটের রশি সত্যি সত্যি একটি গাছের ডালের সঙ্গে আটকে গেল এবং উটটিও থেমে দাঁড়াল।

ইত্যবসরে জায়েদ, আবদুল্লাহসহ অন্যরা দ্রুত উট চালিয়ে তাঁদের কাছে এসে উটকে বশে আনেন। ভীত আয়েশা কান্না থামাতে মায়ের আঁচলে মুখ ঢাকেন। কিছুক্ষণ পর সবকিছু ঠিকঠাক হলে কাফেলা আবার চলতে শুরু করল।

বিরামহীন চলার পর একদিন তারা মদিনার প্রায় কাছাকাছি চলে এলেন। একটু দূরেই কোবা পল্লি দেখা যাচ্ছে। পথশ্রান্তিতে সবাই ভেঙে পড়লেও সবার

www.pathagar.com

মনে আনন্দের জোয়ার বইছে। আর কিছুক্ষণ পথ চললেই তাঁরা মদিনায় পৌঁছে যাবেন। আবার দেখা পাবেন সবার আত্মার আত্মীয়দের। ইসলাম পালনের নিরাপদ এক অভয়াশ্রয় পাবেন তাঁরা। যেখানে কেউ তাঁদের সামনে এসে চাবুক নিয়ে দাঁড়াবে না। কোনো মুসলমানকে নামাজ পড়তে দেখলে কেউ হাসাহাসি করবে না। কুরআন পড়তে বসলে কেউ তলোয়ার উঁচু করবে না। তাঁরা এক শান্তির শহরে যাচ্ছেন।

কোবা পল্লির দ্বারপ্রান্তে যখন এ হিজরতি কাফেলা, ঠিক তখনই শোনা গেল নতুন আরেক মেহমানের পদধ্বনি। তারা শুনতে পেলেন নতুন এক অতিথির আগমনী সংবাদ। কোবা পল্লিতে পদার্পণ করার আগে সন্তানসম্ভবা আবু বকর-কন্যা আসমার প্রসবব্যথা শুরু হয়ে গেল। দীর্ঘ সফর আর শঙ্কা-ভয়ের ক্লান্তি তিনি আর সইতে পারেননি। মদিনায় পৌঁছার আগেই তাঁর গর্ভের সন্তান স্বচক্ষে দেখতে চাইছিল মদিনায় তার সম্ভাষণের বিজয় নাকারা।

অনন্যোপায় কাফেলা জলদি কোবা পল্লিতে যাত্রাবিরতি করল। আসমাকে নিয়ে যাওয়া হলো বসতির এক রহমদিল লোকের ঘরে। কিছুদিন আগে রাসুল ও আবু বকর এখানেই যাত্রাবিরতি করেছিলেন। বসতির লোকজন যখন শুনলেন তিনি রাসুলের একমাত্র সহযাত্রী আবু বকরের কন্যা, তাঁরা যত্নআত্তির ত্রুটি করলেন না। কোবার সবচেয়ে অভিজ্ঞ দাইকে ডেকে আনা হলো। সন্তান প্রসবের যাবতীয় জোগাড়যন্ত করা হলো কিছুক্ষণের মধ্যেই।

বাইরে অপেক্ষা করছিলেন জায়েদ ইবনে হারিসা, আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর, আবু রাফে, আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকিতসহ অন্যরা। একটু পরই ঘরের ভেতর থেকে সুতীব্র চিৎকারে নতুন অতিথি ঘোষণা দিল তার আগমনী নিনাদের। কোবা পল্লিতে এক ছেলেসন্তানের জন্ম দিলেন আবু বকর-তনয়া আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা।

নতুন খালা হওয়া আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ভাগনে পেয়ে খুশিতে চিৎকার করে ওঠলেন। আসমা যদিও তাঁর সৎবোন, কিন্তু দুজনের মাঝে এত বেশি ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল যে, আপন বোনের চেয়ে কেউ কাউকে অন্য চোখে দেখতেন না। আসমা আয়েশার চেয়ে ১০ বছরের বড়। এ কারণে আয়েশা বেড়ে উঠেছেন আসমার স্নেহ-মমতার ছায়াতলে। এমনকি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এই ভাগনের নামানুসারে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার উপনাম রাখেন 'উম্মে আবদুল্লাহ'!

এ কাফেলা যখন নতুন জন্ম নেওয়া অতিথিসহ মদিনায় পৌঁছায়, তখন সারা মদিনা তাঁদের দেখতে চলে আসে। কেননা এ কাফেলার যাত্রী ছিলেন রাসুলের দুজন স্ত্রী, তাঁর কন্যারা এবং আবু বকরের স্ত্রী ও কন্যারা।

www.pathagar.com

তা ছাড়া আরেকটি কারণেও এ কাফেলার শুভাগমন সদ্য মদিনায় আসা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর আগে মদিনায় হিজরত করে এসেছিলেন যেসব মুসলিম নারী, মদিনায় আসার পর তাঁরা কেউ গর্ভধারণ করেননি। মুসলিম মহলে কোনো সন্তান জন্ম হচ্ছিল না। এ কারণে অনেক ইহুদি ও মোনাফেক বলতে শুরু করে–মদিনায় মুসলমানদের আগমন অশুভ লক্ষণ ছাড়া আর কিছু নয়। যখন মদিনার উপকণ্ঠে আসমার ছেলে জন্মগ্রহণ করে, তখন ইহুদি ও ষড়যন্ত্রপ্রিয় মোনাফেকদের মুখে কুলুপ এঁটে যায়।

আল্লাহর রাসুলও অত্যন্ত আনন্দিত হন নতুন এ শিশুর আগমনের সংবাদ শুনে। কেননা মদিনায় তখন কেবল মুসলমানরা নিজেদের আবাস স্থাপন শুরু করছেন। এ মুহূর্তেই যদি তাঁদের ওপর এমন ধরনের কুৎসা রটানো হয়, তবে মুসলিমদের ব্যাপারে অত্যন্ত খারাপ প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে আনসারদের মনে।

কাফেলার সঙ্গে আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন আনন্দে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সদ্যোজাত সন্তানকে কোলে নিয়ে নিজের পিতার নামের সঙ্গে মিল রেখে তার নাম রাখেন আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের।

এই সেই আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের, ক্ষমতালোভী উমাইয়া খেলাফতের হৃৎপিণ্ডে যিনি বীর বিক্রমে আঘাত হেনেছিলেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের রক্তনেশার সামনেও যিনি সামান্যতম মাথানত করেননি। কাবাচত্বরে রক্তমাখা শরীর নিয়ে যিনি আকণ্ঠ পান করেছিলেন শাহাদাতের অমৃত সরোবর। তবু রাসুলের রেখে যাওয়া ইসলামকে তিনি সামান্য পরিমাণও অসম্মান হতে দেননি।

আট

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদে নববির নির্মাণকাজে ব্যস্ত ছিলেন। অন্যদের সঙ্গে তিনিও মসজিদ তৈরির নির্মাণসামগ্রী বয়ে আনছিলেন নিজ হাতে। ইট ও পাথর বহন করার সময় তিনি আবৃত্তি করছিলেন–

আল্লাহুম্মা লা আইশা ইল্লা আইশান আখেরাহ
ফাগফির লিল আনসারি ওয়াল মুহাজিরাহ
হা-যাল হামালু লা হামালা খায়বারা
হা-যা আবাররু রাব্বিনা ওয়া আতহারা

হে আল্লাহ!
পরকালের জীবন ছাড়া আর তো কোনো জীবন নেই

www.pathagar.com

ক্ষমা করো এ সকল মুহাজির ও আনসার,
বহন করা এ বোঝা নয় খায়বার থেকে আগত
এ বোঝা আমাদের প্রভুর দেওয়া, তাঁর পবিত্রতার।

আনসার ও মুহাজির সাহাবিরা রাসুলের এমন উচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতা শুনে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। সকলের হৃদয়ের স্পৃহা কয়েক গুণ বেড়ে গেল। তাঁরাও রাসুলের প্রত্যুত্তরে গেয়ে উঠলেন–

রায়ি'ন কাদা'না ওয়ান নাবিউ ইয়া'মাল
লা-যাকা মিন্নাল আমালু ওয়াল মুদাল্লাল

আমরা বসে থাকব আর নবি করবেন কাজ
আমাদের পথভ্রষ্টতার জন্য এটাই তবে যথেষ্ট আজ।

মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। দুই এতিম বালকের জমি ন্যায্য মূল্যে কিনে মসজিদের জন্য জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে। মসজিদ নির্মাণের আগে জায়গাটি ব্যবহারের অনুপযোগী ছিল। কয়েকটি গাছ, ভূমি উঁচু-নিচু এবং পৌত্তলিকদের কয়েকটি কবর ছিল জায়গাটিতে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সবাইকে সঙ্গে নিয়ে জমিন সমান করে গাছগুলো মসজিদের সামনে পশ্চিম দিকে লাগিয়ে দিলেন। সে সময় কেবলা ছিল মসজিদে আকসা, যা মদিনা থেকে পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

কেবলার দিক থেকে নিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত মসজিদের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১০০ হাত। প্রস্থের আয়তন এর চেয়ে তুলনামূলক কম ছিল। দেয়ালে ব্যবহার করা হলো কাঁচা ইট এবং তার ওপরে কাদা লেপে দেওয়া হলো। ছাদের ছাউনি দেওয়া হলো খেজুরের ডাল ও পাতা দিয়ে। তিনটি দরজা লাগানো হলো। সদর দরজার চৌকাঠে ব্যবহার করা হলো পাথর। মসজিদের ভিত্তি-জমিন করা হলো কম-বেশ তিন হাত উঁচু করে।

রাসুলের পরিবার, আবু বকরের পরিবারসহ মক্কার ছোট্ট এ কাফেলা ইয়াসরিবে এল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের কন্যা ও স্ত্রীদের দেখে আনন্দিত হলেন। মসজিদ নির্মাণের কাজ স্থগিত রেখে তাঁদের এগিয়ে নিয়ে এলেন।

মক্কা থেকে নিজ পরিবারকে নিয়ে আসার জন্য জায়েদ ইবনে হারিসাকে পাঠানোর পর রাসুল পরিবারের বসবাসের বিষয়ে চিন্তা করেন। এ কারণে

www.pathagar.com

মসজিদে নববির উত্তর পাশে তাঁর পরিবারের জন্য কুটিরের মতো একটি ঘর তোলেন। ফাতেমা, উম্মে কুলসুম এবং সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহুম এখানে এসে ওঠেন। রাসুল নিজেও আবু আইয়ুব আনসারির বাড়ি ছেড়ে এখানে এসে পরিবারের সঙ্গে বসবাস শুরু করেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন পর্যন্ত বনু হারিস ইবনে খাজরাজের মহল্লায় অস্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। আয়েশা এবং তাঁর পরিবার সেখানে গিয়ে ওঠেন।

কিন্তু এ বাড়িতে উঠলেও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বেশ কয়েক দিন থেকে অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। শুধু তিনি একাই নন, মক্কা থেকে হিজরত করে আসা আরও অনেক সাহাবি অজ্ঞাত এক রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। শরীরে প্রচণ্ড জ্বর এবং জ্বরের প্রকোপে মাঝে মাঝে অচেতন হয়ে পড়তেন তাঁরা।

মদিনার আবহাওয়া মক্কার চেয়ে ভিন্ন ছিল। এখানকার হাওয়া ও পানি সদ্য আগত মক্কার মুহাজিরদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে খাপ খায়নি। ফলে আগমনের কয়েক দিন পরই অনেক সাহাবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তা ছাড়া, মাতৃভূমি ছেড়ে আসায় সবার অন্তরই ছিল দুঃখ ভারাক্রান্ত। অনেকে নিজেদের পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-সন্তান রেখে চলে এসেছিলেন। স্বজনদের বিচ্ছেদ বারবার তাঁদের মনে দোলা দিয়ে যেত। নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশে এসে তাই প্রথমে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেননি। এসব দুর্ভাবনা ও প্রতিকূল আবহাওয়ার ফলে মুহাজিররা অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেকের জ্বরের প্রকোপ টাইফয়েডে রূপ নেয়। দীর্ঘকালীন জ্বরে তাঁরা একদম কাবু হয়ে পড়েন।

আবু বকরও এমনই রোগে আক্রান্ত হয়ে দিন গুজরান করছিলেন। তাঁর পরিবার মদিনায় এলেও তিনি তাঁদের স্বাগত জানাতে বিছানা থেকে উঠতে পারলেন না।

আয়েশা মদিনায় এসে পিতার এমন দুরবস্থার কথা শুনে তাঁর কাছে ছুটে গেলেন। আবু বকর পাশেই এক ঘরে শুয়ে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর দুই ভৃত্য বেলাল ইবনে রাবাহ হাবশি এবং আমের ইবনে ফুহাইরাও অসুস্থ হয়ে শুয়ে ছিলেন ঘরের মধ্যে। প্রবল জ্বরের ঘোরে তাঁরা প্রলাপ বকছিলেন।

আয়েশা পিতাকে দেখার জন্য ঘরে ঢুকলেন। দেখতে পেলেন, পিতা প্রায় অচেতন হয়ে শুয়ে আছেন একটি তক্তপোশে। তাঁকে দেখে আয়েশার বুকে মোচড় দিয়ে উঠল। সুঠামদেহী আবু বকর কেমন জ্বরাচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর কাহিল শরীর দেখে তাঁকে চেনাই যাচ্ছে না। চোখ বুজে মৃতের মতো পড়ে আছেন।

www.pathagar.com

আবু বকরের এমন অবর্ণনীয় অবস্থা দেখে আয়েশার চোখ জলে ভরে গেল। তিনি পিতার শিয়রের পাশে গিয়ে বসলেন। পিতার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আব্বা, কেমন আছেন আপনি? কেমন লাগছে আপনার?'

প্রিয় কন্যার কণ্ঠ শুনে আবু বকর বহু কষ্টে চোখ মেলে তাকালেন। যদিও জ্বরের ঘোরের দরুন তিনি তাঁর কন্যাকে চিনতে পারলেন না। তাঁর মনে হলো, তাঁর চোখের সামনে দোলা দিয়ে যাচ্ছে আলোকরেখা। সেই আলো থেকে ভেসে আসছে দূরবর্তী কারও কণ্ঠস্বর। অদ্ভুত ভঙ্গিমায় তিনি শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আবৃত্তি করতে লাগলেন–

প্রত্যেক মানুষ ভোরে জেগে উঠে স্বজনদের মাঝে
কিন্তু হায়! মৃত্যু তো তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী।

আয়েশা পিতার কথা শুনে কিছুই বুঝতে পারলেন না। তবে বুঝতে পারলেন, তিনি জ্বরের প্রকোপে আবোল-তাবোল বলছেন। আয়েশার চোখ ছলছল করে উঠল।

তিনি আমের ইবনে ফুহাইরার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমের, আপনার শরীর কেমন?'

আমেরেরও চেতনা ছিল না। তিনি জবাব দিলেন–

মৃত্যু আসার আগেই যেন স্বাদ নিয়ে ফেলেছি মৃত্যুর
এমন কাপুরুষের মৃত্যু তো তার শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকে,
তবু প্রতিটি মানুষ সর্বশক্তি দিয়ে চালিয়ে যায় জীবনসংগ্রাম
তাগড়া ষাঁড় যেমন সামান্য শিং দিয়ে বাঁচায় নিজের চামড়াকে।

আয়েশা বুঝলেন, আমেরকেও জ্বরে পেয়েছে। তিনি সুস্থ মস্তিষ্কে কথা বলছেন না। এবার তিনি বেলালের কাছে এসে দেখলেন বেলাল আধো ঘুমের মধ্যেই প্রলাপ বকছেন–

আহ! আর একটি রাতও কি কাটাতে পারব
ফাখখা উপত্যকায় গোলাপ ও উজখিরের সান্নিধ্যে,
মাজান্নার টলটলে জলাশয়ে পারব কি আর
একটি দিনও সাঁতার কাটার সুখ নিতে,
ফের কি দেখা হবে সেই
শামা ও তাফিল পর্বতে!

---

* ফাখখা : মক্কার নিকটবর্তী একটি উপত্যকার নাম; উজখির : এক ধরনের সুগন্ধি উদ্ভিদ; মাজান্না : মক্কার নিম্নবর্তী অঞ্চলের একটি বাজার সংলগ্ন জলাশয়; শামা ও তাফিল : মক্কার পার্শ্ববর্তী দুটো পাহাড়ের নাম।

www.pathagar.com

পিতা ও দুই ভৃত্যের এমন দুর্দশাগ্রস্ত বাক্যালাপ শুনে কিশোরী আয়েশা নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি কেঁদে ফেললেন। কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন বোধ হয়। এত দিন পর পিতার সঙ্গে দেখা, অথচ তিনি অসুস্থ হয়ে রোগ-যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। আদরের কন্যাকে পর্যন্ত চিনতে পারলেন না! তাঁকে আয়েশা বলে একবার ডাকও দিলেন না।

আয়েশা মন খারাপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদে নববির নির্মাণকাজে ব্যস্ত। আয়েশা তাঁর কাছে চলে গেলেন। কাছে গিয়ে চোখ মুছে রাসুলকে জানালেন তাঁর পিতা ও অন্যদের দুরবস্থার কথা।

এত দিন সাহাবিদের রোগগ্রস্ততার ব্যাপারে রাসুল নিজেও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। নিজের সঙ্গে ধৈর্য ধরছিলেন, আল্লাহ নিজেই যেন সদয় হয়ে মুহাজিরদের মুক্তি দেন এ অজ্ঞাত রোগ থেকে। কিন্তু নিষ্পাপ মুখশ্রীর আয়েশার চোখের পানি দেখে নিজেকে মানাতে পারলেন না। আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন–

'হে আল্লাহ! আমি উতবা ইবনে রাবিআ, শায়বা ইবনে রাবিআ এবং উমাইয়া ইবনে খালফকে তোমার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। তারা আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করেছে। আমাদের এমন জায়গায় আসতে বাধ্য করেছে, যেখানে ছড়িয়ে পড়েছে অজ্ঞাত রোগের প্রকোপ। তুমি তাদের সমুচিত শাস্তি দাও।

'হে আল্লাহ! এই ইয়াসরিব পল্লিকে আমাদের কাছে মক্কার মতো কিংবা তার চেয়েও অধিক প্রিয় করে দাও। এ শহরকে করে দাও স্বাস্থ্যকর এবং প্রাচুর্যে ভরে দাও এর প্রতিটি বাড়িঘর। মদিনার এ মহামারি অসুখকে তুমি বিদূরিত করে দূরবর্তী জুহফার দিকে নিয়ে যাও।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আয়েশাকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। সে রাতেই রাসুল স্বপ্নে দেখলেন, মাথায় উষ্কখুষ্ক চুল নিয়ে এক কৃষ্ণাঙ্গ নারী মদিনা থেকে বের হয়ে জুহফার দিকে চলে যাচ্ছে।

এটা দোয়া কবুল হওয়ার নিদর্শন। এরপর মক্কা থেকে আগত আর কোনো সাহাবি নতুন করে হাওয়া-বদলগত কঠিন জ্বর বা কোনো মহামারি রোগে আক্রান্ত হননি।

আবু বকর এবং অন্য সাহাবিরা ধীরে ধীরে সুস্থ হতে লাগলেন। সবার শুশ্রূষা চলতে লাগল পুরোদমে। আয়েশা যথাসম্ভব তাঁর পিতার সেবায় লেগে রইলেন।

www.pathagar.com

তবে মক্কা থেকে ইয়াসরিবের দীর্ঘ সফর, নতুন আবহাওয়া, ভিন্ন পরিবেশ আয়েশার শরীরেও সইল না। সবার জ্বর যখন ভালোর দিকে, আয়েশা তখন টাইফয়েডে আক্রান্ত হলেন। দীর্ঘমেয়াদি জ্বর। জ্বরে একদম কাহিল অবস্থা। নাওয়া-খাওয়া করতে পারেন না, বাইরে বেরোতে পারেন না। শরীর শুকিয়ে একদম পাটকাঠির মতো হয়ে গেল।

মা উম্মে রুমান চিন্তায় পড়ে গেলেন। এভাবে আরও কিছুদিন থাকলে তো মেয়ের শরীরে হাড় ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। আবু বকরও কোনো কূলকিনারা করতে পারছিলেন না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাঝেমধ্যে এসে দেখে যান আয়েশাকে।

মাসখানেক জ্বরে ভুগে অবশেষে দয়াময়ের করুণায় আয়েশা সুস্থ হয়ে উঠলেন। তবে শরীর একদম দুর্বল হয়ে গেল এবং টাইফয়েডের প্রকোপে মাথার চুল সব পড়ে গেল। চক্ষু কোটরাগত। কোনো রকম হাঁটতে-চলতে পারেন। ছোট্ট শরীরটা রোগে ভুগে এতটুকুন হয়ে গেছে।

উম্মে রুমানের চিন্তার শেষ নেই। তাঁর মেয়ে আল্লাহর রাসুলের স্ত্রী। তাঁর যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে তিনি নিজেকেই ক্ষমা করতে পারবেন না। মেয়ের যত্নের কোনো ত্রুটি রাখলেন না। কিশোরী মেয়ে, তাঁর এখন বাড়ন্ত শরীর। এ সময়ে যদি শরীর এমন ক্ষয়িষ্ণু থাকে, তাহলে বয়স হলেও সে ক্ষতি পুষিয়ে ওঠা যাবে না।

উম্মে রুমান আয়েশার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় তাঁকে বলবর্ধক এটা-সেটা খাওয়াতে লাগলেন নিয়মিত। নানা পথ্য সেবনে জোর দিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। অবশেষে এক আনসারি মহিলা শসা ও খেজুর একসঙ্গে বিশেষ প্রক্রিয়ায় খাওয়ার পরামর্শ দিল। এই অভিনব পথ্য খাওয়ানোর কয়েক দিন পর থেকে আয়েশার স্বাস্থ্য ভালো হতে শুরু করল।

ইয়াসরিবে হিজরত করার পর কেটে গেছে সাতটি মাস। আয়েশা তত দিনে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। শরীরে ফিরে এসেছে সেই সতেজ লাবণ্য। মনে ফিরে এসেছে দুরন্ত চাঞ্চল্য। মাথার চুলগুলো ফের লাউয়ের ডগার মতো লকলকিয়ে বেড়ে উঠছে। বালিকা থেকে কিশোরী হওয়ার লক্ষণগুলোও ফুটে উঠতে শুরু করেছে প্রস্ফুটিত আয়েশার মাঝে। শৈশবের অবুঝ পৃথিবী থেকে পা ফেলতে শুরু করেছেন দুরন্ত কৈশোরের আরেক পৃথিবীতে।

মক্কার মতো এখানেও তাঁর জুটে গেছে সখী-বান্ধবী। তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতাও হয়ে গেছে বেশ। দিনের অনেকটা সময় কেটে যায় নানা রকম

www.pathagar.com

খেলাধুলায়। উম্মে রুমানও বিশেষ কিছু বলেন না এখন। মেয়ে কেবল অসুখ থেকে সুস্থ হয়েছে, কয়েকটা দিন কাটাক না হেসেখেলে।

নয়

শাওয়াল মাস চলছে। মসজিদে নববি নির্মাণের কাজ তত দিনে সমাধা হয়েছে। এর মধ্যে জিবরাইল আলায়হিস সালাম একদিন রাসুলকে বললেন, 'আয়েশা তো আপনার স্ত্রী, তাঁকে সসম্মানে ঘরে তুলুন।'

রাসুলের প্রতি আল্লাহর এই নির্দেশনা যে কত গুরুত্ববহ ছিল, সেটা আজ এই চৌদ্দ শ বছর পরে এসেও পৃথিবীবাসী অনুপুঙ্খভাবে অনুধাবন করতে পারছে। মাত্র নয় বছর বয়সী এক চঞ্চল কিশোরীকে কেন পঞ্চাশোর্ধ্ব রাসুলের সহধর্মিণী করা হয়েছিল, ইতিহাসে এবং বর্তমান আধুনিক সভ্যতায় তা নিয়ে হাজারো প্রশ্ন থাকলেও মুসলিম উম্মাহর জন্য এর চেয়ে বড় নেয়ামত আর কিছুই ছিল না। তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন আয়েশার কারণেই উম্মতে মুসলিমা জানতে পেরেছে নবিজীবনের বহু অজানা অধ্যায়। যেসব বিষয় তিনি ছাড়া আর কেউ জানতেন না। তাঁর মত করে আর কেউ জানাতে পারেনি রাসুলের সাংসারিক জীবন, পারিবারিক বন্ধন, দাম্পত্য ভালোবাসা কিংবা প্রেমময় স্বামীর সাহচর্য।

জিবরাইল যেদিন আয়েশাকে ঘরে তোলার ব্যাপারে বললেন তার কয়েক দিন পরের কথা। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলের কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আপনার স্ত্রীকে ঘরে তুলে নিচ্ছেন না কেন?'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম খানিকটা বিব্রত বোধ করলেন। তবে তিনি স্পষ্ট করেই বললেন, 'আমি মোহরের ব্যাপারে ভাবছি। এ মুহূর্তে মোহর পরিশোধের সামর্থ্য আমার নেই।'

রাসুলের এমন কথায় আবু বকর মোটেও অবাক হলেন না, বরং তিনি মনে মনে খুশি হলেন। রাসুলের কাছে যে এ মুহূর্তে মোহর আদায় করার অর্থ নেই, সেটা তিনি খুব ভালো করেই জানেন। তিনি না জানলে কে জানবে? রাসুলের সার্বক্ষণিক সঙ্গী, সকল কাজের পরামর্শদাতা, সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু তিনি। তাই তিনি প্রস্তুতি নিয়েই এসেছেন।

রাসুল নিজের অপারগতা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাসুলের সামনে মোহর বাবদ ৫০০ দিরহাম (বারো উকিয়া এক নশ সমপরিমাণ) পেশ করলেন। রাসুল প্রফুল্লচিত্তে আবু বকরের এ ভালোবাসা গ্রহণ করলেন। দেরি না করে তখনই দিরহামগুলো পাঠিয়ে দিলেন বাগদত্তা স্ত্রী আয়েশার কাছে।

www.pathagar.com

বিয়ের জন্য যখন আর কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা রইল না, তখন আবু বকর আরেকটি কাজ সমাধা করার প্রতি মনোযোগী হলেন। তিনি মসজিদে নববির কাছে নিজের পরিবারের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করার উদ্যোগ নিলেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি আয়েশার জন্যও মসজিদের উত্তর দরজা লাগোয়া একটি ছোট ঘর তৈরির বন্দোবস্ত শুরু করলেন। যেন রাসুল আয়েশার সঙ্গে তাঁর একান্ত সময়গুলো এখানে কাটাতে পারেন।

বেলা বাড়ছে। আবু বকরের নতুন বাড়িতে একে একে জড়ো হচ্ছেন মদিনার আনসারি মহিলারা। সবাই ফিসফিস করে কথা বলছে। ঠাট্টা-মশকরা করছে একে অন্যের সঙ্গে। হাসিখুশি পরিবেশ।

সবাইকে ঘরে রেখে উম্মে রুমান জলদি ঘর থেকে বাইরে বেরোলেন। মেয়েকে খুঁজতে বেরিয়েছেন তিনি। না জানি কোথায় আছে সে। উফ! এই মেয়েকে নিয়ে আর পারা যায় না!

আয়েশা তখন নতুন বাড়ির পাশে সখীদের সঙ্গে দোলনায় দোল খাচ্ছিলেন। উম্মে রুমান তাঁকে দেখে এগিয়ে এলেন। দোলনা থেকে নামিয়ে দ্রুত হাঁটা ধরলেন বাড়ির পথে। সবাই বসে আছেন তাঁর জন্য।

ঘরে ঢোকার আগে উম্মে রুমান বাড়ির উঠোনে রাখা পানির পাত্র থেকে পানি নিয়ে আয়েশার হাত-মুখ ধুইয়ে দিলেন। মাথার চুল আঁচড়ে পরিপাটি করে বেঁধে দিলেন। এরপর মেয়েকে নিজের চোখের সামনে দাঁড় করালেন একবার। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ তাঁর দিকে।

এইটুকু সাজিয়ে মেয়েকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন উম্মে রুমান। আনসারি মহিলারা আয়েশাকে দেখে সম্ভাষণের সুরে বলে উঠলেন, 'তোমার আগমন কল্যাণময় হোক, শুভ হোক তোমার আগমন, বরকতে ভরে উঠুক তোমার আগমন...।'

ঘরে ঢুকে আচমকা এমন সম্ভাষণ শুনে আয়েশা খানিকটা হকচকিয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না কী ঘটতে যাচ্ছে। কেন সবাই তাঁকে এভাবে সম্ভাষণ জানাচ্ছেন, তার রহস্যও উদ্ঘাটন করতে পারছিলেন না।

একটু পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন আয়েশা বুঝতে পারলেন যে আজকে তাঁর বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠান বলতে আড়ম্বরতার কোনো বালাই ছিল না। না কোনো খাবারের আয়োজন, না কোনো পানীয়ের ব্যবস্থা। উট-বকরি বা একটা দুম্বাও জবাই করা

www.pathagar.com

হয়নি। রাসুলের বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে–এ খবর শুনে খাজরাজ গোত্রের নেতা সাদ ইবনে উবাদাহ এক পেয়ালা দুধ আর সামান্য কিছু খাবার নিয়ে হাজির হলেন। ওই দুধটুকু দিয়েই বর-বধূর শুভ পরিণয়ের বন্ধন সূচিত হলো।

কোনো বালখিল্যতা নয়, দুধের পেয়ালাটি রাসুলের দিকে এগিয়ে দেওয়া হলো। আল্লাহর রাসুল পেয়ালাটি হাতে নিয়ে সামান্য দুধ পান করে আয়েশার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আয়েশা লজ্জায় মরে যাচ্ছিলেন। কিছুতেই রাসুলের হাত থেকে দুধের পেয়ালা নিতে চাচ্ছিলেন না।

এমন নয় যে আজ প্রথম তিনি রাসুলকে দেখছেন বা আজই প্রথম তাঁর হাত থেকে কিছু নিয়ে খাচ্ছেন। মক্কায় তাঁদের বাড়িতে বহুবার রাসুলের সঙ্গে বসে থেকেছেন, একসঙ্গে খেয়েছেন, দুষ্টুমি করেছেন। তবে আজকের রাসুল যেন ভিন্ন ব্যক্তি। আজকের নবি যেন অন্য কেউ। অন্য এক পরিচয়ে বাঁধা পড়ে গেছেন দুজনে। নতুন এক পবিত্র বন্ধনে গেঁথে গেছে দুজনের প্রেমিত হৃদয়। নতুন এক অমর সম্পর্কের সূচনা হতে যাচ্ছে এই মধ্য দুপুরবেলা।

আসমা বিনতে ইয়াজিদ আয়েশার বান্ধবী। তিনি আয়েশার পাশে বসে ছিলেন এতক্ষণ। আয়েশার লজ্জায় আনত অধোবদন দেখে এগিয়ে এলেন। আয়েশাকে সাহস দিয়ে বললেন, 'রাসুলের কাছ থেকে দুধের পেয়ালাটি নাও। রাসুলের এমন উপহার ফিরিয়ে দিয়ো না।'

বান্ধবীর কথায় আয়েশা যেন কিছুটা সাহস পেলেন। রাসুলের হাত থেকে দুধের পেয়ালাটি নিয়ে মুখে তুললেন। এক চুমুক পান করেই আয়েশা পেয়ালাটি নিচে নামিয়ে রাখলেন।

রাসুল মুচকি হেসে বললেন, 'তোমার বান্ধবীদেরও খেতে দাও।'

বান্ধবীরা সবাই না না করে উঠল, 'না, আমাদের খাওয়ার ইচ্ছে নেই।'

রাসুল বললেন, 'পেটে ক্ষুধা রেখে মিথ্যা বলো না।'

বান্ধবী আসমা সাহস করে বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, কেউ যদি বলে–আমি এটা চাই না, কিন্তু মনে মনে সেটা আসলেই চাচ্ছে; তাহলে কি এটা মিথ্যা হবে?'

রাসুল উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, মিথ্যা লেখা হয়। এমনকি ছোট ছোট মিথ্যাও লেখা হয়ে থাকে।'

অনাড়ম্বর আনুষ্ঠানিকতার পর আনসারি নারীরা আয়েশাকে নিয়ে রাসুলের নবনির্মিত ছোট্ট মাটির 'প্রাসাদে' চলে এলেন।

www.pathagar.com

দশ

ছোট্ট একটা ঘর। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বড়জোর আট হাত। চারপাশের দেয়াল মাটির তৈরি। উচ্চতাও প্রস্থের সমান, সাত-আট হাতের বেশি হবে না। যে কেউ দাঁড়ালে ঘরের ছাদ ছুঁতে পারবে। ছাদের ছাউনি খেজুর পাতা ও খেজুর ডালের তৈরি। বৃষ্টির পানি থেকে বাঁচার জন্য ছাউনির ওপরে কম্বলজাতীয় কাপড় বিছানো হয়েছে। ঘরে এক কপাটের কাঠের দরজাটি কখনো বন্ধ করা হতো না। পর্দা লাগানো থাকত, প্রয়োজন হলে পর্দা নামিয়ে দেওয়া হতো।

এ ঘরটিই রাসুলের প্রিয়তমা উম্মুল মুমিনিন আয়েশা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহার বাসরঘর। এ ঘরেই শুরু হলো আয়েশার সংসারজীবন। নতুন এক জীবনের হালখাতা খোলা হলো এ ঘরে পা রাখার মাধ্যমে। পরবর্তী সময়ে এ ঘরই হয়ে উঠেছিল উম্মতে মুহাম্মদির জ্ঞানসাধনার বাতিঘর। এ ঘর থেকেই আয়েশা লাভ করেছিলেন ইসলামের সেই অত্যুজ্জ্বল আলো, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম আলোকিত করে রেখেছে মুসলিম উম্মাহর বৈষয়িক জীবনাচার।

মসজিদে নববির উত্তর-পূর্ব দিকে ছিল এ ঘরটি। মসজিদের পূর্বপাশের দেয়াল-সংলগ্ন ছিল ঘরের দরজা। এ দরজা দিয়েই রাসুল ঘর থেকে মসজিদে প্রবেশ করতেন। অনেক সময় রাসুল যখন মসজিদে অবস্থান করতেন, তখন মসজিদ থেকেই মাথা বাড়িয়ে দিতেন আয়েশার ঘরের দরজা দিয়ে, আয়েশা রাসুলের মাথার চুল আঁচড়ে দিতেন, তেল লাগিয়ে দিতেন।

ঘরের আয়তন এতই ছোট ছিল যে, মাঝেমধ্যে রাসুল যখন ঘরে নামাজ পড়তেন আর আয়েশা শুয়ে থাকতেন, তখন সেজদা দিতে গেলে রাসুলের হাত লেগে যেত আয়েশার পায়ে। আয়েশা পা গুটিয়ে নিলে রাসুল সুস্থিরমতো সেজদা করতে পারতেন।

ঘরের আসবাব বলতে ছিল ঘুমানোর জন্য একটি নিচু চৌকি, একটি চাটাইয়ের বিছানা, খেজুর পাতা কেটে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বানানো একটি বালিশ, খেজুর ও যব রাখার জন্য দুটো পাত্র, পানি রাখার একটি পাত্র ও পানি খাওয়ার একটি পেয়ালা এবং বাতি জ্বালানোর একটি বাতিদান। তেল দিয়ে বাতি জ্বালানোর প্রচলন ছিল তখন। কিন্তু প্রায়ই এমন হতো, মাস চলে যেত কিন্তু বাতি জ্বালানোর জন্য তেলের ব্যবস্থা হতো না ঘরে। চাঁদের আলোতেই কেটে যেত ভরা পূর্ণিমা কিংবা আঁধার অমাবস্যা।

বস্তুত রান্নার জন্যই তেল থাকত না যাঁদের ঘরে, তাঁরা বাতি জ্বালানোর তেল পাবেন কোত্থেকে? এই ছিল রাসুলের প্রিয়তমার ঘরের আসবাব ও চালচিত্র। আয়েশা বলেন, 'যদি আমাদের বাতি জ্বালানোর তেল থাকত, তবে তো সেটা দিয়ে আমরা রান্নার কাজই সেরে ফেলতে পারতাম।'

www.pathagar.com

ঘরভর্তি দারিদ্র্য। নিঃস্বতার ছাপ সবখানে। না কোনো বিলাসিতার সামান্য উপকরণ, না জীবনযাপনের একটুখানি সুলভ আয়োজন। ঘরে খাবার থাকত না অনেক সময়। চুলো জ্বলত না মাসের পর মাস। কোনো সাহাবি কিছু হাদিয়া দিলে সেটাই হতো নবিপরিবারের এক বেলা খাবারের আয়োজন। হাদিয়া যা আসত তা-ও সামান্য, দু-চারটে খেজুর কিংবা এক পেয়ালা দুধ অথবা একটা-দুটো রুটি। এ দিয়েই জঠরজ্বালা নিবারণ হতো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও তাঁর পরিবারের। আয়েশা বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বেঁচে থাকতে কখনো একাধারে এমন তিনটে দিন যায়নি, যখন নবিপরিবারের লোকজন পেট ভরে খেয়েছে।'

কিন্তু তবু ভালোবাসার কমতি ছিল না আয়েশার এ ছোট্ট জীর্ণ কুটিরে। সামান্য খাবারই যখন দুজন একসঙ্গে খেতে বসতেন, মনে হতো পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী দুজন মানুষ বসে খাবার খাচ্ছেন। খাবারের থালা একটিই ছিল, একটিতে দুজন মিলে খেতেন। রাতে যখন খাবার খেতেন অন্ধকারে, তখন এমন হতো—একই খাবারে দুজনের হাত পড়ে যেত।

কখনো মাংসজাতীয় খাবার খেলে আয়েশার চিবানো হাড়গুলো রাসুল আবার চিবিয়ে খেতেন। পানি খাওয়ার পেয়ালায় আয়েশা যেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতেন, রাসুলও দেখে দেখে সে স্থানে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতেন। এর নামই দাম্পত্য ভালোবাসা।

খাবার সামান্য হলেও রাসুল কখনো কখনো দু-একজন মেহমান ডেকে আনতেন। একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও আয়েশা খেতে বসেছেন। এমন সময় বাইরে উমর ইবনে খাত্তাবের সাড়া পাওয়া গেল। রাসুল উমরকেও দস্তরখানে শরিক হতে ডাক দিলেন। খাবার সামান্য ছিল, কিন্তু রাসুলের বরকতময় খাবারের লোভ কী করে সামলাবেন উমর? তিনিও দুজনের সঙ্গে বসে পড়লেন। তখনো পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়নি।

ঘরে বাতি ছিল না। খাওয়ার সময় এমন হলো, থালার মধ্যে একজনের হাত অন্যজনের হাতে লেগে যেত। এ নিয়ে তাঁরা তিনজন হাসাহাসি করতে লাগলেন।

ঘরে একটু বেশি খাবারদাবার থাকলে মাঝেমধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আসহাবে সুফফার শিক্ষার্থীদের ডেকে নিতেন।

যখন উপোস হতো, রাসুল ঘরে এসে আয়েশা বা অন্য স্ত্রীদের জিজ্ঞেস করতেন, 'ঘরে খাওয়ার মতো কিছু আছে কি?'

www.pathagar.com

যখন শুনতেন যে কিছুই নেই, তখন নির্দ্বিধায় বলে দিতেন, 'আজ তবে আমি রোজা রেখে দিলাম।' এ কথা বলে তিনি ইবাদতে মগ্ন হয়ে পড়তেন।

আয়েশা বলেন, 'রাসুলের ইন্তেকালের পরও আমি কখনো পেট পুরে খাবার খাইনি।'

মদিনায় আসার পরবর্তী কয়েকটা বছর অভাব-অনটন বেশি ছিল রাসুলপরিবারে। আর এ সময়টাতে আয়েশা ছায়াসঙ্গী হয়ে ছিলেন রাসুলের। দারিদ্র্যের প্রবল কশাঘাতের প্রতিটি ক্লান্তিকর দিন শেষে তিনি রাসুলকে আগলে নিতেন চপলা ভালোবাসার পরশে। মদিনায় তখন কেবলই ভিত্তি স্থাপিত হচ্ছিল নতুন এক ইসলামি রাষ্ট্রের। নতুন একটি রাষ্ট্র গঠনের মহাভার কাঁধে নিয়ে কাটত রাসুলের পুরোটা দিন। সন্ধেবেলা যখন ঘরে ফিরতেন, আয়েশার মায়াময় মুখটা রাসুলের মনে ছড়িয়ে দিত এক পশলা মৃদু সমীরণ। রাসুল আবার যেন উজ্জীবিত হতেন নতুন প্রেরণা নিয়ে। এ কারণে তিনি আয়েশার অবদানকে অন্য সব স্ত্রীর তুলনায় এগিয়ে রাখতেন সব সময়।

একবারের ঘটনা। রাসুলের সঙ্গে আয়েশার বিয়ে হওয়ার কিছুদিন পরের কথা। রাসুল ও আয়েশা দুজনই দিনমান উপবাসী। সারা দিন পেটে কিছু পড়েনি। এমন সময় এক পারসিক প্রতিবেশী রাসুলকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতে এলেন। শুধু রাসুলকে, একা।

রাসুল প্রতিবেশীকে বললেন, 'না, আয়েশাও যাবে।'

পারসিক বাড়ি গেল। একটু পর এসে বলল, 'শুধু আপনার নিমন্ত্রণ।'

রাসুল আবার একই কথা বললেন। আয়েশাকে বাড়িতে অভুক্ত রেখে তিনি খেতে পারবেন না। লোকটি আবার বাড়ি গেল। হয়তো তার বাড়িতেও আহারের ব্যবস্থা সামান্য ছিল, যা দিয়ে কেবল রাসুলকে আপ্যায়ন করা যায়। এ কারণে সে বারবার বাড়ি গিয়ে গৃহিণীর কাছে জিজ্ঞেস করছিল–দুজনের জন্য আয়োজন করা যাবে কি না।

অবশেষে তৃতীয়বারও যখন রাসুল আয়েশাকে ছাড়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে অস্বীকৃতি জানালেন, তখন লোকটি বলল, 'আচ্ছা চলুন।'

রাসুল জিজ্ঞেস করলেন, 'আয়েশাকেও নিমন্ত্রণ করছ তো?'

লোকটি হেসে জবাব দিল, 'জি হ্যাঁ।'

অতঃপর রাসুল ও আয়েশা দুজনই পারসিক প্রতিবেশীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গেলেন।

www.pathagar.com

এগারো

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বউ হিসেবে রাসুলের ঘরে আসার কিছুদিন পরের ঘটনা। আয়েশার কিশোরী মনে নানা প্রশ্ন উদয় হয়। নানা অকারণ কৌতূহল দোলা দিয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে। আল্লাহর রাসুল কি সত্যিই তাঁকে ভালোবাসেন? কতটুকু ভালোবাসেন? অন্য স্ত্রীদের চেয়ে কম না বেশি? এ নিয়ে তিনি মনে মনে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতেন। কিন্তু কখনো রাসুলের কাছে জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি। রাসুল যদি আবার অন্য কিছু মনে করেন!

একদিন সাহস করে রাসুলকে জিজ্ঞেস করে ফেললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! সত্যি করে বলুন তো, আপনি আমাকে কতটা ভালোবাসেন?'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একটু চিন্তা করে বললেন, 'তোমার এবং আমার মধ্যে ভালোবাসার বন্ধনটা এমন শক্ত, যেমন একটা রশির মধ্যে সুতাগুলো শক্তভাবে জড়িয়ে থাকে, একই বাঁধনে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা থাকে।'

রাসুলের জবাব শুনে আয়েশা খুশি হলেন। এর পর থেকে প্রায়ই তিনি রাসুলকে জিজ্ঞেস করতেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনার ভালোবাসার বন্ধনের কী অবস্থা? আগের মতোই আছে, নাকি ঢিল হয়ে গেছে?'

রাসুল আয়েশার দুষ্টুমির জবাবে বলতেন, 'ভালোবাসার সে বাঁধন আগের মতোই দৃঢ় আছে। বাঁধনে কোনো দুর্বলতা বা পরিবর্তন আসেনি।'

কী কারণে যেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা একবার খুব রেগে গেছেন। রাগের কারণটা জানা না গেলেও তাঁর গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল ঘরের বাইরে থেকে। ঘরে রাসুল আছেন, রাসুলের সঙ্গেই কী একটা বিষয় নিয়ে যেন রাগারাগি হচ্ছে। আল্লাহর রাসুল আয়েশাকে দু-এক কথা বলছেন বটে, তাতে আয়েশার রাগ কমছে না। তিনি রাগান্বিত অবস্থায় জোরে জোরে কথা বলছিলেন।

আয়েশার পিতা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন সময় ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসুলের সামনে মেয়ের এমন উঁচু গলার কথা শুনে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। রাসুলের সেই ছোটবেলার বন্ধু তিনি। তাঁর সকল সুখে-দুঃখে তিনি ছায়ার মতো সঙ্গে থাকেন, সকল কাজের সিদ্ধান্ত একবাক্যে মাথা পেতে নেন; আজ পর্যন্ত তিনি রাসুলের সামনে উঁচু গলায় কথা বলা তো দূরের কথা, তাঁর কোনো কথার দ্বিমত পর্যন্ত করেননি। আর তাঁর এইটুকুন মেয়ে আয়েশা কিনা রাসুলের সামনে রাগ দেখিয়ে কথা বলছে! দারুণ রাগান্বিত হলেন তিনি।

www.pathagar.com

আবু বকর রাগে ফুঁসে উঠে রাসুলের ঘরের সামনে গিয়ে আয়েশাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'এ আমি কী শুনছি উম্মে রুমানের বেটি, তুমি আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলছ!'

এ কথা বলেই তিনি ঘরের ভেতরে ঢুকে গেলেন। আয়েশাকে শাসন করার জন্য হাত উঠিয়ে তাঁর দিকে তেড়ে গেলেন। আল্লাহর রাসুল জলদি আয়েশাকে ধরে নিজের পেছনে নিয়ে গেলেন। আবু বকর দু-একবার আয়েশাকে থাপ্পড় মারার চেষ্টা করলেন বটে কিন্তু রাসুল তাঁকে আড়াল করে রেখেছেন বলে তাঁর চেষ্ট সফল হলো না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আয়েশাকে পেছনে রেখেই আবু বকরকে নিবৃত্ত করলেন। আয়েশার হয়ে নিজেই তাঁর পক্ষে সাফাই গেয়ে আবু বকরকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। মেয়েকে শাসন করা থেকে বিরত রাখলেন।

রাসুলের সামনে শাসন করতে না পেরে মেয়েকে কয়েকটি ধমক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন আবু বকর।

আবু বকর বের হয়ে যেতেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পিতার শাসনের ভয়ে ভীত আয়েশাকে সামনে নিয়ে এলেন। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখলে, কীভাবে তোমার আব্বার হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করলাম! নয়তো আজকে মার খেয়ে তুমি মাটিতে শুয়ে পড়তে।'

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা লজ্জারাঙা হাসি দিয়ে রাসুলের শোকরিয়া আদায় করলেন। এরপর দুজনই একসঙ্গে হেসে উঠলেন।

আবু বকর বাইরেই ছিলেন সম্ভবত। তাঁদের হাসির শব্দ শুনে আবার তিনি ঘরের দরজায় এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। অনুমতি পেয়ে ভেতরে ঢুকে দুজনকে হাসতে দেখে অভিযোগের সুরে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! কেবলই ঝগড়া আবার এখনই হাসি! আপনাদের হাসির মাঝে আমাকেও সঙ্গী করুন, যেভাবে প্রতিটি যুদ্ধে আপনি আমাকে সঙ্গী করেন।'

বারো

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বয়সে তো রাসুলের অনেক ছোট। দুজনের মধ্যে বয়সের তফাতটা ছিল ঢের। কিন্তু রাসুল এমনভাবে আয়েশার সামনে নিজেকে উপস্থাপন করতেন, যেন তিনি আয়েশার সমবয়সী খেলার সাথি ছাড়া কেউ নন। আয়েশার প্রতি এই যে তাঁর নির্ভরতা, নিজেকে আয়েশার মনের মতো করে উপস্থাপন; এর মধ্যে শিক্ষণীয় যে দীক্ষা উম্মতের জন্য রেখে গেছেন, তা কজনই-বা অনুধাবন করতে পারেন? সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাসুল হয়েও তিনি যখন

www.pathagar.com

আয়েশার কাছে আসতেন, নিজেকে স্রেফ আয়েশার একজন বন্ধু হিসেবে উপস্থাপন করতেন। না প্রবল ব্যক্তিত্বের বাহাদুরির প্রকাশ, না মুরব্বির মতো সর্বক্ষণ মাথার ওপর ছড়ি ঘোরানো। তিনি বরং নিজেকে আয়েশার ভালোবাসার সামনে সমর্পণ করে দিতেন নির্দ্বিধায়।

এ সমর্পণের একটি চিত্র পাওয়া যাবে স্বয়ং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনায়। আয়েশা বলেন, 'এক শীতের রাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে এলেন। ঘরে এসে ইবাদতের জন্য নির্ধারিত স্থানে গিয়ে আমলে মগ্ন হলেন। দীর্ঘক্ষণ তিনি ইবাদতরত রইলেন। এরপর ঠান্ডা লাগায় আমার কাছে চলে আসেন। আমি তখন ঋতুমতী। তিনি আমার পাশে শুয়ে আমাকে বললেন, 'কাছে আসো।'

আমি বললাম, 'আমি তো ঋতুবর্তী!'

তিনি অভয় দিয়ে বললেন, 'কোনো অসুবিধা নেই। তোমার হাত দুটো প্রসারিত করো।'

আমি হাত দুটো ছড়িয়ে দিলে তিনি তাঁর মাথা আমার বুকে গুঁজে দিলেন, আর আমি তাঁকে উষ্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। একসময় এভাবেই আমরা দুজন ঘুমিয়ে পড়লাম।'

অনেক সময় গোসল করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম শীতে কাঁপতে থাকতেন। তখন আয়েশাকে বলতেন তাঁকে একটু উষ্ণতা দেওয়ার জন্য। আয়েশা তাঁকে নিজের শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে উষ্ণতা দিতেন।

আয়েশার ঘরে কম্বল ছিল একটিমাত্র। একটি কম্বলের নিচে দুজন ঘুমাতেন। কখনো কম্বলের একপাশ আয়েশা গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে থাকলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অপর পাশে নামাজ পড়তেন। দিনের বেলা অনেক সময় এটাকে রাসুলের শোয়া বা বসার গদি হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কখনো মেহমান এলে তাদের জন্যও বরাদ্দ হতো এ কম্বল, তাদেরও বসার আয়োজন হয়ে যেত এ কম্বল দিয়েই।

একবার এক আনসারি মহিলা রাসুলের ঘরে এসে দেখলেন, আয়েশা ও রাসুলের শোয়ার বন্দোবস্ত মোটের ওপর একটি কম্বল। তাই তিনি বাড়ি গিয়ে উলের তৈরি একটি মাদুর এনে আয়েশাকে উপহার দিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে এলেন, উলের মাদুরটি দেখে প্রশ্ন করলেন, 'এটা কী, আয়েশা?'

www.pathagar.com

আয়েশা রাসুলের চরিত্র সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল। কিছুটা শঙ্কা নিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! এক আনসারি মহিলা আমাদের ঘরে এসে আপনার বিছানা দেখে এটা উপহার হিসেবে দিয়ে গেছেন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি পছন্দ করলেন না। তিনি বললেন, 'এটা ফেরত দিয়ে দাও। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যদি চাইতাম তাহলে আল্লাহ পাহাড়কে আমার অধীন করে দিতেন এবং যখন চাইতাম তা সোনা-রুপায় পরিণত হয়ে যেত।'

এভাবেই রাসুল অল্পে তুষ্টির পবিত্রতায় গড়ে তুলেছিলেন আয়েশাকে।

ইসলামের ভবিষ্যৎ তখনো কুয়াশাচ্ছন্ন। মদিনায় নতুন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হলে কী হবে, ইসলামের পরবর্তী অধ্যায় কীভাবে রচিত হবে সে ব্যাপারে কেউই আগাম কিছু বলতে পারছিল না। নতুন ধর্ম, নতুন আবাস আর নতুন মানুষদের নিয়ে রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর নতুন সফর শুরু করলেন, তিনি সত্যি জানতেন না এ পথ শেষ পর্যন্ত কোন মঞ্জিলে গিয়ে শেষ হবে। মক্কা বা বাইরের শত্রু তো রয়েছেই, নতুন আবাস মদিনাতেও রয়ে গেছে অসংখ্য বিভীষণ।

ঠিক এ মুহূর্তে রাসুলের জীবনে এমন একজন বুদ্ধিমতী, মেধাবী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীর প্রয়োজন ছিল, যিনি সব দিক থেকে রাসুলকে ভালোবাসা ও প্রেরণা দিয়ে উজ্জীবিত করে রাখবেন।

শুধু তা-ই নয়, হিজরতের পরবর্তী সময়কালটা ইসলাম প্রসারের জন্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায়। এ সময়টাতে এমন একজন মহীয়সী নারীর প্রয়োজন ছিল, যিনি রাসুলের প্রতিটি কথা ও কাজকে খুব কাছ থেকে দেখতে পারবেন এবং পরবর্তী অনুসারীদের জন্য সেসব নিজের ভেতরে আত্মস্থ করতে পারবেন। সংগত কারণেই, তিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা।

মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি রাসুলের ঘরে আসেন। একেবারেই কিশোরী, সাধারণ বিচার-বুদ্ধির বয়সও হয়তো হয়নি তখন। কিন্তু নিজের মেধা, বুদ্ধিমত্তা, ভালোবাসা, প্রেমাবেগ দিয়ে তিনি আগলে রেখেছিলেন রাসুল মুহাম্মদকে। একাধারে নয়টি বছর তিনি রাসুলের ছায়াছবিকে নিজের সত্তায় ধারণ করেছেন। রাসুলের প্রতিটি আচার-আচরণ, প্রতিটি আবেগ-কান্নাকে তিনি হৃদয়ের গভীরতা দিয়ে শুধু অনুধাবনই করেননি, পরবর্তী উম্মতের জন্য এক অনিঃশেষ আধার হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন। রাসুলের আর কোনো স্ত্রী এভাবে রাসুলকে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করতে পারেননি।

www.pathagar.com

তেরো

এমন নয় যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দারিদ্র্যকে উপভোগ করতেন। বরং তিনি দারিদ্র্য দিয়ে তাঁর পরিবারকে এমন ছাঁচে ঢেলে গড়ে তুলতে প্রত্যাশী ছিলেন, যাতে পরবর্তী উম্মত সম্পদের মোহে পড়ে নিজেদের ঈমান ও আমলকে বিনষ্ট করে না ফেলে। মানুষ নিঃস্ব হয়ে পৃথিবীতে আগমন করে এবং নিঃস্ব হয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়–এ বোধ ও বিশ্বাস যেন তাঁর অনুসারীদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়, সে জলজ্যান্ত প্রতিচ্ছবি তিনি এঁকে দিয়েছিলেন উম্মাহাতুল মুমিনিনদের ঘরে ঘরে।

একদিন রাসুল দোয়া করছিলেন, 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে নিঃস্বদের সঙ্গে থাকতে দিন, নিঃস্ব হিসেবে আমার মৃত্যু দিন এবং কিয়ামতের দিন আমি যেন নিঃস্ব হয়েই আপনার সামনে দাঁড়াতে পারি।'

আয়েশা রাসুলের এমন আবেদন শুনে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এমন কেন বলছেন, হে আল্লাহর রাসুল?'

রাসুল জবাব দিলেন, 'কারণ হলো, নিঃস্বরা ধনীদের চেয়ে ৪০ বছর আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। হে আয়েশা! গরিব ও অসহায়দের ভালোবাসো, তাদের নিজের কাছাকাছি রাখো, তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহও তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন।'

এমন দুনিয়াবিমুখ আগ্রহ তিনি তাঁর পরিবারের মাঝেও ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াসী ছিলেন।

রাসুলের মনোতুষ্টির জন্য আয়েশা মাঝেমধ্যে এক-আধটু সাজগোজও করতেন। ওইটুকুন মেয়ে, একটু সাজগোজের ইচ্ছা হওয়াটা তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।

একদিন আয়েশা দুই হাতে দুটো স্বর্ণের চুড়ি পরেছিলেন। হয়তো কেউ উপহার হিসেবে দিয়েছিল অথবা কোনো যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে হস্তগত হয়েছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘরে এসে আয়েশার হাতে স্বর্ণের চুড়ি দুটি দেখে একটু অপছন্দ করলেন। এ পার্থিব বাহুল্যটুকু থেকেও তিনি তাঁর প্রিয়তমাকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হলেন। বললেন, 'আয়েশা, তুমি কি চাও আমি তোমাকে এর চেয়ে ভালো কোনো পদ্ধতি বাতলে দেব? তুমি যদি স্বর্ণের চুড়ি দুটি দান করে তার বদলে রুপার চুড়িতে সেফরন রং (দেখতে স্বর্ণের মতো) মেখে নাও, তাহলে সেটাই তোমার জন্য উত্তম হবে।'

আয়েশা কোনো অজুহাত পেশ না করে তা-ই করলেন।

www.pathagar.com

একদিন তিনি হাতের আঙুলে একটি রুপার আংটি পরেছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘরে এসে আয়েশার হাতে আংটিটি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কী পরেছ, আয়েশা?'

তাঁর কথার মধ্যে খানিকটা অপছন্দের সুর ছিল। আয়েশা জলদি উত্তর দিলেন, 'আমি এটা পরেছি আপনার দৃষ্টিতে আমাকে ভালো লাগার জন্য।'

রাসুল বললেন, 'এগুলো যে পরেছ, তুমি কি এগুলোর জাকাত দিয়েছ?'

আয়েশা বুঝতে পারলেন রাসুল কী বোঝাতে চাচ্ছেন।

আয়েশা বলেন, 'রাসুল যেদিন এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর মহান বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হন, সেদিনও এক বাটি যব ছাড়া রাসুলের ঘরে কোনো খাবার ছিল না। সে এক বাটি যবও এক ইহুদির কাছে রাসুলের ঢালটি বন্ধক রেখে আনা হয়েছিল।'

চৌদ্দ

এক রাতের কথা। রাসুল ও আয়েশা ঘুমিয়ে ছিলেন। রাসুল যখন বুঝতে পারলেন আয়েশা ঘুমিয়ে গেছেন, সন্তর্পণে গায়ের চাদর সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়লেন। পায়ের কাছ থেকে গায়ে দেওয়ার চাদর ও জুতো উঠিয়ে দরজার দিকে গেলেন। যেন কোনো শব্দ না হয়, আস্তে করে দরজা খুললেন। একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন আয়েশার ঘুম ভেঙেছে কি না। যখন নিশ্চিত হলেন আয়েশার ঘুম ভাঙেনি, একা একা বাইরে বেরিয়ে এলেন।

আয়েশা ঘুমাননি। তিনি ঘুমের ভান করে শুয়ে ছিলেন এতক্ষণ। আল্লাহর রাসুল মাঝেমধ্যে গভীর রাতে কোথায় যেন চলে যান, বেশ কিছুক্ষণ পর ফিরে আসেন। আয়েশা আগেও কয়েকবার এমনটি দেখেছেন। আয়েশার বিছানা থেকে অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে গেলে রাসুল সাধারণত তাঁর অনুমতি নিয়ে যান। কিন্তু মাঝরাতে হঠাৎ হঠাৎ কোথায় যেন যান। তাই আজ মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন–রাতের বেলা রাসুল কোথায় যান, সেটা তিনি স্বচক্ষে দেখবেন।

হাজার হলেও আয়েশা একজন নারী। নারীর সাধারণ বিচার-বুদ্ধি দ্বারাই তাঁর চিন্তাভাবনা পরিচালিত হয়। অন্যদিকে তাঁর বয়সও নেহাত কম, রাসুলকে ভালোবাসতেন সীমাহীন। নিজের ভালোবাসার অধিকার অন্য কাউকে দিতে তিনি রাজি ছিলেন না। যেদিন তাঁর পালা আসত, সেদিন রাসুলের সান্নিধ্যের

www.pathagar.com

প্রতিটি মুহূর্ত তিনি নিজের করে নিতে চাইতেন। রাসুলের অন্য স্ত্রীদের চেয়ে তাই তাঁর মনে অভিমান ও ঈর্ষাও খানিকটা বেশি ছিল।

তিনি ভেবেছিলেন, রাসুল হয়তো তাকে ঘুমন্ত রেখে অন্য কোনো স্ত্রীর সঙ্গে সময় কাটাতে গেছেন। একজন সাধারণ নারীর মনে এমন চিন্তার উদ্ভব হওয়াটা মোটেও দোষের কিছু নয়। বিশেষত রাসুলের একাধিক স্ত্রী থাকায় তাঁর অন্তরে এমন প্রশ্ন উদয় হওয়াটা স্বাভাবিক।

আর তা ছাড়া আয়েশা ছিলেন সেই কৌতূহলী নারীশিক্ষার্থী, যিনি নবুওয়াতের প্রতিটি জ্ঞান, প্রজ্ঞা, রহস্য সম্পর্কে জানতে ছিলেন সদা উন্মুখ। রাসুলের প্রতিটি কাজের তিনি যেন আয়না ছিলেন। বিশেষ করে, রাসুলের পারিবারিক এবং সাংসারিক প্রতিটি কাজ, কথা, নির্দেশ, সম্মতিকে তিনি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণই শুধু করতেন না, সেগুলোকে নিজের মধ্যে নিরঙ্কুশভাবে ধারণ করতেন। এ কারণে রাসুলের প্রতিটি পদক্ষেপকে তিনি কৌতূহল নিয়ে দেখতেন এবং সেভাবেই জীবন পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ হতেন।

আল্লাহর রাসুল ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই আয়েশা বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। অন্ধকার রাত। কোনো শব্দ না করে দরজা খুলে দূর থেকে রাসুলের পেছন পেছন যেতে লাগলেন। আজ তিনি রহস্যের উন্মোচন করতে চলেছেন। নিজ চোখে দেখতে চান আল্লাহর রাসুল রাতের বেলা কোথায় যান।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এগিয়ে চলেছেন। চলতে চলতে তিনি মসজিদে নববি থেকে একটু দূরে অসংখ্য সাহাবির কবরগাহ জান্নাতুল বাকিতে এসে পৌঁছালেন।

জান্নাতুল বাকিতে পৌঁছে আল্লাহর রাসুল বেশ কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর আকাশের দিকে দুই হাত উত্তোলন করে কান্নাভেজা কণ্ঠে সমাধিস্থ স্বজন ও অনুসারীদের জন্য দোয়া করতে লাগলেন।

আয়েশা দূরে দাঁড়িয়ে রাসুলের দোয়ার দৃশ্য দেখছিলেন। রাসুল দোয়া শেষ করে যখন আবার ফিরতি পথ ধরলেন তখন আয়েশাও দ্রুত ফিরে আসতে লাগলেন। তিনি যে লুকিয়ে রাসুলের পেছনে চলে এসেছেন এবং এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাসুলকে দেখেছেন, এটা কিছুতেই রাসুলকে জানতে দিতে চাচ্ছেন না। তাই দৌড়ে রাসুলের আগে ঘরে এসে চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। রাসুল এসে যেন বোঝেন আয়েশা ঘুমিয়েই ছিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘরে এসে পা টিপে টিপে আবার চাদরমুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। শুয়েই বুঝতে পারলেন আয়েশার শ্বাস-প্রশ্বাস অস্বাভাবিক, তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে, বুক দ্রুতবেগে ওঠানামা

www.pathagar.com

করছে। তিনি পাশ ফিরে ভালোবাসার সুরে আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আয়েশা, কী হয়েছে তোমার? তোমাকে ভীতসন্ত্রস্ত মনে হচ্ছে।'

আয়েশা নিজেকে সুস্থির করার চেষ্টা করে জবাব দিলেন, 'না, কিছু হয়নি!'

রাসুল কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই আবারও জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু তো অবশ্যই হয়েছে। তুমি নিজে থেকে বলবে নাকি সর্বজ্ঞ আল্লাহ আমাকে বলে দেবেন?'

আয়েশা এবার পাশ ফিরে রাসুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক!' এরপর তিনি নিজের কৃতকর্ম রাসুলের সামনে খুলে বললেন।

রাসুল আয়েশার এমন ছেলেমানুষির কথা শুনে বলে উঠলেন, 'ও আচ্ছা, ওই প্রতিচ্ছায়া কি তাহলে তোমারই ছিল, যা আমি আমার সামনে ধাবমান দেখেছিলাম?'

আয়েশা লজ্জাবনত হয়ে জবাব দিলেন, 'হুম, আমিই ছিলাম।'

রাসুল খুনসুটি করে আয়েশাকে চিমটি কাটলেন। আয়েশা মৃদু ব্যথায় হেসে উঠলেন।

এরপর রাসুল বললেন, 'কখনো এমন ধারণা করো না যে আল্লাহর রাসুল তোমার সঙ্গে বেইনসাফি করবেন।'

আয়েশা নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়ে বললেন, 'মানুষ যতই তার বিষয় গোপন রাখুক, আল্লাহ তো সব বিষয়েই অবগত।'

রাসুল এবার পুরো বিষয়টি খোলাসা করে বললেন, 'সেটা অবশ্যই সত্য।'

আরেক দিন। রাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আয়েশার সঙ্গে ঘুমিয়ে ছিলেন। মাঝরাতে হঠাৎ আয়েশার ঘুম ভেঙে গেল। নিশুতি রাত, চারদিকে নিকষ অন্ধকার। আয়েশা রাসুলের সান্নিধ্য পাওয়ার আশায় বিছানায় হাত রাখলেন। রাসুল নেই। তিনি বিছানা পুরোটা হাতড়াতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও রাসুলকে পেলেন না। তাঁর কিশোরী মনের মধ্যে অভিমান জমে উঠল। মনে মনে ভাবলেন–নিশ্চয় রাসুল তাঁকে ঘুমের মধ্যে রেখে অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে গেছেন।

তিনি মনঃকষ্ট নিয়ে বিছানা থেকে নামতে যাবেন এমন সময় তাঁর হাত রাসুলের পা স্পর্শ করল। তিনি ভালোভাবে এগিয়ে দেখেন রাসুল সেজদায় অবনত হয়ে মোনাজাত করছেন। তিনি আল্লাহর রাসুলের মোনাজাত শুনলেন :

www.pathagar.com

'হে আমার প্রভু! আমি আপনার ক্ষোভের পরিবর্তে আপনার সন্তুষ্টি কামনা করি। আপনার শাস্তির বদলে চাই ক্ষমা। আমি সর্বদা আপনার কাছেই আশ্রয় চাই। আপনি আপনার যে রকম প্রশংসা করতে বলেছেন, আমি সে রকম করতে অক্ষম।'

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজের ভুল ধারণা বুঝতে পেরে হায় হায় করে উঠলেন। নিজের কাজের জন্য ভারী লজ্জিত হলেন। মরমে মরে যেতে ইচ্ছে হলো তাঁর। রাসুলের দিকে ফিরে বললেন, 'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আমি কোন ধারণা করছি, আর আপনি আছেন কোন অবস্থায়!'

পনেরো

রাসুলের স্ত্রী সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা চমৎকার রান্না করতে পারতেন। রাসুল যেদিন তাঁর সঙ্গে থাকতেন, সেদিন তিনি রাসুলকে উপাদেয় খাবার রান্না করে খাওয়ানোর চেষ্টা করতেন। আল্লাহর রাসুল তাঁর রান্নার প্রশংসা করতেন বরাবর। এ কারণে অনেক সময় তিনি রাসুলের জন্য এটা-সেটা রান্না করে পাঠাতেন, রাসুল অন্য স্ত্রীদের ঘরে থাকলেও।

সেদিন রাসুল আয়েশার সঙ্গে ছিলেন। আয়েশার ঘরে বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন। সাফিয়্যাহর ঘরে সম্ভবত ভালো কোনো খাবার রান্না হয়েছিল। এ কারণে তিনি তাঁর দাসীর হাতে করে এক পাত্র খাবার আয়েশার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

বিষয়টি একেবারেই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এতে দারুণ অপমানিত বোধ করলেন। একে তো রাসুলের প্রতি তাঁর ভালোবাসায় তিনি কাউকে অংশীদার হতে দিতে চাইতেন না, আবার বয়স কম হওয়ায় তাঁর মনের মধ্যে অভিমানও ছিল তীব্র। তিনি দাসীর হাত থেকে খাবারের পাত্র কেড়ে নিয়ে এমনভাবে ছুড়ে মারলেন, মাটির পাত্র ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল।

সাফিয়্যার দাসী এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উভয়ে আয়েশার এমন কাজে হতভম্ব হয়ে গেলেন। রাসুল আয়েশার রাগান্বিত মূর্তি দেখে কিছু না বলে নিজেই ভাঙা পাত্রের টুকরোগুলো জড়ো করতে লাগলেন। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সাফিয়্যার দাসীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমার আম্মাজানের রাগ দেখেছ?'

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসুল সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহার দাসীকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় করে দিলেন।

কিছুক্ষণ পর আয়েশার রাগ কিছুটা কমল। মাথা ঠান্ডা হলে বুঝতে পারলেন, তিনি যা করেছেন সেটা করা উচিত হয়নি। নিজের এমন কাজের জন্য অনুশোচনা হতে লাগল। অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগলেন।

রাসুলের সামনে এসে নিজের অনুশোচনার কথা ব্যক্ত করে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! বলুন না, এই অপরাধের মাশুল কী হতে পারে?'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আয়েশার অনুতাপ বুঝতে পেরে হাসিমুখে বললেন, 'এমন একটা পাত্র এবং এমন খাবারই তবে তাকে ফিরিয়ে দিয়ো।'

আয়েশা রাসুলের কথামতো সাফিয়্যাকে তেমনই একটা পাত্র জোগাড় করে ফেরত দেন এবং নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করেন।

ষোলো

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা 'হারিরা' (আটা, দুধ, ঘি ও মিষ্টান্নের মিশ্রণে তৈরি একধরনের আরবীয় খাবার) রান্না করেছেন। রাসুলের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করেছেন। তিনি পছন্দ করেন এ খাবার।

কিছুক্ষণ পর ঘরে এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হারিরা খেতে বসলেন। ঘরে সে সময় রাসুলের আরেক স্ত্রী সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহাও ছিলেন। আয়েশা তাঁকেও খেতে বললেন।

সাওদাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন আয়েশা। কেননা তিনি তাঁর পালার দিনটি আয়েশাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া তাঁর যখন বিয়ে হয়, তখন একমাত্র সাওদাই ছিলেন রাসুলের দ্বিতীয় স্ত্রী। সাওদা পরিণিতা হওয়ায় ছোট্ট আয়েশাকে ঘর-সংসারের অনেক বিষয় শিখিয়ে-পরিয়ে দিতেন। এ কারণে সাওদাকে যথেষ্ট সম্মান করতেন আয়েশা।

আয়েশা সাওদাকে হারিরা খেতে বললে তিনি খাবেন না বলে জানালেন। কিন্তু আয়েশা নাছোড়বান্দা, তিনি সাওদাকে খাওয়াবেনই। সাওদার বারংবার অস্বীকৃতি শুনে আয়েশা বললেন, 'আপনাকে অবশ্যই খেতে হবে। যদি না খান, তবে এ হারিরা আমি আপনার মুখে মাখিয়ে দেব।'

এমন হুমকি দেওয়ার পরও সাওদা রাজি হলেন না। আয়েশা আর দেরি করলেন না, হাতের আঙুলে কিছুটা হারিরা নিয়ে সত্যি সত্যি সাওদার মুখে মাখিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

তাঁদের এমন কাণ্ড দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হেসে উঠলেন। দারুণ আমোদিত হলেন আয়েশার ছেলেমানুষি খুনসুটিতে। তিনি সাওদাকে বললেন, 'এবার তুমিও আয়েশার মুখে হারিরা মাখিয়ে দাও।'

সাওদাও দেরি করলেন না, হাতের মধ্যে কিছুটা হারিরা নিয়ে আয়েশার চেহারায় মাখিয়ে দিলেন। আয়েশার হারিরামাখা চেহারা দেখে রাসুল ফের হেসে ফেললেন। চেহারায় হারিরা নিয়ে রাসুলের দুই স্ত্রীও হেসে একে অপরের গায়ে পড়তে লাগলেন।

এমন সময় ঘরের বাইরে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আগমনের শব্দ শোনা গেল। তিনি তাঁর ছেলেকে 'হে আবদুল্লাহ হে আবদুল্লাহ' বলে ডাকছিলেন। রাসুল মনে করলেন, উমর তাঁর কাছে আসার অনুমতি চাইতে পারে। কেননা রাসুলের ঘরের কাছে এসে উমর তাঁর সঙ্গে দেখা না করে যাবেন না। উমর মেয়েলোকের এমন খুনসুটি একদম পছন্দ করেন না। এ কারণে তিনি দুই বধূকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, 'যাও, জলদি মুখ ধুয়ে নাও। উমর আসতে পারে।'

আরেক দিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ঘরের সামনে অজু করছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে তাঁকে পাশ কাটিয়ে মসজিদে নববির দিকে যাচ্ছিলেন। আয়েশা দুষ্টুমি করে পেছন থেকে রাসুলের শরীরে পানি ছিটিয়ে দিলেন। রাসুলও দেরি করলেন না, তিনি আরেকটি পাত্র থেকে পানি নিয়ে আয়েশার শরীরে ছিটিয়ে দিলেন। দুজনের এমন খুনসুটিতে দুজনই হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে রাসুল বললেন, 'দেখো আয়েশা, আমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করিনি বরং বদলা নিয়েছি। আর বদলা নেওয়ার ব্যাপারে তো কুরআন শরিফেই বলা হয়েছে।'

আরেক দিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘরের পাশে লাকড়ি জড়ো করছিলেন। আয়েশা কাছেই ছিলেন। ছুড়ে দেওয়া একটি ছোট লাকড়ি ভুলক্রমে আয়েশার পায়ের ওপর পড়ল। তিনি অতটা ব্যথা না পেলেও ব্যথা পাওয়ার ভান করে রাসুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে রাসুল! বদলা নেওয়া কি জায়েজ আছে?'

তিনি আয়েশার কথার মর্ম বুঝতে পারলেন। মুচকি হেসে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, বদলা নেওয়া তো অবশ্যই জায়েজ। তবে অনিচ্ছাকৃত হয়ে গেলে তো সেটা ধর্তব্য নয়।'

www.pathagar.com

মোটেও কাঠখোট্টা দাম্পত্যজীবন ছিল না এ দুজনের। আরবের অন্য লোকজন যেভাবে স্ত্রীকে যন্ত্রবিশেষ মনে করত, রাসুল কস্মিনকালেও স্ত্রীদের সঙ্গে এমন যন্ত্রসুলভ ব্যবহার করতেন না। যথেষ্ট আনন্দ, প্রেম, ভালোবাসা ছিল তাঁদের সাংসারিক জীবনে। মূলত রাসুলই ছিলেন এ আনন্দের অপরিমেয় উৎস।

সতেরো

নারীমনের ভালোবাসা বড় অদ্ভুত জিনিস। একবার যাকে হৃদয়ের সিংহাসনে বসাবে, দুনিয়ার সকল কিছু তার সামনে তুচ্ছ হয়ে যায়। হোক ভালোবাসার মানুষটি বয়সে ঢের বড়, হোক সে নিঃস্ব কিংবা দেখতে ভারিক্কি। নারীর ভালোবাসার সামনে এর কোনো কিছুই বিবেচ্য নয়। ভালোবাসার মানুষের সামান্য অপমানও সে সহ্য করতে পারে না।

একবার এক ইহুদি এল রাসুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু ইহুদি তো ইহুদিই, তাদের মনের মধ্যে সব সময় কোনো না কোনো কূটচাল কাজ করে। রাসুলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে একপর্যায়ে কোনো বিষয়ে ইহুদি লোকটি অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। সে রাসুলকে অভিশাপ দিয়ে বলল, 'আল্লাহ আপনার মৃত্যু দান করুক!'

আয়েশা পাশেই ছিলেন। ইহুদির মুখ থেকে এমন কথা শুনে তিনি নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। তখনই ইহুদির সামনে দাঁড়িয়ে তার চোখের দিকে আঙুল তুলে বলে উঠলেন, 'তুমি কোথাকার কে যে আল্লাহর রাসুলের মৃত্যু কামনা করছ? তোমার ওপরই অভিশাপ পতিত হোক, মৃত্যু হোক তোমার!'

আয়েশার এমন রণমূর্তি দেখে ইহুদি ভড়কে গেল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামও আয়েশার রুদ্রমূর্তি দেখে তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন, 'আয়েশা, শান্ত হও! আল্লাহ আমাদের পরম বন্ধু। তিনি সব বিষয়ে আমাদের তাঁর ভালোবাসার চাদরে ঢেকে নেন। যারা মন্দ আচরণ করে, তাদের তিনি মোটেও ভালোবাসেন না। তাদের রহমত থেকে বঞ্চিত করেন।'

সহধর্মিণী তো এমনই হওয়া উচিত। স্বামীর সামান্য অপমানে যার অন্তর ব্যথায় জ্বলে উঠবে। স্বামীর আনন্দে যে নিজেকে সবচেয়ে সুখী ভাববে। আয়েশা তো সেই নারীমূর্তিরই প্রবল প্রতিচ্ছবি ছিলেন।

www.pathagar.com

আঠারো

আয়েশার সংসারে একজন নয়, দুজন নয়-নয়জন সতিন ছিলেন! সবার সঙ্গে ভালোবাসা ভাগাভাগি করাটা তাঁর জন্য বেশ পীড়াদায়ক ছিল। কখনো কখনো ভালোবাসার ভাগাভাগি অম্ল-মধুর ঘটনার অবতারণা করত।

এক সফরে রাসুলের সঙ্গে আয়েশা ও হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা দুজনই সঙ্গী ছিলেন। দূরের সফর, দিনভর কাফেলা চলতে লাগল। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর রাসুল যাত্রাবিরতি করলেন।

হাফসা ও আয়েশা দুজন আলাদা আলাদা উটে ছিলেন। কাফেলা থামতেই দুজন যাঁর যাঁর হাওদা থেকে নেমে এক জায়গায় বসে গল্পগুজব করতে লাগলেন। রাসুল তখন আশপাশে ছিলেন না। কাফেলার সবার তদারকি করে তারপর তিনি স্ত্রীদের কাছে আসবেন।

গল্প করতে করতে হাফসার মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি দুষ্টুমির ছলে আয়েশাকে বললেন, 'চলুন, আমরা আমাদের নিজেদের উট বদলাবদলি করি। আমি আপনার হাওদায় চড়ে বসে থাকি, আর আপনি আমার হাওদায় চড়ে বসে থাকুন। দেখি, রাসুল এসে কী করেন!'

বুদ্ধিটা আয়েশার পছন্দ হলো। যদিও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন রাসুল প্রথমে তাঁর কাছেই আসবেন, তবু খানিকটা খুনসুটি তো করা যাবে। আর হাফসাও জানতেন, প্রথম রাতটি রাসুল অবশ্যই আয়েশার সঙ্গে কাটাবেন। তিনিও রাসুলের সঙ্গে একটু হাস্যরসের সুযোগ পাবেন।

আয়েশা ও হাফসা দুজন নিজেদের হাওদা অদল-বদল করে একে অপরের হাওদায় গিয়ে বসে রইলেন। আয়েশার বুক দুরু দুরু করে কাঁপছে, রাসুল তাঁকে চিনতে পারবেন তো? মনের মধ্যে দুশ্চিন্তার ঝড় শুরু হয়ে গেছে, রাসুল যদি তাঁকে না চিনে সত্যি সত্যি আজকের রাতটি হাফসার সঙ্গে কাটিয়ে দেন? আজকের রাতটি কি তবে তাঁর বিফলেই যাবে? তাঁর ভীষণ কান্না পেল।

একটু পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের উটের দিকে এগিয়ে এলেন। রাসুলকে আসতে দেখে আয়েশার হৃৎস্পন্দন যেন থেমে যাওয়ার জোগাড়। কিন্তু রাসুল তো আর স্ত্রীদের খুনসুটির ব্যাপারে জানেন না। তিনি সরাসরি আয়েশার হাওদার দিকে এগিয়ে গেলেন। হাওদার পর্দা সরিয়ে ভেতরে তাকাতেই দেখেন সেখানে হাফসা বসে আছেন। ভেতরে ঢুকে হাফসাকে দেখে তিনি সালাম দিয়ে সেখানেই বসে পড়লেন।

এদিকে আয়েশার মনের অবস্থা ততক্ষণে জলীয় বাষ্পের মতো ফুটতে শুরু করেছে। রাসুলের বিরহ তিনি আর সইতে পারছিলেন না। এ যেন নিজের পায়ে

www.pathagar.com

নিজে কুড়াল মারার মতো অবস্থা। তিনি হাফসাকেও কিছু বলতে পারছেন না, আবার রাসুলকেও কিছু বলতে পারছেন না।

অগত্যা কাঁদতে কাঁদতে হাওদা থেকে বাইরে বের হয়ে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন। কান্নাভেজা কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'হে আমার প্রভু! আপনি একটি সাপ বা বিচ্ছু পাঠিয়ে দিন, সেটি এসে আমাকে দংশন করুক। রাসুল চলে গেলেন অথচ আমি তাঁকে কিছুই বলতে পারছি না।'

আরেক দিন রাতের বেলা। রাসুল ঘরে নেই। রাসুলের আরেক স্ত্রী জয়নব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা কোনো কারণে আয়েশার ঘরে এসেছেন। দুজনে বসে গল্প করছিলেন। ঘরে বাতি নেই, অন্ধকারেই বসে ছিলেন দুজন।

একটু পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘরে এলেন। ঘরে বাতি নেই বিধায় তিনি জানতেন না ভেতরে কে কে আছে। তিনি ঘরে ঢুকে যেখানে জয়নব বসে আছেন সেদিকে গেলেন। এটা দেখে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'ওখানে জয়নব।'

কথাটা শুনে জয়নবের মোটেও ভালো লাগল না। তিনি অত্যন্ত আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মহিলা ছিলেন। খানিকটা রাগীও ছিলেন। আয়েশার এমন কথায় তিনি রেগে গিয়ে আয়েশাকে দু-চার কথা শুনিয়ে দিলেন। জয়নবের কথার পিঠে আয়েশাও প্রত্যুত্তর দিলেন।

ঘরের বাইরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে দাঁড়ানো, এটা আয়েশা বুঝতে পারেননি। মেয়ের এমন মুখে মুখে কথা শুনে তিনি মেয়েকে শাসন করার নিমিত্তে তখনই রাসুলকে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! বাইরে আসুন!'

ঘরের বাইরে পিতার রুদ্রমূর্তি শুনে আয়েশা একদম চুপ হয়ে গেলেন। আর একটা কথাও বললেন না।

উনিশ

আয়েশার ঘরে কয়েক দিনের উপোস চলছে। আয়েশা ও রাসুল দুজনই কয়েক দিন ধরে উপবাসী। ঘরে চুলো জ্বলছে না বেশ কদিন ধরে। শুধু পানি ছাড়া ঘরে খাবার বলতে কিছু নেই আর।

এমন সময় এক সাহাবি এলেন আয়েশার ঘরে। আল্লাহর রাসুলের জন্য কয়েকটি খেজুর নিয়ে এসেছেন হাদিয়াস্বরূপ। খেজুরের পরিমাণও সামান্য–আট থেকে দশটি খেজুর হবে বড়জোর। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সাদরে বরণ করলেন খেজুরের উপহার।

www.pathagar.com

রাসুল ঘরে ছিলেন না। আয়েশা রাসুলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন, রাসুল এলে একসঙ্গে ভাগাভাগি করে খাবেন এ সামান্য ক'টি খেজুর। রাসুলের সঙ্গে বসে দুটো খেজুর খেতে পারারও যে সুখ, তার তুলনা পৃথিবীর আর কিছুর সঙ্গে চলে না। পৃথিবীতে এর চেয়ে পরম আরাধ্য সুখ আর কিছু নেই আয়েশার কাছে। রাসুলের মুখে একটু অন্ন তুলে দেওয়ার মাঝে যে আত্মিক প্রশান্তি, রাসুলের চেহারায় একটু হাসি ফোটানোর মাঝে যে স্বর্গীয় আনন্দ–এর বিনিময়ে পুরো পৃথিবী বাজি ধরা যায়।

আয়েশা রাসুলের পথ চেয়ে বসে রইলেন।

খানিক বাদে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘরে এলেন। শরীর তাঁর ক্ষুধায় ক্লিষ্ট, চোখ-মুখ উপোসের যন্ত্রণায় রুগ্ণ, চলনক্ষমতা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ক্ষুধাতুর শরীর নিয়ে ঘরে এসে রাসুল নিজেকে আয়েশার কোলে সঁপে দিলেন।

রাসুলকে দেখে আয়েশার হৃদয়টা হাহাকার করে উঠল। চোখ ভরে উঠল বোবাকান্নায়। যে রাসুল শুধু একবার চাইলে রোম-পারস্যের সকল বিভূতি-বিলাস মুহূর্তে নিজের করে নিতে পারতেন, যিনি চাইলে হতে পারতেন পৃথিবীর সবচেয়ে বিত্তশালী নবি, যাঁকে সোনা-রুপা, বাড়ি-নারী, হীরা-মোতির বৈভবে ভরিয়ে দেওয়ার জন্য ফেরেশতারা সর্বদা উন্মুখ হয়ে আছেন; সেই তিনি আজ ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ঘরের মেঝেতে বসে পড়েছেন। সেই তিনি আজ কয়েক দিনের উপবাসী জঠরজ্বালায় পেটে পাথর বেঁধে রেখেছেন। এমন দৃশ্য দেখে আয়েশার বুকটা ফেটে যেতে চাইল। রাসুলের এমন কষ্ট তাঁর যে সহ্য হয় না। আহা! যদি তিনি নিজের কলজেটা রাসুলের সামনে পেশ করতে পারতেন!

আয়েশা জলদি একটা থালায় করে হাদিয়া পাওয়া খেজুরগুলো রাসুলের সামনে রাখলেন। রহমাতুল্লিল আলামিন দীর্ঘ উপবাসের পর এমন সুস্বাদু কয়েকটি খেজুর দেখে আল্লাহর শোকর আদায় করলেন।

রাসুলকে খেতে দিয়ে আয়েশা পাশে বসে রইলেন। তিনি ক্ষুধার্ত রাসুলের খাওয়া দেখছেন বসে বসে। কয়েকটি খেজুর খেয়েও রাসুলের চেহারায় তৃপ্তির যে ছায়া তিনি দেখতে পাচ্ছেন, এর বিনিময়ে বেহেশতও যেন তাঁর কাছে তুচ্ছ। আল্লাহর রাসুল আগ্রহভরে খেজুর খাচ্ছেন আর পাশে বসে আয়েশা তৃপ্তনয়নে রাসুলের মুখপানে তাকিয়ে আছেন। রাসুল একেকটা খেজুর খাচ্ছেন আর রাসুলের সঙ্গে সঙ্গে আয়েশার ক্ষুধাও যেন নিমেষে দূর হয়ে যাচ্ছে। রাসুলের তৃপ্ত মুখ দেখে আয়েশার চোখ জলে ভরে যায়।

www.pathagar.com

রাসুল ক্ষুধার্ত ছিলেন, ক্ষুধার তাড়নায় মনে ছিল না যে আয়েশা খেয়েছেন নাকি খাননি। তাই আয়েশা খেজুরগুলো দেওয়ার পরপরই বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন আয়েশা হয়তো আগেই খেয়ে নিয়েছেন। তবু তাঁকে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ততক্ষণে রাসুল খাওয়া শেষ করে ফেলেছেন। জঠরের দীর্ঘ উপবাস প্রশমন করতে সবগুলো খেজুরই খেয়ে ফেলেছেন।

খাওয়া শেষ করে হঠাৎ রাসুলের মনে হলো, আয়েশা কি খেয়েছে? তিনি আয়েশার দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'আয়েশা, তুমি কি খেজুর খেয়েছ?'

আয়েশা নিজের ক্ষুধাকে আড়াল করে তৃপ্ত হেসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার চিন্তা করবেন না। আমার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টিই যথেষ্ট।'

আয়েশার কথা শুনেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বুঝে নিলেন, আয়েশা একটি খেজুরও খাননি। তিনি এতক্ষণ তাঁর অপেক্ষায় ছিলেন একসঙ্গে খাবেন বলে। কিন্তু রাসুলের ক্ষুধার সামনে নিজের ক্ষুধার তাড়নাকে গলা টিপে হত্যা করেছেন তিনি। রাসুলের সন্তুষ্টির জন্য নিজের উপবাসকে বিসর্জন দিয়েছেন হাসিমুখে।

আল্লাহর রাসুল ক্ষুধার তাড়নায় নিজের এমন অবিবেচনাপ্রসূত কাজের জন্য অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং আয়েশার এমন আত্মত্যাগে দারুণভাবে বিচলিত হয়ে উঠলেন। আয়েশাকে বললেন, 'আয়েশা, তোমারও তো কয়েকটি খেজুর খাওয়া উচিত ছিল।'

কিশোরী আয়েশা রাসুলকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আপনি খাওয়া শেষ করুন তো, আল্লাহর রাসুল।'

আয়েশার প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতায় রাসুলের চোখ আর্দ্র হয়ে উঠল। এইটুকুন আয়েশা কীভাবে এত তীব্রভাবে ভালোবাসতে পারে! রাসুল অভিভূত হয়ে গেলেন আয়েশার ভালোবাসার মহানুভবতায়। তখনই তিনি আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে আয়েশার জন্য দোয়া করলেন, 'হে আমার আল্লাহ! আমার আয়েশা আজ যে ধৈর্যের পরিচয় দিল, তুমি এর সর্বোচ্চ বিনিময় তাকে দান করো।'

রাসুলের দোয়ার মাঝে আয়েশা অনুরোধ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার জন্য শুধু এতটুকু দোয়া করুন–বেহেশতেও আমি যেন আপনার স্ত্রী হয়ে থাকতে পারি!'

www.pathagar.com

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পরম প্রেম নিয়ে আয়েশার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আয়েশা, বেহেশতে যদি আমার নৈকট্য চাও, তবে ইবাদতগুজার এবং ধৈর্যশীলতাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করো। আগামীকালের জন্য খাবারের চিন্তা করো না কখনো। আজ যা ঘরে থাকবে তা-ই আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দাও।'

রাসুলের সান্নিধ্য পাওয়ার আশায় এর পর থেকে আয়েশা তাঁর ঘরে এক দিনের খাবারও কখনো সংরক্ষণ করে রাখতেন না। যা-ই থাকত সব অকাতরে মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিতেন।

বিশ

আয়েশা রাসুলের অন্যান্য স্ত্রীর থেকে বয়সে ছোট ছিলেন। এ কারণে তাঁর অভিমানও ছিল সবার চেয়ে বেশি। অন্যদের সঙ্গে না হলেও, রাসুলের সঙ্গে তাঁর অভিমান হতো প্রায়ই। রাসুল যেন ছিলেন তাঁর অভিমান ভাঙানোর এক আশ্চর্য পরশপাথর। তাঁর সঙ্গে অভিমান, আবার তিনি না হলেও অভিমান ভাঙে না।

এমনই একদিনের ঘটনা। বর-বধূ দুজনের মধ্যে বেশ মনোমালিন্য হয়েছে। স্বাভাবিক মান-অভিমান হলে রাসুল নিজেই আগ বাড়িয়ে আয়েশার মান ভাঙাতেন। কিন্তু আজকের ঝগড়ার তোড়টা একটু বেশি হয়ে গেছে, রাসুলের সান্ত্বনাতেও কাজ হচ্ছে না। আয়েশা কিছুতেই রাসুলের কথায় ভিজবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন যেন।

অগত্যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিকল্প এক পদ্ধতি বাতলে দিলেন। আয়েশাকে বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে, আমাদের ব্যাপারে তাহলে তুমি একজন মধ্যস্থতাকারী নির্ধারণ করে নাও, যে বিষয়টি মীমাংসা করে দেবে।'

আয়েশা রাসুলের প্রস্তাবে রাজি হলেন। বিবদমান বিষয়টি তাহলে একজন মধ্যস্থতাকারী সমাধা করে দিক। কিন্তু কে হবে মধ্যস্থতাকারী? রাসুল উমর ইবনে খাত্তাবের নাম প্রস্তাব করলেন। আয়েশা উমরের নাম শুনেই বললেন, 'না, তিনি নয়। তিনি অনেক কঠিন মানুষ। তার চেয়ে আমি আমার পিতাকে মধ্যস্থতাকারী বানাতে চাই।'

আয়েশার কথামতো রাসুল আবু বকরকে ডেকে আনলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে ঘটনা শুনলেন। কিন্তু তিনি আবু বকর, রাসুলের

www.pathagar.com

দেওয়া সিদ্দিক উপাধির ধারক। বিনা বাক্যব্যয়ে রাসুলকে আল্লাহর পয়গাম্বর বলে স্বীকৃতি দানকারী। যিনি রাসুলের জন্য নিজের জীবন হস্ততালুতে নিয়ে ঘুরে বেড়ান তাঁর পদতলে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য।

ঘটনা শুনে তিনি আর দেরি করলেন না, কিসের নালিশ আর কিসের মধ্যস্থতা-মেয়েকে আচ্ছা রকম মারতে লাগলেন। পিতার হাতে দু-চার ঘা খেয়ে আয়েশা দৌড়ে গিয়ে রাসুলের গলা জড়িয়ে ধরে তাঁর পিঠে চড়ে বসলেন। গলা জড়িয়ে ধরেছেন তো ধরেছেনই, আবু বকর যতক্ষণ ঘরে রইলেন ততক্ষণ আর নামলেন না রাসুলের পিঠ থেকে।

মেয়েকে কিছুক্ষণ শাসিয়ে আবু বকর বেরিয়ে গেলেন। আবু বকর বেরিয়ে যেতেই আয়েশা রাসুলের পিঠ থেকে নেমে ঘরের এক পাশে গিয়ে মুখ গোমড়া করে বসে রইলেন। প্রিয়তমার এমন অভিমানী গোমড়া মুখ দেখে রাসুলের ভালো লাগল না। তিনি আয়েশাকে কাছে ডাকলেন। কিন্তু অভিমানী আয়েশা রাসুলের কাছে না এসে সেভাবেই বসে রইলেন। তাঁর এমন অভিমান দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হেসে উঠলেন। কাছে গিয়ে বললেন, 'এতক্ষণ তো আমার পিঠে উঠেই বসে ছিলে, আর এখন আমি ডাকছি অথচ কাছে আসছ না।'

রাসুলের কাছে আয়েশা যতটা না স্ত্রী ছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিশোরী আয়েশাকে তিনি কখনো সংসারের উচাটনে বেঁধে রাখতে চাননি। আয়েশা যেমন স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে বেড়ে উঠছিলেন রাসুল তাঁকে সেভাবেই প্রাগ্রসর করছিলেন ভবিষ্যত পৃথিবীর জন্য।

রাসুল যে শুধু ঘরেই তাকে সোহাগে ভরিয়ে রাখতেন, তা-ও নয়। তিনি অনেক সময় আয়েশাকে নিয়ে বেড়াতেও যেতেন মদিনার বাইরের এলাকাটায়। মদিনায় কখনো উৎসবের দিন এলে রাসুল নিজে তাঁকে উৎসব কেন্দ্রে নিয়ে যেতেন।

মসজিদে নববির সামনে একদিন কী উপলক্ষে যেন একটা উৎসব চলছিল। তাগড়া তাগড়া কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসরা বর্শা নিক্ষেপ, তরবারি চালনা, কুস্তিসহ আরও নানা শারীরিক কসরৎ করে মানুষকে বিনোদন দিচ্ছিল। চারপাশে অনেক লোকের জমায়েত। সবাই বসে-দাঁড়িয়ে এ ক্রীড়ানন্দ উপভোগ করছিল।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামও আয়েশার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ক্রীড়া উপভোগ করছিলেন। আয়েশা তাঁর পাশেই ছিলেন। কিন্তু মানুষের

www.pathagar.com

ভিড়ের কারণে তিনি ঠিকমত দেখতে পারছিলেন না। তাই রাসুল তাঁর জন্য নিজের পাশে জায়গা করে দিয়ে তাকে চাদর দিয়ে ঢেকে নিলেন। এভাবে রাসুলের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি খেলা দেখতে লাগলেন।

এটা সম্ভবত পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগের ঘটনা।

এমন আরেকদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আয়েশার ঘরে ছিলেন। হঠাৎ বাইরে কিছুটা শোরগোল শোনা গেল। বাচ্চারা কী নিয়ে যেন হুড়োহুড়ি করছে। রাসুল দরজার পর্দা সরিয়ে দেখতে লাগলেন বাইরে কী হচ্ছে। দেখলেন, এক কৃষ্ণাঙ্গ বেদেনি অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করে বাচ্চাদের খেলা দেখাচ্ছে। রাসুল বেদেনির এমন করিৎকর্মা কাণ্ড-কারখানা দেখে আয়েশাকে ডেকে বললেন 'আয়েশা, জলদি এদিকে এসো। দেখে যাও দেখে যাও!'

রাসুলও বেদেনির খেলা দেখছিলেন বিধায় ঘরের দরজা দিয়ে আয়েশা তাকাতে পারছিলেন না। অগত্যা তিনি রাসুলের পিঠে চড়ে গেলেন। রাসুলের কাঁধে থুতনি রেখে আগ্রহভরে বেদেনির খেলা দেখতে লাগলেন।

খেলা দেখতে দেখতে একটু পর রাসুল বললেন, 'কী, মন ভরেছে?'

কিশোরী আয়েশার মন ভরেনি। তিনি জবাব দিলেন, 'না, আমি আরও দেখব।'

কী আর করা! রাসুল আয়েশাকে কাঁধে নিয়ে ঘরের দরজায় ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

একুশ

লোকটি সম্ভবত যুদ্ধবন্দী অথবা শত্রুপক্ষের কোনো গুপ্তচর। কোনো এক অভিযান থেকে তাকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। এখন বন্দী হিসেবে তার সঙ্গে বন্দীসুলভ আচরণ করা হবে। আল্লাহর রাসুল চাইলে তাকে মুক্তিও দিয়ে দিতে পারেন। কেননা রাসুলের নীতি ছিল, যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নিয়ে তাদের মুক্ত করে দেওয়া।

তবে সবার জন্য সমান সুযোগ ছিল না। যারা ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল, যাদের পূর্বেকার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য মনে হতো, তাদের ব্যাপারে ন্যায়ানুগ ব্যবস্থাই নেওয়া হতো।

যে লোকটিকে আজ বন্দী হিসেবে মদিনায় নিয়ে আসা হয়েছে, তার অপরাধ সম্ভবত ততটা গুরুতর ছিল না। রাসুল হয়তো তাকে মুক্ত করে দেওয়ার ইচ্ছা করে রেখেছিলেন। তবে যুদ্ধবন্দী হিসেবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ

www.pathagar.com

করা প্রয়োজন। কিন্তু এ মুহূর্তে রাসুলের হাতে অন্য আরও কিছু জরুরি কাজ আছে। জরুরি কাজগুলো সমাধা করে তারপর বন্দীকে নিয়ে ভাবতে হবে। নির্দোষ হলে মুক্ত করে দেবেন আর অপরাধ প্রমাণিত হলে শাস্তি দেবেন।

আল্লাহর রাসুল বন্দী লোকটিকে নিয়ে আয়েশার ঘরের কাছে এলেন। ঘরের পাশে এক জায়গায় তাকে বেঁধে রাখলেন। আয়েশাকে ডেকে বললেন তিনি যেন এ বন্দীর ওপর কড়া নজর রাখেন, যাতে সে পালিয়ে যেতে না পারে।

বন্দীকে বেঁধে রেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অন্য কাজে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আয়েশার ঘরে তাঁর কয়েকজন সখী এলেন। আয়েশা তাঁদের সঙ্গে গল্পে মশগুল হয়ে গেলেন। বন্দী লোকটির কথা তাঁর মনেই রইল না।

এদিকে আয়েশার অমনোযোগিতার সুযোগে বন্দী লোকটি কৌশলে হাতের বাঁধন খুলে চটজলদি পালিয়ে গেল। আয়েশা বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প করেই যাচ্ছেন, বন্দী পালানোর বিষয়টি তিনি ঘুণাক্ষরেও টের পেলেন না।

কিছুক্ষণ পর রাসুল আয়েশার কাছে ফিরে এলেন। নির্দিষ্ট জায়গায় বন্দীকে দেখতে না পেয়ে আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আয়েশা, বন্দী লোকটির কী হলো? সে কোথায়?'

আয়েশা গল্প রেখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন বন্দী কোথাও নেই। তিনি ভীত চোখে রাসুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প করতে করতে তার কথা ভুলে গিয়েছিলাম।'

রাসুল ভীত আয়েশার ওপর খানিকটা রাগ করলেন। তাঁকে শাসন করে বললেন, 'আফসোস! তোমার হাতটা যদি ভেঙে যেত!'

আয়েশাকে সতর্ক করার জন্য রাসুলের একটু রাগই যথেষ্ট ছিল। আয়েশা ব্যথিত হলেন। নিজের কৃতকর্মের জন্য বিব্রত হলেন খুব।

রাসুল আয়েশাকে ওখানে রেখে জলদি সাহাবিদের কাছে চলে গেলেন। তাঁদের বন্দী পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি জানিয়ে এখনই তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। সাহাবিরা কয়েকজন মদিনার চারপাশে ছড়িয়ে পড়লেন এবং খোদার শোকরে কিছুক্ষণ পর পলাতক বন্দীকে গ্রেপ্তার করে ফের মদিনায় নিয়ে আসা হলো।

বন্দীকে আবার ধরতে পেরে আল্লাহর রাসুল তাকে সাহাবিদের তদারকিতে ছেড়ে দিয়ে ঘরে এলেন। ঘরে তখন আয়েশা একাই। রাসুল ঘরে ঢুকে দেখেন আয়েশা নিজের দুই হাত টানটান করে একবার মুঠি বন্ধ করছেন আবার খুলছেন। আয়েশার এমন কাণ্ড দেখে রাসুল কিছুই বুঝতে পারলেন না।

www.pathagar.com

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এগিয়ে এসে আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার আয়েশা, তুমি এমন করছ কেন? তুমি কি অজু করার প্রস্তুতি নিচ্ছ?'

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন, 'আপনি আমার হাত ভেঙে যাওয়ার অভিশাপ দিয়েছেন, হে আল্লাহর রাসুল। তাই দেখছি, আমার কোন হাতটি আগে ভেঙে যায়!'

রাসুলের রাগান্বিত কথা শুনে আয়েশা হয়তো খানিকটা কষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁর ভুলটাও ছোট ছিল না, তবু রাসুলের মুখ থেকে এমন কঠোর বাক্য শুনে মনের গহিনে অভিমান জমেছিল। তাই রাসুলের কথায় অমন পাগলাটে জবাব দিলেন।

আয়েশার এমন পাগলামি জবাব শুনে আল্লাহর রাসুল সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে দোয়া করলেন :

> 'হে আমার প্রভু! আমি একজন মানুষ এবং আমি সাধারণ মানুষের মতোই রাগ করি। নারী কিংবা পুরুষ, যার ওপরই আমি রাগ করি না কেন, আপনি সেটাকে তার দৈহিক এবং আত্মিক পাপ মোচনের কারণ বানিয়ে দিন।'

আয়েশা যেমন রাসুলের প্রতিটি কথা, কাজ, চালচলন, আবেগ, অনুভূতির নিপুণ সমঝদার ছিলেন; তেমনি রাসুলও নিজের ছোট্ট এ বধূয়ার প্রতিটি আবেগ-অনুভূতিকে যথাযথ মূল্যায়ন করতেন। তেমনি তাঁর ভালোবাসা, অভিমান, অনুরাগ, মন্দ লাগা বহিঃপ্রকাশের ভাষাগুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে পারতেন।

একদিন আল্লাহর রাসুল ও আয়েশা অন্তরঙ্গভাবে কথা বলছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আয়েশাকে বললেন, 'আমি কখন তোমার ওপর খুশি থাকি আর কখন নারাজ থাকি, সেটা তুমি যেমন বুঝতে পারো; তেমনি তুমি কখন আমার ওপর খুশি থাকো এবং কখন নারাজ থাকো, সেটাও আমি বুঝতে পারি।'

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি যখন আপনার ওপর নারাজ থাকি, সেটা আপনি কীভাবে বোঝেন?'

রাসুল জবাব দিলেন, 'তুমি যদি কোনো কারণে আমার প্রতি নারাজ থাকো, তাহলে কথা বলার সময় কসম খাও 'ইবরাহিমের আল্লাহর কসম'; আর যখন আমার প্রতি খুশি থাকো, তখন বলো 'মুহাম্মদের আল্লাহর কসম!'

রাসুলের মুখে নিজের এমন সত্যায়ন শুনে আয়েশা ফিক করে হেসে ফেললেন। হাসিমুখ নিয়েই বললেন, 'একেবারে সত্য। হে আল্লাহর রাসুল,

www.pathagar.com

মুহাম্মদের আল্লাহর কসম করে বলছি–আপনি সত্য বলেছেন। তবে যখন আপনার প্রতি নারাজ থাকি, তখন কেবল মুখেই আপনার নাম বর্জন করি, আমার অন্তর তো সব সময় আপনার নামই জপ করে।'

বাইশ

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সেই নবি, যিনি নিজ হাতে ঘরের সব কাজ করতেন। রান্নার আয়োজন, বাইরে থেকে বাজার-সদাই বা পানি নিয়ে আসা, ঘর মেরামত করা, এমনকি নিজের জামাকাপড়ও অনেক সময় তিনি নিজেই পরিষ্কার করতেন।

অথচ রাসুল চাইলেই দু-একজন কাজের লোক রেখে নিতে পারতেন। নিদেনপক্ষে যেকোনো সাহাবিকে বললেই তিনি গর্বভরে রাসুলের যেকোনো কাজ করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। সাহাবিরা রাসুলের ব্যক্তিগত সামান্য কাজ করার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করতেন। কিন্তু আল্লাহর রাসুল সব কাজ একাই সামলে নিতেন, নয়তো তাঁর একান্ত ভৃত্য যারা ছিল, তাদের দিয়ে সমাধা করতেন। অনন্যোপায় না হলে সাহাবিদের কখনো কাজের জন্য বলতেন না। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র কাজও তিনি নিজে করে নিতেন।

রাসুলের স্ত্রীরাও ছিলেন ঠিক রাসুলের অনুসারী। তাঁরাও পারতপক্ষে নিজেদের কাজ অন্য কাউকে দিয়ে করাতেন না। রান্নাবান্নাসহ গৃহস্থালি কাজকর্ম নিজেরা সামাল দিতেন। যাঁদের ঘরে প্রতিদিন খাওয়ার মতো আহার জুটত না, তাঁদের জন্য কোনো ভৃত্য বা কাজের লোক রাখা বিলাসিতা ছিল বৈকি। কাজের লোক যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও নামকাওয়াস্তে মাসোহারা পেতেন। রাসুলপরিবারের সেবা করাটা তাঁরা নিজেদের সৌভাগ্য হিসেবে বরণ করে নিতেন।

একদিন দুপুরবেলা। বাইরে প্রচণ্ড রোদ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘরের সামনে বসে নিজের জুতো সেলাই করছিলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ঘরে বসে চরকায় সুতা কাটছিলেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল রাসুলের ওপর। দেখলেন, রাসুলের কপালে ঘামের কয়েকটা ফোঁটা জমে আছে। প্রচণ্ড রোদের কারণে সে ফোঁটা টপটপ করে নিচে পড়ছিল। আয়েশা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলেন, ঘামের ফোঁটাগুলো যখন নিচে গড়িয়ে পড়ছে, তখন সেগুলো থেকে একধরনের অপার্থিব আলোর বিকিরণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ঘামের ফোঁটাগুলো যেন ঝিকমিক স্ফটিকের মতো জ্বলে ওঠছে বারবার।

www.pathagar.com

আয়েশা চরকা কাটা বাদ দিয়ে মুগ্ধ নয়নে এ দৃশ্য দেখতে লাগলেন। এমন অত্যাশ্চর্য আলোর ফোয়ারা দেখে তিনি এতটাই অভিভূত হয়ে গেলেন যে, রাসুলও যে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন, সেটা তিনি খেয়াল করেননি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আয়েশাকে এমন অবাক নয়নে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলে উঠলেন, 'কী ব্যাপার, আয়েশা, তুমি এভাবে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছো যে?'

আয়েশার দৃষ্টির মুগ্ধতার রেশ তখনো কাটেনি। তিনি রাসুলের চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি দেখছিলাম আপনার কপাল থেকে যে ঘামের ফোঁটা ঝরে পড়ছিল, সেগুলো থেকে এক অপার্থিব আলোর রোশনি চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাচ্ছে। আমি অবাক নয়নে সেই অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখছিলাম। এ মুহূর্তে আবু কাবির হাজলি (জাহেলি যুগের প্রসিদ্ধ আরবি কবি) যদি আপনাকে দেখত, তবে সে তার কবিতার শ্রেষ্ঠ উপমা এখানেই পেয়ে যেত। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপমা আল্লাহর রাসুল স্বয়ং।'

আল্লাহর রাসুল আয়েশার কাব্যপ্রীতি দেখে বলে উঠলেন, 'আচ্ছা! শোনাও দেখি তার কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তি।'

আয়েশা কবি আবু কাবির হাজলির কয়েক পঙ্‌ক্তি কবিতা আবৃত্তি করলেন–

সে সদ্যোজাত শিশু এবং দুগ্ধের চেয়েও পবিত্র অপরূপ
তাকাও তার আলোকময় মুখাবয়বের দিকে, জেনে যাবে–
আলোকরশ্মি ও চন্দ্রকিরণ তার চারপাশ
কীভাবে চমকিত করে আছে।

রাসুল আয়েশার মুখে এ কবিতার আবৃত্তি শুনে এতটাই মোহিত হলেন, তিনি হাতের কাজ ফেলে রেখে আয়েশার আবৃত্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে গেলেন। বিমোহিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তোমার কবিতা আবৃত্তি শুনে আমার হৃদয় যে পরিমাণ আনন্দিত ও তৃপ্ত হয়েছে, তুমি আমার চেহারা দেখেও ততটা আনন্দ পাওনি।'

এই ছিল রাসুলের দাম্পত্যজীবন। এমনই ছিল কিশোরী আয়েশার প্রেমময় সংসার। একজন আরেকজনের প্রশংসায় ছিলেন অকুণ্ঠ। একে অপরের প্রাপ্য সম্মান ও অনুভূতি প্রকাশ করতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করতেন না। ভালোবাসা প্রকাশে একজন ছিলেন আরেকজনের চেয়ে বেশি উদার। হৃদয়ের

www.pathagar.com

ভালোবাসাকে তাঁরা মুখের ভাষায় প্রকাশ করতে কখনো পিছপা হতেন না। আল্লাহর রাসুল নিজের ব্যক্তিত্বকে কখনো ভালোবাসার সামনে দাঁড় করাননি।

তেইশ

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মন খারাপ। রাসুলের সঙ্গে কী একটা ঠুনকো কারণে যেন হঠাৎই অভিমান করে বসেছেন। স্বচ্ছ কাচের মতো কিশোরী মন তো, একটু আঁচড়েই গভীর দাগ পড়ে যায়। তার ওপর প্রথম প্রেম, প্রথম প্রেমের সামান্য দরদও বড় আনচান হয়ে বাজে হৃদয়-অন্দরে। আর প্রেমিক-স্বামীটি যদি হন বিশ্বনবি, যাঁর জন্য মাতোয়ারা আরবের সুন্দরীরা, তখন তো ছোট্ট সোনালি মনটাতে ফুলের আঘাতও সইবে না!

অভিমানে সকাল থেকে না খাওয়া। কিশোরী মুখটা এতটুকুন হয়ে আছে মর্মযাতনায়। রাসুলও সকাল থেকে ঘরে নেই। সেই যে বেরিয়েছেন, আর ফেরার নামটি নেই। একা একা অভিমান আর কতক্ষণ আগলে রাখা যায়? একজন যে তাঁর মুখ থেকে একটু সুরেলা ডাক শোনার জন্য বসে আছে, সেদিকে কি তাঁর কোনো খেয়াল আছে? বুক ফেটে কান্না আসছে, কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে কাঁদতে পারছেন না। আর রাসুলের অন্য স্ত্রীরা যদি জানতে পারেন যে এই সামান্য কারণে আয়েশা কেঁদে বুক ভাসাচ্ছেন, কী হাসাহাসিটাই না করবেন তাঁরা!

তাহলে একা একা এখন কী করবেন অভিমানী আয়েশা? এ যাতনা তাঁর যে আর সহ্য হচ্ছে না! কখন আসবেন তিনি? কখন ডাকবেন প্রিয়তম নাম ধরে?

ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। মুহূর্তে আয়েশার মুখে দেখা দিল ভরা চন্দ্রিমার রোশনাই। হৃদয়টা কেমন যেন খলবলিয়ে উঠল। মনে হচ্ছে এতক্ষণের অভিমানে জমানো কথা সব একসঙ্গে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তিনিও কঠিন পাত্রী!

সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আয়েশা সালামের জবাব দিলেন, তবে মোটেও ফিরে তাকালেন না তাঁর দিকে। এত সহজে হেরে যাওয়ার পাত্রী নন তিনি। বুকভরা অভিমান এত সস্তাদরে বিকোবেন না। মহামূল্যে কিনতে হবে আজ। তিনি অপেক্ষা করছেন।

রাসুলের হাতে একটি খেজুরের পাত্র। কিছুক্ষণ আগেই মাত্র এক সাহাবি তাঁর বাগানের সবচেয়ে ভালো কিছু খেজুর রাসুল সমীপে হাদিয়া দিয়ে গেছেন।

www.pathagar.com

তিনি জানেন, এ খেজুরগুলো আয়েশার খুব পছন্দ। তাই দেরি না করে চলে এসেছেন ঘরে। ঘরে যে আয়েশা অভিমান করে বসে আছেন, সেটাও তাঁর অগোচরে নয়। এবং তিনি ভালো করেই জানেন, অভিমানী কিশোরী আয়েশার রাগ কীভাবে ভাঙাতে হয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ডাক দিলেন, 'হোমায়রা পাখি! এই দেখো তোমার প্রিয় খেজুর। আল্লাহর নাম নিয়ে খেজুরগুলো খেয়ে নাও!'

আয়েশার বুক থেকে সমস্ত অভিমান এক নিমেষে যেন হাওয়া হয়ে উবে গেল। আহ! কী মধুর করে ডাকেন তিনি।

তিনি ফিরে তাকালেন। থালা থেকে দুটো খেজুর উঠিয়ে মুখে দিতে দিতে কপট রাগ দেখিয়ে বললেন, 'আল্লাহর নামেই তো খাব। এত দিন কি আমি আমার বাবার নামে খেয়েছি?'

কিশোরী আয়েশার এমন 'আচ্ছারকম' জবাব শুনে রাসুল অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন।

চব্বিশ

খাজরাজ গোত্রের অন্যতম নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বছরের পর বছর সুযোগের অপেক্ষায় আছে। একবার শুধু সুযোগটা পেয়ে নিক, সেটাকে কীভাবে কাজে লাগাবে, তার সব বন্দোবস্ত সে করে রেখেছে। কিন্তু পাঁচ বছর পার হয়ে গেছে, এখন পর্যন্ত মোক্ষম সুযোগ এসে ধরা দেয়নি তার হাতে।

তাতে বিন্দুমাত্র দমে যায়নি সে। প্রতিদিন সে নতুন নতুন সুযোগ তৈরি করে, কিন্তু তার প্রতিটি চক্রান্ত বিফল হয়ে যায়। তার সঙ্গী-সাথিরাও দিন-রাত তাকে মন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছে—বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। বিশ্বাস হারিয়ো না ইবনে উবাই, খুব শিগগির তুমি সফল হবে। মদিনার নেতা হিসেবে ফের তুমি অধিষ্ঠিত হবে সর্বত্র। আউস-খাজরাজের গোত্রপতি হিসেবে তুমিই ছড়ি ঘোরাবে সবার ওপর।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদের কথায় তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। চোখের সামনে দেখতে পায় সেই মুণ্ড-এর মুকুটটি, যা তাকে পরানোর জন্য আউস-খাজরাজের লোকেরা তৈরি করে এনেছিল। রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যদি সে সময় মদিনায় হিজরত করে না আসতেন, তবে সে-ই হয়ে যেত মদিনার একচ্ছত্র নেতা।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সে দুঃখ কোনো দিন ভুলতে পারেনি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সে হস্তগত করেছিল মদিনার নেতৃত্ব। কিছুদিন পর তার

www.pathagar.com

অভিষেক অনুষ্ঠানের দিনক্ষণও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঠিক এমন সময় মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আসেন রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। রাসুলের ব্যক্তিত্বের বিভায় ম্লান হয়ে যায় আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মামুলি নেতৃত্ব। আউস-খাজরাজের সকল মানুষ একবাক্যে স্বীকার করে নেন রাসুলের অকুণ্ঠ আনুগত্য।

নেতৃত্ব হারানোর পর থেকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই রাসুলের পেছনে লেগে যায়। চোখের সামনে নিজের নেতৃত্ব খোয়ানোর ঘটনা সে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। যে শাসনক্ষমতার দণ্ড সে নিজ হাতে করায়ত্ত করবে বলে স্বপ্ন দেখে আসছিল, তা ধূলিসাৎ হওয়ার ফলে মনের মধ্যে জ্বলতে থাকে প্রতিশোধের আগুন।

কিন্তু সরাসরি রাসুলের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলার সুযোগ তার ছিল না। কেননা আউস-খাজরাজের সিংহভাগ লোকই রাসুলের প্রতি নতশিরে অনুগত। এ মুহূর্তে রাসুলের সামান্য বিরুদ্ধাচরণ করলে বরং হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। এ কারণে সে নানাভাবে ফন্দি আঁটতে থাকে–কীভাবে রাসুল, তাঁর পরিবার এবং মক্কা থেকে আসা মুহাজিরদের সবার সামনে অপদস্থ করা যায়। কীভাবে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করা যায়।

মদিনার প্রায় সবাই মুসলমান হয়ে গেছে। সে প্রাক্তন নেতা হিসেবে যদি মুসলমান না হয়, তাহলে তো তার গোত্রের লোকজনই তাকে ধিক্কার দেবে। এ কারণে বদরের যুদ্ধের পর রাসুলের সামনে এসে মৌখিকভাবে সে কালেমা পড়ে মুসলমান হলো বটে কিন্তু অন্তরে তার রয়ে গেল ধিকি ধিকি আগুনের শিখা। রাসুলকে অপদস্থ করা এবং তাঁকে মদিনা থেকে বিতাড়নের জিঘাংসা সে বুকে পুষতে থাকে গোপনে।

একবার আনসারিদের নেতা সাদ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখার জন্য গাধার পিঠে চড়ে তাঁর বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটি জনসমাবেশ দেখে তিনি তাঁদের কুরআনের কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করে শোনান। সে সমাবেশে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল। সে চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে রাসুলের সামনে এসে বলল, 'আমাদের সামনে এভাবে ধুলো ওড়াবেন না। আপনি আপনার ঘরে গিয়ে বসে থাকুন। আমাদের কাজে নাক গলিয়ে বিরক্ত করা আপনার কাজ নয়।'

উহুদের যুদ্ধের পরের আরেকটি ঘটনা। এক শুক্রবার রাসুল যখন মসজিদে খুতবা দেওয়ার জন্য উঠবেন, তার আগে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নামাজের কাতার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রাসুলের নামে নানা ধরনের প্রশংসাবাক্য

www.pathagar.com

আওড়াতে লাগল। তার এমন কথা শুনে আশপাশের সাহাবিরা তার জামার কাপড় টেনে ধরে বলতে থাকেন, 'হে আল্লাহর দুশমন, বসে যাও! ইতিপূর্বে তুমি যে কাজ করেছ, তারপর আর তোমার মুখে এ ধরনের কথা শোভা পায় না।'

সাহাবিদের বাধার মুখে সে নিবৃত্ত হলো বটে কিন্তু আর মসজিদে রইল না। রাগে গজরাতে গজরাতে মসজিদের বাইরে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলো। এ সময় এক সাহাবি পেছন থেকে ডাক দিয়ে বললেন, 'তোমার ধ্বংস হোক! ফিরে এসো। আল্লাহর রাসুল তোমার মাগফেরাতের দোয়া করবেন।'

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই রুষ্টকণ্ঠে বলে ওঠে, 'রাখো তোমার কথা! খোদার কসম করে বলছি, তার মাগফেরাতের দোয়ারও প্রয়োজন নেই আমার!'

এমনই ছিল তার বিরুদ্ধবাদিতা। রাসুলকে কষ্ট দেওয়ার জন্য হেন কোনো কাজ নেই, যা সে করতে দ্বিধা করত। রাসুলকে বিপদে ফেলতে নানা চক্রান্তে মেতে উঠত। এই চক্রান্ত বাস্তবায়ন করতে উহুদের যুদ্ধে সে তার ৪০০ সঙ্গী নিয়ে মুসলিমবাহিনীর পেছন থেকে ভেগে গিয়েছিল। খন্দকের যুদ্ধে নিজের সাথিদের নিয়ে নিরাপদে ঘরে বসে ছিল। পরিখা খননের কাজে সামান্য সহযোগিতাও করেনি মুসলিমদের। বরং কুরাইশ ও ইহুদিদের নানাভাবে সহযোগিতা করে গেছে তলে তলে। এ ছাড়া অন্যান্য যুদ্ধ বা সামরিক অভিযানেও সে ও তার সঙ্গীরা শরিক হতো না।

মদিনার ইহুদি গোত্র বনু কায়নুকা ও বনু নজিরের সঙ্গে ছিল তার দারুণ সদ্ভাব। নানাভাবে সে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করত। ইহুদিরা যখন রাসুলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তখন ইবনে উবাই তাদের সে ষড়যন্ত্রে নিরলস ইন্ধন জুগিয়ে গেছে। ইহুদিদের এমন ষড়যন্ত্রের কারণেই রাসুল তাদের মদিনা থেকে বিতাড়ন করে খায়বারে পাঠিয়ে দেন।

তবু দমবার পাত্র নয় প্রতিশোধপরায়ণ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। সে কেবল সুযোগের অপেক্ষায় আছে, কবে আবার ফিরে পাবে মদিনার নেতৃত্বের আসন! কিন্তু পাঁচ বছর ধরে তার সকল চেষ্টাই বিফল হয়েছে। রাসুলের বিরুদ্ধে তার কোনো চক্রান্তই আলোর মুখ দেখেনি।

কিন্তু একদিন তার সামনে সুযোগ এসে গেল। মস্ত বড় সুযোগ।

www.pathagar.com

পঁচিশ

পঞ্চম হিজরি সনের রজব মাস।

লোকমুখে যতটুকু জানা গেল, খবর একেবারে মিথ্যে নয়। আরবের উপকূলীয় গোত্র বনু মুস্তালিকের গোত্রপতি হারিস ইবনে জিরার মদিনা আক্রমণের জন্য গোপনে সৈন্য সমাবেশ করছে। তার সঙ্গে আছে বনু মুদলাজ গোত্র এবং মক্কার কুরাইশদের আশীর্বাদপুষ্ট আরও কিছু আরব গোত্র। যেকোনো দিন তারা মদিনা আক্রমণ করতে পারে।

তবে কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোথাও সামরিক অভিযান পরিচালনার মতো ব্যক্তি রাসুল নন। তিনি খবরের শতভাগ সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বুরাইদা ইবনে হুসাইব আসলামি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হারিস ইবনে জিরারের কাছে পাঠালেন দূত হিসেবে। বুরাইদা ফিরে এসে জানালেন–খবর যা শোনা গেছে, তা সত্য। বনু মুস্তালিক মদিনা আক্রমণের রণপ্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম শত্রুর অপেক্ষায় বসে থাকতে নারাজ, বরং তিনি শত্রুকে পাল্টা আঘাত করার জন্য অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলেন। মদিনায় ঘোষণা দেওয়া হলো–দু-এক দিনের মধ্যে মুসলিমবাহিনী বনু মুস্তালিক অভিমুখে রওনা হবে। যারা যারা যুদ্ধে শরিক হতে ইচ্ছুক, তারা যেন সত্বর তাদের অস্ত্র ও রসদ নিয়ে মসজিদে নববি চত্বরে হাজিরা দেয়।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের চোখ আনন্দে জ্বলজ্বল করে উঠল–এই তো সুযোগ! এবার তাকে কিছু একটা করতেই হবে। সে বুঝতে পারছিল, এ অভিযানে সম্মুখ লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কেননা বনু মুস্তালিক এবং অপরাপর গোত্র যারা আছে, তারা রাসুলের বাহিনী দেখে এমনিতেই ভড়কে যাবে। ময়দানে নেমে যুদ্ধ করার মুরোদ তাদের নেই।

রাতে সে তার অনুসারীদের নিয়ে আলোচনায় বসল। বনু মুস্তালিকে পৌঁছে কীভাবে কী করতে হবে, তার একটা ছক এঁকে বুঝিয়ে দিল সবাইকে। কার কী কাজ, কোথায় কোথায় অবস্থান নেবে–সে ব্যাপারেও বলে দিল। এখন শুধু অপেক্ষার পালা।

পঞ্চম হিজরি সনের ২ শাবান।

প্রতিটি যুদ্ধাভিযানে রওনা হওয়ার আগে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের মাঝে লটারি করতেন–কে এ অভিযানে তাঁর সফরসঙ্গী হবেন। যাঁর নাম উঠত তাঁকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। রাসুলপত্নীরা এ

www.pathagar.com

ধরনের অভিযানে রাসুলের সঙ্গী হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী থাকতেন সবসময়। রাসুলের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীটা দেখার এমন সুযোগ কেউ হারাতে চাইতেন না।

বনু মুস্তালিক অভিযানের আগেও যথারীতি স্ত্রীদের নামে লটারি করা হলো। এবার নাম উঠল আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার। আয়েশার খুশির অন্ত নেই। লটারিতে নিজের নাম দেখেই তিনি সফরপ্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। এটা-সেটা দিয়ে সামান্য সাজগোজও করে নিলেন।

তাঁর প্রিয় বোন আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহার একটি ইয়েমেনি মুক্তোর হার ছিল, আয়েশার গলায় দারুণ মানাত সেটি। তিনি বোনের কাছ থেকে হারটি চেয়ে নিলেন, সফর শেষে আবার তাঁকে ফেরত দেবেন। আসমা হারটি বোনের গলায় পরিয়ে সতর্ক করে বলে দিলেন, হারের কোড়াটা কিন্তু একটু ঢিলে। বেখেয়ালে সেটা যেন আবার গলা থেকে পড়ে না যায়!

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা গলায় ইয়েমেনি মুক্তোর হার পরে রাসুলের সফরসঙ্গী হয়ে উটের হাওদায় চড়ে বসলেন।

মদিনা থেকে রওনা হলো ৭০০ সৈন্যের মুসলিমবাহিনী। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। মুহাজিরদের সেনাপতি নির্বাচিত হলেন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আনসারদের পতাকা অর্পিত হলো সাদ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে। রাসুলের অবর্তমানে মদিনার ভারপ্রাপ্ত শাসক নিযুক্ত হলেন আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সঙ্গী অন্য মুনাফিকরাও সদম্ভে চলেছে মুসলিম সেনাবাহিনীর সঙ্গে। তাদের দেখে অনেক সাহাবি ভ্রু কুঁচকে ফেললেন–ইবনে উবাই? সে যাচ্ছে মুসলিম রণাঙ্গনে? অথচ পূর্বের প্রতিটি যুদ্ধেই সে হয়তো লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে, নয়তো ঘরে খিল এঁটে বসে থেকেছে। এ অভিযানে সে বড় আহ্লাদের সঙ্গে বাহিনীর আগে আগে চলছে! নতুন কোনো চক্রান্ত নয়তো?

আবার অনেক সাহাবি মনে করলেন, হয়তো আল্লাহ তাকে হেদায়েত দান করেছেন। তার হৃদয়ে হয়তো ছোঁয়া লেগেছে নবুওয়াতের আলোকিত হাওয়ার। কত নামজাদা পৌত্তলিক-বিধর্মীই তো আসমানি নুরের রোশনি মেখে আত্মহারা ঈমানের বিভূতিতে আলোকিত হয়ে গেল। কতজন রাসুলকে হত্যা করতে এসে নিজ তরবারি রেখে দিয়েছে নিজের পাঁজরে, এমনও তো হয়েছে তাঁদের চোখের সামনেই। সুতরাং, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যদি রাসুলের ব্যক্তিত্বের আলোকচ্ছটায় বিভাসিত হয়, তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে!

www.pathagar.com

কাফেলা চলছে বনু মুস্তালিকের পথে।

প্রায় ১০ দিনের লম্বা সফর। বিরান মরু পেরিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন বনু মুস্তালিক বসতিতে গিয়ে পৌছান, তখন তাঁরা অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিলেন। রাসুল মুস্তালিক গোত্রের বসতির কাছে মুরাইসি ঝরনার পাশে সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁবু ফেললেন। মুস্তালিকের লোকজন রাসুলবাহিনীর এমন ত্বরিত আগমনের ব্যাপারে কল্পনাও করতে পারেনি। তাদের নিযুক্ত অগ্রবর্তী বাহিনীর খবর পৌছানোর গুপ্তচরকে মুসলিমবাহিনী পথিমধ্যেই হত্যা করেছে এবং অন্যান্য সাহায্যকারী গোত্রও তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে সাহস করেনি। ফলে মুসলিমবাহিনীকে আসতে দেখেই বনু মুস্তালিকের যোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ছত্রভঙ্গ বনু মুস্তালিক বাহিনীর দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘোষণা করলেন, 'তোমরা "এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই" এই দাওয়াত যদি কবুল করো, তাহলে তোমাদের প্রাণ ও সম্পদ নিরাপদ থাকবে, অন্যথায় তোমাদের সঙ্গে কথা বলবে আমাদের তরবারি।'

বনু মুস্তালিক তার আহ্বান মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাল এবং তির নিক্ষেপ শুরু করল। তাদের তির নিক্ষেপ করতে দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উপর্যুপরি আক্রমণের নির্দেশ দিলেন।

নারায়ে তাকবির ধ্বনি দিয়ে মুসলিমবাহিনী মুস্তালিক গোত্রের বসতির ওপর উপর্যুপরি আক্রমণ করল। দেখতে দেখতে মুস্তালিকদের চারপাশ ঘিরে ফেলল হামলাকারী বাহিনী। এরপর তাদের সামনে পরাজয় ছাড়া আর কোনো পথ খোলা রইল না।

সংক্ষিপ্ত এ যুদ্ধে বনু মুস্তালিকের ১১ জন যোদ্ধা নিহত হলো এবং বাদবাকি যোদ্ধা অস্ত্র সমর্পণ করল। মুসলিমবাহিনী বনু মুস্তালিকের সকল নারী-পুরুষকে বন্দী করে। নারী বন্দীদের মধ্যে মুস্তালিক গোত্রনেতা হারিস ইবনে জিরারের কন্যা জুয়াইরিয়াও ছিলেন। পরবর্তীতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নির্ধারিত মুক্তিপণের মাধ্যমে তাঁকে মুক্ত করেন এবং তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন। জুয়াইরিয়া রাসুলের প্রস্তাব গ্রহণ করে মুসলমান হন এবং এ সফরেই রাসুল তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদায় ভূষিত করেন।

জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুলের স্ত্রীর মর্যাদায় সম্মানিত হওয়ার ফলে মুসলিমবাহিনীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক বনু মুস্তালিকের সকল বন্দীকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে এই পুরো গোত্র ইসলামের অত্যুজ্জ্বল মানবতাবোধের পরিচয়ে পরিচিত হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

এ যুদ্ধে হিশাম ইবনে সাবাবা নামের একজন আনসারি সাহাবি নিহত হন। তবে তিনি শত্রুর আক্রমণে নিহত হননি। কোনো এক সাহাবি শত্রুপক্ষের লোক মনে করে ভুলক্রমে তাঁকে হত্যা করেন। পরবর্তী সময়ে এ সাহাবি অনুতাপ প্রকাশ করেন।

ছাব্বিশ

যুদ্ধ শেষ। মুসলিমবাহিনী মুরাইসি জলাশয়ের পাশে বিশ্রাম করছে। উট-ঘোড়াকে পানি পান করাচ্ছেন কেউ কেউ। এ সময় একটি দুঃখজনক ঘটনার অবতারণা হলো। উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাজের লোক জাহজাহ ইবনে মাসউদ গিফারি উমরের ঘোড়াকে পানি পান করানোর জন্য জলাশয়ের দিকে যাচ্ছিলেন। সিনান ইবনে উবার জুহানি রাদিয়াল্লাহু আনহু নামের একজন আনসারি সাহাবিও তাঁর ঘোড়াকে পানি পান করানোর জন্য একই পথ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে জাহজাহ ও সিনানের মধ্যে সামান্য কথা-কাটাকাটি হয়ে যায়। কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হলে জাহজাহ ডাক দিয়ে ওঠেন, 'হে মুহাজির দল, আমাকে সাহায্য করো।' এদিকে সিনানও ডাক দিয়ে ওঠে, 'হে আনসার দল, আমাকে সাহায্য করো।'

মুহাজির ও আনসার উভয় পক্ষ ঘটনার চারপাশে সমবেত হয়ে গেল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এমন চিৎকার শুনে জলদি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং বলেন, 'কী সব জাহেলি যুগের মতো আচরণ করছ তোমরা! এসব নিকৃষ্ট কাজ ছাড়ো। এগুলো দুর্গন্ধময় কাজ।'

তিনি উভয় দলকে নিবৃত্ত করেন এবং তাদের তিরস্কার করে গোত্রীয় সংঘর্ষ সমূলে উৎপাটন করেন।

মুহাজির ও আনসার দল এ ঘটনাকে মামুলি ঘটনা মনে করে নিবৃত্ত হলেও আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ঘটনাকে মোটেও সহজভাবে নিল না। সে যেন এমন একটি দুর্ঘটনার জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। যখন সে শুনল মদিনার আনসার এবং মক্কার মুহাজিরদের মধ্যে সামান্য বাগ্‌বিতণ্ডার ঘটনা ঘটেছে, এটা শুনে সে ক্রোধে ফেটে পড়ল, 'এত বড় সাহস? ওরা এমন বলেছে? আমাদের এলাকায় এসে আমাদেরই শত্রু হয়ে বসেছে? তাদের অবস্থা দেখে তো সেই প্রবাদই মনে পড়ছে–নিজের কুকুরকে খাইয়েদাইয়ে মোটাতাজা করো, দেখবে একদিন সে কুকুরই তোমাকে কামড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। তোমরা ভালো

www.pathagar.com

করে শুনে রাখো–এখান থেকে যখন আমরা মদিনায় ফিরে যাব, তখন আমাদের মধ্যকার সম্মানিত ব্যক্তি নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে মদিনা থেকে বের করে দেব।'

সে আনসারি লোকদের খেপাতে তাদের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলতে লাগল, 'এ আপদ তোমরাই ডেকে এনেছ। নিজেদের শহরে তাদের থাকতে দিয়েছ, নিজেদের ধন-সম্পদে তাদের অংশীদার বানিয়েছ। একবার যদি তোমরা তাদের ওপর থেকে তোমাদের দয়ার হাত গুটিয়ে নাও, দেখবে তারা পালানোর পথ পাবে না।'

ইবনে উবাইয়ের কথায় মুহাজির ও আনসার দলের মধ্যে কিছুটা হলেও মিশ্র উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। বিশেষ করে, তার অনুসারীরা অনেকের কাছে গিয়ে এসব কথা বলে তাদের ফুসলাতে লাগল।

ইবনে উবাই যখন খাজরাজের লোকদের কাছে এসব কথা বলছিল, জায়েদ ইবনে আরকাম নামের এক কিশোর সাহাবি তখন ছিলেন সেখানে। এমন উত্তেজনামুখর পরিবেশ দেখে তিনি দৌড়ে রাসুলের কাছে এসে ঘটনা খুলে বললেন। রাসুলের পাশে তখন উমর ইবনে খাত্তাবসহ আরও বেশ কয়েকজন সাহাবি বসে ছিলেন। ইবনে উবাইয়ের এমন স্পর্ধিত কথা শুনে উমর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! অনেক হয়েছে। এবার আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি মুনাফিকটার গর্দান উড়িয়ে দিয়ে আসি। নয়তো আপনি উব্বাদ ইবনে বিশরকে আদেশ করুন, সে গিয়ে ইবনে উবাইকে হত্যা করে আসবে।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উমরকে নিবৃত্ত করে বললেন, 'না উমর, এটা আমি করতে পারি না। আজ যদি আমি তাকে হত্যার আদেশ দিই, তাহলে কালই লোকজন বলাবলি শুরু করবে–মুহাম্মদ তার সঙ্গী-সাথিদের হত্যা শুরু করছে। সেটা আমাদের জন্য শুভ হবে না। তার চেয়ে এ বিশৃঙ্খলা থামাতে তুমি বরং সবাইকে এখনই যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দাও।'

এটা ছিল দিনের এমন একটি সময়, যখন রাসুল সাধারণত কোথাও যাত্রা করতেন না। কিন্তু উত্তেজনামুখর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তিনি বনু মুস্তালিক ছেড়ে সবাইকে মদিনার দিকে রওনা হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের প্রস্তুতিতে কাফেলা যাত্রা শুরু করল মদিনার পথে। রাসুলকে এমন অসময়ে রওনা হতে দেখে আনসারি সাহাবি উসাইদ ইবনে খোজাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলের পাশে এসে পেরেশান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! এমন অসময়ে যাত্রা শুরু করলেন যে? আপনি তো সাধারণত এ সময় কোথাও রওনা হন না।'

www.pathagar.com

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার কি জানা নেই তোমাদের বন্ধু কী বলাবলি করছে?'

উসাইদ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের কোন বন্ধু?'

রাসুল উত্তর দিলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।'

তিনি ইবনে উবাইয়ের নাম শুনে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বলেছে সে?'

রাসুল বললেন, 'সে বলেছে—মদিনায় পৌঁছে সেখানকার সম্মানিত ব্যক্তি নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে মদিনা থেকে বের করে দেবে।'

উসাইদ ইবনে খোজাইর দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি যদি চান তাহলে এখনই তাকে মদিনা থেকে বহিষ্কারের ঘোষণা দিয়ে দিন। আল্লাহর কসম করে বলছি—সে-ই হলো জঘন্যতম নিকৃষ্ট ব্যক্তি আর আপনি সম্মানিত।'

একটুক্ষণ চুপ থেকে উসাইদ আবার বললেন, 'তবে তার ব্যাপারে আপনার একটুখানি নমনীয়তা কাম্য। বুঝতেই পারছেন, আল্লাহ আপনাকে এমন একটা সময়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত করেছেন, যখন তার গোত্রের লোকেরা তাকে নেতৃত্বের মুকুট পরানোর আয়োজন করছিল। তার ধারণা, আপনি তার কাছ থেকে তার নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিয়েছেন।'

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আর কথা বাড়ালেন না। টানা সারা দিন ধরে সফর অব্যাহত রইল। রাতের বেলায়ও রাসুল থামলেন না, কাফেলাকে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

পুরো রাত কাফেলার গতি অব্যাহত রইল। পরদিন বেলা অনেকটা বাড়লে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাহিনীকে যাত্রাবিরতির নির্দেশ দিলেন। দীর্ঘ পথশ্রান্তিতে সবাই একেবারে কাহিল হয়ে ছিলেন। যাত্রাবিরতির সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ সাহাবি বিশ্রামের জন্য যাঁর যাঁর রসদসামগ্রীর ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাসুল এটাই চাইছিলেন, ক্লান্তির দরুন যাতে করে গতকালের তিক্ত অভিজ্ঞতা কারও মনে নতুন করে দানা বাঁধতে না পারে। যদি এখানে তাঁরা গল্প-গুজবের সময় পেতেন, তাহলে হয়তো গতকাল ঘটে যাওয়া ঘটনা আবার নতুন করে আলোচনায় চলে আসত।

এতক্ষণ যাত্রামগ্ন ছিল বলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সুযোগ পায়নি। কিন্তু সে জানতে পেরেছে যে রাসুলকে কেউ একজন তার বিদ্বেষমূলক প্ররোচনার খবর জানিয়ে দিয়েছেন। এ কারণে যাত্রাবিরতির সঙ্গে সঙ্গে নির্লজ্জের মতো রাসুলের

www.pathagar.com

কাছে এসে বলতে শুরু করল, 'আপনি যেসব কথা শুনেছেন আমার ব্যাপারে, ওসব কথা আমি কস্মিনকালেও বলিনি। অমন কথা আমি মুখেও আনিনি।'

রাসুলের পাশে তখন আরও কতক সাহাবি ছিলেন। তাঁরাও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য সৌজন্যের খাতিরে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! জায়েদ এখনো ছেলেমানুষ, মনে হয় সে ভুল শুনেছে। অথবা যা শুনেছে তা পুরোপুরি মনে রাখতে পারেনি। আপনার কাছে এসে যা মনে এসেছে তা-ই বলেছে।'

সাহাবি জায়েদ ইবনে আরকাম যখন এ ব্যাপারে শুনলেন যে তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে এবং তাঁর কথাকে ভুল বলে সম্বোধন করা হয়েছে, তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তিনি নিজেই বলেন, 'এসব কথায় আমি এতটাই ব্যথিত হয়েছিলাম, এর আগে আর কখনো এমন কষ্ট পাইনি। মনের দুঃখে আমি নিজের হাওদার এক কোণে গিয়ে বসে রইলাম।'

কিন্তু আল্লাহ জায়েদকে সম্মানিত করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বিদায় হওয়ার কিছুক্ষণ পর সুরা মুনাফিকুন অবতীর্ণ হলো। সেখানে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের দিকে ইঙ্গিত করে স্বয়ং আল্লাহ জায়েদের কথার সত্যায়ন করলেন:

> 'আর তারা বলে, যদি আমরা মদিনায় ফিরতে পারি, তাহলে সেখান থেকে সম্মানিত লোকেরা অবশ্যই নিকৃষ্টদের বের করে দেবে। অথচ সম্মান তো কেবল আল্লাহ, রাসুল ও মুমিনদের জন্য; কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।'

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কিশোর সাহাবি জায়েদ ইবনে আরকামকে লোক পাঠিয়ে ডেকে আনেন এবং তাঁকে কুরআনের আয়াতটি শুনিয়ে বললেন, 'কষ্ট পেয়ো না, আল্লাহ স্বয়ং তোমার কথার সত্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন।'

এরপর তিনি উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই ছেলে তার কানের মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা পালন করেছে।'

এখানের যাত্রাবিরতি বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। বিকেলবেলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাহিনীকে আবার সামনে এগোনোর নির্দেশ দিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যদিও লজ্জিত, তবে সে এখনো আশা ছাড়েনি। যেকোনোভাবে হোক এ অপমানের প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে।

সাতাশ

কাফেলা মদিনার কাছাকাছি চলে এসেছে। আর মাত্র দু-এক দিনের পথ বাকি। রাতের বেলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক স্থানে যাত্রাবিরতি

www.pathagar.com

করলেন। মদিনার পথে মুসলিমবাহিনীর এটাই হয়তো শেষ মঞ্জিল। মাসখানেকের সফর ছিল। বনু মুস্তালিক গোত্রকে প্রায় বিনা বাধায় পরাভূত করা এবং কোনোরূপ ক্ষতিসাধন ব্যতীত আবার মদিনায় ফিরে আসতে পেরে সাহাবিদের মনে কিছুটা প্রশান্তি বিরাজ করছিল। জলদি জলদি সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাতের শেষ প্রহর। মুসলিমবাহিনী জেগে গেছে। ভোর হওয়ার আগে আগে রওনা দিতে হবে, যাতে সূর্যের আলো তপ্ততা ছড়ানোর আগেই কমপক্ষে এক মঞ্জিল পথ পেরোনো যায়। সবাই যাঁর যাঁর প্রয়োজন সেরে সামানাপত্র গোছগাছ করে নিচ্ছেন।

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জেগেছেন কিছুক্ষণ আগে। উটের হাওদা থেকে নেমে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে কাফেলা ছেড়ে একটু দূরে খানিকটা আড়ালে চলে গেলেন।

প্রয়োজন সেরে যখন তিনি হাওদার কাছে ফিরে এলেন, হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো, গলার মূল্যবান হারটি গলায় নেই! আয়েশা পেরেশান হয়ে গেলেন। এত মূল্যবান হার, তা-ও আবার আনা হয়েছে বোনের কাছ থেকে। এটা হারিয়ে গেলে তো তাঁর ওপর তিরস্কারের বান বয়ে যাবে। তিনি দেরি করলেন না, যে পথ দিয়ে প্রয়োজন সারতে গিয়েছিলেন সে পথে আবার হাঁটা ধরলেন। অন্ধকার রাতে নিচের দিকে তাকিয়ে হারটি খুঁজতে খুঁজতে সেদিকে যেতে লাগলেন।

এদিকে কাফেলার যাত্রা করার সময় হয়ে গেল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সবাইকে রওনা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সাহাবিরা যাঁর যাঁর বাহন নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যে উটের ওপর আরোহণ করতেন, সেটার পিঠের ওপর পালকির মতো করে আলাদা একটি হাওদা বানানো হয়েছিল। যার চারপাশটা কাপড় দিয়ে পর্দাঘেরা থাকত। আরবের সম্মানিত নারীরা এভাবেই উটের পিঠে চড়ে সফর করতেন। আয়েশা যখন উট থেকে অবতরণ করতে চাইতেন, তখন পুরো হাওদাটি দুই পাশে ধরে মাটিতে নামিয়ে আনা হতো। আবার তিনি যখন সফরের জন্য প্রস্তুত হতেন, তখন আগে হাওদায় চড়তেন, পরে দুই পাশ থেকে ধরে সাহাবিরা তাঁকেসহ হাওদাটি উটের পিঠে বসিয়ে রশি দিয়ে বেঁধে দিতেন।

রাসুল কাফেলাকে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পরপর তাঁর পরিবারের দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবিরা আয়েশার হাওদাটি উটের ওপর তুলে দিলেন। কেননা, তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন আয়েশা এতক্ষণে তাঁর প্রয়োজন সেরে

www.pathagar.com

হাওদায় চড়ে বসেছেন। তা ছাড়া আয়েশা এমনিতেও ক্ষীণকায় হালকা-পাতলা গড়নের ছিলেন। তাঁর বয়স তখন বড়জোর ১৪-১৫। এ কারণে হাওদাবাহকেরা বুঝতে পারেননি ভেতরে আয়েশা আছেন কি নেই। আবার কাঠ ও বিভিন্ন আসবাব দিয়ে বানানোর ফলে হাওদাগুলো এমনিতেও বেশ ভারী হতো, এ কারণে সেটা উত্তোলনের সময় তার ভেতরে কিশোরী আয়েশার অস্তিত্ব ঠাহর করা ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

কাফেলা আয়েশাহীন শূন্য হাওদা উটের পিঠে চাপিয়ে রওনা হয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ খোঁজখুঁজির পর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর শখের হারটি পেলেন অবশেষে। খোদার শোকরিয়া আদায় করলেন। নিশ্চিন্ত মনে ফিরে এলেন কাফেলার কাছে। কিন্তু কোথায় কাফেলা? তাঁর হাওদা আর উট কোথায়? তাঁর ভালোবাসার রাসুল কোথায়? কোথাও কেউ নেই। চারদিকে কেবল রাতের শেষ প্রহরের ধূসর আঁধার।

তিনি পরিচিত নাম ধরে ডাকলেন। কোনো উত্তর এল না। সেখানে ডাক শোনার মতো কেউ নেই, কাউকে আহ্বান করার মতোও কেউ নেই। চারদিকে ধু ধু মরু, এদিক-সেদিকে দু-একটা নিঃসঙ্গ টিলা কেবল। কারও নাম ধরে ডাকলে টিলার গায়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে। রাতের এমন আঁধারে কই যাবেন তিনি এখন?

চোখজুড়ে কান্না এলেও নিজেকে সামলে নিলেন বুদ্ধিমতী আয়েশা। ভাবলেন, কিছুক্ষণ পথ চলার পর আল্লাহর রাসুল নিশ্চয় তাঁর খোঁজ করবেন। যখন তাঁকে হাওদার ভেতরে দেখবেন না, তখন নিশ্চয় কাউকে না কাউকে পেছনে পাঠাবেন তাঁর তালাশে। এই ভেবে তিনি মনে মনে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন। সঙ্গে একটি চাদর ছিল, সেটি গায়ে দিয়ে একটি টিলার পাশে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়েও পড়লেন কোমলমতি আয়েশা।

সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘুমটা একটু বেশিই ছিল। ঘুমকাতুরে বলে লোকমুখে তাঁর প্রসিদ্ধি আছে। এ কারণে কাফেলা যখন এ স্থানে যাত্রাবিরতি করে, তখন তিনি নিজের উটটি নিয়ে সবার থেকে একটু তফাতে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ইচ্ছে ছিল, কাফেলা চলে গেলেও সকাল হতে হতে তিনি দ্রুত উট চালিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে কাফেলার সঙ্গী হবেন।

www.pathagar.com

সকাল হতেই সাফওয়ান জেগে উঠলেন এবং উট নিয়ে কাফেলার ফেলে যাওয়া পথে রওনা হলেন। কিন্তু একটু সামনে এগোতেই দেখেন একটি টিলার পাশে চাদর জড়ানো কিছু একটা পড়ে আছে। তিনি এগিয়ে এসে দেখতে পান, উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা চাদর জড়িয়ে জবুথবু হয়ে শুয়ে আছেন। ঘুমের মধ্যে আয়েশার চেহারা হয়তো চাদরের বাইরে চলে এসেছিল এবং পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে সাফওয়ান আয়েশাকে বেশ কয়েকবার দেখেছিলেন রাসুলের সঙ্গে। তিনি তাঁকে চিনে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হয়রান হয়ে বলে উঠলেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলায়হি রাজিউন! এ যে আল্লাহর রাসুলে স্ত্রী!'

তাঁর আচম্বিত কণ্ঠের আওয়াজ পেয়েই আয়েশার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি জলদি নিজেকে চাদরাবৃত করে ফেললেন। কিন্তু সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিস্ময় যেন তখনো শেষ হয়নি। আল্লাহর রাসুলের স্ত্রী এভাবে কাফেলার পেছনে রয়ে যাবেন, এটা তিনি ভাবতেই পারেননি। তিনি ফের জিজ্ঞেস করেন, 'আল্লাহ আপনার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। আপনি কীভাবে পেছনে পড়ে রইলেন?'

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কেবল ঘুম থেকে উঠেছেন, তার মস্তিষ্ক বোধশূন্য। শেষ রাতের ঘটনায় তিনি কিছুটা ম্রিয়মাণও। তা ছাড়া পর্দার বিধান কিছুদিন আগে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে যেকোনো পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ তাঁর একেবারেই ছিল না। তিনি সাফওয়ানের কথার কোনো উত্তর দিলেন না।

অগত্যা সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পারলেন, যেকোনোভাবেই হোক রাসুলের স্ত্রী কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁর একমাত্র কাজ এখন নিরাপদে তাঁকে রাসুলের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তিনি দেরি করলেন না, নিজের উটটি আয়েশার সামনে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'অনুগ্রহ করে আরোহণ করুন।'

এই বলে তিনি পেছনে সরে গেলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিনা বাক্যব্যয়ে উটে চড়ে বসলেন। সাফওয়ান সামনে থেকে উটের রশি ধরে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তাঁকে কাফেলার কাছে পৌঁছাতে হবে।

আয়েশার কথা না বলার আরেকটি কারণ হতে পারে–অভিমান। পূর্বাপর ঘটনা থেকে অনুধাবনযোগ্য, বয়স কম হওয়ায় আয়েশা এমনিতেই অনেক অভিমানী ছিলেন এবং সামান্যতেই রেগে যেতেন। তিনি যখন কাফেলার কাছে এসে কাউকে দেখলেন না, তখন পুরোটা রাগ গিয়ে পড়ল রাসুলের ওপর।

www.pathagar.com

তিনি কীভাবে তাঁকে রেখেই চলে যেতে পারলেন? একবার হলেও তো তিনি তাঁর খবর নেবেন! এমন অভিমানী কারণে তিনি যখন সাফওয়ানকে দেখলেন, ভাবলেন রাসুলই হয়তো তাঁকে না পেয়ে সাফওয়ানকে পাঠিয়েছেন। কিছুটা রাগান্বিত হয়ে তিনি সাফওয়ানকে ভালো-মন্দ কিছু জিজ্ঞেস না করেই তাঁর সঙ্গে কাফেলার দিকে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন।

কাফেলা ততক্ষণে বেশ দূরে চলে গিয়েছিল। আয়েশা ও সাফওয়ান কাফেলার কাছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে দুপুর হয়ে গেল। লোকজন তখন দুপুরের তপ্ত রোদ থেকে বাঁচতে এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। দূর থেকে আয়েশা এবং সাফওয়ানকে আসতে দেখে সাহাবিরা সচকিত হয়ে উঠলেন। তাঁদের কাছে আসতেই পুরো ঘটনা শুনে আয়েশার প্রতি তাঁরা সমবেদনা জ্ঞাপন করলেন এবং সাফওয়ানকে তাঁর দূরদর্শিতার জন্য বাহবা দিতে লাগলেন। সাহাবিদের মনে এ ছাড়া আর কোনো জিজ্ঞাসার বিষয় সৃষ্টি হলো না। সবাই বিষয়টিকে স্বাভাবিক মনে করে সেখানেই ঘটনার ইতি টেনে দিলেন।

কিন্তু মর্মজ্বালায় জ্বলতে থাকা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবার যেন একটা মোক্ষম অস্ত্র পেয়ে গেল। সে যখন আয়েশা ও সাফওয়ানের একাকী আগমনের ঘটনা জানতে পারল, সঙ্গে সঙ্গে তার মুনাফিক সঙ্গীদের জড়ো করে বলতে লাগল, রাসুলের স্ত্রী কেন একাকী সাফওয়ানের সঙ্গে আসবেন? তাঁরা কেন কাফেলার সঙ্গে এলেন না? এতটা সময় তাঁরা কোথায় ছিলেন?

পরিকল্পনামাফিক ইবনে উবাইয়ের সঙ্গী-সাথিরা এমন অপপ্রচার ছড়িয়ে দিতে লাগল পুরো কাফেলায়। যদিও ঘটনা তেমন কিছুই ছিল না, তবু খুব স্বাভাবিক একটি ঘটনাকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে এমনভাবে প্রচার করতে লাগল, যাতে আয়েশার চরিত্রে কালিমা লেপন করা যায় এবং এর দ্বারা রাসুলের পরিবারের ওপর সাধারণ মানুষের ভালোবাসা ও বিশ্বাসে চিড় ধরানো যায়।

এমন অযাচিত অপপ্রচারের ফলে খুব শিগগির পুরো মুসলিমবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল। যারা ইবনে উবাইয়ের সঙ্গী ছিল, তারা তো বিষয়টি নিয়ে চক্রান্তে মেতে উঠল, আর যাঁরা একনিষ্ঠ সাহাবি ছিলেন, তাঁরা এমন কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ইবনে উবাইকে একহাত দেখে নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে লাগলেন। পুরো বাহিনী একটা মারমুখী অবস্থায় পৌঁছে গেল।

এ অবস্থায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিশৃঙ্খলা এড়াতে কাফেলা নিয়ে মদিনার দিকে রওনা দিলেন। মুসলিমবাহিনী মদিনায় চলে এল।

www.pathagar.com

আটাশ

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবিদের কাফেলার মধ্যে ঘটে যাওয়া এসব ঘটনা ও রটনার ব্যাপারে কিছুই জানতে পারলেন না। সাফওয়ান ইবনে মুআত্তালের সঙ্গে আসার পর তিনি নিজের হাওদায় ঢুকে পড়েন এবং কিছু সময় পরই মদিনার দিকে রওনা হন। বাইরে বাহিনীর মধ্যে কী ঘটে চলেছে, সে ব্যাপারে তাঁর যেমন কোনো ধারণা ছিল না, তেমনি তাঁর মনঃকষ্ট হতে পারে ভেবে কেউ তাঁকে বিষয়টি বলেনওনি।

এটা ছিল ২৮ দিনের লম্বা সফর। দীর্ঘ সফরের কষ্ট ও ক্লান্তিতে কিশোরী আয়েশা মদিনায় ফিরে আসার পরপরই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এত দীর্ঘ সফর এর আগে তিনি আর কখনো করেননি। এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে তিনি ঘরের স্বাভাবিক কোনো কাজকর্মও একা একা করতে পারছিলেন না। অসুস্থ হয়ে নিজের কামরাতে অবস্থান করতে লাগলেন।

তবে তিনি না জানলেও মদিনার সব মানুষের মুখে তাঁর ওপর মুনাফিকদের অপবাদের ঘটনাটি চাউর হয়ে গেল। অধিকাংশ সাহাবি ঘটনা শোনামাত্রই এমন ন্যক্কারজনক বিষয়কে জলজ্যান্ত মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিলেন। কিছু সাহাবি সত্য-মিথ্যার দোদুল্যতায় দুলতে লাগলেন। এবং মুনাফিক ছাড়া খুব অল্পসংখ্যক সাহাবি এ মিথ্যা রটনা বিশ্বাস করলেন।

বিখ্যাত কবি সাহাবি হাসসান ইবনে সাবিত, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পোষ্য মিসতাহ ইবনে আসাসাহ এবং উম্মুল মুমিনিন জয়নব বিনতে জাহাশের বোন হামনাহ বিনতে জাহাশ মুনাফিকদের এ চক্রান্তের ফাঁদে পড়ে গেলেন। অথচ দুঃখজনক বিষয় হলো, হাসসান ও হামনাহ এ সফরে মুসলিমবাহিনীর সঙ্গে শরিকই ছিলেন না। তাঁরা মূলত মদিনায় মুনাফিকদের কাছ থেকে শুনে এসব কথা বিশ্বাস করে নেন।

সারা মদিনা এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় থমথমে হয়ে রইল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামও বিমর্ষ হয়ে রইলেন বেশ কিছুদিন। কিন্তু এভাবে কত দিন থাকা যায়? একদিকে নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব, আরবের বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে রাজনৈতিক অগ্রাভিযান; অন্যদিকে ঘরের মধ্যে প্রিয়তমা স্ত্রী রোগশয্যায় শায়িত। তাঁর ব্যাপারে কুচক্রী লোকজন যা-তা বলছে। মদিনার মানুষের মাঝে নানা রটনা ভেসে বেড়াচ্ছে। সমাজ নিয়ে চলতে হলে সকলের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হয়। অনেক সময় সংখ্যালঘুকে সংখ্যাগুরুর ওপর প্রাধান্য দিতে হয় সমাজের শুভ সিদ্ধান্তের কথা চিন্তা করে। কিন্তু তাই বলে নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে এমন ঘৃণিত অপবাদ কত দিন সহ্য করা যায়!

www.pathagar.com

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদিন বিষণ্ন মনে আয়েশার কাছে এলেন। আয়েশার ঘরে তাঁর মা উম্মে রুমানও ছিলেন। আয়েশা রোগগ্রস্ত, শারীরিকভাবেও দুর্বল। অপবাদের ঘটনার কিছুই তিনি এখনো জানেন না। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছিলেন রাসুল কোনো কারণে তাঁর প্রতি অমনোযোগী। আগের মতো তাঁকে আদর-সোহাগ করেন না, তাঁকে ভালোবেসে কাছে ডাকেন না। তাঁর শুশ্রূষার ব্যাপারেও কেন যেন খানিকটা অমনোযোগী।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘরে এসে নিয়মমাফিক উম্মে রুমানের কাছে আয়েশার শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘরের লোক কেমন আছে?' কিন্তু ওই জিজ্ঞেস করা পর্যন্তই, ভালোবাসার দারুণ ঘাটতি রয়ে গেল সে জিজ্ঞাসায়। ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে এমন নির্জীব আচরণ আয়েশার ভালো লাগল না। অগত্যা কুশল বিনিময়ের পর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজেই যেচে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি আমার মায়ের কাছে চলে যাই। তিনি আমার পরিচর্যা করতে পারবেন।'

রাসুল সেটাকেই ভালো মনে করলেন। বললেন, 'আচ্ছা, যেতে পারো। কোনো সমস্যা নেই।'

আয়েশা এক বুক হতাশা ও বেদনা নিয়ে মায়ের কাছে চলে গেলেন। রাসুলের বুকটাও হু হু করে উঠল।

সাহাবিদের ঘরেও এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। কিন্তু আউস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে যেন নতুন করে কোনো সাম্প্রদায়িক কলহের সৃষ্টি না হয়, এ কারণে তাঁরা এসব বিষয়ে নাক গলাতেন না। কেননা ইসলাম একবার যে জনপদের মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জুড়ে দিয়েছে, এমন মিথ্যা অপবাদের কারণে তাঁদের মধ্যে আবার গোত্রকলহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠুক, তা তাঁরা কখনো চাইতেন না। একই কারণে আনসার ও মুহাজির উভয় দল নিজেদের এসব বিষয় থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন। কোনো সাহাবি অন্য কারও কাছে এমন কিছু শুনলে সঙ্গে সঙ্গে তা অপনোদন করতে দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করতেন।

আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন ঘরে এসেছেন। এমন সময় তাঁর স্ত্রী বললেন, 'লোকজন আয়েশা সম্পর্কে কী যেন বলাবলি করছে, আপনি কি সেসব শুনেছেন?'

www.pathagar.com

আবু আইয়ুব সবকিছুই শুনেছেন এবং তিনি এ-ও জানেন কারা এসব করে বেড়াচ্ছে। তাই তিনি স্ত্রীর মুখটা বন্ধ করতে বললেন, 'আচ্ছা উম্মে আইয়ুব, আমাকে একবার বলো তো, তোমার সামনে যদি এমন সুযোগ আসত, তাহলে তুমি কি অনৈতিক কোনো কাজ করতে পারতে?'

আবু আইয়ুবের স্ত্রীর চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল রাগে। তিনি একজন আল্লাহভীরু এবং সতীসাধ্বী নারী, তাঁকেই কিনা এমন প্রশ্ন করা হচ্ছে! তিনি স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী যা-তা বলছেন! আল্লাহর কসম করে বলছি–আমি কখনো এমন কাজ করতাম না।'

আবু আইয়ুব আনসারি স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'ভুলে যেয়ো না, আয়েশা তোমার থেকেও অনেক বেশি ধার্মিক। সুতরাং, যা নিজের ব্যাপারে শুনলে তোমার খারাপ লাগে, তা আয়েশার ব্যাপারে বলা তো দূরে থাক, ভাবার আগে অন্তত দশবার চিন্তা করে নিয়ো।'

অপবাদ রটনায় হাসসান ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারটি ছিল মূলত ঈর্ষাকেন্দ্রিক। তিনি কবি ছিলেন এবং কবিতার যুদ্ধে তিনি কাউকে পরাভূত করতে পারাকে নিজের গর্বের বিষয় মনে করতেন। সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল রাদিয়াল্লাহু আনহুও কবি ছিলেন। এ কারণে তাঁর কাছে সাফওয়ানের বদনামের শাপ বর্ষণই ছিল মূল লক্ষ্য।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি সাফওয়ানের নামে কবিতা আবৃত্তি করতেন–

উড়ে এসে জুড়ে বসে নামধামের শেষ নেই
ফারিয়া-তনয় ঘরের ছেলে ভ্রূক্ষেপেরও লেশ নেই।

সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন হাসসানের এমন নিন্দা কবিতা শুনলেন, তখন ক্ষোভের সঙ্গে শপথ করে বলতে লাগলেন, 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি জীবনেও কখনো কোনো নারীকে স্পর্শ করিনি।' বস্তুত তিনি চিরকুমার ছিলেন এবং নিরালায় জীবনযাপন করতেন।

সাফওয়ান কেবল এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি উন্মুক্ত তরবারি হাতে বের হলেন হাসসানের খোঁজে। তাঁকে নিয়ে হাসসান এমন রটনা রটাচ্ছে, এটা ভাবতে ভাবতে তাঁর চোখ-মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ খেলা করছিল। আজ হাসসানকে যেখানে পাবেন, সেখানেই কাত করে ফেলবেন। তিনি তরবারি হাতে ছুটছিলেন আর আবৃত্তি করছিলেন–

কথার ছল নয়, যদি পারো তরবারি দিয়ে করো মোকাবেলা

www.pathagar.com

আমি বীরযোদ্ধা, কোনো মিথ্যুক-কপট কবি নই, হে নিন্দুকের চ্যালা।

সাহাবিরা সাফওয়ানের এমন উন্মত্ততা দেখে তাঁকে ধরে রাসুলের কাছে নিয়ে গেলে রাসুল তাঁকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে নিবৃত্ত করলেন।

এদিকে এ অপবাদের ঘটনায় এখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ওহি অবতীর্ণ হয়নি। জিবরাইল এখনো সত্যতার ব্যাপারে কোনো ফয়সালা নিয়ে আসেননি।

রাসুল ভালো করেই জানতেন, এ মুহূর্তে যদি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার চ্যালাদের ব্যাপারে কঠোর কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যান, তাহলে লোকমুখে প্রচারিত হয়ে যাবে–রাসুল মুহাম্মদ নিজের স্ত্রীকে বাঁচাতে নিজ দলের লোকদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। হতে পারে তখন আরেক দল কুচক্রী রটিয়ে দেবে–নিশ্চয় এ ঘটনার মধ্যে সত্যতা ছিল বিধায় মুহাম্মদ বিষয়টি ধামাচাপা দিতে প্রতিপক্ষের ওপর এমন নির্দয় আচরণ করেছেন।

কিন্তু রাসুলও মানুষ, তিনি জিন-ফেরেশতা নন। তিনি আলিমুল গায়েব নন যে অদৃশ্যের সব খবর জানবেন। তিনি রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ। মানুষের মতো তিনিও বেদনাহত হন, ব্যথায় মুষড়ে পড়েন, দুশ্চিন্তায় লীন হন। আর কত সহ্য করবেন? প্রিয় স্ত্রীর প্রতি এমন অপবাদে কীভাবে তিনি সুস্থিরমতো জীবনযাপন করেন?

তাই একদিন মসজিদে নববিতে সকল সাহাবিকে একত্র করে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। সকলের দিকে বেদনাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, 'হে লোকসকল! কিছু লোক আমার পরিবার নিয়ে নানা অসত্য রটনা ছড়াচ্ছে, তাদের ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। আমার পরিবারের ব্যাপারে আমি উত্তম ছাড়া মন্দ কিছুই কখনো শুনিনি। আর যে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এসব রটনা ছড়ানো হচ্ছে, তার ব্যাপারেও আমি কখনো মন্দ ধারণা করি না। সে কখনো আমার ঘরে আমার অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করেনি, যদি কখনো করে থাকে, তবে সেটা আমার সঙ্গেই প্রবেশ করেছে।'

রাসুল তাঁর অনুসারীদের আরো কিছু কথা বললেন চলমান অপবাদ আরোপ বিষয়ে। রাসুলের ভাষণ শেষ হতেই আউস গোত্রের সাদ ইবনে মাআজ এবং উসাইদ ইবনে হুদাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসুলের এমন মর্মস্পর্শী বক্তব্য তাঁদের অন্তরে গভীর রেখাপাত করেছিল। যে রাসুলকে তাঁরা ভালোবেসে তাঁদের শহরে সম্ভাষণ জানিয়ে নিয়ে এসেছেন, সেই রাসুলকে

www.pathagar.com

তাঁদেরই লোকজন কষ্ট দিচ্ছে, এ বিষয়টি তাঁরা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! অপবাদ আরোপকারী এমন লোক যদি আউস গোত্রের হয়, তবে তাদের শায়েস্তা করতে আমরাই যথেষ্ট। আর যদি খাজরাজ গোত্রের হয়, তবে তাদের নাম বলুন, আল্লাহর কসম! নিশ্চয় তারা হত্যার যোগ্য!'

তাঁদের এমন কথায় খাজরাজ গোত্রের নেতা সাদ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি জানতেন অপবাদ আরোপকারীরা খাজরাজ গোত্রের লোক। কিন্তু ভরা সমাবেশে সবার সামনে আউস গোত্রের নেতার মুখে নিজ গোত্রের লোকদের হত্যার কথা শুনে তাঁর ভেতরে গোত্রপ্রীতি জেগে উঠল। তিনি দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, 'আল্লাহর কসম! এ মিথ্যা দোষারোপ। আমরা তাদের হত্যা করব না। অপবাদ আরোপকারীরা খাজরাজ গোত্রের লোক জেনেই তোমরা তাদের হত্যার কথা বলছ। তোমাদের গোত্রের লোক হলে কখনো তোমরা এমন ফয়সালা করতে না।'

তাঁর কথায় উসাইদ ইবনে হুদাইর জ্বলে উঠলেন, 'তুমিই বরং মিথ্যা বলছ। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে তুমিও একজন মুনাফিক। কেননা তুমি মুনাফিকদের পক্ষাবলম্বন করছ।'

এভাবে ভরা মজলিসেই আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। এমনকি দুই পক্ষের লোকদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যাওয়ার উপক্রম হলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদের নিবৃত্ত করলেন।

এভাবে নয়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবার আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন সাহাবির সঙ্গে বসে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করলেন। এই সন্দিগ্ধ সময়ে কী করা উচিত, সে ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শ চাইলেন।

এ ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর একান্ত নিকটজন যাঁরা আছেন, তাঁদের সকলের কাছে মতামত জানতে চাইলেন। প্রথমেই গেলেন আলির কাছে।

আলি ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলের সঙ্গে আছেন সেই ছোট্টবেলা থেকে। রাসুলের পরিবারে বড় হয়েছেন তিনি। তাঁর পিতা আবু তালিব মারা যাওয়ার পর রাসুল তাঁর সব ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন। রাসুলের সবচেয়ে আদরের কন্যা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করে সম্মানিত হয়েছেন আলি। বলা যায়, তিনি রাসুলের

www.pathagar.com

সর্বসঙ্গী। সুতরাং, রাসুলের মনোবেদনা অন্য অনেকের চেয়ে ভালো বুঝতে পারেন।

তাঁকে এ বিষয়ে মতামত জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! যদি সত্যি এমন কিছু ঘটে থাকে, তাহলে আপনি ইচ্ছে করলে অন্য কোনো নতুন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন। তবে সত্যতা যাচাই ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। সবচেয়ে ভালো হয় তাঁর দাসী বারিরাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা। সে প্রকৃত সত্য সবার চেয়ে ভালো জানবে।'

ডাকা হলো আয়েশার দাসী বারিরাকে। সে এলে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে সত্য বলার জন্য কঠোর শাসন করলেন। তারপর তাকে আয়েশার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, আয়েশাকে আমি সবচেয়ে সচ্চরিত্রবান বলে জানি। তাঁর মধ্যে আমি কখনো কোনো দোষ দেখতে পাইনি। তবে মাঝেমধ্যে এমন হয় যে আমি অনেক সময় আটা পিষে খামিরা বানিয়ে তাঁকে তা দেখে রাখতে বলে বাইরে যাই। এসে দেখি তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন আর বকরি এসে খামিরা খেয়ে ফেলেছে।'

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ডাকলেন উসামা ইবনে জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে। উসামা একদিকে যেমন রাসুলের পালক পুত্র জায়েদের ছেলে, অন্যদিকে তিনি রাসুলের পালক মাতা উম্মে আয়মানেরও ছেলে। রাসুল নিজের মাতৃসম উম্মে আয়মানকে জায়েদ ইবনে হারিসার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। রাসুলের মা আমিনার ইন্তেকালের পর এই উম্মে আয়মানই তাঁকে মাতৃস্নেহে মানুষ করেন। এই দুই ভালোবাসার মানুষের ঘরে জন্ম নেন উসামা। তিনিও ছোটবেলা থেকে রাসুলের ঘরে মানুষ হয়েছেন। উসামা ছোট থাকতে রাসুল তাঁকে গাধার পিঠে চড়িয়ে এদিক-সেদিক বেড়াতে নিয়ে যেতেন আর লোকজনকে বলতেন, সে আমার ছোট ভাই।

উসামাকে আয়েশার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আয়েশার প্রশংসা করে বললেন, 'আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন? হে আল্লাহর রাসুল! তাঁর ব্যাপারে আমি ভালো ছাড়া জীবনে একটা মন্দ কথা কখনো শুনিনি। আপনি যা শুনছেন তা অবশ্যই মিথ্যা ও বানোয়াট কাহিনি ছাড়া আর কিছুই নয়।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর অন্য স্ত্রীদের কাছেও এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সবাই আয়েশার ব্যাপারে ভালো ছাড়া মন্দ কোনো কথা বলেননি। উম্মুল মুমিনিন জয়নব বিনতে জাহাশকে কিছুদিন আগেই বিয়ে

www.pathagar.com

করেছেন রাসুল। রূপে-গুণে এ মহিলা অত্যন্ত তেজোদীপ্ত ছিলেন। এ কারণে আয়েশার মনে তাঁর প্রতি খানিকটা ঈর্ষা কাজ করত। কিন্তু তাঁকেও যখন রাসুল আয়েশার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি জলদি কানে আঙুল দিলেন, যেন এমন কথা শোনাও পাপ। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'আল্লাহর কসম করে বলছি, আয়েশার ব্যাপারে ভালো ছাড়া এক বিন্দু মন্দ কথা আমার জানা নেই।'

অথচ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারে অপবাদ রটনায় যারা অগ্রগামী ছিল, তাদের অন্যতম ছিলেন জয়নবের বোন হামনাহ বিনতে জাহাশ। হামনাহ হয়তো বোনের সংসারে সুখ আনতে এমন রটনায় অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু যাঁদের জীবন সাজানো হয়েছে নবির ভালোবাসার ছাঁচে ঢেলে, তাঁরা কখনো অপরের দুর্নাম রটিয়ে নিজেদের সুখ ক্রয় করেন না। জয়নব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা আয়েশার প্রতি সত্যতার সাক্ষ্য দিয়ে সে নববি ভালোবাসারই প্রমাণ দিয়ে দিলেন।

উনত্রিশ

বনু মুস্তালিক অভিযানের পর ২০ দিন পেরিয়ে গেছে। ২০টা দিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রোগে-শোকে জীর্ণপ্রায়। শারীরিক ক্লেশ তো আছেই, রাসুলের বিরহও তিনি সহ্য করতে পারছেন না। রাসুলের অবহেলা তাঁকে আরও কুরে কুরে শেষ করে দিচ্ছে। অপবাদের ঘটনা পিতা আবু বকর বা মা উম্মে রুমান তাঁকে জানাননি। আদরের মেয়ে, অসুস্থ অবস্থায় এমন ঘটনা শুনলে না জানি কেমন কষ্ট পাবে! এ কথা ভেবে মা-বাবা আয়েশাকে এসব বিষয় জানাতে আগ্রহী হননি। তাঁরা তাঁদের মেয়েকে চেনেন। এক বিন্দু ফুলের কলঙ্ক কখনো তাঁকে স্পর্শ করেনি, দুনিয়ার মানুষ যে যা-ই বলুক। এখন শুধু আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষায়।

২০ দিন পর এক রাতের ঘটনা। মদিনার আনসার-মুহাজির অনেক মহিলা আয়েশাকে দেখতে আসেন, তাঁর সেবা-শুশ্রূষায় পাশে থাকেন। অপবাদ রটনাকারী সাহাবি মিসতাহ ইবনে আসাসার মা উম্মে মিসতাহ সেদিন ছিলেন আয়েশার ঘরে। তিনি আবু বকরের নিকটাত্মীয় হওয়ায় মাঝেমধ্যে আসতেন আয়েশাদের বাড়িতে। সেদিনও এসেছিলেন। আয়েশার শরীর আজ খানিকটা ভালো। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে উম্মে মিসতাহ তাঁর সঙ্গে রওনা হলেন।

www.pathagar.com

বাইরে বেরিয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন হাঁটতে শুরু করলেন, হঠাৎ উম্মে মিসতাহ নিজের গায়ের চাদরের কোনায় পা আটকে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ দিয়ে নিজের ছেলের প্রতি অভিশাপ বেরিয়ে এল, 'মিসতাহর কপাল পুড়ুক!'

উম্মে মিসতাহর কথায় আয়েশা হতভম্ব হয়ে গেলেন। বলছে কী এ মহিলা! নিজের ছেলের প্রতি অভিশাপ দিচ্ছে! তিনি বলে উঠলেন, 'ছি ছি! এ আপনি কী বললেন? আপনি এমন একজন মুহাজির সাহাবির ওপর অভিশাপ দিচ্ছেন, যিনি বদরের যুদ্ধে শরিক হয়েছেন!'

আয়েশার মুখ থেকে তাঁর ছেলের প্রতি এমন করুণা শুনে উম্মে মিসতাহ কিছুটা অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন না আয়েশা এসবের কিছু জানেন নাকি জানেন না। তিনি আয়েশার সামনে গিয়ে বললেন, 'হে আবু বকর-কন্যা! সে তোমার ব্যাপারে কী বলে বেড়াচ্ছে সেসবের কিছুই কি তুমি জানো না? এটা সম্ভব যে, তুমি সত্যি পরম বিশ্বাসী নারীদের একজন যে সবকিছু স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে। নাকি সত্যি তুমি কিছু জানো না?'

আয়েশা তাঁর কথার আগামাথা বুঝতে পারলেন না। ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সে আমার ব্যাপারে কী বলেছে? এ ব্যাপারে তো কিছু জানি না।'

উম্মে মিসতাহ বললেন, 'তোমার ব্যাপারে জঘন্য অপবাদ রটানো হয়েছে।' এরপর তিনি এত দিন ধরে ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনা আয়েশার কাছে খুলে বললেন। আয়েশা তাঁর মুখ থেকে ঘটনার একেকটি বাক্য শুনছিলেন আর মনে হচ্ছিল তাঁর পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। কী শুনছেন তিনি এসব? এ-ও কি সম্ভব? তিনি যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

এমন নির্জলা অপবাদ শুনে তাঁর মতো একজন পুণ্যবতী নারীর পক্ষে তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। যেটুকু সুস্থ হয়েছিলেন এ কদিনে, এ ঘটনা শোনার পর অসুস্থতা যেন আরও দ্বিগুণ বেগে বাড়তে লাগল। তিনি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে কেবল উম্মে মিসতাহকে বলতে পারলেন, 'সত্যিই কি এমনটা ঘটেছে?'

এ কথা বলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। উম্মে মিসতাহ জলদি তাঁর কাছে এসে চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে দিলে তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন। জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি যেন কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেললেন পুরোপুরি। তাঁর দুই চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। কোনো কথা না বলে প্রয়োজন না সেরেই দৌড়ে বাড়ির পথ ধরলেন।

www.pathagar.com

বাড়িতে এসে মা উম্মে রুমানকে ধরলেন, 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! সারা মদিনার লোকজন যে আমার নামে এত কথা বলে বেড়াচ্ছে, কই আপনি তো আমাকে সেসবের কিছুই বলেননি!'

উম্মে রুমান অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলা ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, আয়েশা যেহেতু একবার জেনে গিয়েছে সব, এবার আর কোনো কিছু গোপন করা যাবে না। তিনি ধীরস্থির ভঙ্গিতে মেয়ের পাশে এসে তাঁকে বললেন, 'মা আমার! ব্যাপারটি হালকাভাবে নাও। কোনো মেয়ে যদি সুন্দরী হয় এবং তার স্বামী যদি তাকে সীমাহীন ভালোবাসে, আর তার যদি সতিন থাকে, তাহলে নারীরা তো বটেই অনেক পুরুষও তার নামে এন্তার রটনা রটাতে থাকে। যদি এমন ঘটনা না ঘটত, তবে সেটাই হতো বিরল ঘটনা। তুমি এ নিয়ে একদম চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কিন্তু আয়েশা সবকিছু ঠিক হওয়ার মতো অবস্থায় ছিলেন না। তিনি ব্যথায় একেবারে ভেঙে পড়লেন, সব হারানোর বেদনায় মুষড়ে গেলেন। এখন তিনি বুঝতে পারছেন, কেন আল্লাহর রাসুল তাঁর কাছে এসে বসতেন না, কেন তাঁকে সোহাগ করে ডাকতেন না। আয়েশা রোদন করে কাঁদতে লাগলেন। তিনি নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেলেন, ঘুমাতে ভুলে গেলেন। তাঁর কিশোরী মনে কেবল দাউ দাউ ব্যথার দহন।

আবু বকর মেয়ের এমন অবিরত কান্না দেখে সহ্য করতে পারলেন না। তিনি মেয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'বেটি, এত কাঁদলে যে তোমার ছোট্ট কলজেটা ফেটে যাবে, মা! শান্ত হও!'

কীভাবে তিনি শান্ত হবেন? যে রাসুলের ভালোবাসায় তিনি সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন, রাসুলের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য চাতক পাখির মতো দিনের পর দিন বসে থেকেছেন; সেই রাসুল পর্যন্ত তাঁকে বিশ্বাস করলেন না! আজ তিনি তাহলে আর কার কাছে যাবেন? এ পৃথিবীতে তাঁর আর কে রইল ভালোবাসার? কে আছে আর চোখ বুজে বিশ্বাস করার?

একবার ভাবলেন, তিনি কুয়ায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা কেন করছেন না!

এভাবে দুই দিন কেটে গেল। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার অবস্থা মৃতপ্রায়। দুটো দিন কেটে গেছে কেবল কান্নার ওপর দিয়ে। নিজের এক বুক দুঃখ বলার মতো মানুষটাও আর নেই তাঁর।

তিনি মায়ের ঘরের বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদছিলেন। এমন সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এলেন। বাড়িতে আবু বকর, উম্মে রুমান

www.pathagar.com

ছাড়াও এক আনসারি মহিলা ছিলেন। রাসুল এসে আয়েশার পাশে বসলেন। রাসুলের মুখও বেদনাক্লিষ্ট। তিনিও আর এ দীর্ঘ বেদনা সহ্য করতে পারছিলেন না। আয়েশার রোদনভরা অবয়ব দেখে তাঁর বেদনা আরও গভীর হলো।

আয়েশার পাশে বসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহ পড়লেন। এরপর সান্ত্বনার সুরে বলতে লাগলেন, 'আয়েশা! লোকজন যা বলাবলি করছে, আশা করি তুমি তা শুনেছ। যদি তা সত্য হয়ে থাকে, তবে তুমি তওবা করো। আল্লাহ ক্ষমা করবেন। আর যদি তা সত্য না হয়ে থাকে, তবে আল্লাহই তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করবেন।'

রাসুলের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়েশার কান্না থেমে গেল। তিনি হঠাৎই একদম স্থাণুর মতো নির্বিকার হয়ে গেলেন। একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন রাসুলের কথা শুনে। এ কদিন লোকজনের মুখে অনেক কথা শুনেছেন, অনেক গঞ্জনা সহ্য করেছেন নীরবে। কিন্তু রাসুলের মুখে এমন কথা শোনার পর তাঁর চোখের অশ্রু নিমেষেই শেষ হয়ে গেল। তিনি কথা বলার মতো শক্তি হারিয়ে ফেললেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা মাথা উঁচু করে মা-বাবার দিকে তাকালেন। কিন্তু আবু বকর বা উম্মে রুমান কোনো কথা বলছেন না, তাঁরা দুজন চুপ। রাসুলের কথার পিঠে কোনো কথা বলার মতো সাহস তাঁদের নেই। কিন্তু আয়েশার আছে। কারণ, অপবাদ দেওয়া হয়েছে তাঁর চরিত্রে। সন্দেহের বীজ ঢোকানো হয়েছে তাঁর ভালোবাসার মানুষের মনে। রটনা রটানো হয়েছে তাঁর চারিত্রিক নিষ্কলুষতা নিয়ে।

সুতরাং, তিনি চুপ থাকতে পারেন না। তিনি আয়েশা! আয়েশা বিনতে আবু বকর সিদ্দিক। তাঁর পিতা সত্যবাদিতার জন্য অর্জন করেছেন পৃথিবীর প্রথম সিদ্দিক উপাধি। তিনি নিজেও আল্লাহর রাসুলের প্রিয়তমা স্ত্রী। যাঁর চাদরের তলায় শুয়ে রাসুলের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়েছে ওহিয়ে এলাহি। তিনি কী করে চুপ থাকবেন?

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হৃদয়ের দৃঢ়তা নিয়ে মুখ খুললেন, 'আমার ব্যাপারে যেসব রটনা রটানো হয়েছে, সে ব্যাপারে আমি কখনো তওবা করব না। লোকজন যা বলাবলি করছে, যদি তা আমি স্বীকার করে নিই, তবে সেটা হবে মিথ্যাকে স্বীকার করে নেওয়া। আল্লাহই ভালো জানেন, এ ব্যাপারে আমি পরিপূর্ণ নিষ্কলুষ। আর লোকজনের কথা যদি আমি অস্বীকারও করি, তবু হয়তো কেউ তা বিশ্বাস করবে না। আমার অবস্থা তো এখন ইউসুফ (আ.)-এর পিতার মতো। যিনি সব হারিয়ে শুধু আল্লাহর কাছে বলেছিলেন, 'অতএব, সুন্দর ধৈর্যই

www.pathagar.com

এখন কাম্য। আর তোমরা যা বলছ, সে ব্যাপারে আমি কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।'

আয়েশার হৃদয়ে খেদ ছিল, ভালোবাসা হারানোর গভীর বেদনা ছিল, নিজেকে সত্যায়ন করার মানবিক প্রতিজ্ঞা ছিল। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে রাসুলের সামনে সেসব অকপটে বলে দিলেন। তিনি জানতেন, তিনি সত্য। সুতরাং, মহাসত্যের মালিক কখনো তাঁকে কলুষিত করবেন না। তাঁকে তাঁর সত্যতার বিভাবরী শক্তি দিয়ে পুরো পৃথিবীর কাছে আলোকিত করবেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিঃশঙ্ক। তাঁর মুখাবয়বে এক বিন্দু দ্বিধা নেই। তিল পরিমাণ জড়তা নেই তাঁর আচরণে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আয়েশার পাশে বসে ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ রাসুলের চেহারায় পরিবর্তনের আভাস দেখা দিল। রাসুলের চেহারার এমন পরিবর্তনের সঙ্গে আয়েশা পরিচিত। বহুবার তাঁর সামনে তিনি রাসুলের সঙ্গে এমন হতে দেখেছেন। বুঝতে পারলেন, তাঁর হৃদয়ে ওহি অবতীর্ণ হচ্ছে। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিচ্ছে, শরীরে মৃদু কম্পন। রাসুল নিজেকে চাদরে আবৃত করে নিলেন। তাঁর মাথার নিচে একটি চামড়ার বালিশ রেখে দেওয়া হলো। তিনি অর্ধশোয়া অবস্থায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

রাসুলের চোখ মুদ্রিত। ঘরের সবাই স্তব্ধ হয়ে আছেন, কেউ কোনো কথা বলছেন না। আবু বকর ও উম্মে রুম্মান উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকিয়ে আছেন রাসুলের ওহিদীর্ণ মুখাবয়বের দিকে। তাঁদের বুক দুরু দুরু করে কাঁপছে, মুখে কোনো কথা সরছে না। ঘরে থাকা আনসারি মহিলাও নিশ্চল বসে আছেন।

কিন্তু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা শঙ্কাহীন। তাঁর মনের মধ্যে সামান্য ভয়ের লেশমাত্র নেই। সম্রাজ্ঞীর মতো মাথা উঁচু করে বসে আছেন তিনি। তাঁর চেহারায় শঙ্কার পরিবর্তে খেলা করছে চিত্তহরী প্রশান্তি। কারণ তিনি জানেন, পৃথিবীর সকল মানুষ একদিকে বললেও যিনি মহামহিম, তিনি সব সময় সত্যই প্রকাশ করেন। সত্য প্রকাশে তিনি কখনো কারও পরোয়া করেন না। তাঁর সত্যের কাছে পৃথিবীর সকল মিথ্যা নিমেষে কর্পূরের মতো উবে যায়।

কিছুটা সময় নীরবে কেটে গেল। একটু পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জেগে উঠলেন। শীতের মৌসুম ছিল, তবু ওহি অবতীর্ণ হওয়ার ধকলে রাসুলের মুখাবয়বজুড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে। চোখ খুলে রাসুল কপালের ঘাম মুছলেন। তাঁর মুখে হাসি। তিনি হাসিমুখে আয়েশার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আয়েশা! সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহ তোমার

www.pathagar.com

নিষ্কলুষতার সত্যায়ন করে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। ওঠো, আল্লাহর প্রশংসা করো।'

রাসুলের এই এতটুকু কথায় সারা ঘরে কান্নার রোল পড়ে গেল। এ যে আনন্দাশ্রু! এ যে দীর্ঘ যাতনার পর দগ্ধ হৃদয়ে এক সালসাবিল ঝরনাধারা! এ যে ভালোবাসার মোহে ছুটে চলা এক নদীর সগৌরবে সাগরের বুকে আত্মবিসর্জন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘরের সবাইকে সুরা নুরের ১১ থেকে ১৯ নং আয়াতগুলো পাঠ করে শোনালেন। উম্মে রুমান তাকালেন প্রাণের কন্যা আয়েশার দিকে। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরলেন। মেয়েকে আদর করে বললেন, 'যাও মা, জীবনসঙ্গীর প্রতি শোকরিয়া আদায় করো।'

হায় আয়েশা! হায় অভিমানী আয়েশা সিদ্দিকা! অভিমানে কিশোরী হৃদয়টা মুহূর্তে উথলে উঠল তাঁর। এক বুক কান্না যেন উঠে আসতে চাইল বুকের অতল থেকে। কিশোরী হোক, রাসুলের বধূয়া হোক, উম্মুল মুমিনিন হোক; সবশেষে একজন নারী তো। মনটা একেবারে মোমের মতো। একটু দাগ লাগলেই কী গভীর রেখা পড়ে যায় সেখানে।

মায়ের কথায় তাঁর অভিমান আরও উথলে উঠল। চোখজুড়ে কান্নার অবিরল ধারা। এ কদিন কেঁদেছেন বেদনায়, এখন কাঁদছেন আনন্দে, অভিমানে। অভিমানে ফুলে ফুলে উঠছেন বারবার। তাই উম্মে রুমান আবেদন করার পর রাসুলের সামনেই তিনি বলে উঠলেন, 'না, আমি তাঁর শোকরিয়া আদায় করব না। যদি করতে হয়, তবে আমি শুধু আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করব, তাঁকে ধন্যবাদ দেব।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আয়েশার অভিমানের অতলতা অনুমান করতে পারলেন। ভাবলেন, এমনটি হওয়াই তো স্বাভাবিক। তিনি আর দেরি করলেন না, বেরিয়ে পড়লেন আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে। মসজিদে নববিতে ঘোষণা করবেন আয়েশার নিষ্কলুষতার পয়গাম, যা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আয়াত অবতীর্ণ করে সত্যায়ন করেছেন। বস্তুত সারা মদিনায় তাঁর চেয়ে সুখী আর কেউ নেই এখন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববিতে সকল সাহাবিকে একত্র করে আয়েশার নির্দোষিতার পক্ষে আল্লাহর ঘোষণা শুনিয়ে দিলেন। মদিনাবাসী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ঘরে ঘরে আয়েশার বন্দনায় স্তুতি হতে লাগল—তাঁর নিষ্কলঙ্কের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন। কী সৌভাগ্য!

www.pathagar.com

মদিনার মুনাফিকদের মুখে লেগে গেল কুৎসিত চুনকালি। এ ঘটনার পর মদিনার লুকিয়ে থাকা সব মুনাফিকের চেহারা বাইরে বেরিয়ে এল। এত দিন যারা তলে তলে মুসলিমদের বিরুদ্ধাচরণ করত, এ ঘটনায় তারা একদম জনসম্মুখে এসে পড়ল। তাদের একপ্রকার একঘরে করে ফেলা হলো এবার। মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সমাজছাড়া হয়ে অপমানিত অবস্থায় জীবনযাপন করতে লাগল।

যে তিনজন ব্যক্তি প্রকাশ্যে আয়েশার ব্যাপারে কুৎসা রটিয়েছিল, তাদের ধরে এনে বিচারের মুখোমুখি করা হলো। হাসসান ইবনে সাবিত, মিসতাহ ইবনে আসাসা ও হামনাহ বিনতে জাহাশকে মিথ্যা অপবাদ আরোপের অপরাধে ৮০টি করে বেত্রাঘাত করা হলো। একই সঙ্গে ব্যভিচার, অপবাদ ও অপপ্রচারের শাস্তি হিসেবে 'আয়াতে আয়েশা'কে নির্ধারণ করা হলো ইসলামি আইনের মূলমন্ত্র হিসেবে।

আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি নিজেকে কখনো এতটা সম্মানিত ভাবতে পারিনি যে-আল্লাহ আমার নিষ্কলুষতার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করবেন, যা মসজিদে মসজিদে তেলাওয়াত হবে এবং নামাজে পড়া হবে। আমি বড়জোর এতটুকু আশা করেছিলাম, আল্লাহ তায়ালা রাসুলকে স্বপ্নের মাধ্যমে আমার নির্দোষিতার ব্যাপারে অবহিত করবেন। কেননা, আল্লাহ তো ভালো করেই জানেন যে আমি নির্দোষ। অথবা আমি ভেবেছি, মামুলিভাবে কোনো একটা সংবাদের মাধ্যমে আল্লাহ রাসুলকে তা জানিয়ে দেবেন। কিন্তু আমার ব্যাপারে ওহি, যা কুরআনে অঙ্গীভূত হয়ে অবতীর্ণ হবে; আল্লাহর কসম! এমন সৌভাগ্যবান নিজেকে আমি কখনোই ভাবতে পারিনি।'

ত্রিশ

বোন আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছ থেকে নেওয়া মুক্তোর হারটি আরেকবার বেশ বিড়ম্বনায় ফেলল উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে। সেবারও ঘটনা ঘটল মদিনার বাইরে, কোনো এক সফর থেকে ফেরার পথে। এ হার যেন এক বরকতময় সোনার পাথরবাটি!

রাতের শেষ প্রহর। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অভিযান থেকে মদিনা ফিরছিলেন। দিনের বেলা সূর্যের তেজের কারণে পথ চলতে কষ্ট হয় বিধায় রাতের বেলা সফরের আয়োজন। সঙ্গে সাহাবিরা তো আছেনই, স্ত্রীদের মধ্যে আছেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা।

www.pathagar.com

কাফেলা এগিয়ে চলছিল। সুবহে সাদিক হতে এখনো খানিকটা দেরি। কাফেলা জাতুল জাইশ নামক স্থান অতিক্রম করছিল তখন। আরও কিছুদূর গিয়ে ফজরের নামাজের যাত্রাবিরতি করা হবে। এমন সময় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা গলায় হাত দিয়ে দেখলেন তাঁর গলার হারটি নেই। তিনি চমকে উঠলেন। হাওদার এদিক-সেদিক হাতড়াতে লাগলেন–না, নেই। হারটি কোথাও নেই, কোথাও পড়ে গেছে বেখেয়ালে। জলদি রাসুলকে জানালেন হার হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টি।

এর আগে হার হারিয়ে যে দারুণ কাণ্ড হয়েছিল, তা ভালোই মনে আছে রাসুলের। এ কারণে এবার আর কোনো ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। তিনি কাফেলাকে যাত্রাবিরতির নির্দেশ দিলেন।

আয়েশা এবং রাসুল উট থেকে নেমে এদিক-সেদিক কিছুক্ষণ হারটি খুঁজলেন, পেলেন না। তাঁরা দুজন না পেয়ে রাসুল একজন স্বেচ্ছাসেবককে নিযুক্ত করলেন হারটি তালাশ করতে। যে পথে কাফেলা এগিয়ে এসেছে, সে পথ ধরে তাঁকে খুঁজতে বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যে কাফেলার অন্যরা জেনে গেলেন যে আয়েশার হার হারিয়ে গেছে, তাঁরাও এদিক-সেদিক খুঁজতে লাগলেন মূল্যবান হারটি। কিন্তু না, কোথাও পাওয়া গেল না।

রাতের বেলার ক্লান্তিকর সফর। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একটু বিশ্রাম নেওয়ার প্রস্তুনি নিলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজের হাওদা থেকে নেমে উটের পাশে বসে ছিলেন। রাসুল তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতি, তাই বিশ্রামের জন্য আলাদা কোনো আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়নি। অগত্যা রাসুল আয়েশার কোলে মাথা রেখে চোখ বুজলেন, খানিকটা ঘুমিয়ে নেওয়া যেতে পারে। সবাইকে নির্দেশ দিলেন–এখান থেকে ফজরের নামাজ পড়ে কাফেলা আবার যাত্রা শুরু করবে।

এদিকে সমস্যা দেখা দিল অন্য জায়গায়। সুবহে সাদিক প্রায় হয়ে এসেছে, একটু পরই ফজর নামাজের সময় হয়ে যাবে। কিন্তু যাত্রীদের কারও কাছে পবিত্রতা অর্জন করার মতো পর্যাপ্ত পানি নেই। জায়গাটিও এমন বিরান যে আশপাশে কোনো জলাশয় বা কূপের দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না। এ অবস্থায় এখানে যাত্রাবিরতি করলে ফজরের নামাজ কাজা হওয়ার প্রবল আশঙ্কা।

কাফেলার লোকজন বিষয়টি নিয়ে কানাঘুষা শুরু করলেন। কয়েকজন আবু বকরের কাছে এসে এ বিষয়ে একটু কড়া কথা বলে ফেললেন, 'দেখলেন, আপনার মেয়ে কী কাণ্ডটা করলেন? তিনি রাসুলসহ আমাদের সবাইকে এমন একটি জায়গায় আটকে রাখলেন, যেখানে পানির নাম-গন্ধ পর্যন্ত নেই।'

www.pathagar.com

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকজনের কথায় আয়েশার প্রতি দারুণ রুষ্ট হলেন। হওয়ারই কথা, এক হার নিয়ে আগেও একবার অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। এবারও সেই হার হারিয়ে সবাইকে গঞ্জনার ভাগীদার করা হচ্ছে। হারটি যদি না হারাত, তাহলে তাঁরা সামনে এগিয়ে কোনো জলাশয় বা কূপের কাছে যাত্রাবিরতি করতে পারতেন, তাহলে লোকজনের আর পানির অভাব হতো না।

পিতা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কন্যা আয়েশার ওপর প্রচণ্ড রাগ নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর কাছে গিয়ে দেখেন তাঁর উরুর ওপর মাথা রেখে রাসুল নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। আয়েশার হাত রাসুলের চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে। এটা দেখে তাঁর রাগ কিছুটা দমে গেলেও তিনি থামলেন না, চাপা গলায় তাঁকে বলতে লাগলেন, 'কী করো তুমি? প্রতিবার কোনো না কোনো ঝামেলা বাধিয়ে রাখো! রাসুলসহ সবাইকে তুমি এমন জায়গায় আটকে রেখেছ, না তাঁদের কাছে কোনো পানি আছে, আর না আশপাশে পানির কোনো সন্ধান আছে।'

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা পিতার কথার কোনো জবাব দিতে পারলেন না। মাথা নিচু করে বসে রইলেন। কীভাবে জবাব দেবেন? তাঁর কোলে যে প্রশান্তির নিদ্রায় মগ্ন আছেন এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটি! তাঁর ঘুমের চেয়ে মূল্যবান এ মুহূর্তে তাঁর কাছে কিছু নেই আর।

আবু বকর শুধু বকেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি আয়েশার বাহুতে সামান্য আঘাতও করলেন হাত দিয়ে। আয়েশা তবু অনড়, রাসুলের ঘুমের ব্যাঘাত হবে ভেবে একচুল পরিমাণ নড়লেন না।

একটুক্ষণ পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জেগে উঠলেন। ফজরের সময় ততক্ষণে সমাগত। সাহাবিরা নামাজের প্রস্তুতি নেওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। রাসুলকে জেগে উঠতে দেখে পানিহীনতার বিষয়টি তাঁকে জানানো হলো।

কী করা যায়–করণীয় ভাবতে ভাবতে ঠিক সে মুহূর্তে জিবরাইল আলায়হিস সালাম ওহি নিয়ে উপস্থিত হলেন। জানানো হলো–অজুর জন্য যখন আশপাশে পানি পাওয়া যাবে না, তখন আপনি মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করতে পারবেন। অবতীর্ণ হলো সুরা নিসার ৪৩ নং আয়াত। মুসলিম উম্মাহর জন্য বিধিত হলো তায়াম্মুমের বিধান।

www.pathagar.com

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জিবরাইলের মুখ থেকে এমন নির্দেশনা শুনে প্রথমে তাকালেন আয়েশার দিকে। এরপর মুচকি হেসে সবাইকে জানিয়ে দিলেন তায়াম্মুমের বিধান।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত রাগ গলে পানি হয়ে গেল। তাঁর চেহারায় দেখা দিল কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসার প্রশ্রয়। তিনি এগিয়ে এসে আয়েশাকে বললেন, 'আমার বেটি! তোমার বরকতের তো শেষ নেই। তোমার জন্য যদিও সবার যাত্রা বিলম্বিত হয়েছে, কিন্তু তোমার অসিলায় আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর পবিত্রতার জন্য সহজ ও বরকতময় এক বিধান অবতীর্ণ করেছেন।'

এতক্ষণ যেসব সাহাবি আয়েশার ব্যাপারে অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করছিলেন, তাঁরাও আয়েশার বরকতময় উপস্থিতির শোকরিয়া আদায় করতে লাগলেন। বিখ্যাত সাহাবি উসাইদ ইবনে হুদাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকরের কাছে এসে বলতে লাগলেন, 'হে আবু বকরের পরিবার! ইসলামের জন্য এটাই তোমাদের প্রথম বরকত নয়।'

এ কথা দ্বারা উসাইদ অপবাদের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন মূলত। কেননা সেবারও আয়েশার নিষ্কলুষতার বিষয়টি স্বয়ং আল্লাহ কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে পৃথিবীবাসীর কাছে সত্যায়িত করেছিলেন।

সকলে খুশিমনে তায়াম্মুম করে ফজরের নামাজ আদায় করলেন।

নামাজ আদায় করে কাফেলা যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বহন করা উটটি দাঁড় করানো হলো যাত্রার জন্য। উট দাঁড়াতেই উটের নিচে উজ্জ্বল কোনো বস্তুর অবয়ব দেখা গেল। আয়েশা নিচু হয়ে ধুলো থেকে বস্তুটি তুলে দেখেন–এ যে তাঁর হারিয়ে যাওয়া সেই মুক্তোর হার!

একত্রিশ

মদিনায় রাসুলের ঘরে এসে সংসার শুরু করার কিছুদিন পরের কথা। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন সদ্য কিশোরী। কোনো এক অভিযানে রাসুলের সঙ্গে গেছেন। দূরান্তের সফর।

ফেরার পথে রাসুল কাফেলার সবাইকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আয়েশাকে নিয়ে পেছনে রয়ে গেলেন। আয়েশা এর অন্তর্নিহিত কারণ বুঝতে পারলেন না।

www.pathagar.com

সবাই যখন সামনে এগিয়ে গেলেন, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আয়েশার সামনে এসে বললেন, 'চলো, আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করি। দেখি কে আগে যেতে পারে!'

রাসুলের কথা শুনে আয়েশা ভাবলেন–ও আচ্ছা, এই ব্যাপার! দেখা যাক কার পায়ের চঞ্চলতা কেমন। এই ভেবে তিনি দেরি করলেন না, রাসুলের সঙ্গে দৌড় শুরু করলেন।

আয়েশা তখন হালকা গড়নের এক চঞ্চলা কিশোরী, খুব সহজেই রাসুলকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেলেন। রাসুল বিনা বাক্যব্যয়ে আয়েশাকে বিজয়ী ঘোষণা করলেন।

এর কয়েক বছর পরের ঘটনা। এমনই এক অভিযান থেকে ফিরছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। সঙ্গে যথারীতি আয়েশা। আয়েশা সঙ্গে থাকাতেই কিনা, রাসুলের মনে পড়ে গেল সেদিনের সেই দৌড় প্রতিযোগিতার কথা। সেদিন তিনি আয়েশার কাছে হেরে গিয়েছিলেন। আজ আরেকবার দৌড় প্রতিযোগিতা করে দেখা যাক–কে হারে আর কে জেতে!

আয়েশাকে বললেন প্রতিযোগিতার কথা। আয়েশা সেদিনের কথা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলেন। রাসুল যখন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, তখন তিনিও পিছিয়ে যাওয়ার মতো মেয়ে নন, চটজলদি ময়দানে নেমে পড়লেন।

রাসুল সঙ্গী সাহাবি দলকে সামনে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়ে আয়েশার সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করলেন। কিন্তু আজ ছাড়াছাড়ি নেই, সব দিনও সবার সমান যায় না। রাসুল খুব সহজে আজ আয়েশাকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেলেন।

কিশোরী আয়েশা তখন আর সেই চঞ্চলা কিশোরীটি নেই। তত দিনে তিনি বেশ বড়সড় হয়ে গিয়েছিলেন। আগের চেয়ে শরীরে মেদ জমেছিল কিছুটা। ফলে দৌড়ের গতিও কমে গিয়েছিল।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আয়েশাকে দৌড় প্রতিযোগিতায় হারিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'বুঝলে আয়েশা, এটা হলো সেদিনের প্রতিশোধ!'

বত্রিশ

মদিনায় রাসুলের ঘরে বধূ হয়ে আসার পর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ওপর অনেক দায়িত্ব এসে পড়ল। একদিকে রাসুলের দেখভাল তো আছেই,

www.pathagar.com

অপরদিকে নবুওয়াতের যে আলোকরশ্মি তিনি প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করতেন, সেসব আলোকবিভা নিজের অন্তঃকরণে দৃঢ়ভাবে প্রতিস্থাপন করাও ছিল তাঁর স্বেচ্ছা প্রণোদনা।

রাসুলের সহচর অনেকেই ছিলেন, অনেক সাহাবি রাসুলের সান্নিধ্য বিপুলভাবে পেয়েছেন, কিন্তু সান্নিধ্যধন্য হওয়ার পাশাপাশি সেই সান্নিধ্যের নির্যাস পরবর্তী উম্মতের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছেন খুব অল্পসংখ্যক সাহাবি। সামরিক অভিযান, রাষ্ট্রীয় বা দাওয়াতি কাজে মদিনার বাইরে অবস্থান, স্মরণশক্তি প্রখর না হওয়া, হাদিস সংরক্ষণের ব্যাপারে গুরুত্ব না দেওয়া; এসব নানা কারণে অনেক বিখ্যাত সাহাবির নামও হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে কম উচ্চারিত হয়েছে।

কিন্তু আয়েশা ছিলেন সবার চেয়ে আলাদা এবং সবার চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে। আয়েশার সবচেয়ে বড় সুবিধা ছিল-তিনি ছিলেন রাসুলের ঘরের ঘরনি। তিনি এমন সব বিষয়ের ব্যাপারে জানতে পারতেন, যা আবু বকর বা উমরের মতো সর্বসঙ্গীর পক্ষেও জানা সম্ভব হতো না। আবার আয়েশা নারী হওয়ার সুবাদে তাঁকে সামরিক অভিযান বা রাষ্ট্রীয় কাজে কখনো নবুওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু থেকে পৃথক হতে হয়নি। ফলে রাসুলের সঙ্গ এবং তাঁকে অনুকরণের প্রচেষ্টায় অন্য অনেকের চেয়ে তিনি ছিলেন এগিয়ে।

সর্বোপরি তাঁর মেধা ও স্মরণশক্তি ছিল উল্লেখ করার মতো। রাসুলকে যেকোনো কাজ করতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেটার অনুকরণ করতেন। যদি কোনো ধর্মীয় বিষয় বুঝে না আসত, তবে তিনি অকপটে তা রাসুলকে জিজ্ঞেস করতেন। রাসুলের সঙ্গে যাপিত জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও তিনি সাবলীল বর্ণনায় মনে রেখেছিলেন। এ কারণে দেখা যায়, রাসুলের দাম্পত্যজীবনের অধিকাংশ হাদিসই তাঁর বর্ণনা করা।

রাসুলের বধূ হয়ে আসার পর আয়েশার ওপর আরেকটি অলিখিত দায়িত্ব এসে পড়ল। সেটা হলো মদিনার নারীসমাজের ধর্মীয় প্রতিনিধি। মদিনার নারীরা বিভিন্ন সময়ে যেসব সমস্যায় নিপতিত হতেন, বিশেষত একান্ত নারীবিষয়ক সমস্যা, সব সমস্যা তাঁরা সরাসরি রাসুলের কাছে বলতে পারতেন না। আবার রাসুলও অত্যধিক লজ্জাশীলতার কারণে সবাইকে খোলামেলাভাবে সবকিছু বুঝিয়ে বলতে সংকোচ বোধ করতেন। এ কারণে নারীরা তাঁদের সমস্যার কথাগুলো আয়েশার কাছে এসে বলতেন। আয়েশা বিষয়টি নিয়ে রাসুলের সঙ্গে আলাপ করে সেগুলোর সঠিক সমাধানটি তাঁদের বলে দিতেন।

www.pathagar.com

এভাবেই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা একসময় এ উম্মতের প্রথম মুহাদ্দিস এবং ইসলামি আইনবিশারদ হিসেবে আবির্ভূত হন, যা পরবর্তী উম্মতের জন্য এক অপরিমেয় রহমতস্বরূপ অভিহিত হয়েছে।

তো, কিশোরী আয়েশা বধূ হয়ে আসার পর মদিনার নারীরা তাঁর কাছে এটা-সেটা জিজ্ঞেস করতে আসতে লাগলেন। কোনোটা মেয়েলি বিষয়, কোনোটা স্বামী-সংসার বিষয়ক, কোনোটা আবার নিতান্ত সাধারণ জিজ্ঞাসা। তিনি সকল সমস্যার আশু সমাধানে এগিয়ে এলেন।

একবার এক নারীসাহাবি এলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন ঘরেই ছিলেন। তিনি রাসুলকে কিছু একটা বলতে চান, কিন্তু বিষয়টি একান্ত নারীবিষয়ক হওয়ায় সংকোচ করছিলেন। সেখানে আয়েশাও ছিলেন, তিনি ওই নারীকে বিষয়টি বলার ব্যাপারে অভয় দিলেন।

ওই নারী প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি পবিত্রতা অর্জনের জন্য কীভাবে পাক-সাফ হব?' অর্থাৎ, ঋতুস্রাব যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন আমি কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করব—এই ছিল ওই নারীর জিজ্ঞাসা।

মহিলার কথার উত্তরে রাসুল বললেন, 'সুগন্ধিযুক্ত এক টুকরো তুলো নাও এবং সেটা দিয়ে অজু করো।'

নারীসাহাবি কিছুটা দ্বিধায় পড়ে গেলেন, তুলো দিয়ে কীভাবে অজু করবেন? তিনি ফের জিজ্ঞেস করলেন, 'তুলোর টুকরো দিয়ে কীভাবে অজু করব?'

রাসুল আবারও একই উত্তর দিলেন, 'ওই টুকরো দিয়ে অজু করো।'

নারীসাহাবি বিষয়টি বুঝতে পারছেন না। হয়তো এভাবে পবিত্রতা অর্জনের বিষয়টি তিনি আগে কখনো শোনেননি, কিংবা পদ্ধতিটিই তাঁর কাছে বিষম ঠেকছে। ওদিকে রাসুলও অপরিচিত নারীর সামনে খুলে বলতে পারছেন না। আবার ওই নারীও নাছোড়বান্দা, সমস্যার একটা সমাধান না নিয়ে তিনি ফিরবেন না। অগত্যা নারীসাহাবি ফের আরেকবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি ওই তুলোটা দিয়ে কী করে অজু করব?'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন, এ মূর্খ বেদুইন নারীকে দিয়ে হবে না। তিনি শালীনতার মধ্য থেকে এর চেয়ে বেশি খোলাসা করে আর বলতে পারবেন না। হাল ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে ওই নারীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা পাশে ছিলেন। রাসুলের অপারগতা আর ওই নারীর উপর্যুপরি প্রশ্নবাণ দেখে এতক্ষণ তিনি মিটিমিটি হাসছিলেন। রাসুলের

www.pathagar.com

কথার মর্মার্থ তিনি আগেই উপলব্ধি করেছেন। এবার ওই মহিলাকে নিজের দিকে ডেকে বুঝিয়ে বলে দিলেন–ঋতুমতী নারীর ঋতুকাল বন্ধ হয়ে গেলে তুলো বা কাপড়ের সাহায্যে কীভাবে নিজের পবিত্রতা অর্জন করবে।

মদিনায় আয়েশার ঘরটি ছিল মদিনার নারীসমাজের জন্য এক অভয়াশ্রয়ের মতো। সেখানে মায়েরা আসতেন তাঁদের কন্যার ব্যাপারে কথা বলতে, অনেক মেয়ে আসত তার পিতা বা স্বামীর অহিতকর বিষয় নিয়ে। আরবের সম্ভ্রান্ত ঘরের নারীরা যেমন সমাদৃত হতেন সেখানে, মরুর বেদুইনবালারাও নির্ভয়ে কথা বলতেন তাঁর সঙ্গে। তিনি হয়ে উঠেছিলেন সকলের প্রেরণা ও সমাধানের প্রতীক।

একবার এক নারী এলেন। নিজের দুঃখের কথা জানালেন আয়েশার কাছে। বড় বেদনা নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, 'আমার স্বামী আমার সঙ্গে স্বামীসুলভ আচরণ করেন না, আবার আমাকে তালাকও দেন না। আমি তাঁর কাছে একটি খেলনা ছাড়া যেন আর কিছুই নই। তিনি যখন ইচ্ছা আমাকে তালাক দেন, আবার ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই এসে বলেন–আমি আমার মন পরিবর্তন করেছি। আবার আমাকে নিয়ে ঘর-সংসার শুরু করেন। কিন্তু তখনো তিনি আমার সঙ্গে স্বামীসুলভ কোনো আচরণ করেন না। কিছুদিন পর আবার তালাক দেন। এভাবে বারবার তিনি আমার ভালোবাসা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন।'

সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর। রাসুল তখন ঘরে ছিলেন না। আয়েশা মনোযোগ দিয়ে ওই মহিলার কথা শুনলেন। রাসুল যখন ঘরে এলেন, তখন রাসুলের কাছে মহিলা ও তাঁর প্রতি স্বামীর অসদাচারের বিষয়টি তুলে ধরলেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত আরবে প্রচলন ছিল–ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে যদি স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়, তবে তালাক পতিত হবে না। এভাবে সে যতবার ইচ্ছা তালাক দেওয়া এবং তা ফিরিয়ে নিতে পারবে। তখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে ইসলামের কোনো বিধি অবতীর্ণ হয়নি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা করলেন। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ওহি অবতীর্ণ হলো। সুরা বাকারার ২২৯ নং আয়াত নিয়ে জিবরাইল আলায়হিস সালাম এলেন–

'তালাকে রজয়ি হলো দুবার। তারপর হয় নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রীকে রাখবে, নয়তো সহৃদয়তার সঙ্গে তার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাবে।'

সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আর এভাবেই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আরবের নারীদের অধিকারের বিষয়ে যুগপৎ ভূমিকা রেখে চললেন।

www.pathagar.com

আজ যাঁরা নারীস্বাধীনতার প্রবক্তা, তাঁরা খুব ঘৃণাভরে ইসলামের নারীনীতিকে অবজ্ঞা করেন। তাঁরা বিশ্ববাসীর সামনে বলে বেড়ান–ইসলামে নারীকে অধিকার দেওয়া হয়নি, ইসলামে নারীর বাক্‌স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে, নারীকে কেবল পুরুষের হাতের ক্রীড়নক বানানো হয়েছে...ইত্যাকার আরও নানা ধরনের অজ্ঞতাসুলভ কথা। অথচ তাঁরা কখনো না পড়েছেন ইসলামি আইন, আর না পাঠ করেছেন রাসুলের জীবনঘনিষ্ঠ বর্ণনা। আয়েশা বা উম্মুল মুমিনিনদের জীবনী তো তাঁরা কখনো স্পর্শ করার কথা চিন্তাই করেননি। অথচ তাঁরা সভা-সেমিনারে, বই-পত্রিকায়, আলাপ-আলোচনায় বারবার ইসলামে নারীর অবমাননা নিয়ে বড় বড় কথা বলে আসছেন। মানুষের অজ্ঞতা যে কত গভীরভাবে তাঁদের অন্ধ করে রাখে, এসব অজ্ঞ বিদ্বানগণ হচ্ছেন তাঁর সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

অথচ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার জীবনচরিত আমাদের সামনে। জাহেলি যুগ থেকে যে আরব কেবল ইসলামের প্রস্ফুটিত আলোকমঞ্জরি মেখে মদিনায় সুবাস ছড়াচ্ছিল, তখনই তিনি নারীমুক্তির নিশানকে এভাবে উচ্চকিত করে তুলে ধরেছিলেন।

একদিন এক তরুণী এলেন আয়েশার কাছে। তাঁর মন ভারাক্রান্ত, মুখে হাসি নেই। আয়েশা তাঁকে মন খারাপের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'আমার পিতা আমার মতের বিরুদ্ধে চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে চান। এ বিয়েতে আমার মত নেই।'

তরুণী নিজের মনের দুঃখের কথাগুলো আয়েশাকে বললেন। কিন্তু বললেও কাজ হবে না, কেননা তখন আরবে বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের কোনো ইচ্ছাধিকার ছিল না। পিতা বা অভিভাবক যেখানে ইচ্ছা, যার সঙ্গে ইচ্ছা কন্যাকে বিয়ে দিতে পারতেন। এ ব্যাপারে কন্যার কোনো ধরনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য ছিল না।

তরুণীর কথা শুনে আয়েশারও মন খারাপ হলো। রাসুল তখন ঘরে ছিলেন না। তাই তিনি তরুণীকে বসিয়ে রেখে বললেন, 'রাসুল ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'

আয়েশার মনে আশা ছিল, ইসলাম যেহেতু কারও ওপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেয় না, সুতরাং এ বিষয়েও সঠিক কোনো সমাধান ইসলামে রয়েছে। একজন পূর্ণ যুবতীর যুক্তিগ্রাহ্য মতামতকে ইসলাম অবজ্ঞা করতে পারে না। জাহেলি যুগের রীতি-নীতি দিয়ে ইসলাম সমাজে ইনসাফ কায়েম করবে, এমনটি তিনি আশা করতেন না।

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘরে এলেন। তরুণীটি তখনো আয়েশার কাছে উপবিষ্ট। আয়েশা রাসুলকে তরুণীর বৃত্তান্ত জানালেন। ঘটনা শুনে রাসুল দেরি করলেন না, তখনই মেয়ের পিতাকে ডেকে পাঠালেন।

রাসুলের ডাক শুনে তরুণীর পিতা জলদি চলে এলেন। রাসুলের ডাক যেকোনো সাহাবির জন্য ছিল সৌভাগ্যের বিষয়। হোক সেটা ভালোবাসার ডাক কিংবা শাস্তির।

পিতা আসতেই রাসুল তাঁকে মেয়ের বিয়ের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। পিতা নিজের কৃতকর্মের ব্যাপারে সত্যতা স্বীকার করে জানালেন-তিনি ভুল করেছেন। তিনি মেয়ের অমতে আর তাঁকে বিয়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করবেন না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, 'বিয়ের ব্যাপারে কুমারী মেয়েদের কাছ থেকে মৌখিক সম্মতি নিতে হবে, আর বিয়ের কন্যা যদি বিধবা হয়, তবে তাদের মৌখিক স্বীকারোক্তি নেওয়া আবশ্যক।'

আয়েশার বুদ্ধিমত্তার তারিফ না করলেই নয়। তিনি নারীচরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলো খুব ভালো করে বুঝতেন। একজন সদ্য কৈশোর পেরোনো চপলা কুমারী মেয়ে লজ্জা বা সংকোচে নিজের বিয়ের ব্যাপারে মতামত জানাতে পারবে না। নিজের পিতা, ভাই বা অভিভাবকের সামনে বিয়ের ব্যাপারে মৌখিক সম্মতিও তাদের জন্য চরম দুঃসাহসের কাজ হয়ে দেখা দেয়। এ বিষয়টি তিনি ভালো করেই বুঝলেন। তাই তিনি চট করে রাসুলকে জিজ্ঞেস করে ফেললেন, 'একজন কুমারী মেয়ের পক্ষে তো মুখ ফুটে মৌখিক সম্মতি জানানোটা কঠিন ব্যাপার।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আয়েশার কথার অর্থ বুঝতে পারলেন। তিনি সহজ সমাধান করে দিলেন, 'তখন নীরবতাই তার সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হবে।'

ঘটনা এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু না, ঘটনার পরিশিষ্ট এখনো খানিকটা বাকি রয়ে গেছে।

রাসুল যখন তরুণী ও তাঁর পিতার সমস্যার সমাধান করে দিলেন এবং এ ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা স্পষ্ট বলে দিলেন, তখন তরুণীর উচিত ছিল মনের আনন্দে নিজের বাড়ি চলে যাওয়া। কেননা শরিয়তের রায় তাঁর পক্ষে গেছে এবং তাঁর অমতে আর অনিচ্ছুক বিয়েটাও হচ্ছে না।

কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন তরুণীটিকে ইচ্ছাধিকার দিয়ে বললেন, 'বিয়ে করা বা না করার এখতিয়ার এখন পুরোটাই তোমার'; তখন তরুণী যা বললেন, সে ব্যাপারে উপস্থিত কেউ চিন্তাও করতে পারেনি, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার পিতা আমার জন্য যে বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন, এখন

www.pathagar.com

আমি সে বিয়েতে রাজি আছি। আমি আপনাকে এ জন্যই বিষয়টি জানিয়েছি, যাতে পরবর্তী সময়ে মেয়ের পিতারা এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল থাকেন যে, মেয়েকে জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়ার অধিকার তাঁদের নেই।'

তেত্রিশ

খাওলা বিনতে হাকিমকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বেশ ভালো করেই চেনেন। তিনি ইসলামের প্রাথমিক সময়ে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসুলের প্রিয়তম স্ত্রী খাদিজার সঙ্গে তাঁর বেশ সদ্ভাব ছিল এবং খাদিজার ইন্তেকালের পর রাসুলের পরবর্তী বিয়েতে তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

একদিন তিনি এলেন আয়েশার ঘরে। তাঁর চেহারায় ক্লান্তির ছাপ, পোশাক-আশাক অগোছালো। আয়েশার কাছে এসে বিস্তারিত বললেন তাঁর মনের বেদনা। আয়েশা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন তাঁর কথা, কিন্তু রাসুল ঘরে না থাকায় কোনো সুরাহা করতে পারলেন না।

তবে তিনি সুরাহা না করতে পারলেও তত দিনে মদিনার নারীদের কাছে সুবিদিত হয়ে গেছে–আয়েশার কাছে গেলে একটা না একটা সমাধান মিলবেই। বয়সে ছোট হলে কী হবে, নিজের প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার স্ফুরণে আরবীয় নারীদের নানা সমস্যা সমাধানে তিনি যেন সত্যিকারের উম্মুল মুমিনিন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। সেই আশাতেই এসেছেন খাওলা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘরে এলেন খানিক পর। ঘরে ঢুকে অবিন্যস্ত খাওলাকে দেখে রাসুল কিছুটা চমকে গেলেন। বিস্ময়কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আয়েশা! তার এ অবস্থা কে করল? কী হয়েছে তার?'

খাওলার দিকে একবার ব্যথাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আয়েশা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! তাঁর বর্তমান অবস্থা তো এমন, যেন তাঁর এখনো বিয়েই হয়নি। যদিও তিনি একজন বিবাহিত নারী। তাঁর স্বামী দিনভর রোজা রাখেন এবং রাতভর ইবাদতে কাটান। তাঁর দিকে সামান্য ভ্রুক্ষেপও করেন না। কিন্তু তিনিও মানুষ, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। এখন আপনি তাঁকে যেমন বিধ্বস্ত দেখছেন, এ তারই ফল।'

খাওলার স্বামী বিখ্যাত সাহাবি উসমান ইবনে মাজউন। তিনিও পূর্ব যুগের মুসলিম। সাধক প্রকৃতির লোক। রাসুলের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ মান্যতায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু তা যদি সীমাতিক্রম করে, তাহলে তো ঘটনা হিতে বিপরীত হতেই পারে। রাসুল সঙ্গে সঙ্গে উসমানকে ডেকে পাঠালেন।

www.pathagar.com

রাসুলের নির্দেশ পেয়ে উসমান ইবনে মাজউন ছুটে এলেন। তিনি এলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'উসমান, মনে রেখো, সন্ন্যাসীদের মতো জীবনযাপনের নির্দেশ আমাদের দেওয়া হয়নি। ইসলামে কোনো বৈরাগ্য নেই। আমি কি তোমার জন্য সর্বোত্তম আদর্শ নই? নাকি তুমি আমার সুন্নতকে অতিক্রম করছ?'

উসমান ইবনে মাজউনের জন্য এমন কথা ছিল চাবুকাঘাতের মতো। তাঁর বুকের মধ্যে হাতুড়িপেটা হতে লাগল। কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। কী ভুল করে ফেলেছেন, এখনো বুঝতে পারছেন না। কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'না, কী বলছেন হে আল্লাহর রাসুল! আমি তো বরং আপনার প্রতিটি সুন্নতকে অক্ষরে অক্ষরে পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করি।'

রাসুল উসমানের বিষয়টি বুঝলেন, তিনি আসলে সুন্নতকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে পার্থিব সকল কিছুকে তুচ্ছজ্ঞান করছেন। তিনি তাঁকে নিজের কাছে বসিয়ে বলতে লাগলেন, 'তোমাদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে খোদাভীরু এবং ধর্মীয় ব্যাপারে সর্বাধিক আমলকারী লোক। তবু কিন্তু আমি ঘুমাই, রোজা রাখি, ইফতার করি এবং স্ত্রীর অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকি। তুমি আল্লাহকে ভয় করো উসমান! কারণ, তোমার প্রতিও তোমার পরিবারের অধিকার আছে, মেহমানের অধিকার আছে, এমনকি তোমার নিজের শরীরকে আরাম দেওয়ার অধিকারও আছে। এ কারণে কিছুদিন রোজা রাখবে, কিছুদিন বাদ দেবে এবং রাতের কিছু অংশ ইবাদত করবে ও কিছু অংশ ঘুম ও পরিবারের জন্য ব্যয় করবে।'

উসমান বিষয়টি অনুধাবন করলেন এবং ভবিষ্যতে স্ত্রী ও পরিবারের দিকে পূর্ণ খেয়াল রাখবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন।

এ তো গেল উসমানের ব্যাপার। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুলকে জানালেন, উসমানের সাহচর্যে থাকতে থাকতে খাওলার অবস্থাও এখন প্রায় অনুরূপ হয়ে গেছে। তিনিও সারা রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেন।

এ কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী, সারা রাত না ঘুমিয়ে কাটায় সে?' তারপর তাঁকে উপদেশ দেওয়ার সুরে বললেন, 'আহা! কেন তুমি নিজের ওপর এমন বোঝা চাপিয়ে নিচ্ছ, যা তুমি বহন করতে পারবে না? ভুলে যেয়ো না, এমন করতে থাকলে একসময় তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে এবং ইবাদতের মধ্যে বিরক্তি চলে আসবে। একমাত্র আল্লাহ তায়ালার বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না।'

এভাবেই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা মদিনার নারীদের সমস্যার সমাধান করে চলছিলেন।

www.pathagar.com

ইসলাম নারীকে কথা বলার সুযোগ দেয় না, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দেয় না, এমন কথা তো আমাদের নিত্যই শুনতে হয়। ইসলাম নারীকে ঘরে বন্দী করে রাখে, তাঁদের বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেয় না, এমন অভিযোগ তো যুগ যুগ ধরে একশ্রেণির লোক কালের বাঁশির মতো বাজিয়ে চলেছে। কিন্তু তারা কি কখনো আয়েশার জীবনের এই দিকগুলোতে দৃষ্টি দিয়েছে? তারা কি কখনো উম্মুল মুমিনিনের নারী অধিকারের বিষয়ে ইসলামসম্মত ধারণাগুলো পড়ে দেখেছে? আরবের কলুষিত সমাজব্যবস্থা থেকে ইসলাম যেভাবে নারীকে আলোকিত বারান্দায় এনে উপস্থাপন করেছিল, আয়েশা ছিলেন সেই আলোকিত বারান্দার সুরভিত গোলাপ। তাঁর সুবাসে পরবর্তী সময়ে সুবাসিত হয়েছে শত সহস্র গুলিস্তান। কিন্তু যারা মূক-বধির, তারা কীভাবে পাবে সেই গুঞ্জরিত পুষ্পের মাতোয়ারা সুবাস?

মদিনার মুনাফিকনেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মেয়ে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা। রাসুল মদিনায় আগমনের কিছুদিন পরই তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন। পুণ্যবতী ও রূপসী বলে খ্যাতি ছিল তাঁর।

হাবিবার প্রথম বিয়ে হয় বিখ্যাত শহিদ সাহাবি হানজালা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে। উহুদ যুদ্ধে তিনি বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে মর্মান্তিকভাবে শহিদ হন। তাঁর বিয়ে ও শাহাদাত ইসলামি ইতিহাসে বিশেষভাবে স্থান করে আছে।

হানজালার শাহাদাতের পর তাঁর বিয়ে হয় সাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে। সাবেত বক্তা হিসেবে বেশ সুপরিচিত থাকলেও উচ্চতায় কিছুটা খাটো ছিলেন এবং দেখতেও তেমন সুশ্রী ছিলেন না। এ কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তেমন একটা বনিবনা হতো না। কিছুদিনের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে তাঁদের সংসারে বেশ একটা কলহের সৃষ্টি হলো। তা ছাড়া হাবিবার পরিবার থেকেও এ বিয়েটা নিয়ে অসন্তুষ্টির সীমা ছিল না। মূলত সামাজিক চাপের কারণেই হাবিবাকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল।

বিষয়টি নিয়ে হাবিবা তাই একদিন চলে এলেন আয়েশার কাছে। আয়েশাকে পুরো ঘটনাটি খুলে বলে তিনি এ ব্যাপারে তাঁর সাহায্য কামনা করে সাবেতকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘরে এসে হাবিবার কাছ থেকে পুরো ঘটনা শুনলেন। অবশেষে বললেন, 'তুমি কি তাহলে সাবেতকে তার বাগান (মোহর বাবদ) ফেরত দিতে চাচ্ছ?'

হাবিবা বেশ অকপটেই বললেন, 'হ্যাঁ।'

www.pathagar.com

এমন স্বীকারোক্তির পর আর তেমন কোনো কথা চলে না। রাসুল সাবেতকে ডাকলেন। হাবিবার ইচ্ছাধিকারের ব্যাপারে তাঁর মত জানতে চাইলেন। সাবেতের কাছেও এর কোনো বিকল্প সমাধান ছিল না। বিবাহবিচ্ছেদ যদিও ইসলামে অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে, তবু ক্ষেত্রবিশেষে তা প্রয়োগ ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

অগত্যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বামী-স্ত্রী সাবেত ও হাবিবার সম্মতিতে উভয়ের বিবাহবিচ্ছেদ সম্পাদন করে দেন।

এ ঘটনা পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবী ও ইসলামের দোষ অন্বেষণকারী গবেষকদের চোখে কখনো পড়েছে কি না, জানা নেই। তবে তাঁদের উচিত, উম্মুল মুমিনিনদের জীবনী ভালোভাবে অধ্যয়ন করা। কেননা ইসলামের চেয়ে সুরক্ষিত এবং নিরাপদ নারীস্বাধীনতা পৃথিবীর আর কোনো মতবাদ কোনো দিন দিতে পারেনি। উম্মুল মুমিনিনগণ ছিলেন সেই সুরক্ষিত নারীস্বাধীনতারই একেকজন প্রদীপ্ত বাতিঘর।

চৌত্রিশ

সুলাসিল অভিযান থেকে ফিরে এসে বিখ্যাত সাহাবি আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু এলেন রাসুলের কাছে। চোখে-মুখে তাঁর জিজ্ঞাসা। রাসুলকে কিছু একটা বলতে চান। কিন্তু কিছুটা সংকোচ, কিছুটা দ্বিধা কাজ করছে। বলবেন কি বলবেন না, এমন দোটানায় পড়ে গেছেন। কিন্তু কথাটি না বললেও মনের মধ্যে খচখচ করছে। অগত্যা সাহস করে রাসুলকে প্রশ্নটি করেই ফেললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি সবচেয়ে কাকে বেশি ভালোবাসেন?'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমরের কথা শুনে অবাক হলেন না, সামান্য দ্বিধাও করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'আয়েশাকে।'

আমর যেন খানিকটা হকচকিয়ে গেলেন। আয়েশা! এত বড় বড় সাহাবি রয়েছেন, ইসলামের জন্য আত্মত্যাগকারী এত বীর রয়েছেন, যাঁরা রাসুলের মুখের সামান্য কথায় জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত, তাঁদের রেখে আয়েশার কথা বললেন রাসুল! তিনি আনন্দে বিস্মিত হলেন। তিনি হয়তো মনে মনে নিজের নামটি শুনতে চাইছিলেন রাসুলের মুখে।

আবার ভিন্নভাবে প্রশ্নটি করলেন, 'না, হে আল্লাহর রাসুল! আমি পুরুষদের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছি।'

www.pathagar.com

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমরের দিকে তাকিয়ে আবার হাসিমুখে উত্তর দিলেন, 'আয়েশার পিতাকে।'

আমর দুদিকে মাথা নেড়ে নিজের পরাজয় বরণ করে নিলেন।

রাসুলের দ্বিতীয় জবাবটি সত্যি প্রণিধানযোগ্য। আমর যখন জিজ্ঞেস করলেন, 'পুরুষদের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছি...।' রাসুল সরাসরি বলতে পারতেন–আবু বকরকে। কিন্তু এখানেও তিনি আয়েশাকে টেনে আনলেন, আয়েশার পিতাকে আয়েশার সঙ্গে জুড়ে দিলেন। আয়েশার প্রতি এমনই অকপট এবং দ্বিধাহীন ছিল রাসুলের ভালোবাসা।

মদিনার আনসার-মুহাজির সবাই জানতেন আয়েশার প্রতি রাসুলের এমন প্রগাঢ় ভালোবাসার কথা। এ ভালোবাসা মদিনাবাসীর জন্য এক অতুলনীয় সবক ছিল। স্ত্রী মানেই যখন কেবল যৌনসম্ভোগ ও সন্তান জন্মদানের ব্যক্তিবিশেষ মনে করা হতো, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর আমি হচ্ছি আমার স্ত্রীর কাছে সর্বোত্তম পুরুষ।'

রাসুল নিজে আয়েশা এবং অপর স্ত্রীদের ভালোবেসে এ কথার বাস্তব উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর রাসুলের এমন ঘোষণার পর মদিনার পুরুষদের মাঝে যেন স্ত্রীকে নতুন করে আবিষ্কারের গবেষণা শুরু হয়ে গেল।

মদিনার লোকজন রাসুলের জন্য সামান্য কিছু করতে পারাকে নিজেদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতেন। ভালোবেসে অনেক সময় তাঁরা রাসুলের ঘরে এটা-সেটা হাদিয়া পাঠাতেন। তবে তাঁরা এ-ও জানতেন, আয়েশা রাসুলের প্রিয়তমা স্ত্রী। এ কারণে আয়েশার ঘরে যেদিন রাসুলের পালা থাকত, তাঁরা সেদিন হাদিয়া পাঠাতে আগ্রহবোধ করতেন। ভালোবাসার এ দুই মানব-মানবীর জন্য তাঁদের জীবন ছিল উৎসর্গিত।

কিন্তু অন্য স্ত্রীদের কাছে বিষয়টি ভালো লাগত না। ভালো না লাগারই কথা। তাঁরাও রাসুলের স্ত্রী, উম্মাহাতুল মুমিনিন। রাসুলের ভালোবাসার পূর্ণচন্দ্র পাওয়ার অধিকার তাঁদেরও রয়েছে। রাসুলের প্রেমে নিজেদের উৎসর্গ করার এমন মহাসৌভাগ্য তাঁরাও হেলায় হারাতে চাইতেন না।

এ নিয়ে তাঁরা একদিন গিয়ে ধরলেন রাসুল-কন্যা ফাতেমাকে। মদিনার নারীদের মধ্যে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। রাসুলের স্ত্রীরা তাঁকে যথেষ্ট সমীহ করতেন। ইবাদত, খোদাভীতি, ব্যক্তিত্বে তিনি অন্য সবার চেয়ে ছিলেন আলাদা। রাসুলও নিজের এ কন্যাকে সীমাহীন

www.pathagar.com

ভালোবাসতেন। তিনি এলে রাসুল দাঁড়িয়ে তাঁর কপালে চুমু খেতেন এবং তাঁকে নিজের পাশে বসাতেন। এসব কারণে উম্মুল মুমিনিন সকলে এলেন ফাতেমার কাছে।

তাদের দাবি সত্ত্বেও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুলের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলাতে রাজি ছিলেন না, কিন্তু উম্মুল মুমিনিনদের উপর্যুপরি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি রাসুলকে জানাবেন বলে কথা দিলেন।

সুযোগমতো ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা আয়েশার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে সালাম দিলেন। রাসুল তখন আয়েশার সঙ্গে শুয়ে ছিলেন। ফাতেমার গলার আওয়াজ পেয়ে তিনি তাঁকে ভেতরে প্রবেশ করতে বললেন। ভেতরে এসে ফাতেমা রাসুলের কুশল জিজ্ঞাসার পর বিষয়টি সরাসরি বলে ফেললেন, 'আমাকে অন্য উম্মুল মুমিমিনগণ আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। তাঁরা ইবনে কুহাফার কন্যার ব্যাপারে ন্যায়ানুগ সমতা চান।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফাতেমার অপারগতার বিষয়টি বুঝতে পেরে তাঁকে বললেন, 'আমার প্রিয় কন্যা! যাকে আমি ভালোবাসি, তুমি কি তাকে ভালোবাসো না?'

রাসুলের কথায় ফাতেমা সচকিত হলেন। তিনি কি সীমা অতিক্রম করে ফেলেছেন? জলদি উত্তর দিলেন, 'কেন নয়? আমিও তাঁকে ভালোবাসি।'

রাসুল এবার নিজ কন্যাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, 'আমি চাই, তুমিও তাকে ভালোবাসো।'

রাসুলের এ কথার পর ফাতেমার আর বলার কিছু ছিল না। বুঝতে পারলেন, সব জায়গায় যুক্তি-বুদ্ধি চলে না। তিনি রাসুলের কথার মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারলেন। আর কোনো কথা না বাড়িয়ে চলে এলেন এবং অন্যান্য উম্মুল মুমিনিনের কাছে এসে ঘটনার আগাগোড়া বর্ণনা করলেন।

ফাতেমা ও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘর ছিল পাশাপাশি এবং তাঁরা দুজন বেশ ভালো বন্ধু ছিলেন। আয়েশা ফাতেমার ব্যাপারে সীমাহীন প্রশংসা করতেন। বলতেন–'ফাতেমা ছিলেন ঠিক তাঁর পিতার প্রতিচ্ছবি। তাঁর মতো ইবাদতগুজার নারী আমি আর দেখিনি।'

উম্মুল মুমিনিনগণ ফাতেমার ব্যর্থতায় হতাশ হলেও তাঁরা ফাতেমাকে আবার রাসুলের কাছে যাওয়ার জন্য আবেদন করলেন, যাতে তিনি বিষয়টি বিস্তারিতভাবে রাসুলকে বুঝিয়ে বলতে পারেন। কিন্তু ফাতেমা অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ, তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন–এ বিষয় নিয়ে আমার পক্ষে আবার রাসুলের সামনে দাঁড়ানো সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

উম্মুল মুমিনিনগণ এবার ধরলেন রাসুলের আরেক স্ত্রী উম্মে সালামাকে। বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী বলে তাঁর সুনাম ছিল। অনেক কঠিন সমস্যাকেও তিনি সহজভাবে সামলে নিতে পারতেন। রাসুল-স্ত্রীদের আবেদনের মুখে তিনি জানালেন–ঠিক আছে, তিনি রাসুলকে এ বিষয়ে বলবেন।

তবে বিষয়টি তিনি তখনই রাসুলকে বললেন না। দু-এক দিন পর সময়-সুযোগমতো কথার ছলে তিনি রাসুলের সামনে বিষয়টি উত্থাপন করলেন। তাঁর কথার পরিপ্রেক্ষিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অকপটেই বললেন, 'উম্মে সালামা! আয়েশার ব্যাপারে আর কিছু বলো না। সে ছাড়া আর কোনো স্ত্রীর বিছানায় আমার ওপর ওহি অবতীর্ণ হয়নি।' সুতরাং, তার প্রতি আমার খানিকটা দুর্বলতা থাকাটাকে অন্যায় মনে করো না।

উম্মে সালামা নিজের ব্যাপারে ভয় করলেন। তিনি রাসুলের মনঃকষ্টের কারণ হতে চাইলেন না। দ্বিতীয়বার এ ব্যাপারে আর কথা না বাড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি, যেহেতু আমি আয়েশার ব্যাপারে আপনাকে কষ্ট দিয়েছি।'

উম্মে সালামা চলে গেলেন। কিন্তু অন্য স্ত্রীরা কয়েক দিন পর আবার সাওদা বিনতে জামআর ঘরে মিলিত হয়ে এ ব্যাপারে কথা বলতে শুরু করলেন। অবশেষে তাঁরা জয়নব বিনতে জাহাশকে বিষয়টি নিয়ে রাসুলের সামনে যাওয়ার আবেদন করলেন।

রাসুলের স্ত্রীদের মধ্যে জয়নব বিনতে জাহাশের বিশেষ প্রভাব ছিল। আয়েশার পর তাঁকেই প্রভাবশালী মনে করা হতো। প্রথমত তাঁর সঙ্গে রাসুলের বিয়ের ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত তিনি রাসুলের ফুফাতো বোন ছিলেন। তৃতীয়ত তিনি অনেক দরাজ দিলের মানুষ ছিলেন। দান-খয়রাত করার ব্যাপারে তাঁর উদারতা ছিল চোখে পড়ার মতো।

এসব কারণে রাসুল-স্ত্রীগণ তাঁকে আয়েশা-সংক্রান্ত বিষয়ে রাসুলের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন।

সবার অনুরোধে জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা এলেন রাসুলের কাছে। এসে অনুনয় করে জানালেন, 'আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার স্ত্রীগণ ইবনে কুহাফার মেয়ের ব্যাপারে ন্যায়বিচার আশা করে।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন সম্ভবত মসজিদে নববিতে ছিলেন। কিন্তু জয়নবের গলার আওয়াজ কিছুটা উঁচু ছিল। ফলে আয়েশা তাঁর কুটির থেকে জয়নবের কথা শুনতে পেলেন। তিনি একটু এগিয়ে এলেন।

www.pathagar.com

রাসুলের দৃষ্টি পড়ল আয়েশার ওপর। রাসুল আয়েশার দৃষ্টিতে প্রভাবিত হয়ে চুপ রইলেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা গত কিছুদিন ধরে এমনতর আলোচনা শুনতে শুনতে ক্লান্ত। এ কদিন রাসুলের সম্মান রক্ষার্থে তিনি কাউকে কিছু বলেননি। কিন্তু বিষয়টি তাঁর জন্য সীমাতিরিক্ত মনে হচ্ছিল। আর তা ছাড়া রাসুলও বারবার একই অনুরোধ শুনতে শুনতে বিরক্তবোধ করছেন। রাসুলের বিরক্তি তিনি বরদাশত করতে পারতেন না। তাই তিনি জয়নবকে অনুরোধ করলেন বিষয়টি আর আগে না বাড়িয়ে এখানেই ইতি টেনে দিতে। জয়নব অন্যান্য উম্মুল মুমিনিনের প্রতিনিধিত্ব করছেন, সুতরাং তিনিও বিষয়টির সুষ্ঠু সমাধান আশা করছিলেন। তিনি দু-এক কথা বললেন আয়েশাকে উদ্দেশ করে। কিন্তু আয়েশার মেধা ও তীক্ষ্ণ ধীশক্তির সামনে জয়নব বেশিক্ষণ নিজের দাবির ওপর অটল থাকতে পারলেন না। আয়েশার যুক্তি ও প্রজ্ঞার সামনে শেষ পর্যন্ত নিজের পরাজয় মেনে নিলেন।

রাসুল এতক্ষণ দুই স্ত্রীর রাগ-অনুরাগ দেখছিলেন। জয়নব চলে যেতে তিনি আয়েশাকে প্রশ্রয় দিয়ে বললেন, 'সত্যিই তুমি আবু বকরের বেটি!'

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা খুব যে সুন্দরী ছিলেন–ব্যাপারটি এমন নয়। তিনি যে ভালো রান্না করতে পারতেন, তা-ও নয়। তিনি যে অনেক বড় পরিবার থেকে এসেছিলেন, এমনও নয়। বিভিন্ন হাদিসের ভাষ্য ও ইতিহাসগ্রন্থের সূত্রে বর্ণিত–উম্মুল মুমিনিনদের মাঝে সবচেয়ে সুন্দরী ছিলেন জয়নব বিনতে জাহাশ, সাফিয়্যা বিনতে হুয়্যাই, জুয়াইরিয়া বিনতে হারেস রাদিয়াল্লাহু আনহুম। আর রান্না ও ঘরকন্নার ব্যাপারে সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিপুণতার কথা সর্বজনবিদিত ছিল। বড় পরিবার থেকেও এসেছিলেন সাফিয়্যা ও জুয়াইরিয়া, তাঁরা গোত্রপতির কন্যা ছিলেন। আবার যদি অল্পবয়স্কা বলে আয়েশাকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টি সামনে আনা হয়, তবু এ যুক্তি ধোপে টিকবে না। কেননা সাফিয়্যাকে যখন রাসুল বিয়ে করেন, তখন তাঁর বয়সও ছিল মাত্র ১৭ বছর। বিয়ের সময় হাফসার বয়স ছিল ২২। জুয়াইরিয়ার বয়সও এমন ছিল।

ভালোবাসা বিষয়টি একেবারেই অন্তর্গত একটি বিষয়। এর জন্য পার্থিব কোনো সংজ্ঞার প্রয়োজন হয় না। এ কারণে একজন মানব হিসেবে আরেকজন মানবীর প্রতি ভালোবাসার আধিক্য থাকাটা স্বাভাবিক ব্যাপার। আয়েশার চপলা ব্যবহার, তাঁর বুদ্ধিমত্তা, প্রখর স্মরণশক্তি, ধর্মীয় জ্ঞানার্জনে তাঁর আগ্রহ, ইসলামের বিধি-বিধানের ব্যাপারে তাঁর বিচারশক্তি রাসুলকে দারুণভাবে আকৃষ্ট

www.pathagar.com

করত। তা ছাড়া রাসুলের প্রতি তাঁর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল অন্য স্ত্রীদের চেয়ে অনেক বেশি প্রগাঢ়। এসব কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে একটু বেশিই ভালোবাসতেন।

কিন্তু এত কিছুর পরও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কখনো অন্য স্ত্রীদের অধিকারের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতেন না। সবার অধিকার সমানভাবে ভাগ করতেন তিনি। হিজরতের পর আয়েশাকে ঘরে তোলার পর তাঁর স্ত্রী ছিলেন দুজন–আয়েশা ও সাওদা। তখন দুজনের মধ্যে পালা ভাগ নিয়ে তেমন সমস্যা হতো না। কিন্তু কয়েক বছর পর যখন স্ত্রীদের সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন রাসুল সকল স্ত্রীর মধ্যে দিন হিসেবে পালা ভাগ করে দেন। একেক দিন একেক স্ত্রীর ঘরে রাত্রিযাপন করতেন। ভাতা বণ্টনের ব্যাপারেও সমান অংশ করতেন। এ ব্যাপারে কখনো কোনো তারতম্য হয়নি। এমনকি রাসুল যখন মৃত্যুশয্যায়, তখনো তিনি স্ত্রীদের পালা বণ্টনের ব্যাপারে ব্যত্যয় করেননি। এটা ছিল রাসুলের অনুপম চারিত্রিক আদর্শ।

কিন্তু হৃদয়ের ভালোবাসা সমানভাবে ভাগ করা–এটা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তা তিনি রাসুল হোন কিংবা বীরযোদ্ধা হোন, এটা সম্পূর্ণ পরস্পরের আত্মিক হৃদ্যতার বন্ধন। আয়েশার প্রতি বা অন্য কোনো স্ত্রীর প্রতি দুর্বলতা থাকলেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ দোয়া করতেন, 'হে আমার প্রভু! আমার পক্ষে এটুকু সমতা বিধান করাই সম্ভব। আপনি আপনার ক্ষমতা দিয়ে যে সমতা করতে পারেন, সে ক্ষমতা দিয়ে আমার বিচার করবেন না। আমার নিয়ন্ত্রণে যতটুকু সমতা বিধান সম্ভব, তা আমি পালন করার চেষ্টা করি। কিন্তু যা আমার নিয়ন্ত্রণে নয়, সে ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করবেন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'পুরুষদের মধ্যে অনেকেই উচ্চস্থান অর্জন করেছেন। কিন্তু নারীদের মধ্যে মারইয়াম বিনতে ইমরান এবং ফেরাউন-স্ত্রী আসিয়া ছাড়া কেউ এমন উচ্চস্থান অর্জন করতে পারেননি। তবে গোটা নারীসমাজের ওপর আয়েশার মর্যাদা এমন, যেমন নাকি সকল খাবারের ওপর সারিদের মর্যাদা।'

পঁয়ত্রিশ

রাসুলের একটি সাধারণ নিয়ম ছিল–তিনি যখন মদিনায় অবস্থান করতেন, তখন প্রতিদিন আসরের পর সকল স্ত্রীর ঘরে একবার করে হাজিরা দিতেন। সকলের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করতেন। এ ব্যাপারে রাসুল

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সব সময় সতর্ক থাকতেন। সামান্য সময়ের জন্য হলেও সবাইকে একটু একটু করে সময় দিতেন।

উম্মুল মুমিনিনদের ঘরগুলো মসজিদে নববির আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও মসজিদ এবং স্থান সংকুলানের কারণে স্ত্রীদের ঘরগুলো দুটো পাড়ায় বিভক্ত ছিল। মসজিদের পাশেই ছিল আয়েশা, হাফসা, সাওদা ও সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহুমের ঘর। আরেক পাশে একটু দূরে উম্মে সালামা, জয়নব, মায়মুনা, জুয়াইরিয়া, উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমের ঘর।

রাসুলের সাধারণ এ পরিভ্রমণ নিয়মে একবার কিছুটা ব্যত্যয় ঘটল। ঘটনা ছিল–জয়নব বিনতে জাহাশকে তাঁর কোনো এক আত্মীয় বেশ খানিকটা মধু উপহার দেন। উপহার পাওয়া এ মধু অত্যন্ত সুস্বাদু ছিল, আর রাসুলও মধু খুব পছন্দ করতেন। এ কারণে রাসুল যখন জয়নবের ঘরে আসতেন, তখন তিনি মধু দিয়ে তৈরি করা এটা-সেটা খেতে দিতেন তাকে। মধু খাওয়ার এ অবসরে জয়নবের ঘরে স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেশি সময় অতিবাহিত হতো।

এদিকে রাসুলের অন্য স্ত্রীগণ তাঁর জন্য পথ চেয়ে বসে থাকেন। তিনি এলে তাঁদের পর্ণকুটিরও যেন আলোয় বিভাসিত হয়ে ওঠে। রাসুলের জন্য তাঁদের প্রতীক্ষা মূর্ত হয়ে ওঠে নিমিষে। বিশেষত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুলের পথপানে চেয়ে থাকতেন চাতক পাখির মতো। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন পরপর কয়েক দিন জয়নবের ঘরে কিছুটা বেশি সময় দেওয়া শুরু করলেন, তখন তিনি নিজেকে প্রবোধ দিতে পারলেন না। বেদনাহত হয়ে তিনি হাফসা ও সাওদার কাছে বিষয়টি খোলাসা করলেন এবং তাঁদের কাছে পরামর্শ চাইলেন–কী করা যায়?

তিনজন মিলে পরামর্শ করলেন–যেভাবেই হোক, জয়নবের মধুর প্রতি রাসুলের বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করতে হবে। সেটা কীভাবে করতে হবে, তারও একটা ছক আঁকলেন তাঁরা।

পরদিন যথারীতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জয়নবের ঘর থেকে হাফসার ঘরে এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। হাফসার ঘরে এলে তিনি পরিকল্পনামাফিক রাসুলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কী পান করেছেন? কিসের যেন দুর্গন্ধ আসছে!'

রাসুল সহজভাবে স্বীকারোক্তি দিলেন, 'আমি তো জয়নবের ঘরে মধুর শরবত খেয়েছি মাত্র।'

হাফসা বললেন, 'সম্ভবত এ "মাগাফির" ফুলের মধু। এ কারণেই এমন দুর্গন্ধ আসছে।'

www.pathagar.com

'মাগাফির' আরবে উৎপন্ন একধরনের ফুল, যার মধ্যে নাবিজের (খেজুর প্রক্রিয়াজাত করে বানানো পানীয়) মতো ঝাঁজ হতো। এ ফুল থেকে মৌমাছি যে মধু আহরণ করত, সে মধুতেও নাবিজের মতো ঝাঁজ থাকত এবং কিছুটা দুর্গন্ধ হতো।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আয়েশার কাছে এলেন। আয়েশাও একইভাবে দুর্গন্ধের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। সাওদাও এমন কথা বললেন। রাসুল দুর্গন্ধ অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। এ কারণে পরপর তিনজন স্ত্রী যখন মধুর দুর্গন্ধের ব্যাপারে বললেন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করে বসলেন–তিনি জীবনে আর কোনো দিন মধুই খাবেন না!

এখানে আরেকটি সম্ভাব্য বিষয়ও ঘটে থাকতে পারে। রাসুলের এ ত্রয়ী স্ত্রী যখন বুদ্ধি করে রাসুলের মুখ থেকে 'মিথ্যা দুর্গন্ধের' ব্যাপারে বলছিলেন, রাসুল তখন ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন নেপথ্যের কাহিনি। জয়নবকে একটু বেশি সময় দেওয়ার কারণে তাঁরা এমন মিথ্যা কাহিনি ফেঁদে বসবেন, এটা রাসুল মেনে নিতে পারেননি। এ কারণে তিনি রাগান্বিত হয়ে জীবনে আর মধু না খাওয়ার প্রতিজ্ঞা করে বসেন।

যা-ই হোক, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এমন প্রতিজ্ঞা করার পরপরই জিবরাইল আলায়হিস সালাম ওহি নিয়ে অবতরণ করলেন। তাঁকে পাঠ করে শোনালেন সুরা তাহরিমের প্রথম দুই আয়াত :

> 'হে নবি, আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদের খুশি করতে তা নিজের জন্য হারাম করেছেন কেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।
>
> আল্লাহ তোমাদের জন্যে কসম থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

এরপর এ ত্রয়ী উম্মুল মুমিনিন নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন এবং রাসুল-সকাশে ক্ষমাপ্রার্থনা করে নিজেদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেন।

এ সময়কালে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ঘটল, যার ব্যাপারে সুরা তাহরিমের পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ঘটনা ছিল–রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনিন হাফসাকে কোনো একটি গোপন বিষয় অবহিত করে বলেছিলেন, তিনি যেন কারও কাছে বিষয়টি প্রকাশ না করেন। কিন্তু হাফসা বিষয়টি তিনি নিজের মধ্যে রাখতে

www.pathagar.com

অপারগ হন এবং আয়েশার কাছে প্রকাশ করে দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতেই রাসুলের এ স্ত্রীদ্বয়কে সতর্ক করে আল্লাহ তায়ালা সুরা তাহরিমের পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ করেন।

> 'যখন নবি তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ নবিকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবি সে বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন এবং কিছু বললেন না। নবি যখন তা স্ত্রীকে বললেন, তখন স্ত্রী বললেন, "কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল?" নবি বললেন, "যিনি সর্বজ্ঞ, ওয়াকিবহাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন।"
>
> 'তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তওবা করো, তবে ভালো কথা। আর যদি নবির বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করো, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ জিবরাইল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তাঁর সহায়। উপরন্তু ফেরেশতাগণও তাঁর সাহায্যকারী।'

ছত্রিশ

রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে অভিমান করে এক কঠিন প্রতিজ্ঞা করে ফেললেন–আগামী এক মাস তিনি কোনো স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন না এবং রাত্রিবাস করবেন না। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরের পাশে আরেকটি দোতলা ঘর ছিল, এটাকে আল-মাশরাবা বলা হতো, তিনি প্রতিজ্ঞা পূরণার্থে সেখানে একাকী বসবাস শুরু করলেন।

নেপথ্যের পূর্বঘটনা এক দিক থেকে দেখলে তেমন কিছু নয়, আবার আরেক দিক থেকে দেখলে বেশ গুরুতর।

ঘটনা নবম হিজরি সনের।

ইসলামের বিজয়নিনাদ এখন সারা আরবে ধ্বনিত হচ্ছে। মুসলিম সেনাবাহিনী প্রায় পুরো আরব জয় করে ফেলেছে। প্রতিদিন কোনো না কোনো নতুন অঞ্চল জয়ের সুসংবাদ আসছে মদিনায়। সেসব জয়-পরবর্তী গনিমতের সম্পদ এসে জমা হচ্ছে মদিনার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে। মুক্তহস্তে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেসব বিলিয়ে দিচ্ছেন গরিব-দুঃখী আর এতিম-বিধবাদের মধ্যে। কোনো কিছুই অবশিষ্ট রাখছেন না। ফলে মদিনার মুসলমানদের দারিদ্র্য দূর হয়েছে অনেকটা।

www.pathagar.com

কিন্তু উম্মুল মুমিনিনদের ঘরে সেই আগের অবস্থাই বিরাজমান। সবারই নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর অবস্থা। অনেক স্ত্রীর ঘরে সন্ধ্যায় পিদিম জ্বলে না। তাঁদের জন্য বার্ষিক সরকারি ভাতার ব্যবস্থা আছে–৮০ ওয়াসাক শুকনো খেজুর এবং ২০ ওয়াসাক যব। ও দিয়ে দুবেলা কোনো রকম আহারের বন্দোবস্ত হয় বটে, কিন্তু নতুন রাষ্ট্র 'মদিনা'র রাষ্ট্রনায়কের স্ত্রী হিসেবে তাঁদের জন্য তা বড় বেমানান। অথচ স্ত্রীদের অনেকেই ছিলেন আরবের বিভিন্ন গোত্রের গোত্রপতির কন্যা, অনেকে ছিলেন ধনী পরিবারের মেয়ে। বিলাস এবং সম্পদের চাকচিক্যে জীবনযাপন করে এসেছেন তাঁরা। সেসব সুখ আর বিলাস জলাঞ্জলি দিয়ে রাসুলকে ভালোবেসে জীর্ণ কুটিরে নিজেদের সঁপে দিয়েছেন বিনা দ্বিধায়। তবু নিজেদের ভরণ-পোষণের জন্য আরেকটু সচ্ছলতার আবদার তো তাঁরা করতেই পারেন।

এ নিয়েই সেদিন দরবার বসেছিল। রাসুলকে ঘিরে বসেছিলেন সকল নবিপত্নী। একে একে জানিয়েছিলেন তাঁদের দাবিদাওয়া। রাসুল কেবল শুনছিলেন, মুখ ফুটে কিছু বলছিলেন না।

কেউ কেউ এমনও বলছিলেন–রোম-পারস্যের সম্রাট কায়সার-কিসরার বেগমরা বিলাসের সাত-চাদরে ডুবে থাকে। আমরা তো অমন কিছু চাইছিনে, সাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপনের জন্য আমাদের নির্ধারিত ভাতার পরিমাণটা আরেকটু সচ্ছল হলেই হলো!

উমর ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এমন পারিবারিক দরবারের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন। দেখলেন, রাসুল মুখ গম্ভীর করে মাঝে বসে আছেন আর তাঁকে ঘিরে বসে আছেন সকল নবিপত্নী। উমর ও আবু বকর নিজ নিজ কন্যাকে ওখানেই সবার সামনে খানিকটা শাসালেন এভাবে দরবার বসিয়ে রাসুলের সামনে নিজেদের দাবিদাওয়া পেশ করার কারণে। কন্যাদ্বয় কথা দিলেন–তাঁরা ভবিষ্যতে আর এমন আচরণ করবেন না, যার দ্বারা রাসুল কষ্ট পান।

বিশেষ করে উমর নিজ কন্যা হাফসাকে একান্তে ডেকে বললেন, 'রাসুলের কাছে অসাধ্য কোনো জিনিসের আবদার কখনো করো না। তোমার যা লাগে আমার কাছে বলো, আমি ব্যবস্থা করে দেব। রাসুল তোমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে রেখেছেন শুধু আমার সম্মানের দিকে তাকিয়ে। নয়তো অনেক আগেই তোমাকে ছেড়ে দিতেন। এ সম্মানের অসম্মান করো না।'

এদিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের কথা শুনে কোনো সিদ্ধান্ত না জানিয়ে সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। হয়তো মনে মনে কিছুটা

www.pathagar.com

মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিলেন স্ত্রীদের ওপর। তিনি নবি, আরবের বাদশাহ নন; এটা তাঁদের বোঝা উচিত ছিল! আর তা ছাড়া নবিপরিবারের প্রতিজন সদস্যকে তিনি নিজের চারিত্রিক ছাঁচে গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। তিনি যেমন সাদাসিধে, লৌকিকতাহীন, অল্পে তুষ্টির মধ্যে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁদেরও একই জীবনাচারে অভ্যস্ত করাতে পছন্দ করতেন।

স্ত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর রাসুল ঘোড়ায় চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনাবশত ঘোড়া থেকে পড়ে তিনি কোমরে সামান্য চোট পান। ফলে বিশ্রামের জন্য আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘর-সংলগ্ন একটি দ্বিতল কামরা ছিল, সেখানে গিয়ে অবস্থান করতে থাকেন এবং সেদিনই প্রতিজ্ঞা করলেন–আগামী এক মাস তিনি কোনো স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন না এবং রাত্রিবাস করবেন না।

সারা মদিনায় মাতম শুরু হয়ে গেল। নানাজনে নানা কথা ছড়াতে লাগল।

ঘটনা খারাপ থেকে খারাপ হতে লাগল। এরই মধ্যে একদিন রাতের বেলা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। এমন সময় এক আনসারি সাহাবি হন্তদন্ত হয়ে উমরের দরজায় কড়া নেড়ে বললেন, 'উমর ইবনে খাত্তাব, বাড়ি আছেন?'

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘুম ভেঙে গেল। আনসারি সাহাবির গলার আওয়াজ শুনে তিনি মনে করলেন, আরবের গাসসানি গোত্র মদিনায় হামলা করল নাকি! এত রাতে এভাবে হন্তদন্ত হয়ে ডাকার কারণ কী? তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে সাহাবিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে? গাসসানিরা হামলা করেছে নাকি?'

সাহাবি বললেন, 'না, বরং তার চেয়েও বড় দুঃসংবাদ আছে।'

উমর ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'দুঃসংবাদ! কী হয়েছে?'

সাহাবি ভয় পাওয়া কণ্ঠে বললেন, 'আল্লাহর রাসুল তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দিয়েছেন!'

এ কথা শুনে উমরের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে লাগল। কী শুনছেন তিনি! এটা কীভাবে হতে পারে? এমনটা হলে...উফ! তিনি আর ভাবতে পারলেন না, অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন, 'ঘটনা যদি এমনই হয়ে থাকে, তাহলে হাফসার কপালে চরম দুঃখ আছে।'

সুবহে সাদিকের শুভ্র বিকিরণ দেখা যাচ্ছে পুবাকাশে। আনসারি সাহাবিকে চলে যেতে বলে উমর ভোর হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

www.pathagar.com

ভোর হতেই মসজিদে নববিতে চলে এলেন। প্রথমে গেলেন কন্যা হাফসার ঘরে। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহর রাসুল তোমাকে তালাক দিয়েছেন?'

হাফসা এ কথা শুনে আঁতকে উঠলেন, 'কই, না তো! আমি তো এমন কিছু শুনিনি।'

উমর আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'রাসুল এখন কোথায়?'

হাফসা আয়েশার হুজরা-সংলগ্ন দ্বিতল কামরাটি দেখিয়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসুল ওই কামরায় আছেন।'

উমর মেয়ের প্রতি খানিকটা রুষ্ট হয়ে বললেন, 'তোমার মনে কখনো যেন এমন দুর্ভাবনা না আসে যে–তোমার সখী (আয়েশা) তোমার চেয়ে সুন্দরী হওয়ার কারণে আল্লাহর রাসুল তাকে তোমার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। তুমি কখনো তার সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টা করো না। জেনে রেখো, সে রাসুলের প্রিয়তমা স্ত্রী।'

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলের মনঃকষ্টের বিষয়টি বুঝতে পেরে তাঁর অন্য স্ত্রীদের কাছেও গেলেন। সবাইকে তাঁদের দাবি থেকে সরে আসার অনুরোধ করলেন এবং নিজেদের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হওয়ার সুপারিশ করলেন।

সবাই মৌনতা অবলম্বন করলেও উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা উমরের প্রতি কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। উমর যখন তাঁর দরজায় গিয়ে অনুরোধ করে বললেন, 'তোমরা এমন নেয়ামতের সম্মান করছ না যে তোমরা আল্লাহর রাসুলের স্ত্রী। তোমরা ভালো করেই বুঝতে পারছ, যদি তিনি তোমাদের তালাক দিয়ে দেন, তাহলে আল্লাহ তোমাদের চেয়েও রূপে-গুণে অনন্য নারী তাঁকে দান করবেন। এটা তোমাদের বোঝা উচিত।'

উমরের এ কথা শুনে উম্মে সালামা বলে উঠলেন, 'উমর, আপনি সবকিছুতেই নাক গলাতে পছন্দ করেন। এখন আবার এসেছেন নবিপরিবারের বিষয়েও নাক গলাতে?'

উম্মুল মুমিনিনের এমন কঠোর ভাষ্য শুনে উমর খানিকটা চুপসে গেলেন। তিনি বিষয়টি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আর উচ্চবাচ্য না করে মসজিদে নববির দিকে চলে গেলেন।

মসজিদে নববিতে এসে দেখেন সবাই এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। বিশেষত মদিনার মুনাফিকরা 'আল্লাহর রাসুল তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দিয়েছেন'–এ মর্মে রটনা রটাতে শুরু করেছে।

www.pathagar.com

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে নববিতে এসে সোজা রাসুলের কামরার দিকে চলে গেলেন। রাসুলের কামরার নিচে একজন খাদেম ছিল। উমর খাদেমকে তাঁর আগমনের সংবাদ জানিয়ে রাসুলের কাছে সাক্ষাতের অনুমতি চাইতে বললেন।

খাদেম রাসুলের কাছ থেকে ফিরে এসে জানাল, রাসুল কিছু না বলে চুপ করে আছেন। উমর তাকে আবার পাঠালেন। দ্বিতীয়বার এসেও সে একই জবাব দিল। তৃতীয়বার পাঠানোর পর উমর ভেতরে যাওয়ার অনুমতি পেলেন। এমন সময় সেখানে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও উপস্থিত হলেন। উমর আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে রাসুলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

উমর ও আবু বকর কামরার ভেতরে ঢুকে দেখলেন, আল্লাহর রাসুল একটি খেজুর পাতার চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছেন। খেজুর পাতার দাগ তাঁর পিঠে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটি খাবারের থালা আর দুটো পানির মশক ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই। রাসুলের এমন রিক্ত জীবনাচার দেখে উমরের চোখ জলে ভরে গেল।

উমর কামরার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। রাসুল কিছু বলছেন না। ঘরের ভেতরে গম্ভীর পরিবেশ, অভিমানে গুমোট হয়ে আছে চারপাশ। উমর ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন–রাসুলের সামনে এমন কিছু বলবেন, যাতে তাঁর মনের অভিমান কিছুটা হলেও লাঘব হয়।

তিনি রাসুলকে সালাম দিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! মক্কায় থাকতে আমাদের স্ত্রীরা কখনো আমাদের সামনে মুখ তুলে কথা বলতে পারেনি। কিন্তু মদিনার পরিবেশটাই যেন কেমন, এখানে এসে আমাদের ঘরের নারীরাও কথা বলতে শিখে গেছে। আপনি হয়তো জানেন না, আমার ঘরওয়ালিও কয়েক দিন আগে বলল, তাকেও নাকি এখন মাসে মাসে ভাতা দিতে হবে। এ কথা শুনে আমি আচ্ছামতো তার কান মলে দিয়েছি।'

উমরের এমন কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সত্যি সত্যি হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, 'আমার স্ত্রীরাও ভাতা বৃদ্ধি করার কথা বলছিল।'

রাসুলের মনের মেঘ সরে গিয়েছে দেখে উমর সাহস করে বলে ফেললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি সত্যি সত্যি আপনার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন?'

রাসুল বললেন, 'না তো!'

রাসুলের মুখে না-বোধক সত্যায়ন শুনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুশিতে 'আল্লাহু আকবার' তাকবির বলে উঠলেন। রাসুলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাইরে

www.pathagar.com

সাহাবিরা সবাই উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছেন। আমি কি তাঁদের এ সংবাদটা দিতে পারি?'

রাসুল বললেন, 'যদি তোমার দিতে ইচ্ছা হয়, তবে বলে দাও।'

উমর ঘরের বাইরে বেরিয়ে সমবেত সাহাবিদের উদ্দেশে বললেন, 'আল্লাহর রাসুল তাঁর স্ত্রীদের তালাক দেননি।'

এ ধরনের রটনায় যারা ইন্ধন জুগিয়েছিল, সেই মুনাফিকদের মুখ সঙ্গে সঙ্গে কালো হয়ে গেল। আরেকটি চক্রান্ত এভাবে ধূলিসাৎ হতে দেখে তাদের দুঃখের সীমা রইল না।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রতিদিন দিন গুনছেন–কবে শেষ হবে রাসুলের প্রতিজ্ঞার সময়সীমা? দিন যেন আর ফুরোয় না। কিশোরী মনটা সারাক্ষণ উতলা হয়ে থাকে। সেই কবে রাসুল এসেছিলেন তাঁর ঘরে, আজ কত দিন হতে চলল! আর কদিন বাকি এক মাস শেষ হতে?

অবশেষে দিন ফুরোল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রতিজ্ঞার সময় শেষ করে সর্বপ্রথম আয়েশার ঘরেই এলেন। অভিমানী আয়েশার চোখজুড়ে জল। বুক ফেটে আনন্দের ফল্গুধারা বের হয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু তবু তাঁর দুষ্টুমি বুঝি শেষ হয় না।

রাসুল ঘরে ঢুকতেই চতুর আয়েশা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি তো এক মাসের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন! কিন্তু আজ তো উনত্রিশতম দিন অতিক্রম হলো। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হওয়ার সময় এখনো এক দিন বাকি আছে যে!'

রাসুল আয়েশার দুষ্টুমি বুঝে ফেললেন। তিনিও মুচকি হাসি লুকিয়ে বললেন, 'আয়েশা! মাস কখনো কখনো উনত্রিশ দিনেরও হয়ে থাকে।'

আয়েশার কথা শুনে আল্লাহর রাসুল হাসলেও তাঁর মনের মধ্যে মেঘ জমে আছে। একটু আগেই আল্লাহ তায়ালা নবিপত্নীদের ব্যাপারে কঠিন এক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।

> 'যদি নবি তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পরিবর্তে দিতে পারেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামাজি, তওবাকারী, ইবাদতগুজার, রোজাদার, অকুমারী ও কুমারী।'

এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আয়েশার সামনে গিয়ে বললেন, 'আয়েশা, আমি তোমাকে একটি প্রস্তাব দেব। তুমি তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ করে তোমার সিদ্ধান্ত জানাবে।'

www.pathagar.com

রাসুল এত দিন পরে আয়েশার ঘরে এসেছেন, কত দিন পর তিনি তাঁর দর্শন পেয়েছেন, কত কথা জমা হয়ে আছে বুকের মধ্যে। রাসুলের এমন গম্ভীরদর্শন মুখ দেখে আয়েশা খানিকটা ঘাবড়ে গেলেন। ভয়ে ভয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! বলুন আপনার প্রস্তাব।'

রাসুল খানিকটা ইতস্তত করে আয়েশাকে সদ্য অবতীর্ণ হওয়া আল্লাহর ঘোষণা পাঠ করে শোনালেন।

আয়াতটি শোনার পরপরই আয়েশা বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি কোন বিষয়ে আমার পিতা-মাতার সিদ্ধান্ত জানতে চাইব? আমি নিজেই তো ভালোবেসে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে চিরদিনের জন্য বেছে নিয়েছি।'

আয়েশার এমন সত্যভাষণে রাসুলের চেহারায় খুশির রেখা দেখা দিল। রাসুলের অন্তর থেকে বেদনার কালো মেঘ সরে গেল। যদিও অন্য স্ত্রীরা কী উত্তর দেবেন, তা এখনো তিনি জানেন না।

রাসুল অন্য স্ত্রীদের এ ঘোষণা শোনানোর জন্য বেরোতে যাবেন, তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এটা আপনার অন্য স্ত্রীরা না জানলে খুশি হব।'

আয়েশার এমন মেয়েলি ছেলেমানুষি দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মৃদু হেসে জবাব দিলেন, 'আয়েশা, আমি পৃথিবীতে এসেছি মানুষকে শিক্ষা দিতে, কারও ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে প্রেরিত হইনি।'

তিনি আয়েশা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা। রাসুলের ছায়াসঙ্গী। একাধারে ১০ বছর রাসুলের ভালোবাসায় স্নাত মানবী। বয়সে ছিলেন একেবারেই কিশোরী; তবু জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অনুসন্ধিৎসা, ধর্মবোধ এবং রাসুলের প্রতি ভালোবাসা তাঁকে অনন্য করে তুলেছিল। শুধু মানবিক ভালোবাসাই নয়, ধর্মপালন এবং ধর্মীয় জ্ঞানার্জনেও তিনি অর্জন করেছিলেন রাসুলের ঐকান্তিক আস্থা। সর্বদিক থেকে তিনি হয়ে উঠেছিলেন রাসুলের পরিপূর্ণ সহধর্মিণী।

সাঁইত্রিশ

মক্কায় উড্ডীন হয়েছে ইসলামের পতাকা। যে মক্কার মাটি থেকে একদিন বিতাড়িত হয়েছিল ইসলাম, আট বছর পর সে মক্কা প্রায় বিনা রক্তপাতে পদানত হয়েছে রাসুলের তাকবির ধ্বনিতে। মক্কা বিজয় ইসলামকে আরবের বুকে চিরস্থায়ী স্থায়িত্ব এনে দিল। সমগ্র আরবের অন্যান্য গোত্র ও কবিলা বিনা

www.pathagar.com

বাক্যব্যয়ে মেনে নিতে লাগল ইসলামের শাশ্বত পয়গাম। দলে দলে মানুষ সমবেত হতে লাগল ইসলামের পতাকাতলে। এ সময় আরব তো বটেই, আরবের বাইরের পৃথিবীতেও নাকাড়া বেজে উঠেছিল কালেমায়ে তাওহিদের।

পরবর্তী বছর রাসুল তাঁর সকল সাহাবিকে নিয়ে মক্কায় হজব্রত পালন করতে এলেন। আরব এবং অনারব প্রায় সকল সাহাবি এ হজব্রতে অংশ নিতে মক্কায় একত্র হন। জাবালে রহমতের পাদদেশে সমবেত লক্ষাধিক অনুসারীর সামনে শেষ নবি ও রাসুল হিসেবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলেন। এ ভাষণে তিনি পুনর্বার ব্যক্ত করলেন ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, তাঁর উম্মতের করণীয় এবং অনাগত ভবিষ্যৎ পৃথিবীর প্রতি মহাসত্যের পয়গাম। সর্বশেষ তিনি এক আল্লাহকে সাক্ষী রেখে নিজের নবুওয়াতি দায়িত্বের সত্যায়ন করলেন। তাঁর সকল অনুসারী ঐকতানে উচ্চারণ করলেন–আপনি আপনার দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন। মুহাম্মদ আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী রইলে!'

রাসুল হজ পালন শেষে মদিনায় ফিরে এলেন।

একাদশ হিজরির ২৯ সফর।

সেদিন ছিল সফর মাসের শেষ সোমবার। মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পর কেটে গেছে ১০টি বছর। রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা তাঁর মুক্ত দাস আবু মুহাইবিয়াকে নিয়ে মদিনায় অবস্থিত কবরগাহ জান্নাতুল বাকিতে এলেন। এখানে তাঁর বেশ কয়েকজন আত্মীয়, বন্ধু এবং অসংখ্য অনুসারীর কবর। তিনি তাঁদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করতে এসেছেন। মদিনায় থাকলে তিনি প্রায়ই এখানে আসেন। রোদনভরা প্রার্থনায় মৃত ব্যক্তিদের মাগফেরাত কামনা করে থাকেন। আজও তাঁদের জন্য দীর্ঘক্ষণ প্রার্থনা করলেন।

রাসুলের শরীরটা কয়েক দিন থেকে তেমন ভালো নেই। শরীরে বেশ জ্বর নিয়ে বের হয়েছেন। জান্নাতুল বাকিতে প্রার্থনা শেষে মনে হচ্ছিল জ্বরের প্রকোপ আরও বাড়ছে। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড মাথাব্যথা শুরু হলো। তাঁর মাথায় বাঁধা পাগড়িও জ্বরের প্রচণ্ডতায় গরম হয়ে উঠেছিল। তিনি আবু মুহাইবিয়ার সাহায্য নিয়ে আয়েশার ঘরে পৌঁছালেন।

ঘরে পৌঁছে দেখেন আয়েশাও মাথাব্যথায় ছটফট করছেন আর বলছেন, 'ওহ, আমার মাথাটা গেল!' আয়েশার এমন অস্ফুট গোঙানি শুনে রাসুল বললেন, 'আয়েশা, আমারও তো মাথাব্যথা।'

www.pathagar.com

নিজের অসুস্থতা সত্ত্বেও রাসুল আয়েশাকে কাছে টেনে প্রবোধ দিলেন। একটু খুনসুটি করে বললেন, 'আমার আগে যদি তুমি মারা যাও, তবে আমি খুব সুন্দর করে তোমায় গোসল করাব, তোমার জানাজা দেব এবং তোমাকে কবরে রাখব। কেমন হবে ব্যাপারটা?'

রাসুলের কথা শুনে আয়েশাও কম গেলেন না, তিনি রাগত চোখে রাসুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও বুঝতে পারছি, আমি মারা গেলে এ ঘরে আপনি আরেকজন নতুন বউ নিয়ে আসবেন। এমনটিই আশা করছেন মনে মনে, তাই না?'

স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক প্রেম-ভালোবাসা যদিও অব্যাহত ছিল কিন্তু বেশিক্ষণ তা স্থায়ী হলো না। রাসুল ধীরে ধীরে অসুস্থতার দরুন শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর চিরকালীন নিয়মমতো একেক দিন একেক স্ত্রীর ঘরে রাত কাটাতে লাগলেন। প্রচণ্ড অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি স্ত্রীদের অধিকার রক্ষায় ছিলেন পূর্ণ সজাগ। সজ্ঞানে কারও প্রতি সামান্য অসাম্য হোক, এমনটি তিনি চাইতেন না। প্রত্যেক স্ত্রী নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে রাসুলের সেবা করতে লাগলেন। কিন্তু অসুস্থতা কমছিল না কিছুতেই।

পরবর্তী মাস, ৫ রবিউল আউয়াল সোমবার।

অসুস্থ অবস্থায় আরও কয়েকটি দিন কেটে গেছে। অসুস্থতা দিন দিন বেড়েই চলছিল। জ্বরের প্রচণ্ডতায় মাঝেমধ্যে অচেতন হয়ে যেতেন। উম্মুল মুমিনিনগণ সকলেই রাসুলের অসুস্থতার কারণে অস্থির হয়ে রইলেন এ কদিন। প্রত্যেক স্ত্রীর ঘরে থাকাকালীন জ্বরের ঘোরে বারবার জিজ্ঞেস করতেন–আগামীকাল আমি কার ঘরে থাকব, আগামীকাল আমি কার ঘরে থাকব? রাসুলপত্নীগণ বুঝতে পারলেন, রাসুলের মন আয়েশার ঘরে যাওয়ার জন্য বেচঈন হয়ে আছে। আয়েশার ভালোবাসার পরশ পেতে রাসুলের অসুস্থ দেহ-মন উদ্‌গ্রীব।

সেদিন তিনি মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে ছিলেন। উম্মুল মুমিনিনগণ অনেকেই তাঁর পাশে। রাসুলের কণ্ঠে এমন ব্যগ্রতা শুনে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন–রাসুলকে আয়েশার ঘরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক। তাঁরা রাসুলের মনোবাসনার সামনে নিজেদের ভালোবাসার দাবি ত্যাগ করলেন। অথচ প্রত্যেক স্ত্রীই কামনা করেন, তাঁর স্বামী অসুস্থ হলে তিনি নিজের সবটুকু দিয়ে স্বামীর সেবা করবেন, তাঁর শুশ্রূষা করবেন, নিজের ভালোবাসার পরশ দিয়ে তাঁকে সুস্থ

www.pathagar.com

করে তুলবেন। এটা একজন স্ত্রীর কেবল অধিকার নয়, ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশেরও এক অতুলনীয় সুযোগ। কিন্তু রাসুলের মনঃকামনা বোঝার পর তাঁরা নিজেদের ভালোবাসার এমন সুযোগ বিসর্জন দিলেন। তাঁদের ঘরে রাসুলের অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট পালার দিনটি তাঁরা ছেড়ে দিলেন আয়েশার জন্য। এটা রাসুলের প্রতি যেমন তাঁদের আন্তরিক ভালোবাসার উজ্জ্বল উদাহরণ, তেমনি আয়েশার প্রতি স্নেহ-মমতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

পরেরবার যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন—আগামীকাল আমি কার ঘরে থাকব? তখন স্ত্রীরা তাঁকে জানালেন—আপনি যার ঘরে থাকতে চান আপনি সে ঘরেই থাকতে পারেন। উম্মুল মুমিনিনগণ এরপর ফজল ইবনে আব্বাস এবং আলি ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে ডেকে আনলেন। অসুস্থতার দরুন রাসুল দাঁড়াতে পারছিলেন না, ফজল ও আলি দুজন দুদিক থেকে রাসুলকে ধরে মায়মুনার ঘর থেকে আয়েশার ঘরের দিকে নিয়ে যেতে লাগলেন। রাসুলের পা নাড়ানোর মতো শক্তিও ছিল না, দুজন তাঁকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন আর তাঁর পা মাটিতে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। এভাবেই তাঁকে আয়েশার ঘরে এনে শুইয়ে দেওয়া হলো।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা অন্য উম্মুল মুমিনিনদের বদান্যতায় আপ্লুত হলেন। অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন তিনি রাসুলের জন্য। অবশেষে তিনি এলেন। আয়েশা নিজেকে রাসুলের সেবায় উৎসর্গ করে দিলেন। রাসুলের কাছ থেকে শেখা সুস্থতালাভের সকল দোয়া পড়ে তিনি তাঁর শরীরে ফুঁক দিতে লাগলেন। জ্বরের প্রচণ্ডতায় তাঁর শরীরের উত্তাপ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। উত্তাপ কমাতে আয়েশা রাসুলের মাথার পট্টি বারবার পানিতে ভিজিয়ে দিচ্ছিলেন, তাঁর শরীর মুছে দিচ্ছিলেন ঠাণ্ডা পানি দিয়ে।

কিন্তু শরীরের উত্তাপ কিছুতেই কমছিল না, বরং হঠাৎ করে তা আরও বৃদ্ধি পেল। এমনকি তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ অচেতন থাকার পর যখন আবার চেতনা ফিরে পেলেন, তখন আয়েশাকে ডেকে বললেন, 'কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন কুয়া থেকে সাত মশক পানি এনে আমার ওপর ঢালো। আমি লোকজনের সামনে গিয়ে কিছু জরুরি বিষয়ে অসিয়ত করতে চাই।'

রাসুলের কথা অনুযায়ী বিভিন্ন কুয়া থেকে সাত মশক পানি আনা হলো। হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার একটি বড় গামলা ছিল, আয়েশা রাসুলকে সে গামলার কাছে নিয়ে বসিয়ে দিলেন। অন্যরা তাঁর মাথায় পানি ঢালতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ পানি ঢালার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেই হাত উঁচু করে বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে, আর প্রয়োজন নেই।'

www.pathagar.com

পানি ঢালার পর তিনি কিছুটা সুস্থ বোধ করলেন। খানিকটা পরিপাটি হয়ে লোকদের সাহায্যে মসজিদে নববির মিম্বারে গিয়ে বসলেন সবাইকে কিছু জরুরি কথা বলার জন্য। তিনি আনসারদের সহযোগিতা, মুহাজিরদের ত্যাগ, উম্মাহর ভ্রাতৃত্ব, মুসলিমদের করণীয় এবং আবু বকরের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা পুনর্ব্যক্ত করে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা শেষ করে জোহরের নামাজ পড়ালেন অসুস্থ শরীর নিয়ে। নামাজের পর আরও কিছুক্ষণ কথা বলে আবার আয়েশার ঘরে চলে এলেন।

অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও নামাজের ব্যাপারে তাঁর কোনো অবহেলা ছিল না। সঠিক সময়ে তিনি মসজিদে নববিতে নামাজের জামাতের ইমামতি করছিলেন এ কদিন।

৮ রবিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার।

অসুস্থতার কোনো কমতি নেই। তবু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এদিন মাগরিবের নামাজ পড়ালেন। নামাজে সুরা মুরসালাত পুরোটা তেলাওয়াত করলেন দরদভরা কণ্ঠে। নামাজ শেষে আয়েশার ঘরে এসে আবার শয্যাগত হলেন। তিনি তখন প্রায় অচেতন। এশার সময় চোখ খুলে আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এশার জামাত কি হয়ে গেছে?'

আয়েশা জানালেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! এখনো জামাত হয়নি। তাঁরা সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

রাসুল বললেন, 'আমার জন্য পানির ব্যবস্থা করো, আমি অজু করব।'

আয়েশা জলদি রাসুলের জন্য অজুর পানির ব্যবস্থা করলেন। অসুখের তীব্রতা সত্ত্বেও তিনি উঠে অজু করলেন নিয়মমতো। অজুর পর আয়েশা রাসুলকে নামাজের জন্য পরিপাটি করে দিলেন। যখন তিনি নামাজের জন্য ঘর থেকে মসজিদে নববিতে পা রাখবেন, তখন হঠাৎই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন মেঝেতে। আয়েশা পাগলের মতো রাসুলের দিকে দৌড়ে গেলেন তাঁকে ধরতে। কয়েকজনের সাহায্যে জলদি তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো। আয়েশা শঙ্কিত চোখে তাঁর পাশে বসে রইলেন। তাঁর চোখভরা কষ্টের নোনাজল। রাসুলের কষ্ট তাঁকেও পীড়িত করছিল ক্ষণে ক্ষণে।

কিছুক্ষণ পর রাসুল চোখ মেলে তাকালেন। চেতনা ফিরে পেয়েই জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকেরা কি নামাজ পড়ে ফেলেছে?'

আয়েশা জবাব দিলেন, 'না, হে আল্লাহর রাসুল! তাঁরা সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

www.pathagar.com

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরও দুবার চেষ্টা করলেন উঠে বসার, কিন্তু পারলেন না। শরীর সায় দিল না। শারীরিক প্রশান্তির জন্য তিনি গোসল করলেন। গোসল করে উঠতে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে গেলেন আবার। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবু বকরকে সংবাদ পাঠাও, তিনি যেন নামাজের ইমামতি করেন।'

এটি ছিল একটি স্পষ্ট নির্দেশনা। নির্দেশনা ছিল পরবর্তী উম্মতের জন্যও। তাঁর পর আবু বকর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন, এ আদেশ ছিল তার ইঙ্গিতবহ। কিন্তু আয়েশা ভাবছিলেন ভিন্ন কিছু। প্রথমত আবু বকর অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ। রাসুলের অবর্তমানে তাঁকে নামাজ পড়ানোর কথা বললে তিনি হয়তো আবেগে কান্না শুরু করবেন এবং নামাজই পড়াতে পারবেন না। কেননা এর আগে এমনটি হয়নি কখনো যে রাসুলের অপারগতায় আবু বকর বা অন্য কেউ নামাজ পড়িয়েছেন। যেহেতু আবু বকর রাসুলের সবচেয়ে কাছের বন্ধু, এ কারণে রাসুলের রোগশয্যার অপারগতা তাঁকে আরও বেশি ব্যাকুল করে ফেলতে পারে। দ্বিতীয়ত বিষয়টি একান্তই আয়েশার সুদূরপ্রসারী চিন্তার প্রতিফলন। তিনি তাঁর ধীশক্তি এবং বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক ইঙ্গিত দিয়ে বুঝতে পারছিলেন, রাসুলের পর তাঁর স্থলাভিষিক্তির ব্যাপারে আবু বকরই অগ্রগণ্য। কিন্তু তিনি তাঁর পিতাকে ভালোবাসেন বিধায় রাজনৈতিক পরিধি থেকে তাঁকে দূরে রাখার চিন্তা করছিলেন। তা ছাড়া রাসুলের অবর্তমানে অন্য কাউকে ইমাম হিসেবে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে অনেক সাহাবি তাঁকে গ্রহণ করতে না-ও পারেন। রাসুলের শূন্যস্থান পূরণ করার মতো ব্যক্তি হিসেবে তাঁর সমালোচনা করতে পারেন অনেকে।

এসব বিষয় বিবেচনা করেই আয়েশা রাসুলকে জানালেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আবু বকর ব্যতীত অন্য কাউকে ইমামতির দায়িত্ব দেওয়া হোক।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পুনর্বার একই আদেশ দিলেন। আয়েশা আবার বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আবু বকর একজন কোমলপ্রাণ মানুষ। কুরআন পাঠ করতে গেলে তিনি চোখের পানি ধরে রাখতে পারেন না। তাই তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ইমামতির দায়িত্ব দিলে ভালো হতো!'

কিন্তু রাসুল পরপর দুবার আবু বকরকে নামাজ পড়ানোর জন্য আদেশ করলেন। আয়েশাও একইভাবে নিজের পিতার ব্যাপারে দায়িত্ব অব্যাহতির আবেদন জানালে রাসুল কিছুটা রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'তোমরা তো দেখি ইউসুফ (আ.)-এর সঙ্গে আচরণকারী নারীদের মতো আচরণ করছ। আবু বকরকে গিয়ে বলো লোকদের নিয়ে নামাজ আদায় করতে!'

www.pathagar.com

এরপর আর কোনো কথা বলার মতো শক্তি আয়েশার ছিল না। জলদি আবু বকরকে সংবাদ জানানো হলো নামাজে ইমামতি করার জন্য। রাসুলের সরাসরি নির্দেশে আবু বকর ওইদিন এশার নামাজের ইমামতি করলেন। তবে তাঁর এ দায়িত্ব শুধু ওইদিন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রইল না, রাসুল জীবিত থাকাকালে প্রতি ওয়াক্ত নামাজ তিনিই পড়ালেন।

১১ রবিউল আউয়াল রোববার।

রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর আয়ত্তাধীন সকল দাস-দাসীকে মুক্ত করে দিলেন। তাঁর নিজস্ব সম্পদ বলতে মাত্র সাতটি দিরহাম ছিল, সেগুলো দান করে দিলেন। অস্ত্রশস্ত্র যা ছিল তা মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। ঘরে বিতরণযোগ্য যা ছিল, সবই বিলিয়ে দিলেন। রাতে ঘরে প্রদীপ জ্বালানোর মতো কোনো তেল ছিল না, আয়েশা এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে তেল ধার করে আনলেন। খাবারের জন্য কিছু যবের বিনিময়ে তাঁর একটি মূল্যবান ঢাল এক ইহুদির কাছে আগেই বন্ধক রাখা হয়েছিল।

এই ছিল সমগ্র আরব উপদ্বীপের মুকুটহীন সম্রাট রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের শেষ সম্বল। এই সম্পদ রেখেই তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তাঁর শেষ সফরের। যেমন নিঃস্ব হয়ে এসেছিলেন তেমনই নিঃস্ব হয়ে চলে যাওয়ার সকল আয়োজন সম্পন্ন করলেন। আর আয়েশা গভীর মমতায় পর্যবেক্ষণ করছিলেন রাসুলের প্রতিটি কার্যকলাপ। এভাবেই তিনি নবির চারিত্রিক আদলে দারিদ্র্যকে ভালোবেসে কাটিয়েছেন পরবর্তী সমগ্র জীবন।

আটত্রিশ

১২ রবিউল আউয়াল, সোমবার।

ফজরের নামাজের জামাতে ইমামতি করছিলেন আবু বকর। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আয়েশার ঘরে শয্যাগত, ঘর থেকে বেরোবার শক্তি নেই। আবু বকরের কুরআন তেলাওয়াত শুনে ঘরের পর্দা সরিয়ে মসজিদের ভেতরে তাকালেন। ভোরের নামাজের প্রশান্তিদায়ক দৃশ্য। তিনি ২৩ বছর আগে একাকী যে নামাজের বিধান নিয়ে মক্কার পথে নেমেছিলেন, সে নামাজ আজ শত মানুষের কাতারে পরিণত হয়েছে। যে কুরআন একদিন সঙ্গোপনে পাঠ করতে হত, আজ সে কুরআনের সুর লহরী সপ্তাকাশ ছুঁয়ে যাচ্ছে। পুরো আরবে ধ্বনিত হচ্ছে আজান। তিনি পুলকিত হৃদয়ে আবু বকরের নামাজ পড়ানোর দৃশ্য দেখলেন।

www.pathagar.com

রাসুলকে তাকাতে দেখে নামাজরত সাহাবিরা আনন্দিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা মনে করলেন রাসুল অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন বুঝি, এ কারণে জামাতে শরিক হবেন। তাঁরা রাসুলের জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করলেন। কিন্তু রাসুলের পক্ষে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া সম্ভব ছিল না। তিনি হাত ইশারায় সাহাবিদের নামাজ চালিয়ে যেতে বললেন। এরপর পর্দা নামিয়ে আবার আয়েশার শয্যায় নিজেকে সমর্পণ করলেন।

রাসুলের পরিবারের সকল সদস্য এবং একান্ত কাছের অনুসারীরা বুঝে গিয়েছিলেন, রাসুলের অন্তিম সময় সমাগত। তাঁরা সকলেই আয়েশার ঘরে এসে সমবেত হতে লাগলেন।

ভোর হতেই এলেন রাসুলের একমাত্র জীবিত সন্তান নয়নমণি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। রাসুল মেয়েকে কাছে ডাকলেন। তাঁর সঙ্গে একান্ত কিছু কথা বললেন। কথার শুরুতে ফাতেমা কেঁদে ফেললেন। একটু পরই তিনি আবার হেসে উঠলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে রাসুলের কষ্ট হচ্ছিল ভীষণ। রাসুলের কষ্ট দেখে ফাতেমা নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। তিনি কেঁদে উঠলেন, 'হায়! আব্বার কী কষ্ট হচ্ছে!'

রাসুল তাঁকে কাঁদতে নিষেধ করে সান্ত্বনা দিলেন। কথা শেষ করে ফাতেমা তাঁর দুই ছেলে হাসান ও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে কাছে ডাকলেন। তাঁরা রাসুলের কাছে এলে রাসুল তাঁদের কপালে চুমু খেলেন এবং তাঁদের সচ্চরিত্রের উপদেশ দিলেন।

এ সময় রাসুলের অন্য স্ত্রীরাও আয়েশার ঘরে চলে এসেছেন। রাসুলের অন্তিম সময়ে সবাই তাঁর কাছাকাছি থাকতে চান। এত দিনের ভালোবাসার বন্ধন আজ বুঝি ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে! সবাই বিমর্ষ হয়ে আছেন, মনে মনে রাসুলের রোগমুক্তির জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছিলেন। রাসুল উম্মুল মুমিনিদেরও বিভিন্ন উপদেশ দিলেন।

রাসুল আয়েশার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন। আয়েশাকে ডেকে বললেন, 'আয়েশা, তোমার কিছু স্বর্ণালংকার ছিল, সেগুলো কী করেছ?'

অলংকারগুলো অন্য কোথাও ছিল, আয়েশা সেগুলো রাসুলের সামনে পেশ করলেন। রাসুল স্বর্ণগুলো দেখে বললেন, 'মুহাম্মদ এ স্বর্ণগুলো নিয়ে কী করে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে? এগুলো এখনই দান করে দাও।' আয়েশা আর দেরি করলেন না, তখনই সব গরিব-দুঃখীদের মাঝে দান করার ব্যবস্থা করলেন।

www.pathagar.com

ধীরে ধীরে রাসুলের মুখাবয়বে মৃত্যুযন্ত্রণা ফুটে উঠছিল। তিনি শারীরিক ব্যথার তীব্রতায় বারবার মূর্ছা যাচ্ছিলেন। অসহ্য ব্যথায় কখনো কুঁকড়ে উঠছিলেন। আয়েশাকে ডেকে বললেন, 'আয়েশা! খায়বারে এক ইহুদি নারী আমাকে যে বিষমিশ্রিত খাবার খাইয়েছিল, তার প্রতিক্রিয়া এখনো টের পাচ্ছি। সে বিষক্রিয়ায় আমার শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরা দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে।'

একটু তন্দ্রামতো আসতেই রাসুল গায়ের চাদর দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে ফেললেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর মুখের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে অস্ফুট স্বরে বলতে লাগলেন, 'নামাজের ব্যাপারে সতর্ক থেকো, দাস-দাসীদের প্রতি যত্নবান থেকো...!'

মূলত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর হয়ে অবচেতনভাবে অনেক কথা বলছিলেন। কথাগুলো সন্নিবেশিত ছিল না, কিছুটা অগোছালো এবং আকস্মিক ছিল। কিন্তু প্রতিটি কথাই ছিল উম্মতের জন্য বিশেষ দিকনির্দেশনামূলক।

রাসুলের মাথা আয়েশার কোলে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়ে বারবার রাসুলের শরীরে ফুঁ দিচ্ছিলেন। ঘরের অন্যরাও বিশেষ বিশেষ দোয়া পড়ে রাসুলের রোগমুক্তির প্রার্থনা করছিলেন, যেসব দোয়া রাসুল তাঁদের শিখিয়েছিলেন।

সময় ফুরিয়ে আসছিল। জীবনের অন্তিম সময় পার করছিলেন রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা গভীর মমতায় রাসুলের মাথা নিজের কোলে নিয়ে বসে আছেন। কয়েক দিনের নির্ঘুম চোখ তাকিয়ে আছে রাসুলের দিকে। তাঁর এক জীবনের ভালোবাসা। তাঁর সমগ্র জীবনটাই বাঁধা পড়ে আছে এই মহামানবের হৃদয়ের বাগডোরে। আয়েশা কান্নাভেজা চোখে তাকিয়ে ছিলেন। জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রাসুলের জীবনপ্রদীপ একবার জ্বলে উঠছিল আবার নিভে যাচ্ছিল। আয়েশার জন্য এ বড় কষ্টকর সময়। তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। নিজের বুকে রাসুলকে ধরে আছেন অথচ তিনি বুঝতে পারছেন রাসুল তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। হাত থেকে ধীরে ধীরে ছুটে যাচ্ছে তাঁর আজন্ম প্রেমের হীরকজ্যোতি। তাঁর ভালোবাসার পৃথিবী ধীরে ধীরে গ্রাস করছে নিকষ আঁধার।

এ সময় আয়েশার ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘরে ঢুকলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি তাজা মেসওয়াক। সম্ভবত কেবলই

www.pathagar.com

কোনো গাছের ডাল থেকে বানিয়ে এনেছিলেন। রাসুলের দৃষ্টি মেসওয়াকটির দিকে নিবদ্ধ হলো। তিনি কিছুক্ষণ সেটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। আয়েশা সঙ্গে সঙ্গে রাসুলের দৃষ্টি অনুসরণ করে বুঝতে পারলেন রাসুল সম্ভবত মেসওয়াক করতে চাইছেন। তিনি বললেন, 'মেসওয়াকটি কি আপনাকে এনে দেব?'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আবদুর রহমানের কাছ থেকে মেসওয়াকটি নিয়ে রাসুলের হাতে ধরিয়ে দিলেন। কিন্তু হাতে ধরিয়ে দিয়ে বুঝতে পারলেন মেসওয়াকটি বেশ শক্ত, রাসুলের পক্ষে এটি চিবিয়ে দাঁত মাজা সম্ভব নয়। তিনি আবার বললেন, 'আমি কি এটা আপনার জন্য নরম করে দেব?'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্মতি প্রকাশ করলেন। আয়েশা নিজের মুখ দিয়ে মেসওয়াকটির এক প্রান্ত চিবিয়ে নরম করে রাসুলের হাতে ধরিয়ে দিলেন। রাসুলের হাতে মেসওয়াক করার মতো অতটা শক্তি ছিল না, আয়েশা দাঁত মাজন করতে রাসুলকে সাহায্য করলেন। পাশে একটি পাত্রে পানি ছিল, মেসওয়াক শেষে পানি দিয়ে তিনি রাসুলের মুখ মুছিয়ে দিলেন।

মেসওয়াক করা শেষ হলো। রাসুলের চোখে শূন্য দৃষ্টি। তিনি ওপরের দিকে তাকালেন, ঘরের ছাদের দিকে। মনে হচ্ছে তিনি খেজুর পাতার ছাউনি ভেদ করে তাকিয়ে আছেন দূর গগনের নিরুদ্দেশের দিকে। আকাশ পেরিয়ে তাঁর দৃষ্টি চলে গেছে আরও দূর মহাকাশে।

রাসুলের ঠোঁট মৃদু নড়ছিল। আয়েশার কাঁধ ও বুকের মাঝখানে রাসুলের মাথা। আয়েশা নিজের বুকের ওপর রাসুলের মাথা ধরে রেখেছেন। রাসুল কী বলতে চাচ্ছেন সেটা শোনার জন্য আয়েশা একটু ঝুঁকে রাসুলের মুখের কাছে কান পাতলেন। রাসুল তখন তাঁর জীবনের শেষ বাণী বলছিলেন :

> 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আপনার নেয়ামতধন্য নবি, সিদ্দিক, শহিদ এবং পুণ্যবানদের সঙ্গে আমাকেও স্নাত করুন। আমাকে আমার পরম বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করান। হে আল্লাহ! হে আমার পরম বন্ধু! আমার রফিকে আ'লা...!'

পুরো ধরণি নিমিষেই স্তব্ধ হয়ে গেল। নববি মহল্লা থেকে পুরো মদিনা, মক্কা থেকে নিয়ে সমগ্র জাজিরাতুল আরব, রোম-পারস্য থেকে এ বিশ্ব জাহান মুহূর্তে মূল্যহীন হয়ে পড়ল। যাঁর আগমনে সহস্র বছর ধরে সেজেছিল এ ধরণি, তিনি আজ অনাড়ম্বর যাত্রায় বিদায় নিলেন। যাঁর আগমনের জন্য অযুতকাল

www.pathagar.com

প্রতীক্ষিত ছিল মহাবিশ্ব, তিনি এ ধুলোর ধরাকে আজ বলে গেলেন আলবিদা। তিনি মাত্র ২৩ বছরের সংগ্রাম দিয়ে লিখে গেলেন যে ইতিহাস, অনাগত পৃথিবীর শত সহস্র বছরের ইতিহাসে তাঁর নাম লেখা থাকবে হীরকফলকে। এতিম হয়ে এ ধরিত্রীতে পা রেখেছিলেন, আজ পুরো পৃথিবীকে এতিম করে তিনি বিদায় নিলেন।

তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ। সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

আয়েশার বুকে মাথা রেখে এই পৃথিবীর শেষ নবি, আল্লাহর শেষ প্রতিনিধি রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। আয়েশার বুকটা ভীষণ ভারী মনে হলো। মনে হলো সমগ্র পৃথিবীর ভার তাঁর ওপর পতিত হয়েছে। তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। নিজ হাতে রাসুলের ঘুমন্ত চোখ বন্ধ করে উচ্চস্বরে কেঁদে উঠলেন। প্রিয়তম হারানোর বেদনায় রোদন-বিলাপে তিনি ভুলে গেলেন চারপাশের পৃথিবী। আজ তিনি সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছেন। তাঁর পৃথিবী আজ রিক্ততায় ভরপুর, সকল আলো রূপ নিয়েছে নিকষ তমসায়।

বেশ কিছুদিন আগে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এক রাতে স্বপ্নে দেখেছিলেন, তাঁর ঘরে তিনটি আলোকিত চাঁদ খসে পড়ছে। তিনি অভিভূত হলেন এমন স্বপ্ন দেখে। পিতা আবু বকরের কাছে স্বপ্নের বিবরণ খুলে বললে তিনি বললেন, 'তোমার ঘরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তিনজন ব্যক্তির কবর হবে।'

রাসুলের জানাজা সমাপন হওয়ার পর সাহাবিদের মধ্যে মতবিরোধ হলো–রাসুলকে কোথায় কবর দেওয়া হবে? বিভিন্নজন বিভিন্ন মত ব্যক্ত করছিলেন। কেউ বলছিলেন জান্নাতুল বাকিতে, কেউ মসজিদে নববির কথা উল্লেখ করছিলেন, কেউ অন্য কোনো সম্মানিত স্থানের ব্যাপারে মত দিচ্ছিলেন। সকলের মতদ্বৈততার মাঝে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, 'একটি কথা আমার এখন মনে পড়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন, 'নবিদের সেখানেই সমাধিস্থ করা হয়, যেখানে তাঁরা ইন্তেকাল করেন।'

আবু বকরের এ কথার পর আর কোনো মতবিরোধের সুযোগ রইল না। রাসুলকে আয়েশার ঘরেই সমাধিস্থ করা হলো।

www.pathagar.com

উনচল্লিশ

দুই বছর পর। রাসুল-পরবর্তী খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুশয্যায় শায়িত। প্রিয় কন্যা আয়েশা পিতার পাশে বসে তাঁর শুশ্রূষার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। আবু বকরের অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসছে। তিনি মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কী বারে ইন্তেকাল করেছিলেন?'

আয়েশা উত্তর দিলেন, 'সোমবারে।'

'আজ কী বার?'

'আজ সোমবার।'

আবু বকর ওপরের দিকে নিঃসীম শূন্যতায় তাকিয়ে হৃদয়ের ব্যক্ততা প্রকাশ করে বললেন, 'আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, এ রাতের পর যেন আরেকটি রাত আমার জীবনে না আসে।'

আয়েশার হৃদয়টা বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল। দুই বছর হলো তিনি রাসুলকে হারিয়েছেন। তাঁর কোলে মাথা রেখেই ধরণির শ্রেষ্ঠ মানুষ পরপারে চলে গেছেন। আজ তাঁর ভালোবাসার আরেক পৃথিবী পরমপ্রিয় বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছেন। আয়েশার চোখ জলে ভরে গেল।

আবু বকর মেয়েকে কাঁদতে নিষেধ করলেন। তিনি আয়েশার কাছে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'রাসুলকে কয়টি কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল?'

আয়েশা বিমূর্ত মুখে জবাব দিলেন, 'আমরা তাঁকে তিনটি কাপড় দিয়ে কাফন দিয়েছিলাম। এগুলো সাহুলিয়া ছিল। তবে এর মাঝে তাঁর মাথার রুমাল ও জুব্বা অন্তর্ভুক্ত নয়।'

আবু বকর নিজের পরনের কাপড়ের দিকে ইশারা করে বললেন, 'আমাকে আমার পরনের কাপড় দিয়েই কাফন দিয়ো। এটাতে জাফরানের সামান্য দাগ আছে, কাফন দেওয়ার আগে ধুয়ে নিয়ো। এর সঙ্গে আর দুটো কাপড় যোগ করো।'

মুসলিম জাহানের শাসনকর্তা তাঁর কাফনের জন্য পুরোনো জামা বেছে নিলেন। কোনো আড়ম্বরতা নেই, কোনো লৌকিকতার বালাই নেই। একদম সাদামাটা বিদায়যাত্রার প্রস্তুতি। পিতার এমন কথা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল আয়েশার। তিনি বললেন, 'কিন্তু আপনার এ জামা তো পুরোনো!'

আবু বকর শ্লেষের হাসি হেসে বললেন, 'এই পুরোনো জামাতেই হয়ে যাবে। মৃতদের চেয়ে জীবিতদের নতুন কাপড়ের বেশি প্রয়োজন। কাফনের কাপড় তো মাটির অত্যাচারে একসময় নষ্টই হয়ে যাবে।'

www.pathagar.com

আয়েশার চোখ ছলছল করে উঠল।

আবু বকরের আরেকটি অন্তিম ইচ্ছা ছিল। তিনি চাচ্ছিলেন, রাসুলের পাশে যেন তাঁর কবর রচিত হয়। সারাটা জীবন যেভাবে তিনি রাসুলের সঙ্গে কাটিয়েছেন সকল হিরণ্ময় মুহূর্ত, মৃত্যুর পরও তিনি সেভাবেই রাসুলের পাশে থাকতে চান। মক্কার পীড়নক্লিষ্ট দিনগুলোতে, সাওর গুহার অন্ধকারে, উহুদ যুদ্ধের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ে তিনি যেভাবে রাসুলের ছায়াসঙ্গী হয়ে থেকেছেন, সেভাবে যেন মৃত্যুর পরও রাসুলের কবরসঙ্গী হতে পারেন।

তিনি কন্যা আয়েশার কাছে তাঁর ঘরে রাসুলের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হওয়ার আবেদন জানালেন। পিতার এমন আবেদনে আয়েশার না করার কোনো কারণ ছিল না। রাসুলের পর তিনিই তো ইসলামকে পুনরুজ্জীবন করেছেন। ইসলামের বিরুদ্ধে সকল বিদ্রোহ বজ্রকঠিন হাতে দমন করেছেন। রাসুলের অবিকল ছায়াছবি তিনি। তিনি যদি রাসুলের পাশে সমাহিত হওয়ার সুযোগ না পান, তাহলে পৃথিবীতে আর কে পাবে সে সুযোগ?

আবু বকরের মৃত্যুর পর তাঁকে আয়েশার ঘরে রাসুলের কবরের ডান পাশে সমাহিত করা হলো। আয়েশার স্বপ্নে দেখা দ্বিতীয় চাঁদ আজ খসে পড়ল তাঁর ভাঙা কুটিরে।

চল্লিশ

প্রথম খলিফা আবু বকরের পর দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ১০ বছর ইসলামি খেলাফতের শাসনকর্তা হিসেবে অধিষ্ঠিত রইলেন। ইসলামের বিজয় নাকারাকে তিনি আরব থেকে আফ্রিকা-ইউরোপ পর্যন্ত ছড়িয়ে দিলেন। যে ইসলাম হেরা গুহার অন্ধকারে বিভাসিত হয়েছিল 'ইকরা' ধ্বনির মাধ্যমে, তিনি সে ধ্বনিকে অর্ধেক পৃথিবীতে প্রতিধ্বনিত করলেন।

একাধারে ১০ বছর ইসলামি খেলাফতের সেবা করার পর তাঁরও সময় হয়ে এল প্রিয়তম বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার। এক ভোরে মসজিদে নববিতে ফজরের নামাজে ইমামতির সময় ফিরোজ নাহওয়ান্দি আবু লুলু নামের এক পার্সিয়ান গুপ্তঘাতক তাঁর পেটে বিষমাখা ছুরি দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে। পরপর ছয়বার আঘাতের ফলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। রক্তে ভেসে যেতে লাগল তাঁর চারপাশ। মসজিদে নামাজরত লোকজন তাঁকে ধরে তাঁর বাসভবনে নিয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

· গভীর আঘাত। বিষক্রিয়ার ফলে আঘাতের তীব্রতা আরও ব্যাপক হলো। তিনি বারবার অচেতন হয়ে যাচ্ছিলেন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বুঝতে পারছিলেন তাঁর সময় শেষ হয়ে আসছে। আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে খুব বেশি সময় বাকি নেই আর। তিনি কিছু একটা বলার জন্য উত্তেজিত হয়ে আছেন। এ সময় তিনি তাঁর ছেলে আবদুল্লাহকে কাছে ডাকলেন। তাঁকে বললেন, 'তুমি উম্মুল মুমিনিন আয়েশার কাছে যাও। তাঁর কাছে গিয়ে বলবে না যে, খলিফা উমর আমাকে পাঠিয়েছেন। বলবে, উমর ইবনে খাত্তাব আমাকে পাঠিয়েছেন। তাঁর কাছে আবেদন করবে–উমর তাঁর পূর্ববর্তী দুই বন্ধুর পাশে সমাহিত হতে চান।'

অর্ধেক পৃথিবীর শাসনকর্তা উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। অনেক আগে থেকেই তাঁর মনে এ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি খলিফা হওয়ার কারণে কখনো আয়েশার কাছে এমন আবেদন করতে পারেননি। হয়তো আয়েশা তাঁকে ভুল বুঝতে পারেন, উমর খলিফা হওয়ার কারণে এমন আবেদন করছেন। আয়েশা হয়তো খলিফার ক্ষমতার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তাঁকে অনুমতি দিয়ে দিতেন। কিন্তু উমর এমন ভয়েই সে সুযোগ কখনো নেননি। যখন মনে করলেন, তিনি এখন আর মুসলিম জাহানের খলিফা নন। তিনি মৃত্যুপথযাত্রী এক সামান্য মুসলিম মাত্র, তখনই তিনি আয়েশার কাছে এমন সৌভাগ্যের জন্য আবেদন করলেন।

পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমর আয়েশার কাছে গেলেন। আয়েশা উমরের ওপর মরণাঘাতের দুঃসংবাদ শুনেছেন। তিনি তাঁর জন্য রোদন করছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ এলেন। তিনি আয়েশার সামনে গিয়ে বললেন, 'উমর ইবনে খাত্তাব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রিয়তম দুই বন্ধুর পাশে সমাহিত হওয়ার আবেদন করেছেন আপনার কাছে।'

আয়েশা প্রথমে একটু থমকে গেলেন। কিন্তু ইসলামের জন্য উমরের ত্যাগ আর রাসুলের সঙ্গে তাঁর আন্তরিকতা মুহূর্তে তাঁকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্রতী করল। তিনি আবদুল্লাহকে বললেন, 'রাসুলের পাশের স্থানটি যদিও আমি নিজের জন্য মনে মনে নির্বাচন করে রেখেছিলাম, তবে উমরের জন্য সন্তুষ্টচিত্তে আমি তা ছেড়ে দিচ্ছি। এ ব্যাপারে উমরকে অগ্রাধিকার দিতে আমার কোনো দ্বিধা নেই।'

আবদুল্লাহ মরণশয্যায় শায়িত উমরের কাছে এসে আয়েশার সম্মতির কথা জানালেন। মৃত্যুযন্ত্রণা ভুলে উমরের চোখে-মুখে খুশির রেখা ফুটে উঠল। পরক্ষণেই তিনি আবদুল্লাহকে বললেন, 'আবদুল্লাহ, যদিও তিনি অনুমতি দিয়েছেন, তবু আমি মারা গেলে আমার লাশ নিয়ে উম্মুল মুমিনিনের ঘরের

www.pathagar.com

সামনে রেখে বলবে–খাত্তাবের ছেলে উমর আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছেন। যদি তিনি অনুমতি দেন, তাহলেই কেবল আমাকে তাঁর ঘরে রাসুলের বাম পাশে দাফন করো। আর যদি মনে করো তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন বা তাঁর মনে কোনো দ্বিধা কাজ করছে, তাহলে কোনোক্রমেই তাঁকে বাধ্য করবে না। এর পরিবর্তে আমাকে সাধারণ মানুষের কবরগাহে দাফন করবে। আমি এ বিষয়ে চিন্তিত যে, আমার খলিফা হওয়ার কারণ তাঁর অনুমতিলাভে কোনো প্রভাব ফেলেছে কি না।'

মৃত্যু পূর্ববর্তী সময়েও উম্মুল মুমিনিন আয়েশার প্রতি উমরের যে সম্মান এবং ভালোবাসা, এ এক নজিরবিহীন উপমা।

এর কিছু সময় পর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করলেন। পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমর আয়েশার সামনে এসে পিতার অসিয়ত অনুযায়ী সবকিছু খুলে বললেন। আয়েশা উমরের সম্মানবোধ এবং শ্রদ্ধার বিনয় দেখে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। আল্লাহর রাসুল তো এমন পরশপাথরই বিনির্মাণ করে গেছেন তাঁর ২৩ বছরের অক্লান্ত সাধনায়। উমর সে পরশধন্য মৃত্তিকারই এক অনুপম আধার।

আয়েশার নতুন করে বলার কিছু ছিল না, তিনি তাঁর পূর্বের কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন। আবদুল্লাহ এবং অন্য লোকজন মহামতি উমর ইবনে খাত্তাবকে তাঁর আজন্ম মুর্শিদ রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বাম পাশে সমাহিত করলেন। প্রিয় বন্ধুদের পাশে শুয়ে শেষনিদ্রায় ঘুমিয়ে গেলেন আধা জাহানের মুকুটহীন সম্রাট।

একচল্লিশ

খেলাফতে রাশেদার সময় দু-একজন সাহাবি বর্ণনা করতেন, কোনো নামাজির সামনে দিয়ে যদি কুকুর, গাধা বা কোনো নারী হেঁটে যায় তবে নামাজির নামাজ ভেঙে যাবে।

একদিন এ কথা শুনে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাগান্বিত হয়ে বলে ওঠলেন, 'আচ্ছা, তাহলে নারীও একটা ইতর প্রাণী! এ কেমন ইনসাফ তোমাদের, আমরা কুকুর আর গাধার সমতুল্য হয়ে গেলাম? আল্লাহর রাসুল নামাজ পড়তেন আর আমি তার সামনে শুয়ে থাকতাম।' তখন তো সমস্যা হত না!

এরপর তিনি এর বিপরীত ফতোয়া দিলেন–এমনটি ঘটলে নামাজ নষ্ট হবে না। অতঃপর তাঁর রায়ের ওপরই ফতোয়া নির্ধারিত হয়।

www.pathagar.com

মূলত তিনি যখন কোনো মাসয়ালার ব্যাপারে মতামত পেশ করতেন, তখন সমগ্র মুসলিম সালতানাতে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস পেত না কেউ। আবু হুরায়রা, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, আবু সায়িদ খুদরি, আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতো হাদিস বর্ণনাকারী ও ধর্মবিদ সাহাবিও তাঁর রায়কে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিতেন। তাঁর অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কাছে সকলেই ছিলেন নতজানু। একজন উম্মুল মুমিনিন হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন সে সময়কার বিজ্ঞ ধর্মবেত্তা।

আজকে নারী অধিকার নিয়ে মুসলিম রমণীরা বড় সঙ্কোচবোধ করেন, নিজেদের নিয়ে তাঁরা খুব হীনম্মন্যতায় ভোগেন। মুসলিম উম্মাহর সবচে বড় নারীবাদী ব্যক্তিত্বের নাম আয়েশা বিনতে আবু বকর। ধর্মীয় জ্ঞান ও বিদ্যায় নারীর অগ্রগতিতে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থকার তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা প্রায় ৫০ জন নারী বিদ্যার্থিনীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁরা বিভিন্ন সময় তাঁর কাছ থেকে ধর্মীয় বিষয়াদি শিক্ষালাভ করেন। ইমাম জুহরি ও হাসান বসরির মতো বিখ্যাত ইমামগণ তাঁদের কাছ থেকে হাদিস রপ্ত করেন।

এছাড়াও নারী অধিকার, নারীশিক্ষা, বিয়েতে কন্যার সম্মতি প্রদান, কুসংস্কারের মূলোৎপাটন, স্বামী ও পিতার সম্পত্তিতে নারীর অংশীদারিত্ব, নারীদের তালাক ও ইদ্দতসহ নানা বিষয়ে তিনি জোরগলায় কথা বলেছেন। রাসুলের সমগ্র জীবনের ভাষ্যকার হিসেবে তিনি ছিলেন মুসলিম উম্মাহর নারী অধিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ রোল মডেল। তাঁর জীবনী অধ্যয়ন করলে নারী অধিকারের আর কোনো স্লোগানের প্রয়োজন পড়ে না।

খেলাফতে রাশেদার সময়কালে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সম্মান ও ভালোবাসার পরশমণি হয়ে তিনি যাপন করছিলেন তাঁর নিরালা জীবন। মদিনায় মসজিদে নববির পাশে তাঁর ছোট্ট ঘরটি হয়ে ওঠেছিল সকলের জন্য আলোর আধার। উম্মতের মধ্যমণি হয়ে তিনি রাসুলের রেখে যাওয়া ইসলামকে আলোকিত করে তুলছিলেন পুরো মুসলিম বিশ্বে।

তবে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার জীবনের গভীর বেদনাময় অধ্যায় ছিল ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু নিহত হওয়ার পরবর্তী বিশৃঙ্খলার সময়টা। এ বিশৃঙ্খলা এক সময় এমন চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, উম্মতের অভিভাবক হিসেবে তাঁকে পর্দাঘেরা হুজরা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হয়। শুধু তাই নয়, বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ করার জন্য তাঁকে সেনাপতিবেশে যুদ্ধের ময়দানে পর্যন্ত লড়তে দেখা যায়।

www.pathagar.com

কিন্তু তিনি কখনোই নিজেকে বাইরের পৃথিবীর সামনে প্রদর্শন করতে আগ্রহী ছিলেন না। পরিস্থিতি তাঁকে বাধ্য করেছিল উটের হাওদায় চড়ে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত মহান মানুষের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা দিতে। পরবর্তী জীবনভর তিনি এ নিয়ে আফসোস করেছেন। যখন 'উটের যুদ্ধে'র কথা স্মরণ করতেন তখনই অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে অঝোরে কাঁদতেন। ইবনে সাদ লিখেছেন, 'তিনি আফসোস করে প্রায়ই বলতেন, 'হায়! আমি যদি গাছ হয়ে যেতাম, আমি যদি কোনো পাথর হয়ে যেতাম। আমি যদি সামান্য কোনো ইটের টুকরো হতাম। হায়! যদি আমি না-ই হতাম!!'

যত দিন বেঁচে ছিলেন, এই অনুতাপ তাঁকে প্রতিদিন পুড়িয়ে সোনার মতো খাঁটি করেছে। তিনি মৃত্যুর আগে স্বজনদের অসিয়ত করে যান, 'তোমরা আমাকে রওজা মুবারকে রাসুলের পাশে দাফন করো না। আমি রাসুলের অবর্তমানে একটি মস্ত অপরাধ করে ফেলেছি।'

জীবনে এক সময় ডাক এল ওপারের। ভাটার টানে তরী তখন তটে ভিড়বার জন্য অপেক্ষমাণ। সেই কিশোরীবেলার মাত্র দশটা বছর তিনি রাসুলের প্রেমে ভরে নিয়েছিলেন তাঁর ভালোবাসার অকূল পাথার, বাকি সারাটা জীবন তিনি কাটিয়ে দিয়েছিলেন সেই প্রেম সায়রে সাঁতার কেটে। প্রতিদিন কামনা করতেন রাসুলের সঙ্গে মিলিত হবার, ফের দুজন মিলে চন্দ্রালোকিত রাতে হাঁটবেন মদিনার অলি-গলিতে। অবশেষে এতোদিন পর তাঁর ডাক এল। রাসুলের প্রিয়তমা প্রস্তুত হলেন প্রিয়তম মুহাম্মদের সঙ্গে শুরু করতে আরেক জীবন।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি মদিনায় নিজ কুটিরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। অসংখ্য মানুষ সাক্ষাতের উদ্দেশে তাঁর দরজায় ভিড় করত। কেউ কুশল জিজ্ঞেস করলে হাসিমুখে বলার চেষ্টা করতেন, ভালো আছি।

এ সময় একদিন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। আয়েশা ইতস্তত করতে লাগলেন। ভয় ছিল, তিনি হয়তো এসেই তাঁর প্রশংসা শুরু করে দেবেন। কিন্তু বোনের ছেলেরা তাঁকে বুঝালেন, আপনি উম্মুল মুমিনিন, তিনি আপনাকে সালাম জানাতে এসেছেন। তিনি তখন বললেন, তোমরা যদি চাও তবে ডেকে আনো।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ভেতরে এলেন। উম্মুল মুমিনিনের ধারণা সত্য হলো। ইবনে আব্বাস বসেই বলতে শুরু করলেন, 'সেই ছোট্টকাল থেকেই আপনার নাম উম্মুল মুমিনিন। আপনি রাসুলের প্রিয়তমা স্ত্রী।

www.pathagar.com

তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আপনার দেহ থেকে প্রাণটি বের হওয়ার সময়টুকু শুধু অপেক্ষা। যে রাতে আপনার হারটি হারিয়ে যায়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পানি তালাশ করেন এবং লোকেরা পানি পেল না, তখন আপনার কারণেই আল্লাহ তায়ালা তায়াম্মুমের বিধান অবতীর্ণ করেন। আপনার নির্দোষিতা ও দোষমুক্তির কথা জিবরাইল সপ্তাকাশ থেকে নিয়ে এসেছেন। কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি মসজিদে পাঠ করা হবে এসব আয়াত...।'

ইবনে আব্বাস আরো কিছু বলতে চাইছিলেন। কিন্তু আয়েশা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ইবনে আব্বাস, আমাকে আপনি এই প্রশংসা থেকে ক্ষমা করুন। আমি কেবল এতটুকু চাই যে, আমার যদি অস্তিত্বই না হতো!'

সময় ফুরিয়ে আসছে। ১৩ জুন ৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দ, ৫৭/৫৮ হিজরি সনের রমজান মাসের ১৭ তারিখ। মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের শাসনকালের শেষ সময় চলছিল।

উম্মুল মুমিনিন বেশ কয়েকদিন থেকে অসুস্থ। রাতের বেলা অসুস্থতা আরো বেড়ে গেল। মসজিদে নববিতে আগত মুসল্লিরা এশার নামাজ শেষে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। বেতের নামাজ শেষ করে যখন সবাই মসজিদে থেকে বেরুতে যাবেন, এমন সময় আয়েশার হুজরা থেকে মৃত্যুসংবাদ গুঞ্জিয়ে ওঠল মদিনার বাতাসে। পুরো মদিনা স্তব্ধ হয়ে গেল নিমেষে। কান্নার রোল পড়ে গেল ঘরে ঘরে। রাসুলের প্রেমময় জীবনের অনিঃশেষ আলোকবর্তিকা নিভে গেল আজ নিশিবেলায়।

উম্মুল মুমিনিন মৃত্যুর আগে অসিয়ত করে গিয়েছিলেন, তাঁকে যেন রাসুলের অন্য স্ত্রীদের সঙ্গে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয় এবং কাফন-দাফনে যেন দেরি করা না হয়। যাতে লোকজন তাঁর জানাজা দেখতে না পারে। তাঁর কথা মতো এমনই করা হলো। রাতেই তাহাজ্জুদের সময় তাঁকে জান্নাতুল বাকিতে সমাহিত করা হয়।

রাতের বেলা হওয়া সত্ত্বেও জান্নাতুল বাকিতে এত লোকের সমাগম ঘটেছিল, এমন সমাগম এর আগে কখনো দেখা যায়নি। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু সে সময় মদিনার ভারপ্রাপ্ত গভর্নর ছিলেন। তিনি জানাজার নামাজ পড়ান। কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ ইবনে আতিক, উরওয়াহ ইবনে জুবায়ের এবং আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুম রাসুলের ভালোবাসার ছোট্ট পাখিকে মদিনার মাটির অতল অন্ধকারে শুইয়ে দেন।

www.pathagar.com

রাসুলের প্রিয়তমা আয়েশা ঘুমিয়ে গেলেন রাসুলের শহরে। ভালোবাসার চিরন্তন সিলমোহর পৃথিবীর বুকে এঁটে দিয়ে গেলেন। যা অনাগত উম্মতকে দিশা দিয়ে যাবে অনন্তকাল।

তিনি উম্মুল মুমিনিন আয়েশা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনি অমরাবতী। তিনি অবিস্মরণীয়।

এক নজরে

জন্ম: ৬১২/৬১৩ খ্রিষ্টাব্দ।

বিয়ে: বিয়ের সময় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স ছিল ৬ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ৫০।

বিবাহ সন: ৬২০ খ্রিষ্টাব্দ।

দাম্পত্যজীবন: রাসুলের সাথে তাঁর দাম্পত্যকাল ১০ বছর। (৯ বছর বয়সে স্বামীগৃহে আগমনের পর)

মৃত্যুসন: ১৩ জুন ৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৫৭/৫৮ হিজরি সনের রমজান মাসের ১৭ তারিখ ।

দাফন: মদিনার জান্নাতুল বাকিতে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩/৬৪ বছর।

www.pathagar.com

উম্মুল মুমিনিন

হাফসা বিনতে উমর অধ্যায়

রাদিয়াল্লাহু আনহা

এক

রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখনো নবুওয়াতপ্রাপ্ত হননি। মক্কায় একজন ভালো মানুষ হিসেবে বসবাস করছেন। মক্কার লোকজন তাঁর সত্যবাদিতা এবং সচ্চরিত্রের জন্য তাঁকে আল-আমিন বলে ডাকে। তিনি স্ত্রী খাদিজা এবং সন্তানদের নিয়ে নিরুপদ্রব জীবনযাপন করছিলেন সে সময়টাতে।

এ সময় মক্কার তীর্থস্থান কাবাঘর পুনর্নির্মাণ নিয়ে স্থানীয় গোত্রপতিদের মধ্যে একটা বিবাদ বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সংস্কার শেষে পবিত্র পাথর কাবাঘরে স্থাপন করবে কে, এ নিয়ে গোত্রপতিদের কোন্দল তুঙ্গে। কেউ কোনো সুরাহা দিতে পারছিল না। অবশেষে তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হলো–উপস্থিত ব্যক্তিরা ব্যতীত আগামীকাল সকালে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম কাবাঘরে আসবে, তার সিদ্ধান্তই মেনে নেওয়া হবে।

দেখা গেল, পরদিন সকালে সবার আগে কাবাঘরে এসেছেন তাদের সকলের প্রিয় আল-আমিন, মুহাম্মদ। সবাই তার শরণাপন্ন হলে তিনি পরামর্শ দেন–একটি বড় চাদর এনে সেটার মাঝখানে পবিত্র পাথর বসানো হোক। চাদরটির চারপাশে প্রতি গোত্রের একজন করে গোত্রপতি ধরে পাথরকে কাবার ভেতরে নিয়ে যাওয়া হোক। সকলেই তার এমন অভিনব সমাধানে যারপরনাই আনন্দিত হলো। পবিত্র পাথরকে চাদরের ওপর বসিয়ে সকলেই সেটাকে ধরে কাবার ভেতরে নিয়ে গেল এবং আল-আমিন সেটা নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে দিলেন।

মুহাম্মদের এমন বুদ্ধিমত্তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল সবাই।

www.pathagar.com

এ ঘটনা নবুওয়াতের পাঁচ বছর আগে ৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে। এ বছরই কুরাইশবীর উমর ইবনে খাত্তাবের ঔরসে জন্ম নেয় এক কন্যাসন্তান। এ কন্যাসন্তানের নাম রাখা হলো হাফসা। হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহা।

নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছর হাফসা তাঁর পিতা উমর ইবনে খাত্তাবের অনুপ্রেরণায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মদিনায় হিজরতের পূর্বে খোনায়েস ইবনে হোজাফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। খোনায়েসও বিয়ের আগেই মুসলমান হয়েছিলেন। ধর্ম রক্ষার্থে তিনি ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন এবং মদিনায় হিজরতের প্রাক্কালে ফিরে আসেন।

মদিনায় হিজরতের প্রাথমিক দলে হাফসা ও তাঁর স্বামী অংশগ্রহণ করেন। রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উমরসহ অধিকাংশ সাহাবিকে তিনি ও আবু বকর হিজরত করার কয়েক মাস আগে মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দেন।

মদিনায় হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর স্বামী খোনায়েসের সঙ্গে সংসার শুরু করেন। দ্বিতীয় হিজরিতে মদিনাজুড়ে বদর যুদ্ধের রণভেরী বেজে ওঠে। ইসলামের প্রথম যুদ্ধাভিযানে অংশ নিতে মদিনায় সাজ সাজ রব পড়ে যায়। সত্য ও মিথ্যার প্রথম সশস্ত্র জিহাদে শরিক হতে প্রত্যেক মুসলিম নিজেদের সর্বস্ব নিয়ে বদর প্রান্তরে সমবেত হন।

খোনায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহুও এ যুদ্ধাভিযানে অংশ নেন এবং বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে মারাত্মকভাবে আহত হন। আহত অবস্থায় তাঁকে মদিনায় নিয়ে আসা হয়। বেশ কিছুদিন মুমূর্ষু থেকে অবশেষে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁর জানাজা বহন করে কবরস্তানে নিয়ে যান।

হাফসা মাত্র ২২ বছর বয়সে বৈধব্যের বিরহে নিপতিত হলেন। জীবনের উষালগ্নে এমন বেদনাবিধুর অভিজ্ঞতা তাঁকে বিমর্ষ করে তোলে। মেয়ের এমন উন্মনা বিরহ দেখে পিতা উমরও চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়লেন। কোন বাবাই বা তাঁর মেয়ের এমন একাকিত্বের জীবন দেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে?

স্বামী শহিদ হওয়ার পর হাফসার ইদ্দতকালীন তিন মাস পূর্ণ হলো। পিতা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবার মেয়ের জন্য যোগ্য পাত্রের সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

www.pathagar.com

বদরের যুদ্ধের পরপর অসুস্থ অবস্থায় রাসুলের আদরের মেয়ে রোকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা ইন্তেকাল করেন। তিনি উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সহধর্মিণী ছিলেন। চমৎকার একটি জুটি ছিল। দুজনই ছিলেন লজ্জার ভূষণে আবৃত। একসঙ্গে সর্বপ্রথম হিজরত করেন ইথিওপিয়ায়, আবার একই সঙ্গে ইথিওপিয়া থেকে হিজরত করে আসেন মদিনায়। ভালোবাসায় টইটম্বুর ছিল তাঁদের সংসার। কিন্তু আল্লাহর ইশারায় এ জুটির একটি পাখি বেহেশতের সবুজ পাখিদের ভিড়ে মিশে গেলেন। বদরের যুদ্ধের পরপরই রোকাইয়া আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এলেন উসমানের কাছে। সদ্য গত হওয়া স্ত্রীর বেদনায় মুষড়ে পড়া উসমানের যাতনা কিছুটা হলেও উপশম করার নিমিত্তে তিনি তাঁর মেয়ে হাফসার নাম প্রস্তাব করলেন বিয়ের জন্য। উসমান হ্যাঁ বা না কোনো উত্তর না দিয়ে জানালেন, এখন তিনি বিয়ে নিয়ে ভাবছেন না। যদি মনস্থির করেন, তখন এ বিষয়ে ভাববেন।

উসমানের পক্ষ থেকে একপ্রকার না-সূচক উত্তর পেলেন উমর ফারুক। তিনি মনঃক্ষুণ্ন হয়ে প্রিয় বন্ধু আবু বকরের কাছে এলেন। তাঁকেও একই প্রস্তাব দিলেন। তিনি হ্যাঁ বা না কোনো উত্তর না দিয়ে এ বিষয়ে বরং চুপ থাকলেন। আবু বকরের এমন আচরণে উমরের মনোবেদনা আরও তীব্র হলো। তিনি নিজের মনঃকষ্টের কথা কিছুটা হালকা করতে রাসুলের কাছে এলেন।

রাসুলের কাছে এসে উসমান ও আবু বকর তাঁর সঙ্গে কেমন বিমাতাসুলভ আচরণ করেছেন, সে ব্যাপারে অনুযোগ করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হয়তো এমন প্রস্তাবের জন্যই প্রতীক্ষিত ছিলেন।

রাসুলের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক হোক–এমন আকাঙ্ক্ষা অনেকেই করতেন। কিন্তু ঐশী ইশারা ছাড়া রাসুল কারও সঙ্গে আত্মীয়তা করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতেন না।

উমর ইবনে খাত্তাব রাসুলের অন্যতম প্রিয় বন্ধু এবং অত্যন্ত উঁচু মাপের সাহাবি। যদিও আবু বকরের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না, কিন্তু আবু বকরের পরে যদি কারও নাম উচ্চারিত হয়, তবে তিনি উমর। সে হিসেবে উমরও মনে মনে কামনা করতেন তাঁর সঙ্গে রাসুলের একটা আত্মীয়তার বন্ধন হোক। যেমন আবু বকর-তনয়া আয়েশাকে নিজের বধূ করে তিনি তাঁকে সম্মানিত করেছেন। কিন্তু উমর এমন কথা কখনো সরাসরি রাসুলের সামনে বলতে পারেন না, যদি না রাসুল নিজ থেকে কখনো আগ্রহ প্রকাশ করেন।

www.pathagar.com

উমরের মুখ থেকে উসমান ও আবু বকরের ব্যাপারে অনুযোগ শুনে রাসুল বললেন, 'তাদের আচরণে কষ্ট নিয়ো না। আমি হাফসার জন্য উসমান ও আবু বকরের চেয়ে উত্তম পাত্রের ব্যবস্থা করব এবং উসমানের জন্যও হাফসার চেয়ে উত্তম পাত্রীর ব্যবস্থা করে দেব।'

এর পরই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উমরের কাছে তাঁর মেয়ে হাফসাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পেশ করেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যান। বস্তুত উমরের জন্য এর চেয়ে উত্তম কোনো প্রস্তাব আর হতে পারে না। এবং রাসুল তাঁর আরেক কন্যা উম্মে কুলসুমকে উসমানের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানান।

তৃতীয় হিজরির শাবান মাস মোতাবেক ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উমর-তনয়া হাফসাকে বিয়ে করে নিজ ঘরে তুলে আনেন। এ বিয়ের মোহর নির্ধারণ করা হয়েছিল ৪০০ দিরহাম।

বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর আবু বকর উমরকে ডেকে বলেন, 'আপনার প্রস্তাবে তখন আমি সম্মত হইনি বলে আপনি হয়তো আমার ওপর রাগ করেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে রাসুলের মনোভাব কিছুটা হলেও আমি আগে থেকেই আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। এ কারণে আপনার প্রস্তাব পেয়েও চুপ থাকি। কথাটা আপনাকে তখন বলতে পারিনি, কেননা রাসুল নিজ থেকে তখনো কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেননি কারও কাছে।'

দুই

রাসুলের সঙ্গে হাফসার বিয়ের সময় তাঁর ঘরে সাওদা ও আয়েশা আগে থেকেই স্ত্রী হিসেবে ছিলেন। সাওদা নববধূকে নিজেদের আঙিনায় বরণ করে নেন। আয়েশাও নিপাট হৃদয়ে হাফসাকে রাসুলের পরিবারে স্বাগত জানান বটে, কিন্তু পরবর্তী প্রায় এক বছর আয়েশা হাফসার সঙ্গে মন খুলে খুব একটা মিশতে পারেননি। তবে বছরখানেক যাওয়ার পর হাফসা তাঁর নিজ গুণে আয়েশার অন্তরঙ্গ বান্ধবীতে পরিণত হন। শুধু তা-ই নয়, হাফসা তাঁর সবচেয়ে কাছের বন্ধুতে রূপান্তরিত হন। সকল কাজকর্ম এবং সলাপরামর্শ এ দুজন মিলে করতেন।

পিতা-মাতা উভয় দিক থেকে হাফসা ছিলেন বিদূষী, প্রজ্ঞা ও মননে উন্নত, মতপ্রকাশে স্বাধীনচেতা। সর্বোপরি তিনি ছিলেন তাঁর পিতার সরাসরি

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত। যেকোনো বিষয়ে তাঁর পিতা তাঁকে উপদেশ দিতেন এবং সঠিক পথে পরিচালনার সবক শেখাতেন। তিনিও তাঁর পিতার একান্ত বাধ্যগত কন্যা ছিলেন।

জাহেলিয়াতের যুগে আরবের মেয়েদের কোনো প্রকার ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল না। এ তো ছিল সেই যুগ, যে যুগে কন্যাসন্তানকে অপমানের নিদর্শন বলে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো। কোনো বিষয়ে তাঁরা কোনো মতামত দিতে পারত না। বৈষয়িক হোক বা সাংসারিক, পুরুষেরা তাদের মতামতের কোনো গুরুত্ব দিত না। কিন্তু মদিনায় হিজরতের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নারীদের যথেষ্ট মর্যাদা দিতে শুরু করেন এবং নানা বিষয়ে তাঁদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁর অনুসারীদের পরামর্শ দেন।

এর ফলে মদিনায় এসে অঙ্কুরোদ্গম শুরু হয়েছিল আরবের নারীস্বাধীনতার। বিশেষত, উম্মুল মুমিনিনরা ছিলেন এ নারীস্বাধীনতার অগ্রদূত। ব্যক্তিস্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নারীশিক্ষা, ধর্মীয় বিষয়ে সমাধান প্রদান–এমন নানা বিষয়ে তাঁরা কথা বলার অধিকার সংরক্ষণ শুরু করেন। আর এসবই হয়েছিল রাসুলের সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘর। তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। স্ত্রী জয়নব বিনতে মাজউন উমরের কথার পিঠে কথা বলে কিছুটা তর্কও করছিলেন, যা ছিল উমরের জন্য একেবারেই নতুন অভিজ্ঞতা। মক্কায় থাকাকালে তিনি কখনো এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হননি। কেননা মক্কার কোনো নারী স্বামীর মুখের ওপর কথা বলবে–এমন চিন্তা করাটা ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার।

তিনি স্ত্রীর মুখে এমন তর্কপ্রিয় কথা শুনে বললেন, আগে তো তুমি এমন ছিলে না। কোন জিনিস তোমাকে এমন কাজে উদ্বুদ্ধ করল?

জয়নব বিনতে মাজউন উত্তর দিলেন, কেন নয়? রাসুলের স্ত্রীরা তো রাসুলের সঙ্গে তর্ক করে থাকেন, ঘরোয়া বিষয়ে তাঁদের মতামত প্রকাশ করে থাকেন। রাসুল কখনো তাঁদের শাসন করেন না। রাসুল তাঁদের কথা বলার স্বাধীনতা দেন।

উমর এ কথা শুনে ঘাবড়ে গেলেন–উম্মুল মুমিনিনরা রাসুলের সঙ্গে তর্ক করেন? তাঁর মেয়েও রাসুলের মুখের ওপর কথা বলে? তিনি আর দেরি করলেন না, তখনই হাফসার ঘরে চলে এলেন। এসে হাফসাকে জিজ্ঞেস করলেন,

www.pathagar.com

'হাফসা, তোমরা উম্মুল মুমিনিনরা কি রাসুলের সঙ্গে তর্ক করো, যার কারণে রাসুল চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে রাত পার করেন?'

হাফসা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, রাসুলের স্ত্রীগণ এমনটি করে থাকেন কখনো কখনো।'

এ কথা শুনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যারপরনাই ব্যথিত হলেন। মেয়েকে শাসিয়ে বললেন, 'মনে রেখো, এর পরিণতিতে তুমি গভীর সংকটে পড়ে যাবে। আল্লাহর রাসুলের মনোবেদনার কারণে কখনো আল্লাহ যদি তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে তোমার জীবন বরবাদ করে দেন, তখন নিজেকে দোষী ভাবা ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না। কখনো আল্লাহর রাসুলের কাছে এমন কোনো জিনিসের কামনা করবে না, যা তিনি অপছন্দ করেন, কখনো তাঁর সঙ্গে তর্ক করবে না, সাংসারিক কোনো বিষয় নিয়ে কখনো তাঁর মনে কষ্ট দেবে না। তোমার কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে আমার কাছে চাইবে, আমি তোমার অভাব পূরণ করার চেষ্টা করব।'

হাফসার মেজাজ কিছুটা উষ্ণ ছিল। কখনো কখনো তিনি রাগতস্বরে কথা বলে উঠতেন। এ নিয়েও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মেয়েকে কড়াভাবে শাসন করতেন। একদিন এমন পরিস্থিতিতে তিনি মেয়েকে বলছিলেন, 'শোনো মেয়ে! আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে এমন কোনো ধৃষ্টতা করো না, যাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। আল্লাহ চাইলে তিনি রাসুলকে তোমার চেয়েও অনেক ভালো মেয়ে অর্পণ করতে পারেন। তখন তোমার জীবন ঘোর অমানিশায় পতিত হয়ে যাবে।'

হাফসার মাধ্যমে রাসুল যেন কোনো কষ্ট না পান, এ ব্যাপারে উমর সর্বদা সচেতন থাকতেন।

জয়নব বিনতে জাহাশের ঘরে রাসুলের মধুর শরবত পান করার ঘটনা এবং প্রয়োজনীয় ভাতা বৃদ্ধির ব্যাপারে অন্য স্ত্রীদের দাবিদাওয়ার ঘটনা 'আয়েশা অধ্যায়ে' বর্ণিত হয়েছে। এ দুটো ঘটনাতেই হাফসার উল্লেখ রয়েছে। তবে রাসুলের একটি গোপন কথা প্রকাশ করার ঘটনায় তিনি বিশেষভাবে আলোচিত হন এবং আল-কুরআনে সুরা তাহরিমে এমন কাজের জন্য ভর্ৎসনা করা হয়।

ঘটনা ছিল–কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাফসাকে অবহিত করেন এবং তাঁকে বলে দেন, তিনি যেন কারও কাছে এ গোপন তথ্য প্রকাশ না করেন। রাসুলের ভরসা ছিল, হাফসা গোপন কথাটি কাউকে বলবেন না। কিন্তু আয়েশা যেহেতু তাঁর অন্তরঙ্গ বান্ধবী ছিলেন

www.pathagar.com

এবং তিনি তাঁকে বিশ্বাস করতেন, ফলে তিনি আয়েশার কাছে গোপন তথ্যটি প্রকাশ করে দেন।

তথ্যটি প্রকাশ করে দিলে আল্লাহ ওহির মাধ্যমে তা রাসুলকে অবহিত করেন। হাফসার এমন আচরণে রাসুল মনঃক্ষুণ্ন হন। তিনি হাফসার কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি অবাক হয়ে যান–বিষয়টি রাসুল কীভাবে জানতে পারলেন? কেননা একমাত্র আয়েশা ছাড়া পৃথিবীতে এ কথা আর কেউ জানে না এবং আয়েশা এ গোপন কথা কাউকে বলবেন না বলেই তাঁর বিশ্বাস। তখন আল্লাহর রাসুল সুরা তাহরিমের ভর্ৎসনামূলক আয়াতগুলো পড়ে শোনান।

গোপন কথাটি কী ছিল, এ নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো বিবরণ হাদিস, ইতিহাস বা রাসুলের জীবনচরিতে পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন হাদিস ও ইতিহাস বিচার করে হাদিসবেত্তা ও ইতিহাসবিদগণ মোটামুটি তিনটি বিষয় উল্লেখ করে থাকেন, যা রাসুল হাফসাকে গোপন রাখতে বলেছিলেন।

এক. জয়নবের ঘরে মধুপানের বিষয়টি। যখন হাফসা রাসুলকে বললেন যে, জয়নবের ঘর থেকে পান করে আসা মধুর শরবতে সম্ভবত 'মাগাফির' (একপ্রকার ঝাঁজ ও দুর্গন্ধযুক্ত ফুল, যা থেকে মৌমাছি মধু আহরণ করে) মিশ্রিত মধু ছিল, এ কারণে দুর্গন্ধ আসছে। তখন রাসুল এ বিষয়টি কারও কাছে প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। কেননা কথাটি যদি জয়নবের কানে যায়, তবে তিনি নিতান্ত কষ্ট পাবেন। স্ত্রীদের মধ্যে এ নিয়ে মনোমালিন্যও হতে পারে। এসব থেকে বেঁচে থাকার জন্য তিনি বিষয়টি গোপন রাখার কথা বলেছিলেন। যদিও মধুতে কোনো রকম দুর্গন্ধ ছিল না।

দুই. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাফসার অবর্তমানে তাঁর ঘরে রাসুলের মিসরীয় ক্রীতদাসী মারিয়াকে নিয়ে সময় কাটিয়েছিলেন। এ বিষয়টি হাফসা জানতে পেরে যারপরনাই রাগান্বিত হন। তখন রাসুল হাফসাকে প্রবোধ দিতে প্রতিজ্ঞা করেন–আর কখনো তিনি মারিয়ার সঙ্গে উপগত হবেন না। তবে মারিয়ার সঙ্গে আর উপগত না হওয়ার প্রতিজ্ঞাটি যেন হাফসা গোপন রাখেন।

যদিও এটা দোষণীয় কিছু ছিল না, তবু প্রকাশিত হলে নানাজনে নানা কথা বলার সুযোগ পেত। যার দরুন রাসুল এটিকে গোপন রাখতে বলেছিলেন। কিন্তু হাফসা বিষয়টি গোপন না রেখে আয়েশার কাছে বলে দেন।

স্ত্রীর সম্মান রক্ষার জন্য যখন রাসুল একটি হালাল বিষয়কে নিজের জন্য হারাম বলে প্রতিজ্ঞা করেন (ক্রীতদাসী মারিয়ার সঙ্গে উপগত না হওয়ার প্রতিজ্ঞা), তখন আল্লাহ তায়ালা সুরা তাহরিমে রাসুলের স্ত্রীদের ভর্ৎসনা করেন এবং রাসুলকে হালাল বিষয় হারাম করার ব্যাপারে সতর্ক করে দেন।

www.pathagar.com

তিন. রাসুলের তিরোধানের পর পর্যায়ক্রমে আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ইসলামি খেলাফতের খলিফা হবেন–এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী রাসুল হাফসার কাছে প্রকাশ করেন এবং তা কারও কাছে বলতে নিষেধ করেন। কিন্তু হাফসা তা প্রকাশ করে দেন।

কারণ যা-ই হোক, রাসুলের সাবধানবাণী তোয়াক্কা না করে গোপন বিষয় প্রকাশ করার কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হন এবং সংশোধনের নিমিত্তে হাফসাকে অন্তর্বর্তীকালীন (এক) তালাক প্রদান করেন।

হাফসার জন্য এটা অত্যন্ত বেদনার বিষয় ছিল। তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে তাঁর পিতার কাছে চলে যান। তাঁর পিতা উমরও মেয়ের এমন আচরণে যথেষ্ট বিব্রত হন এবং ক্ষোভে নিজের কপালে আঘাত করতে থাকেন। তিনি মেয়েকে সংশোধনের জন্য বলেন, 'রাসুলের কাছে আবু বকর এবং আয়েশার বিপরীতে আমার এবং তোমার অবস্থান কখনোই সমকক্ষ মনে করো না। এই বোধ যেন কখনো তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।'

এ ঘটনার কিছুকাল পর জিবরাইল ওহি নিয়ে অবতীর্ণ হন এবং রাসুলকে অবহিত করেন, উম্মুল মুমিনিন হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে যেন ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কেননা, তিনি রাতভর নামাজ পড়েন এবং দিনের বেলা রোজা রাখেন। আল্লাহর কাছে তাঁর এ আমল অত্যন্ত প্রিয়। শুধু তা-ই নয়, হাফসা বেহেশতেও আপনার স্ত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন করবেন। পৃথিবীতে থাকাবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে বেহেশতে রাসুলের সঙ্গিনী হওয়ার সুসংবাদ কেবল তিনিই পেয়েছিলেন। তিনি এ সৌভাগ্যের হকদার ছিলেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে এ নির্দেশনার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাফসার অন্তর্বর্তীকালীন তালাক ফিরিয়ে নেন।

এখানে হাফসা ও রাসুলের দাম্পত্যজীবন থেকে অনন্য একটি বিষয় শিক্ষণীয় রয়েছে। হয়তো অনেকের স্ত্রী এমন আছেন, যাঁর রাগ বেশি বা অন্য দোষণীয় কোনো স্বভাবদোষে দুষ্ট। যার ফলে স্বামী স্ত্রীর প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে তাঁকে তালাক দেওয়ার কথা ভাবতে বাধ্য হন অথবা কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে ইচ্ছা পোষণ করেন।

রাসুলের অবস্থাও ঠিক এমনই ছিল। কিন্তু আল্লাহ জিবরাইলকে পাঠিয়ে রাসুলকে অবহিত করলেন–হয়তো হাফসার মধ্যে রাগী মনোভাব, কথা রক্ষা না করার প্রবণতা বিদ্যমান। কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন কিছু সদ্গুণ রয়েছে, যার বদৌলতে তিনি বেহেশতে আপনার সঙ্গিনী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

www.pathagar.com

বিষয়টি হলো ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দ স্বভাব রয়েছে। দাম্পত্যজীবনে স্বামী যদি কেবল স্ত্রীর মন্দ স্বভাবটি নিয়েই হা-হুতাশ করে, তার চারিত্রিক মন্দ গুণের কথা মানুষের কাছে বলে বেড়ায়, তবে সে সংসারে শান্তি চিরদিনের জন্য তিরোহিত হয়ে যাবে। স্বামীর উচিত স্ত্রীর ভালো গুণ খুঁজে বের করা এবং সেগুলোর প্রশংসা করা। প্রশংসা এবং প্রেরণা মানুষকে বদলে যেতে উৎসাহ দেয়। অন্ধকারকে অন্ধকার কখনো বিদূরিত করতে পারে না, অন্ধকার দূর করার জন্য প্রয়োজন আলোর উদ্ভাসন। মন্দ স্বভাবকে কখনো গালমন্দ দিয়ে দূর করা যায় না, ভালোবাসার আলো দিয়েই তা দূর করতে হয়।

হাফসার বিষয়টিই দেখা যেতে পারে। তাঁর প্রাত্যহিক আমলে আল্লাহ এতটাই খুশি হয়েছেন যে, তাঁর পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্য স্বয়ং জিবরাইলকে পাঠিয়ে দিয়েছেন!

এভাবেই স্ত্রীর মন্দ কাজ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার বদলে তাঁর ভালো কাজ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করলে অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে।

তিন

অন্য অনেকের চেয়ে হাফসার মধ্যে জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা ছিল প্রবল। ধর্মীয় বিষয়ে অনেক কিছুই তিনি রাসুলের কাছ থেকে জেনে নিতেন। আবার কোনো বিষয়ে খটকা লাগলে সেটাও নিঃসংকোচে জিজ্ঞেস করতেন।

একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাফসার সামনে বসে কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন, 'বদর ও হোদাইবিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিরা দোজখের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে না।'

রাসুলের এ কথা শুনে হাফসা জানতে চাইলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! কিন্তু আল্লাহ তো বলেছেন, 'তোমরা প্রত্যেকে জাহান্নামে নতজানু হয়ে উপস্থিত হবে!'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাফসার এমন প্রত্যুৎপন্নমতি জিজ্ঞাসা শুনে হাসিমুখে বললেন, 'কিন্তু আল্লাহ তো পরের আয়াতেই বলেছেন, 'অতঃপর আমি খোদাভীরুদের মুক্তিদান করব এবং অত্যাচারীদের নতজানু অবস্থায় দোজখে নিক্ষেপ করব।'

এসব ধর্মীয় বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে হাফসা বরাবরই অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। জ্ঞানার্জনে তাঁর এমন আগ্রহ দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর

www.pathagar.com

জন্য শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেন। শাফা বিনতে আবদুল্লাহ আদাওয়্যা নামের এক শিক্ষিত নারীকে তাঁর শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেন। এ নারীর তত্ত্বাবধানে থেকে তিনি লিখতে-পড়তে এবং চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। ফলে আরবের মধ্যে অল্প যে কজন নারী লিখতে-পড়তে জানতেন, হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন তাঁদের একজন।

স্বাভাবিকভাবেই স্মরণযোগ্য, রাসুল সেই সময়টাতে হাফসার শিক্ষার জন্য আলাদা শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছিলেন, যখন আরবে মেয়েদের জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো, মেয়েদের পরিবারে অলক্ষ্মী মনে করা হতো এবং পিতার জন্য তাঁরা একপ্রকার বোঝা হিসেবে বিবেচিত হতো। শুধু তা-ই নয়, নারীদের সে সমাজে সন্তান উৎপাদনের একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই মনে করা হতো না। সে সময় রাসুল নিজ স্ত্রীর মধ্যে জ্ঞান-অনুসন্ধিৎসা লক্ষ করে তাঁকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব হাতে নিলেন। তিনি নিজে একজন নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও নারীশিক্ষার ব্যাপারে যে উদারতার পরিচয় দিলেন, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য এ ছিল এক বিশাল উপমা।

আজ যখন অনেক শিক্ষিত লোকজন প্রশ্ন করেন–ইসলাম নারীকে গৃহবন্দী করে রাখে, নারীর নারীত্বকে প্রস্ফুটিত হতে দেয় না, নারীকে মানুষ হিসেবে গণ্য করে না; তাঁদের উচিত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার জীবনের এই অধ্যায় থেকে সত্য উদ্ঘাটন করে শিক্ষা গ্রহণ করা।

হাফসা আরবি ভাষায় বিজ্ঞতা অর্জন করার কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এক বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। আল-কুরআনের অবতীর্ণ সুরাগুলো কাগজ, চামড়া, কাঠ, পাথরসহ বিভিন্ন মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করে রাসুল সেগুলো হাফসার তত্ত্বাবধানে সংরক্ষণ করেন। হাফসার প্রতি বিশ্বাসের প্রগাঢ়তা ছিল বলেই রাসুল তাঁর কাছে এমন মহামূল্যবান ঐশী দলিল সংরক্ষণ করার জন্য দিয়েছিলেন।

রাসুলের মৃত্যুর পরও সেগুলো তাঁর সংরক্ষণে ছিল। আবু বকর তাঁর খেলাফতকালে যখন পুরো কুরআন একীভূত করার উদ্যোগ নেন, তখন হাফসা তাঁর সংরক্ষিত অংশ আবু বকরের কাছে অর্পণ করেন। আবু বকর কাজ অসমাপ্ত রেখেই মৃত্যুবরণ করলে দ্বিতীয় খলিফা উমর এ সংস্কারকাজে হাত দেন।

তিনি শাহাদাতবরণ করলে দীর্ঘদিন কুরআনের এ সংকলিত কপি হাফসার তত্ত্বাবধানে থাকে, যে পর্যন্ত না উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খেলাফতকালে

www.pathagar.com

পুরো কুরআনকে একক সংস্করণে একীভূত করেন। তাঁর এ কপি থেকেই পরবর্তী সময়ে সমগ্র মুসলিমবিশ্বে কুরআন কপি করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

পার্থিব সম্পদ ও ভোগবিলাসের প্রতি হাফসা বরাবরই অনাগ্রহী ছিলেন। খুব সীমিত অর্থে জীবনযাপন করতেন। রাসুল এবং প্রথম খলিফা আবু বকরের পরলোকগমনের পর তাঁর পিতা উমর যখন খলিফা নির্বাচিত হন, তখনো তিনি অতি সাধারণ জীবনযাপন করতেন। রাসুল কর্তৃক খায়বারে তাঁকে আলাদা জায়গির প্রদান করা হয়েছিল। সেখান থেকে যা আয় হতো, তার নির্দিষ্ট পরিমাণ নিজের জন্য রেখে পুরোটা গরিব-দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন।

মৃত্যুর আগে হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর আপন ভাই আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে ডেকে পাঠান এবং খায়বারের গাবাতে অবস্থিত তাঁর জায়গির আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়ে যান।

উম্মুল মুমিনিন হাফসা বিনতে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহা মোট ৬০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। মুসলিম শরিফে তাঁর ১০টি হাদিস গ্রহণ করা হয়েছে, বুখারি ও মুসলিমে সমন্বিতভাবে ৪টি হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে, মুসনাদে আহমদে ৪৪টি হাদিস গ্রহণ করা হয়েছে।

হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা ৪১ হিজরি সনে ৬০ বছর বয়সে দুনিয়ার সকল পাট চুকিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যের আশায় পরলোকগমন করেন। এ সময় মুসলিম সালাতানাতের খলিফা ছিলেন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু। তৎকালীন মদিনার গভর্নর মারওয়ান ইবনে হাকাম তাঁর জানাজা পড়ান। জানাজা শেষে তিনি খাটিয়া কাঁধে করে কিছুদূর নিয়ে যান। তারপর আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খাটিয়া বহন করেন।

হাফসার আপন ভাই আবদুল্লাহ ইবনে উমর এবং তাঁর ছেলে আসেম, সালেম, আবদুল্লাহ, হামজা নববি আলোয় আলোকিত এই বেহেশতি চেরাগকে মাটির বিছানায় শুইয়ে দেন।

মুমিনজননী হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার কোনো সন্তান ছিল না।

www.pathagar.com

এক নজরে

জন্মঃ ৬০৫ খ্রিষ্টাব্দ।

বিয়েঃ বিয়ের সময় হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স ছিল ২২ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ৫৫।

বিবাহঃ ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি মাস মোতাবেক তৃতীয় হিজরির শাবান মাস।

দাম্পত্যজীবনঃ রাসুলের সাথে দাম্পত্যকাল ৮ বছর।

মৃত্যুঃ ৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর/নভেম্বর মোতাবেক ৪১/৪২/৪৫ হিজরি।

দাফনঃ মদিনার জান্নাতুল বাকিতে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯/৬০ বছর।

www.pathagar.com

উম্মুল মুমিনিন
জয়নব বিনতে খোজায়মা অধ্যায়
রাদিয়াল্লাহু আনহা

এক

তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন 'উম্মুল মাসাকিন' দীন-দুঃখীদের জননী নামে। উম্মুল মুমিনিন জয়নব বিনতে খোজায়মা রাদিয়াল্লাহু আনহা। খুব অল্প সময় তিনি রাসুলের স্ত্রী হিসেবে পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন। রাসুলের স্বল্প সান্নিধ্যে তিনি অর্জন করেছেন ইতিহাসের এক অমর অধ্যায়। সিরাতবিদ ও ইতিহাসবেত্তাদের নির্ণয়মতে, রাসুলের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যজীবন ছিল দুই মাস অথবা তিন মাস। এ সংক্ষিপ্ত দাম্পত্যজীবনের বিনিময়ে তিনি অর্জন করেন 'উম্মুল মুমিনিন', 'বিশ্বাসীদের জননী' উপাধি। চৌদ্দ শ বছর ধরে তাঁর আলোচনা পৃথিবীর সর্বত্র আলোচিত হয়ে আসছে। ইসলাম যত দিন থাকবে, তত দিন তাঁর নামও উচ্চারিত হতে থাকবে ইসলামবিশ্বাসী মানুষের হৃদয় জিকিরগাহে।

উহুদের প্রান্তর। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। একদিকে পৌত্তলিক দেবতায় বিশ্বাসী মক্কার কুরাইশবাহিনী, অন্যদিকে এক আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী মদিনার মুসলিমগণ। তাদের সেনানায়ক স্বয়ং রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

যুদ্ধের নাকারা বেজে উঠেছে। তুমুল লড়াই চলছে ময়দানজুড়ে। একদিক থেকে এক মুসলিম বীরকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তিনি যুদ্ধের ময়দানের এক পাশে দাঁড়িয়ে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে দোয়া করছিলেন :

'হে ভূমণ্ডলের স্রষ্টা! এ যুদ্ধে আমি যেন কোনো ক্রোধান্ধ সাহসী শত্রুর সম্মুখীন হই। আমি যেন তার হাতে শহিদ হই। সে যেন আমার ঠোঁট, কান,

www.pathagar.com

নাক কেটে নেয়। শহিদ হওয়ার পর এভাবে নাক, কান, ঠোঁট কাটা অবস্থায় আমি তোমার সামনে দণ্ডায়মান হব এবং তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে–তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেন এভাবে কর্তিত হয়েছে? আমি জবাব দেব, হে আমার মওলা! শুধু তোমার ও তোমার রাসুলের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে।'

এই বীরের নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি জয়নব বিনতে খোজায়মার স্বামী। এ মুসলিম বীর আল্লাহর কাছে দোয়া করে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে তাঁর তলোয়ার ভেঙে দুই টুকরো হয়ে গেল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহর হাতে একটি খেজুরের ডাল ধরিয়ে দিলেন। তিনি সেটি নিয়ে আবার যুদ্ধে নেমে গেলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে বীর বিক্রমে শহিদের সৌভাগ্যবান তালিকায় নাম লেখালেন। শহিদ হওয়ার পর সত্যি সত্যি কুরাইশরা তাঁর নাক, কান, ঠোঁট কেটে ফেলে। এভাবেই রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে দাফন করা হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাসুলের ফুফাতো ভাই এবং রাসুলের পরবর্তী স্ত্রী জয়নব বিনতে জাহাশের আপন ভাই ছিলেন।

স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের শাহাদাতের পর জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। এর প্রধান কারণ ছিল, মুসলিম হওয়ার কারণে তিনি তাঁর পরিবার ও গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নজদ অঞ্চলের সুলাইম গোত্রের মেয়ে ছিলেন। বিবাহসূত্রে তিনি মক্কায় আসেন এবং ইসলাম ধর্মে মুগ্ধ হয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর পরিবার এবং গোত্র তাঁর এ ইসলাম গ্রহণকে ভালো চোখে দেখেনি। তারা তাঁর সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান বলবৎ রাখে।

রাসুলের নির্দেশে তিনি ও তাঁর স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ মদিনায় হিজরত করেন। আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ বদরের যুদ্ধেও অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। অবশেষে উহুদের যুদ্ধে তিনি শাহাদাত লাভে ধন্য হন।

স্বামীর শাহাদাতের পর তিনি মদিনাতেই অবস্থান করতে থাকেন। তবে পরিবার ও গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুন দারিদ্র্যে নিপতিত হন। এ অবস্থায় আল্লাহর রাসুল তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। জয়নব রাসুলের প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলে তাঁর ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তৃতীয় হিজরির জিলহজ মাসের শেষ দিকে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর বিয়ের মোহর নির্ধারণ করা হয় ৪০০ দিরহাম।

www.pathagar.com

এ বিয়ের তিনটি প্রধান কারণ ছিল। প্রথমত, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাসুলের ফুফাতো ভাই ছিলেন এবং মক্কার বিশিষ্ট প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান ছিলেন। ইসলামের জন্য তাঁর আত্মত্যাগও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এ কারণে শাহাদাতের পর তাঁর স্ত্রীকে সম্মানিত করার অভিপ্রায়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জয়নবের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান।

দ্বিতীয়ত, জয়নব আগে থেকেই 'উম্মুল মাসাকিন' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। গরিব-দুঃখীদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ার্দ্র। তাঁর কাছে কেউ কিছু চেয়ে কখনো খালি হাতে ফিরে যেত না। ইসলাম গ্রহণের পরও তাঁর এ চারিত্রিক মহানুভবতা বজায় ছিল। স্বামীর শাহাদাতের পর তিনি একপ্রকার নিঃসম্বল হয়ে পড়েন। তাঁর এমন চারিত্রিক উৎকর্ষ যেন বজায় থাকে এবং মুসলিমদের মাঝে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে, এ কারণে রাসুল তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে উদ্বুদ্ধ হন।

তৃতীয় কারণটি অবশ্য রাজনৈতিক। জয়নব বিনতে খোজায়মার পিতার সুলাইম গোত্র তখনো ইসলাম থেকে দূরে ছিল। ইসলামের সঙ্গে তারা শত্রুতা পোষণ করত। এ গোত্রের দু-একজন ব্যক্তি গোপনে ইসলাম গ্রহণ করলেও পুরো গোত্র ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। এ কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ গোত্রের সঙ্গে সদ্ভাব তৈরি করার লক্ষ্যে তাদের কন্যা জয়নবকে বিয়ে করেন।

রাসুলের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যজীবন ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের। মাত্র তিন মাস বা তার চেয়েও কম সময় তিনি রাসুলের সান্নিধ্যে ধন্য হওয়ার সুযোগ পান। এ সময়ের কোনো ঘটনা বা তথ্য ইতিহাসে বিবৃত হয়নি। কয়েক দিন অসুস্থ থাকার পর তৃতীয় হিজরির রবিউল আউয়াল অথবা রবিউস সানি মাসে তিনি নশ্বর পৃথিবীকে বিদায় জানিয়ে আল্লাহর কাছে চলে যান।

জয়নব বিনতে খোজায়মা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুলের প্রথম স্ত্রী, যাঁকে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজে তাঁর জানাজা পড়ান, তাঁর লাশের খাটিয়া কাঁধে নিয়ে কবরগাহে যান এবং নিজ হাতে তাঁকে কবরে শোয়ান।

রাসুলের বাহুডোরে কাটানো তাঁর সময় ছিল সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এর বিনিময়ে তিনি অর্জন করেন এক মহান উপাধি, এক অবিনশ্বর নাম–উম্মুল মুমিনিন।

www.pathagar.com

আগত-অনাগত সকল মুমিনের জননী হওয়ার সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেন এ ক্ষুদ্র সময়ে।

এক নজরে

জন্ম: ৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দ।

বিয়ে: বিয়ের সময় জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স ছিল ৩০ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ৫৫।

বিবাহ: তৃতীয় হিজরির জিলহজ/জিলকদ মাস।

দাম্পত্যজীবন: রাসুলের সাথে তাঁর দাম্পত্যকাল ২/৩ মাস।

মৃত্যু: তৃতীয় হিজরির রবিউল আউয়াল/রবিউস সানি।

দাফন: মদিনার জান্নাতুল বাকিতে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩০ বছর।

www.pathagar.com

উম্মুল মুমিনিন
উম্মে সালামা বিনতে উমাইয়া অধ্যায়
রাদিয়াল্লাহু আনহা

এক

ইথিওপিয়ার নিশুতি রাত। মক্কা থেকে আসা মুসলিম উদ্বাস্তু শিবিরের একটি ঘর। ঘরে শুয়ে কথা বলছিলেন এক মুসলিম দম্পতি। তাঁরা কথা বলছিলেন তাঁদের ফেলে আসা মাতৃভূমি নিয়ে, বলছিলেন তাঁদের নতুন ধর্ম নিয়ে, যে রাসুলের কথায় তাঁরা নিজ দেশ ছেড়ে সুদূর ইথিওপিয়ায় রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছেন–কথা বলছিলেন সে রাসুল মুহাম্মদকে নিয়েও। তাঁর প্রতি নিজেদের অপার আনুগত্য প্রকাশ করছিলেন বারবার।

তাঁরা কথা বলছিলেন নিজেদের দাম্পত্যজীবন নিয়েও। একজনের প্রতি আরেকজনের ভালোবাসার নিবেদন জানান দিচ্ছিলেন পরস্পরে। জন্মান্তরের যে বন্ধন তাঁদের মধ্যে গড়ে দিয়েছে ভালোবাসার সুরম্য সৌধ, শত ঝড়-ঝঞ্ঝাও তাঁদের সে সৌধকে গুঁড়িয়ে দিতে পারবে না; তাঁরা এমন প্রতিজ্ঞা করছিলেন।

নারীটি বলছিলেন, 'আমি শুনেছি, কোনো স্ত্রী যদি তাঁর স্বামীর আগে মারা যায় এবং তার স্বামী যদি দ্বিতীয় বিয়ে না করে, তবে বেহেশতে তারা পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকবে। তেমনি কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীর আগে মারা যায় এবং তার স্ত্রী যদি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ না করে, তবেও তারা বেহেশতে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একজন আরেকজনকে পাবে। তাহলে আসুন, আমরা পরস্পরে ওয়াদাবদ্ধ হই–আমি আগে মারা গেলে আপনি আর দ্বিতীয় বিয়ে করবেন না, আর আপনি আগে মারা গেলে আমিও দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করব না...।'

পুরুষটি স্ত্রীর এমন গভীর নিবেদিত কথা শুনে তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'প্রিয়তমা! তুমি কি আমার একটি কথা রাখবে?'

www.pathagar.com

স্ত্রী বললেন, 'শোনার জন্যই তো পরামর্শ করছি।'

স্বামী তাঁর হাত দুটো ধরে বললেন, 'আমি যদি তোমার আগে মারা যাই, তবে অবশ্যই তুমি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করবে। মনে থাকবে?'

নারীটি বেদনায় আহত হলেন। পুরুষ লোকটি আল্লাহর উদ্দেশে হাত তুললেন, 'হে আল্লাহ! আমার যদি আগে মৃত্যু হয়, তাহলে তুমি আমার স্ত্রীকে আমার চেয়েও ভালো স্বামী মিলিয়ে দিয়ো। যে তাকে আমার চেয়েও বেশি ভালোবাসবে, আমার চেয়েও সুখে রাখবে।'

স্বামীর এ দোয়া আল্লাহ কবুল করলেন। এ নারীর পরবর্তী সময়ে বিয়ে হয়েছিল শেষ নবি রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে। উম্মুল মুমিনিন হওয়ার অমর গৌরব অর্জন করেন তিনি। পুরুষটির নাম আবদুল্লাহ, আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু। আর নারীটির নাম হিন্দ, উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা।

দুই

উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা। হিন্দ বিনতে উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা। ইসলামের ইতিহাস যাঁকে স্মরণ করেছে শ্রদ্ধাভরে। মুমিনজননী হিসেবে যিনি বরিত হয়ে আসছেন শতাব্দী পর শতাব্দী। যাঁর নামের সুরভি ছড়িয়ে আছে পূর্ব থেকে পশ্চিমের সকল মুসলিম মানসে। যাঁর ত্যাগ আর ভালোবাসার কাহিনি কিংবদন্তি হয়ে আছে ইসলামের ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

তাঁর আগে মাত্র তিনজন নারী ইসলাম গ্রহণ করেছেন–খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ, উম্মে আয়মান ও উম্মে ফজল। নারীদের মধ্যে তিনি চতুর্থ। তাঁর স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদও সেই সৌভাগ্যবানদের একজন, যাঁরা ইসলামের সত্যদীপ্ত ঘোষণা শোনার পরপরই কালেমাপাঠে ধন্য হন। নবুওয়াতের আলোকশিখা প্রোজ্জ্বল হওয়ার পর ১১তম পুরুষ হিসেবে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বস্তুত, তিনি তাঁর স্বামীর হাত ধরেই ইসলামের আলোকিত রাজপথের যাত্রী হন।

আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদ ছিলেন রাসুলের ফুফাতো ভাই, তাঁর মা বারাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব রাসুলের ফুফু। এ ছাড়া রাসুল এবং আবদুল্লাহ উভয়ে সুয়াইবা নাম্নী এক নারীর দুধপান করার ফলে তাঁরা ছিলেন পরস্পরের দুধভাই।

www.pathagar.com

নবুওয়াতের রোশনি মক্কায় বিভাসিত হওয়ার আগেই উম্মে সালামা ও আবু সালামা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। (আবদুল্লাহর ডাকনাম আবু সালামা। তাঁদের ছেলের নাম ছিল সালামা। এ সৌভাগ্যবান সন্তানের নামানুসারে মায়ের নাম উম্মে সালামা এবং পিতার নাম আবু সালামা ডাকা হতো।) মুহাম্মদি নবুওয়াত ঘোষণার পর স্বামী-স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের সত্যানুসন্ধানী হৃদয়ের আকুলতা প্রশমিত করেন। নিজেদের সঁপে দেন রাসুলের নবপ্রবর্তিত ধর্মের আলোক-বিধানে।

কিন্তু যত সহজে বলা যাচ্ছে তখনকার সময়ে নতুন ধর্ম পালন মোটেও এত সহজ ছিল না। মক্কার যে-ই ইসলাম গ্রহণ করত, তার ওপর নেমে আসত নির্যাতন, উৎপীড়ন, অপমান আর লাঞ্ছনার অভিশাপ। সালামা-দম্পতিও বাদ গেলেন না। মক্কার পৌত্তলিক বিধর্মীরা নানাভাবে তাঁদের হেনস্থা করতে লাগল। ঘরে-বাইরে সব জায়গায় কুরাইশদের আক্রমণের শিকার হতে লাগলেন তাঁরা।

নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুসারীদের সমুদ্র-পার্শ্ববর্তী দেশ ইথিওপিয়ায় দেশান্তর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। রাসুলের এমন নির্দেশ পাওয়ার পর যাঁদের সামর্থ্য ছিল তাঁরা গোপনে ইথিওপিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। সালামা-দম্পতিও ছিলেন এ দলে। হৃদয়ের গভীরে ইসলামের পরশপাথরকে আগলে নিয়ে তাঁরা রওনা হলেন অজানা গন্তব্যের দিকে।

এ ঘটনা নবুওয়াতপ্রাপ্তির পঞ্চম বছর ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের। তাঁদের সঙ্গে সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন রাসুলের জামাতা উসমান ইবনে আফফান এবং তাঁর সহধর্মিণী ও রাসুলকন্যা রোকাইয়া। এ দলে মোট ১২ জন পুরুষ ও ৫ জন নারী ছিলেন। প্রথম হিজরতের প্রায় বছরকালের মধ্যে আরও ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮ জন নারী দ্বিতীয়বারের মতো ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন।

ইথিওপিয়ায় পৌঁছে তাঁরা সেখানে স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে লাগলেন বটে কিন্তু পেছনে ফেলে যাওয়া মক্কায় রাসুল ও তাঁর আনীত ধর্মের জন্য হৃদয়ের আকুতি কিছুতেই বাঁধ মানত না। সব সময় তাঁরা ভাবতেন মক্কার মুসলমানদের নিয়ে। সেখানে ফেলে আসা তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের জন্যও তাঁদের মন কাঁদত। এভাবে প্রায় পাঁচ বছর সালামা-দম্পতি ইথিওপিয়ায় অবস্থান করেন। এখানেই তাঁদের পুত্র সালামার জন্ম হয়।

দিন যেতে লাগল। এরই মধ্যে নবুওয়াতের দশম বর্ষের গোড়ার দিকে হঠাৎ তাঁরা সংবাদ পেলেন, মক্কার কাফেররা অধিকাংশই মুসলমান হয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে মুসলমানদের আর কোনো শত্রুতা নেই। মক্কার পরিস্থিতি এখন একেবারেই শান্তিপূর্ণ।

www.pathagar.com

এ সংবাদ শুনে নির্বাসিত মুসলিমগণ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। তাঁদের অনেকেই তোড়জোড় শুরু করলেন মক্কা ফিরে যাওয়ার। তাঁদের মধ্যে সালামা-দম্পতিও ছিলেন। অবশেষে ৩৩ জন নারী-পুরুষ জাহাজযোগে আরব উপকূলে অবতরণ করলেন এবং নিঃশঙ্ক হয়ে মক্কার দিকে এগোতে লাগলেন। কিন্তু সামনেই তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল ভয়াবহ দুঃসংবাদ। মক্কার কাছাকাছি এসে জানতে পারলেন, তাঁরা যে সংবাদ শুনেছিলেন তা নিতান্তই অমূলক ও ভিত্তিহীন। মক্কার অবস্থা বরং এখন আগের চেয়ে আরও খারাপ হয়েছে। মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে গিয়েছে।

এ সংবাদ শোনার পর অধিকাংশ সাহাবি আবার ইথিওপিয়ার দিকে যাত্রা শুরু করলেন। তাঁরা আবার সেই নরক গুলজার মক্কায় ফিরতে আগ্রহী নন। তবে সালামা-দম্পতি দমে গেলেন না, নিজেদের পথে অটল রইলেন। বাকি সঙ্গীদের ইথিওপিয়ায় ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করে তাঁরা সকল বাধাবিঘ্ন মাড়িয়ে মক্কায় যাওয়ার মনস্থির করলেন।

বুকে সাহস নিয়ে তাঁরা মক্কায় ফিরে এলেন। দীর্ঘ দেশান্তরের পর তাঁরা মক্কায় ফিরে এলে আবু সালামার মামা আবু তালিব এবং তাঁর মা রাবাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব তাঁদের অভয়াশ্রয় প্রদান করলেন। যদিও মক্কার কুরাইশরা এই দুই সম্মানিত ব্যক্তির কারণে তাঁদের কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারল না, কিন্তু নানাভাবে তাঁদের হেনস্থা করার ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। মদিনায় হিজরতের আগ পর্যন্ত এভাবেই তাঁরা মক্কায় কুরাইশদের নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করে বসবাস করতে থাকেন।

অবশেষে একদিন মদিনায় হিজরতের ঘোষণা এল। আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে মদিনার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বিপক্ষীয় চুক্তির ফলে রাসুল তাঁর সাহাবিদের গোপনে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পরামর্শ দিলেন। মদিনার আউস ও খাজরাজ গোত্রের সঙ্গে এ দ্বিপক্ষীয় চুক্তির পর রাসুলের অনেক সাহাবি মদিনায় হিজরত করতে লাগলেন। ইথিওপিয়ার চেয়ে মদিনা অনেক কাছে। তা ছাড়া পথও ততটা দুর্গম নয়, উট নিয়েই চলে যাওয়া যায়। তাই একদিন আবু সালামা তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা ও পুত্র সালামাকে নিয়ে মদিনার পথে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। ইথিওপিয়ায় হিজরতকারী প্রথম দলের সঙ্গী ছিলেন তাঁরা, মদিনায় হিজরতেরও প্রথম যাত্রী হলেন এ দম্পতি। নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান এক জুটি।

www.pathagar.com

তিন

একটি উট, যাত্রী তিনজন–আবু সালামা, স্ত্রী উম্মে সালামা এবং তাঁদের শিশুসন্তান সালামা। গোপনে তাঁরা বের হলেন মক্কা থেকে। কেউ যেন জানতে না পারে, এ জন্য সতর্কতার সঙ্গে প্রস্তুতি নিয়েছেন। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উটের পিঠে বোঝাই করে উম্মে সালামা তাঁর শিশুপুত্রকে নিয়ে উটের হাওদায় চড়লেন আর আবু সালামা উটের রশি হাতে যাত্রা শুরু করলেন।

সাফা পাহাড়ের পাদদেশে আবতাহ নামক স্থানে আসার পরপরই ঘটল বিপত্তি। উম্মে সালামার পিতৃবংশ বনু মুগিরার কিছু লোক সে পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। তারা এ মুসলিম দম্পতিকে উট নিয়ে যেতে দেখেই বুঝে ফেলল, তাঁরা মক্কা থেকে পালাচ্ছেন। জলদি তারা আবু সালামার উটের সামনে এসে পথরোধ করে দাঁড়াল। নেতাগোছের লোকটি আবু সালামাকে হুমকি দিয়ে বলতে লাগল, 'তুমি অন্য গোত্রের লোক, তুমি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারো। তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাও, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের বংশের মেয়েকে নিয়ে ফকিরের মতো কিছুদিন তুমি ইথিওপিয়ায় ঘুরে বেড়াবে, আবার ইয়াসরিবে চলে যাবে; এ আমরা হতে দিতে পারি না।'

এ কথা বলে তারা আবু সালামার হাত থেকে উটের লাগাম নিজেদের হাতে নিয়ে উম্মে সালামা ও তাঁর শিশুসন্তানকে নিজেদের এলাকার দিকে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করল।

এই কথা-কাটাকাটির মধ্যেই সেখানে হাজির হয়ে গেল আবু সালামার পিতৃবংশ আবদুল আসাদ গোত্রের লোকজন। এবার তারা বনু মুগিরার লোকজনের দিকে তেড়ে গিয়ে বলতে লাগল, 'তোমরা তোমাদের মেয়েকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে যাও, আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের বংশের শিশুপুত্রকে তোমাদের সঙ্গে যেতে দেব না। আমাদের শিশুপুত্র আমরা নিয়ে যাব।'

এ কথা বলে আবদুল আসাদের লোকজন উটের পিঠ থেকে শিশুপুত্র সালামাকে উম্মে সালামার কোল থেকে টেনে নামাতে লাগল। উম্মে সালামা প্রাণপণে নিজের সন্তানকে বুকের সঙ্গে আগলে ধরে রাখলেন। বারবার যুদ্ধংদেহী লোকদের কাছে মিনতি করতে থাকেন তাঁর তিন বছরের শিশুপুত্রকে যেন তাঁর কাছ থেকে জুদা করা না হয়। তাঁর বুক শূন্য করে তাকে নিয়ে গেলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন। কিন্তু পাষণ্ডরা মায়ের কোনো মিনতিই গায়ে মাখল

www.pathagar.com

না। তারা উম্মে সালামার বুক থেকে পুত্র সালামাকে জোর করে টেনে নামাতে লাগল।

এমন টানাহেঁচড়ার মাঝে আচমকাই শিশু সালামার কচি হাত ভেঙে গেল। সালামা গগনবিদারী চিৎকার করে মা মা বলে ডাকতে থাকে। উম্মে সালামা কাঁদতে কাঁদতে উট থেকে নেমে নিজের আহত ছেলেকে শুশ্রূষা করার আবেদন জানালেন। কিন্তু মক্কার এ নির্দয় কাফেররা তাঁকে সে সুযোগটাও দিল না। তাঁরা হাতভাঙা সালামাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। উম্মে সালামা মরুর ধুলোয় বসে বুক চাপড়ে চিৎকার করতে লাগলেন। কিন্তু বনু মুগিরার লোকজন তাঁকে চিৎকার করে কাঁদারও সুযোগ দিল না। ওভাবেই তাঁকে টেনেহিঁচড়ে তাদের পল্লির দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

কিছুক্ষণ আগেও তিন সদস্যের এক পরিপূর্ণ সুখী পরিবার মদিনার পথে যাত্রা করেছিল। কিন্তু এখন তিনজন তিন গন্তব্যের যাত্রী হয়ে গেল। আবু সালামা স্ত্রী-সন্তানকে পেছনে ফেলে চোখের জল মুছে একা একা মদিনার পথে হাঁটতে লাগলেন। ক্রন্দসী উম্মে সালামাকে তাঁর পিতৃবংশ বনু মুগিরা তাদের কাছে নিয়ে গেল। আর তাঁদের শিশুসন্তান সালামাকে মা-বাবাহীন কান্নারত অবস্থায় বনু আবদুল আসাদের ডেরার দিকে নিয়ে যাওয়া হলো।

এ ঘটনা হিজরতের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার একটি। ইসলামের জন্য আরবে যত হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে, এ ঘটনাও অম্লান হয়ে আছে সে ইতিহাসে। রক্ত, অশ্রু আর বেদনার অজস্র স্রোত বেয়ে ইসলামকে তাজাদম করে গেছেন যাঁরা, উম্মে সালামার আত্মত্যাগ সে কাফেলারই এক অত্যুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা।

প্রতিটি দিন যায়, উম্মে সালামা নিজের ভেতরে নিজে ম্রিয়মাণ হতে থাকেন। বনু মুগিরা পল্লিতে তিনি একপ্রকার গৃহবন্দী হয়ে আছেন। বুকের ভেতর বোবাকান্না উথলে ওঠে প্রায়ই, চোখের জল দিয়ে আর কত তা নিবারণ করা যায়! একটুখানি পথের দূরত্ব বনু আবদুল আসাদ পল্লি, তবু তাঁকে তাঁর গর্ভজাত সন্তানের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় না। তিনি বেদনায় প্রতিদিন মুষড়ে পড়েন আর আল্লাহর কাছে এই জালিমদের অন্তরে যেন রহম পয়দা হয়, সে দোয়া করেন।

উম্মে সালামা প্রতিদিন আবতাহ নামক সে স্থানটিতে এসে বসে থাকেন, যেখান থেকে তাঁর স্বামী ও সন্তানকে আলাদা করা হয়েছিল। পাহাড়ের পাদদেশে পাথরের কোলে হেলান দিয়ে কখনো তিনি তাকিয়ে থাকেন মদিনার

www.pathagar.com

পথের দিকে, যদি আবু সালামা ফিরে আসেন মদিনা থেকে। কখনো আকুল হয়ে চেয়ে থাকেন বনু আবদুল আসাদ কবিলার পথের দিকে, যে পথে তাঁর কলিজার টুকরো সন্তানকে হাতভাঙা অবস্থায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সে পথে তাকিয়ে থাকলে তিনি যেন এখনো স্পষ্ট শুনতে পান সালামার মা মা ডাক। কান্নায় ঝাপসা হয়ে যায় উম্মে সালামার চোখ। তিনি যে আর সইতে পারেন না!

এভাবে প্রতিদিন, সপ্তাহ পেরিয়ে মাস, মাস পেরিয়ে বছর হয়ে গেল; উম্মে সালামা প্রতিটা দিন এসে আবতাহর সেই ধুলোমলিন পথের পাশে একাকী বসে থাকেন। লোকজন তাঁকে পাগলিনী ভেবে এড়িয়ে যায়। হায়! উম্মে সালামা তো পাগলই। যাঁর সন্তানকে তাঁর বুক থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, যাঁর স্বামীকে তাঁর সামনে থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শুধু ইসলাম গ্রহণের কারণে, তিনি তো সব হারিয়ে আজ পাগলই হয়ে গেছেন। তাঁর হৃদয়ের ব্যথা এই নিষ্ঠুর মক্কার কে বুঝবে আর!

একজন বুঝলেন। তিনি বনু মুগিরারই নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি। সম্পর্কে উম্মে সালামার চাচা। উম্মে সালামাকে এভাবে প্রতিদিন পাগলিনীর মতো বসে থাকতে দেখে তিনি বনু মুগিরার লোকজনকে তিনি ধমক দিয়ে বললেন, 'তোমরা কেমন নির্দয়, বলো তো! এই অসহায় নারীকে কেন তার গন্তব্যে যেতে দিচ্ছ না? তোমরা তাকে তার সন্তান থেকে দূরে রেখেছ এবং তার স্বামীর কাছ থেকেও পৃথক করেছ। এ কেমন অবিচার তোমাদের! তাকে তার পথে যেতে দাও।'

ইতিহাস এই লোকের নাম স্মরণ রাখেনি। তবে তাঁর কথায় হৃদয় গলল বনু মুগিরার লোকদের। তারা উম্মে সালামার কাছে এসে বলল, তুমি যেখানে যেতে চাও, চলে যেতে পারো। তোমার ওপর আমাদের আর কোনো বিধিনিষেধ নেই।

উম্মে সালামার হৃদয় যেন খলবলিয়ে উঠল। তিনি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। অবশেষে তিনি তাঁর স্বামী-সন্তানের সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন!

বনু মুগিরার এতটুকু দয়া দেখে বনু আবদুল আসাদও দয়াপরবশ হয়ে তাদের হেফাজতে থাকা শিশুসন্তান সালামাকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিল। এত দিন পর! আহ্! উম্মে সালামা বুকের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন সালামাকে। মা আর ছেলের চোখের পানিতে ভিজে যেতে লাগল মক্কার নির্দয় পাথরজমিন। এ বড় দামি অশ্রু। এ অশ্রুর দাম দিয়েই তো কেনা হয়েছে উম্মতে মুহাম্মদির মুক্তির সনদ।

www.pathagar.com

উম্মে সালামা আর দেরি করলেন না। একাই যাত্রার প্রস্তুতি নিলেন। নিজ বংশের লোকদের থেকে একটি উট সংগ্রহ করে তখনই বেরিয়ে পড়লেন মদিনার পথে। মদিনায় একাকী অপেক্ষায় আছেন তাঁর প্রিয় স্বামী আবু সালামা, যত দ্রুত সম্ভব তাঁর কাছে চলে যাবেন। পথ দুর্গম, পদে পদে বিপদ, বেদুঈন দস্যুদের ভয়। কিন্তু উম্মে সালামার অন্তরে আজ কোনো ভয়ডর নেই। তিনি নিঃশঙ্ক হয়ে পাখির মতো যেন উড়াল দিয়ে চলেছেন। যেভাবেই হোক, আল্লাহ তাঁর যাত্রাপথ নিরাপদ রাখার কোনো না কোনো ব্যবস্থা অবশ্যই করে দেবেন।

আল্লাহ তাঁর নিরাপদ সফরের ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি যখন একাকী উট নিয়ে তানয়িম নামক স্থানে এলেন, তখন হঠাৎই সেখানে উসমান ইবনে তালহার সঙ্গে দেখা হলো। উসমান ইবনে তালহা উম্মে সালামাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবু উমাইয়ার কন্যা! একাকী কোথায় রওনা হয়েছ তুমি?'

উম্মে সালামা কিছুটা ভয় পেলেন। কেননা উসমান ইবনে তালহা পৌত্তলিক বিধর্মী এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে কঠোর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। একাধারে তিনি ছিলেন কাবাঘরের চাবিরক্ষক এবং কুরাইশদের যেকোনো যুদ্ধে গোত্রীয় পতাকা থাকত তাঁর হাতে। সে হিসেবে তিনি মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হতেন। তাঁর ভাই মুসআব ইবনে উমায়ের ইসলাম গ্রহণ করায় তিনি তাঁকে অকথ্য নির্যাতন করেন। মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল স্পষ্ট। যদিও পরবর্তী সময়ে হোদায়বিয়ার সন্ধির পর তিনি ও খালিদ ইবনে ওয়ালিদ একসঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন।

এসব কারণে উম্মে সালামা প্রথমে কিছুটা ভয় পেলেও পরক্ষণে চিন্তা করলেন, যার নিঃস্ব হওয়ার ভয় নেই তার আর কিসের ভয়! তিনি তো সব হারিয়ে রিক্ত হয়ে ছিলেন এত দিন। আল্লাহ তাঁকে আবার তাঁর সন্তান ফিরিয়ে দিয়েছেন। আজ যদি আবার বিপদ আসে, তবে আবারও আল্লাহ ভরসা।

তিনি উসমান ইবনে তালহার কাছে গিয়ে বললেন, 'আমি মদিনায় যাচ্ছি আমার স্বামীর কাছে।'

উসমান ইবনে তালহা বললেন, 'একাকী? সঙ্গে আর কেউ নেই তোমার?'

উম্মে সালামা দৃঢ়কণ্ঠে জানালেন, 'আল্লাহ এবং আমার শিশুপুত্র ছাড়া আর কেউ নেই আমার সঙ্গে।'

উসমান ইবনে তালহা উম্মে সালামার কথা শুনে বললেন, 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তোমাকে এভাবে একা যেতে দেব না। চলো, আমি তোমাকে মদিনায় পৌঁছে দিয়ে আসব।' এ কথা বলে তিনি উম্মে সালামার উটের লাগাম ধরে মদিনার পথে হাঁটতে লাগলেন।

www.pathagar.com

ইসলামের বিরুদ্ধবাদী হলেও উসমান ইবনে তালহা যথেষ্ট ভদ্র ব্যক্তি ছিলেন। এভাবে একাকী এক নারীকে বিরান পথে মদিনা যেতে দেখে তিনি তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন। শুধু তা-ই নয়, পথিমধ্যে যখনই উম্মে সালামা যাত্রাবিরতি করতেন, উসমান তাঁর থেকে দূরে সরে যেতেন। উম্মে সালামা তাঁর শিশুপুত্রকে নিয়ে উটের হাওদা থেকে নামলে তিনি এসে উটের পিঠ থেকে হাওদা নামিয়ে উটটিকে একটি গাছের ছায়ায় বেঁধে সেটির দানাপানির ব্যবস্থা করে সেখানেই বসে যেতেন। উম্মে সালামা অন্য কোথাও বসে সঙ্গে নিয়ে আসা সামান্য খাবার থেকে আহার গ্রহণ করতেন এবং ছেলেকে খাওয়াতেন। আবার যখন উম্মে সালামা উটে চড়ার মনস্থ করতেন, তখন তিনি আগেই উটের পিঠে হাওদা বসিয়ে দিয়ে দূরে চলে যেতেন। উম্মে সালামা উটের পিঠে চড়লে তিনি উটের রশি ধরে সামনে সামনে চলতেন।

উম্মে সালামা বলেন, 'আরবের যেসব লোকের সঙ্গে আমি সফর করেছি, তাঁদের মধ্যে উসমান ইবনে তালহার চেয়ে ভদ্র কাউকে আর দেখিনি।'

এভাবেই চলছিল তাঁদের মদিনার পথে যাত্রা। অবশেষে একসময় তিনজনের ক্ষুদ্র এ কাফেলা মদিনার উপকণ্ঠে কোবা পল্লিতে এসে উপনীত হলো। এখানে আমর ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর গোত্রের বসবাস। এ পল্লির কাছাকাছি আসতেই উসমান ইবনে তালহা উম্মে সালামাকে সম্বোধন করে বললেন, 'তোমার স্বামী আবু সালামা এ পল্লিতে অবস্থান করছে। আল্লাহর নাম নিয়ে চলে যাও। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন!'

এ কথা বলে উসমান ইবনে তালহা আর দেরি করলেন না, তিনি আবার মক্কার দিকে ফিরতি পথ ধরলেন।

অবশেষে উম্মে সালামা মিলিত হলেন স্বামী আবু সালামার সঙ্গে। দীর্ঘ বিরহের পর এ ছিল মধুর মিলন। একটি বছর দুজনই নিশিদিন কাটিয়েছেন দুজনের বিরহব্যথায়। আজ ফের মিলিত হলেন। তাঁদের সন্তান আজ তাঁদের কোলে, বেহেশতের সুখ যেন ধরা দিল কোবা পল্লিতে।

চার

কিছুদিন পর রাসুল মদিনায় হিজরত করে এলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মদিনা রাষ্ট্র গড়ার কাজে নিজেদের আত্মনিয়োগ করেন। মদিনায় এক বছর কাটাতে না কাটাতেই বেজে ওঠে বদর যুদ্ধের দামামা। আবু সালামা বীরদর্পে শরিক হলেন বদর রণাঙ্গনে। পরাভূত করলেন দাম্ভিক কুরাইশদের উঁচু শির।

www.pathagar.com

বছর দেড়েক বাদে যখন উহুদের ময়দানে আবার বেজে উঠল রণভেরি, আবু সালামা সে লড়াইয়েও অংশ নিলেন। তবে এ লড়াইয়ে তিনি আহত হলেন। তাঁর বাম বাহুতে আবু সালমা হাতমি নামের এক কুরাইশের ছুড়ে দেয়া তির বিদ্ধ হয়। তিরের আঘাতে বেশ গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয় বাহুতে। এ ক্ষত সারাতে যুদ্ধের পর মাসাধিককাল তাঁকে চিকিৎসা নিতে হয়। উম্মে সালামা সর্বাত্মক স্বামীর শুশ্রূষায় নিজেকে উজাড় করে দিলেন। আবু সালামা খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠলেও হাতের ক্ষত রয়ে গেল।

এ ঘটনার কিছুদিন পর মদিনায় সংবাদ আসে–মক্কার আসাদ গোত্রের এক নেতা কিছু যোদ্ধা নিয়ে মদিনায় আক্রমণ করতে আসছে। এ সংবাদ পেয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবু সালামার নেতৃত্বে দেড় শ সাহাবির একটি সেনাদল প্রেরণ করলেন তাদের দমন করতে। আবু সালামা সাহাবিদের দলটি নিয়ে আসাদ গোত্রের বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য কাতান নামক স্থানে যান। সেখানে এক খণ্ডযুদ্ধের পর কুরাইশরা পলায়ন করে। তবে আবু সালামা তাঁর আহত হাতে আবার আঘাত পান এবং ক্ষত থেকে প্রচুর রক্তপাত হতে থাকে।

দীর্ঘ ২৯ দিনের লম্বা অভিযান ছিল। অভিযান শেষ করে যখন তিনি মদিনায় ফিরে আসেন, তখন তিনি বেশ অসুস্থ। তাঁর ক্ষত ঘায়ে পরিণত হয়ে যায় এবং সেটা পচন ধরতে শুরু করে। কিছুদিন রোগশয্যায় থাকার পর তিনি অসুস্থাবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

এটা চতুর্থ হিজরি সনের ৯ জমাদিউল উখরার ঘটনা।

উম্মে সালামার সুখের নীড় ভেঙে গেল। তিনি কাঁদতে কাঁদতে রাসুলের কাছে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ জানাতে এলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবু সালামার মৃত্যুসংবাদে দারুণভাবে ব্যথিত হলেন। নবুওয়াত আগমনের কিছুদিন পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামকে বুকে আগলে নিয়ে তিনি দু-দুবার হিজরত করেন। স্ত্রী-সন্তানকে মক্কার হায়েনাদের হাতে ছেড়ে শুধু রাসুলের নির্দেশ রক্ষার্থে তিনি মদিনায় পাড়ি জমিয়েছিলেন। বদর-উহুদ রণাঙ্গনে বীর বিক্রমে লড়াই করেছেন। ইসলামের প্রতিটি কাজে তাঁর আত্মত্যাগ ছিল অবিস্মরণীয়। রাসুল এমন একজন প্রিয়তম বন্ধুর বিয়োগব্যথায় মুষড়ে পড়লেন।

রাসুল আবু সালামার ঘরে এলেন। প্রবল বেদনা নিয়ে আবু সালামার মৃত দুই চোখ নিজ হাতে বন্ধ করে দিলেন। উম্মে সালামা রোদন করছিলেন, তাঁকে সান্ত্বনা জানানোর ভাষা নেই। অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভেবে আল্লাহর কাছে

www.pathagar.com

আবু সালামার মাগফেরাত এবং উম্মে সালামার ধৈর্যধারণের শক্তি চেয়ে প্রার্থনা করলেন।

আবু সালামার জানাজা রাসুল নিজে পড়ালেন এবং জানাজা পড়ানোর সময় চার তাকবিরের বদলে নয়টি তাকবির দিলেন। নামাজ শেষে সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! কোথাও ভুল হয়নি তো? চার তাকবিরের স্থলে আপনি নয়টি তাকবির দিলেন!'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের আশ্বস্ত করে বললেন, 'আবু সালামা এমন ব্যক্তি ছিলেন, যাঁর জন্য হাজার তাকবিরও যথেষ্ট নয়।' রাসুল নিজেই আবু সালামার মর্যাদাকে ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা করলেন।

স্বামী আবু সালামার মৃত্যুর সময় উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পর তিনি এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। তার নাম রাখলেন জয়নব। এর আগে তাঁর আরও তিনজন সন্তান ছিল–উমর, দুররা ও সালামা। এতগুলো সন্তান নিয়ে উম্মে সালামার মদিনায় একা বসবাস করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল।

রাসুলের ঘনিষ্ঠ সাহাবিরা উম্মে সালামার এমন নিঃসঙ্গতার ব্যাপারে ভাবতে লাগলেন। এতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে উম্মে সালামার জন্য সংসার পরিচালনা দুঃসাধ্য ব্যাপার। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মে সালামার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। কিন্তু উম্মে সালামা জানালেন–এ মুহূর্তে তিনি বিয়ের কথা ভাবছেন না। এরপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু তাঁকেও না করে দিলেন তিনি। স্বামীর শোক কাটিয়ে উঠতে পারেননি এখনো।

হয়তো উম্মে সালামা মনে মনে ভাবছিলেন স্বামীর সেই প্রার্থনার কথা–আমি মারা গেলে আল্লাহ যেন তোমাকে আমার চেয়েও ভালো স্বামী মিলিয়ে দেন। কিন্তু আবু সালামার চেয়ে ভালো মানুষ, বাহাদুর লোক তিনি কোথায় পাবেন মদিনায়? কে আর আছে এমন?

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার পুত্র উমর তখন বেশ বড়। তাঁর মাধ্যমেই প্রস্তাব এল। এ প্রস্তাব ছিলে স্বয়ং রাসুলের পক্ষ থেকে। রাসুলের পক্ষ থেকে প্রস্তাব পাওয়ার পর উম্মে সালামা ভাবলেন, তাঁর স্বামীর সেই প্রার্থনা তবে কি কবুল হলো? কেননা রাসুলের চেয়ে উত্তম স্বামী এ আরবে আর কে আছে?

রাসুলের এ প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার মতো নয়। তবু তিনি কিছু বিষয় নিয়ে চিন্তিত। রাসুলের বিবাহবন্ধনে আয়েশা-হাফসার মতো কম বয়সী স্ত্রী রয়েছেন, তিনি তাঁদের চেয়ে বয়সে ঢের বড়। আশঙ্কা করলেন–তিনি স্ত্রী হয়ে রাসুলের

www.pathagar.com

ঘরে গেলে অন্যদের চেয়ে তাঁর মর্যাদা খাটো করে দেখা হতে পারে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলা, অন্যের ঈর্ষার কারণ হওয়াটা পছন্দ করতেন না। আরেকটি বিষয়–আবু সালামার সংসারে তাঁর চারজন সন্তান, তাদের ভবিষ্যতের ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট চিন্তিত।

রাসুলের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসার পর তিনি এ বিষয়গুলো তাঁর সামনে তুলে ধরলেন :

–হে আল্লাহর রাসুল! আমার আত্মসম্মানবোধ অত্যন্ত প্রখর। কখনো অন্য স্ত্রীদের কারণে আমার এ দোষ প্রকাশ পাবে, যার কারণে আপনি কষ্ট পাবেন। ফলে আমি গোনাহগার হব।

–আমি একজন বয়স্ক নারী, স্বামী সোহাগের বিষয়টি স্মরণযোগ্য।

–আমার চারজন সন্তান রয়েছে। তাদের দেখভালের দায়িত্ব আমার ওপর।

উম্মে সালামার প্রার্থিত বিষয়গুলো শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন, 'আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তোমার অন্তর থেকে আত্মসম্মানবোধের প্রখরতা কমিয়ে দেন। আর তুমি যদি বয়স্ক হয়ে থাকো, তবে আমার বয়স তোমার চেয়েও বেশি। এটি কোনো সমস্যা নয়। আর তোমার সন্তানেরা আমার সন্তান হিসেবেই পরিগণিত হবে।'

উম্মে সালামা এমনিতেই বিচক্ষণ মহিলা। রাসুলের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পাওয়ার পর তাঁর দ্বিধা করার কথা ছিল না। তিনি এসব বিষয় উত্থাপন করে রাসুলের সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন সুদৃঢ় করার প্রয়াস করছিলেন এবং তিনি তাঁর এ প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণরূপে সফল হলেন।

চতুর্থ হিজরি সনের শাওয়াল মাসের শেষ দিকে রাসুলের সঙ্গে উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হলো। আজ থেকে তিনি কেবল উমর, দুররা, সালামা আর জয়নবের মা নন; তিনি সমগ্র মুসলিম বিশ্বের মা হওয়ার গৌরব অর্জন করলেন। তিনি সম্বোধিত হলেন উম্মুল মুমিনিন হিসেবে।

বিয়ের আয়োজন খুব সংক্ষিপ্ত করে করা হলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামার ঘরে এলে তিনি চামড়ার ওপর পশমের কাজ করা একটি মাদুর বিছিয়ে দিলেন। সংসারের ভরণ-পোষণের জন্য উম্মে সালামা নিজেই চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজ করতেন। সেখান থেকে সুন্দর একটি চামড়ার মাদুর রাসুলের জন্য পেতে দেওয়া হলো। ওলিমা উপলক্ষে সামান্য খাবারের আয়োজনও করেছিলেন তিনি। রুটি দিয়ে খাওয়ার জন্য আটা ও

www.pathagar.com

চর্বিমিশ্রিত মালিদা নামের একপ্রকার উপাদেয় মিষ্টান্ন পদ রান্না হয়েছিল। রাসুলকে তা খেতে দিলেন।

রাসুল উম্মে সালামাকে তাঁর ঘর থেকে নিজের প্রয়াত স্ত্রী জয়নব বিনতে খোজায়মা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে এনে তোলেন। জয়নব বিনতে খোজায়মা বছরখানেক আগে ইন্তেকাল করেন। উম্মে সালামা এ ঘরেই নিজের পরবর্তী জীবনের মলাট খুলে সংসার শুরু করলেন।

পাঁচ

উম্মে সালামাকে স্ত্রী হিসেবে রাসুলের হুজরায় নিয়ে আসার পর কিশোরী স্ত্রী আয়েশার বেশ মন খারাপ হলো। কেননা নিজের ভালোবাসায় তিনি অন্য কাউকে ভাগ দিতে আগ্রহী নন। উম্মে সালামার আগমনের সংবাদ শুনে তাঁর মনের মধ্যে দোলাচল শুরু হয়ে গেল। তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন, উম্মে সালামা নাকি দেখতে ভারী সুন্দরী! তিনি বাস্তবে যতটা সুন্দরী, আয়েশার মনে হতে লাগল তিনি সম্ভবত তার চেয়ে বেশি সুন্দরী। মনের মধ্যে একটা ঈর্ষা ঈর্ষা ভাব কাজ করতে লাগল।

মনের কথা বলার জন্য বান্ধবী হাফসার কাছে গেলেন। হাফসাকে খুলে বললেন নিজের দুশ্চিন্তার কথা। হাফসা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি আয়েশাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আপনি যতটা শুনেছেন বস্তুত তিনি ততটা সুন্দরী নন। এ নিয়ে আপনার চিন্তা করার কারণ নেই।' হাফসার কথায় আয়েশার মনে কিছুটা হলেও প্রশান্তি এল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি যখন উম্মে সালামাকে সামনাসামনি দেখেন তখন বুঝতে পারেন, হাফসা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন মাত্র, উম্মে সালামা সত্যি ভারী সুন্দরী।

সুন্দরী হওয়ার পাশাপাশি উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বেশ রক্ষণশীল ও লজ্জাবতী ছিলেন। রাসুলের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর তিনি সংকোচের কারণে রাসুলের সামনে স্বাভাবিক হতে পারছিলেন না। এ কারণে রাতের বেলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর ঘরে এলেন, তখন তিনি তাঁর কোলের শিশুকে দুধ খাওয়ানো শুরু করে দিলেন। রাসুল নিজেও লজ্জাশীল মানুষ। বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে দেখে তাঁকে দু-এক কথা জিজ্ঞেস করে আবার ফিরে গেলেন। এভাবে পরবর্তী তিন রাত একই কাণ্ড ঘটল। উম্মে সালামাও স্বাভাবিক হতে পারলেন না, আবার রাসুলও লজ্জা ভেঙে উম্মে সালামার সংকোচ দূর করতে পারলেন না।

www.pathagar.com

আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মে সালামার দুধভাই। তিনি উম্মে সালামার এমন সংকোচজনক ঘটনা শুনে যারপরনাই বিরক্ত হলেন। কেননা তাঁর এমন আচরণে রাসুল যদি কষ্ট পান, তবে তা তাঁর জন্য অপমানজনক বিষয় হয়ে যাবে। পরদিন রাতের বেলা রাসুল উম্মে সালামার ঘরে আসার আগেই আম্মার ইবনে ইয়াসির উম্মে সালামার ঘরে এসে এমন কাজের জন্য তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন এবং তাঁর ছোট বাচ্চাকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন।

অবশ্য পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। রাসুলের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যজীবন উপমাতুল্য। একটা সময় গিয়ে জ্ঞানে, গুণে, প্রজ্ঞায় উম্মুল মুমিনিনদের মাঝে আয়েশার পর তাঁর অবস্থান ধারণা করা হতে থাকে। রাসুলের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবেও তিনি যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন।

উম্মে সালামার বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল মদিনায় মশহুর। তিনি রাসুলের নবুওয়াতি জীবনের বিভিন্ন পরিক্রমায় তাঁর মেধা ও মননের স্বাক্ষর রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় তাঁর বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

ষষ্ঠ হিজরি সনে হজের মৌসুমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের নিয়ে হজ পালনের উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে মক্কার পথে যাত্রা করেন। প্রায় পনেরো শ সাহাবির বিশাল কাফেলা, সকলে শান্তিপূর্ণ হজ পালনের জন্য আল্লাহর ঘরের উদ্দেশে বের হয়েছেন। কিন্তু হোদায়বিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হওয়ার পর মুসলিমগণ মক্কার কুরাইশদের বাধার সম্মুখীন হয়ে সেখানেই যাত্রাবিরতি করতে বাধ্য হন এবং কুরাইশদের দাবির মুখে মক্কায় না যাওয়া-সংক্রান্ত এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

রাসুলের সঙ্গে আসা সাহাবিরা এ চুক্তির শর্তসমূহ মানতে কিছুতেই রাজি হলেন না। তাঁদের কাছে চুক্তির শর্তগুলো কেবল অন্যায্যই মনে হয়নি, তাঁরা এগুলোকে নিজেদের জন্য অপমানজনক বলেও অভিহিত করলেন। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের প্রবোধ দিলেন যে এর মাঝেই আল্লাহ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। তিনি মক্কায় যাওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে সবাইকে এখানেই মাথার চুল কামিয়ে, সঙ্গে নিয়ে আসা পশু কোরবানি দিয়ে হজের অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করতে বললেন।

www.pathagar.com

রাসুল প্রবোধ দিলেন বটে কিন্তু সাহাবিদের মনের মেঘ তাতে খুব একটা সরল না। রাসুল তিনবার একই আদেশ দেয়ার পরও সাহাবিরা চুপ হয়ে বসে রইলেন। ইসলাম ও মুসলিমদের চিরশত্রু কুরাইশদের এমন অপমানজনক শর্ত তাঁদের ভেতরে অভিমানস্পৃহা আবার জাগ্রত করে দিয়েছে। তাঁরা অনন্যোপায় হয়ে যাঁর যাঁর তাঁবুতে গিয়ে মনমরা হয়ে বসে রইলেন। উমরের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষও চুক্তির শর্তগুলো মানতে পারলেন না। কুরবানির কার্যাদি সম্পন্ন করা ব্যতীত তিনিও একাকী বসে রইলেন। চারদিকে এক গুমোট অবস্থা বিরাজ করতে লাগল।

সাহাবিদের এমন মনঃক্ষুণ্ণতা রাসুলকে বিমর্ষ করে তুলল যদিও, তবু তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটলেন না। তিনি বিমর্ষ মনে নিজের তাঁবুতে ফিরে এলেন। এ সফরে তাঁর সঙ্গে সহধর্মিণী উম্মে সালামাও এসেছেন। রাসুলকে বিমর্ষ বদনে তাঁবুতে ফিরতে দেখে তিনি আদ্যোপান্ত জানতে চাইলেন বাইরে কী ঘটনা ঘটেছে। রাসুল তাঁকে কুরাইশদের চুক্তি এবং সাহাবিদের নিষ্ক্রিয়তার বিষয়টি খুলে বললেন।

ঘটনা শুনে উম্মে সালামা রাসুলকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! সাহাবিদের এমন নিষ্ক্রিয়তা ক্ষমা করুন। তাঁরা সকলে কাবার ভালোবাসা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছিলেন বিধায় এমন সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। সাহাবিদের আর কিছু বলার দরকার নেই। আপনি নিজে স্বপ্রণোদিত হয়ে বাইরে গিয়ে মাথার চুল কামিয়ে ফেলুন এবং নিজের পশু কোরবানি করুন। আপনাকে এসব করতে দেখলে সাহাবিরা আর বসে থাকতে পারবেন না, তাঁরাও আপনাকে অনুসরণ করবেন।'

উম্মে সালামার এমন বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত রাসুলকে চমকিত করল। তিনি তাঁর কথামতো তাঁবুর বাইরে এসে মাথার চুল কামিয়ে সঙ্গে নিয়ে আসা কোরবানির পশু জবাই করে হজের স্থগিত কার্যাদি সম্পন্ন করে ফেললেন। রাসুলকে এসব করতে দেখে সাহাবিরা আর বসে থাকতে পারলেন না। তাঁরাও রাসুলের দেখাদেখি মাথার চুল কামিয়ে যাঁর যাঁর কোরবানির পশু জবাই করে রাসুলের অনুসরণ করতে লাগলেন।

উম্মে সালামার ত্বরিত বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্তের ফলে এ বিব্রত অবস্থা থেকে আবার সহসাই ভ্রাতৃত্বের আবহে ফিরে এলেন সকল সাহাবি।

উম্মে সালামার এমন বিচক্ষণতার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অনেক যুদ্ধাভিযানে পরামর্শের জন্য তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। বিশেষত খায়বার অভিযান, তায়েফ অভিযান, হাওয়াজিন ও সাকিফ অভিযান, মক্কা বিজয়সহ বিদায় হজে তিনি রাসুলের সফরসঙ্গী হওয়ার গৌরব অর্জন

www.pathagar.com

করেন। মূলত যুদ্ধবিদ্যা এবং বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের এ গুণাগুণ তাঁর রক্তেই মিশে ছিল। ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সমরনায়কদের একজন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তাঁর চাচাতো ভাই।

এক অর্থে উম্মে সালামা ছিলেন রাসুলের অন্যতম মন্ত্রণাদাতা। পারিবারিক যেকোনো বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামার মতামতকে গুরুত্ব দিতেন এবং উম্মে সালামাও সাংসারিক বা পার্থিব নানা বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করতেন।

আয়েশাকে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে রাসুলের সামনে উম্মুল মুমিনিনদের দাবি তিনিই উত্থাপন করেছিলেন। এ থেকে অনুমিত হয়, অন্যান্য উম্মুল মুমিনিনের চেয়ে রাসুলের কাছে তাঁর মতামতের গুরুত্ব অধিক ছিল বিধায় সকলে তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন। যদিও আয়েশার ব্যাপারে তাঁদের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

মতপ্রকাশের ব্যাপারে তিনি অন্যদের চেয়ে ছিলেন অনেক বেশি স্বাধীনচেতা। স্ত্রীদের সঙ্গে রাগ করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন সকল স্ত্রীর সঙ্গ পরিত্যাগ করেছিলেন, তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলের পারিবারিক বিষয়ে কথা বলতে এগিয়ে এলে উম্মে সালামা বলে ওঠেন, 'উমর! আপনি রাসুলের স্ত্রীদের ব্যাপারেও নাক গলাতে এসেছেন?'

উমরের সামনে এমন সোজাসাপ্টা সত্যভাষণ তাঁর মতো স্বাধীনচেতা নারীর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

ছয়

পঞ্চম হিজরি সনের কথা। কেবলই খন্দকের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামার ঘরে এসে জোহরের নামাজের পর বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় জিবরাইল আলায়হিস সালাম এসে মদিনার উপকণ্ঠে বসবাসরত ইহুদি গোত্র কুরায়জার ওপর আক্রমণের নির্দেশনা জানালেন।

খন্দকের যুদ্ধের সময় এ ইহুদি গোত্রটি নানাভাবে মক্কার কুরাইশদের যুদ্ধসাহায্য করেছে। অথচ মদিনার সঙ্গে তাদের মৈত্রী চুক্তি ছিল যে, তারা মদিনার মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ শত্রুতা পোষণ করবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করবে না, বরং মদিনা আক্রান্ত হলে তারা মুসলিমদের

www.pathagar.com

যুদ্ধসাহায্য করবে। কিন্তু তারা মৈত্রী চুক্তি ভঙ্গ করায় রাসুল বিশ্বাসঘাতক এ গোত্রকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার সংকল্পে সেদিনই আসরের সময় মদিনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বনু কায়নুকার দুর্গ অবরোধ করেন।

প্রায় ২৫ দিন অবরোধ করে রাখার পর ইহুদিরা আত্মসমর্পণে রাজি হয়। তবে তারা শর্ত দেয়–তাদের অন্যতম মিত্র সাহাবি আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনজিরের সঙ্গে আলোচনা করে তারপর অস্ত্র সমর্পণ করবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবু লুবাবাকে ইহুদিদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য পাঠালেন।

আবু লুবাবা ইহুদিদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য দুর্গে প্রবেশ করে তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। আলোচনার একপর্যায়ে ইহুদি নারী-শিশুরা এসে তাঁর সামনে কান্নায় ভেঙে পড়ে। এ কান্নার দৃশ্য দেখে তিনি কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন। ইহুদিরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি আমাদের অস্ত্র সমর্পণ করতে বলেন?'

জবাবে আবু লুবাবা বললেন, 'হ্যাঁ, আমার পরামর্শ সেটাই।' এ কথা বলার পর তিনি একটি ভুল করে ফেললেন। তাদের পরামর্শ দেওয়ার পর তিনি নিজের হাত গলার কাছে নিয়ে ইশারা করলেন–তোমরা অস্ত্র সমর্পণ করো বা না করো, তোমাদের হত্যা করা হবে।

এমন ইশারা করার পরই বুঝতে পারলেন, তিনি মারাত্মক ভুল করে ফেলেছেন। রাসুলের গোপন নির্দেশনা তিনি ইহুদিদের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন। নিজের কৃতকর্মের অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুর্গ থেকে বের হয়ে রাসুলের সঙ্গে দেখা না করেই মদিনায় চলে আসেন এবং নিজেকে মসজিদে নববির একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন–রাসুল তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে নিজ হাতে যদি বাঁধন না খোলেন, তবে তিনি এভাবেই খুঁটির সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখবেন।

পরদিন কুরায়জা গোত্রের সকল ইহুদি রাসুলের হাতে আত্মসমর্পণ করলে গোত্রের পুরুষদের হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং নারী ও শিশুদের বন্দী করা হয়।

এ অভিযান শেষ হলেও আবু লুবাবা নিজেকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধেই রাখেন। কেননা তখন পর্যন্ত রাসুলের কাছে কোনো ঐশী নির্দেশ এসে পৌঁছায়নি। আবু লুবাবার স্ত্রী নামাজ বা প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁর বাঁধন খুলে দিতেন, প্রয়োজন সারলে তিনি আবার নিজেকে আগের মতো বেঁধে ফেলতেন।

ঘটনার ষষ্ঠ দিন রাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামার ঘরে রাত্রিযাপন করছিলেন। ভোরবেলা আল্লাহর নির্দেশনা এল–আবু লুবাবার

www.pathagar.com

তওবা কবুল হয়েছে। এ নির্দেশনা আসার পর রাসুলের মুখে হাসি দেখা গেল। উম্মে সালামা রাসুলকে এভাবে কারণ ছাড়া হাসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহ সব সময় আপনাকে হাসিমুখে রাখুক। কী কারণে হাসছেন, বলুন তো!'

রাসুল বললেন, 'আল্লাহ আবু লুবাবার তওবা কবুল করেছেন।'

রাসুলের মুখে এ কথা শুনে উম্মে সালামার মুখ হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠল। কয়েক দিন থেকে মসজিদে নববির খুঁটির সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় আবু লুবাবাকে দেখে তাঁরও মন খারাপ হয়ে ছিল। তাঁর তওবা কবুল হওয়ার কথা শুনে তিনি রাসুলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কথা কি আমি বাইরে সবাইকে বলব?'

রাসুল বললেন, 'বলে দিতে পারো।'

উম্মে সালামা তাঁর হুজরার দরজায় দাঁড়িয়ে আবু লুবাবাকে সম্বোধন করে বললেন, 'হে আবু লুবাবা, সন্তুষ্ট হও! আল্লাহ তোমার তওবা কবুল করেছেন।'

তখন ফজরের নামাজের সময়। মসজিদে আসা সাহাবিরা উম্মে সালামার এ ঘোষণা শুনে খুশিতে এগিয়ে এসে আবু লুবাবার বাঁধন খুলে দিতে চাইলেন। কিন্তু আবু লুবাবা তাঁদের নিষেধ করে বললেন, 'একমাত্র আল্লাহর রাসুল ছাড়া আর কেউ আমার বাঁধন খুলবে না।'

কিছুক্ষণ পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজ পড়তে এসে আবু লুবাবার বাঁধন খুলে দিয়ে তাঁর তওবা কবুল হওয়ার মোবারকবাদ জানান।

নবম হিজরি সনে তাবুক অভিযানের পরও এমন আরেকটি ঘটনা ঘটে। কাব ইবনে মালিক, হেলাল ইবনে উমাইয়া এবং মুরারাহ ইবনে রাবি রাদিয়াল্লাহু আনহুম, এ তিনজন সাহাবি কিছু অপারগতার কারণে তাবুক অভিযানে অংশগ্রহণ না করায় আল্লাহ তাঁদের ওপর অসন্তুষ্ট হন। ফলে অভিযান থেকে ফিরে এসে আল্লাহর নির্দেশে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদের একঘরে করে রাখেন।

দীর্ঘ ৫০ দিন একঘরে হয়ে থাকার পর তাঁদের ক্ষমা ঘোষণা করে আয়াত অবতীর্ণ হয়। সে রাতেও রাসুল উম্মে সালামার ঘরে ছিলেন। রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকি থাকতে ওহি অবতীর্ণ হল। এ ঐশী সুসংবাদ মদিনার মুসলিমদের দীর্ঘ কামনা ছিল। তাই উম্মে সালামা তখনই এ সুসংবাদ সবাইকে শুনিয়ে দিতে চাইলেন। রাসুল তাঁকে থামিয়ে বললেন, 'এখন তো গভীর রাত! সকালে উঠে বলে দিয়ো।'

www.pathagar.com

উম্মে সালামা সকালে উঠে সবাইকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন।

আরেকটি অসামান্য সম্মানে ভূষিত ছিলেন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তিনিই রাসুলের একমাত্র স্ত্রী, যিনি জিবরাইলকে সরাসরি রাসুলের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছেন। ঘটনাটি বেশ মজার।

একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামার ঘরে ছিলেন। এমন সময় সেখানে সাহাবি দাহিয়্যা কালবি এলেন রাসুলের সঙ্গে কথা বলতে। দাহিয়্যাকে দেখে উম্মে সালামা অন্যদিকে সরে যান। দাহিয়্যা কালবি দীর্ঘক্ষণ রাসুলের সঙ্গে কথা বলে যখন চলে যান, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলো তো সে কে ছিল?'

উম্মে সালামা দাহিয়্যাকে ভালো করেই চিনতেন। তিনি হয়রান হয়ে উত্তর দিলেন, 'সে তো দাহিয়্যা কালবি ছিল।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোনো কথা না বলে মুচকি হেসে মসজিদে নববিতে চলে গেলেন এবং সেখানে সমবেত সাহাবিদের উদ্দেশে সেসব কথাই বলতে লাগলেন, যা কিছুক্ষণ আগে দাহিয়্যা কালবি তাঁকে জানিয়ে গিয়েছেন। উম্মে সালামার কুটির মসজিদে নববির লাগোয়া ছিল। নিজের কুটির থেকে রাসুলের মুখনিঃসৃত ঐশী বাণী শুনে উম্মে সালামা বুঝতে পারলেন, দাহিয়্যা কালবির রূপধারী লোকটি ছিলেন স্বয়ং ফেরেশতা জিবরাইল। জিবরাইলই একটু আগে ওহি নিয়ে এসেছিলেন রাসুলের কাছে।

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ, জিবরাইল যখন মানুষের রূপ ধরে রাসুলের কাছে আসতেন, তখন সাহাবি দাহিয়্যা কালবির রূপে আসতেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজের ঘরে ওহি অবতীর্ণের বিষয়টি নিয়ে অন্যান্য উম্মুল মুমিনিনের কাছে খুব গর্ব করছিলেন একদিন এবং এটাকে কেবল তাঁর একক বৈশিষ্ট্য বলেই দাবি করছিলেন।

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা চুপচাপ তাঁর কথা শুনছিলেন আর ঠোঁট টিপে হাসছিলেন। আয়েশার কথা শেষ হলে উম্মে সালামা নিজের ঘটনাগুলো একে একে শোনাতে লাগলেন। আয়েশা তাঁর কথা শুনে চুপ হয়ে গেলেন।

সাত

হাদিস শোনার ব্যাপারে উম্মে সালামার আগ্রহ ছিল অপরিসীম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববিতে যখনই কোনো কথা বলতেন, তিনি চেষ্টা করতেন সেসব কথা শুনে আত্মস্থ করতে। উম্মুল মুমিনিনদের মধ্যে

www.pathagar.com

আয়েশার পর তিনিই সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বিচক্ষণতা এবং প্রজ্ঞার দরুন রাসুল-পরবর্তী মদিনায় তিনি অন্যতম ফকিহ হিসেবে সমাদৃত ছিলেন। এমনকি আবু হোরায়রার মতো হাদিস বর্ণনাকারীও তাঁর মতের বিরোধিতা করার সাহস পেতেন না।

একদিন তিনি তাঁর ঘরে বসে চুল পরিপাটি করছিলেন। তাঁর দাসী মাশাত তাঁর চুল বেঁধে দিচ্ছিল। এমন সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমবেত সাহাবিদের কিছু বলার জন্য মসজিদে নববির মিম্বারে দাঁড়ালেন। যখন তিনি 'হে লোকসকল...' বলে তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন, তখন উম্মে সালামা দাসী মাশাতকে বললেন, 'জলদি আমার চুলগুলো বেঁধে দাও তো!'

দাসী মাশাত বলল, 'এত তাড়াতাড়ি করতে হবে কেন? রাসুল তো কেবল "হে লোকসকল" বলেছেন।'

তার কথা শুনে উম্মে সালামা রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'বোকা মেয়ে! আমি কি লোকসকলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নই?' এ কথা বলে তিনি নিজেই নিজের চুল বেঁধে মসজিদে নববির দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে নিবিড়ভাবে রাসুলের কথা শুনতে লাগলেন।

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার জ্ঞানানুসন্ধিৎসা ছিল প্রবল। নানা বিষয়ে তিনি রাসুলকে প্রশ্ন করতেন। যখনই কোনো সমস্যা বা ঘটনা সামনে আসত, তিনি নিঃসংকোচে রাসুলকে জিজ্ঞেস করতেন।

উম্মে সালামার আগের সন্তানদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম লালন-পালনের ভার নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে দুজন তখনো বেশ ছোট ছিল। উম্মে সালামা নিজ হাতে চামড়া প্রক্রিয়াজাত করে উপার্জন করতেন এবং এ উপার্জন দিয়ে নিজের ও সন্তানদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতেন। তিনি একজন স্বনির্ভর নারী ছিলেন।

একদিন তিনি রাসুলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার স্বামী আবু সালামার সন্তানদের জন্য আমি যা কিছু ব্যয় করি, আমি কি এর বিনিময়ে সওয়াব পাব?'

উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাদের জন্য তুমি যা ব্যয় করো, তার বিনিময়ে অবশ্যই সওয়াব পাবে।'

প্রণিধানযোগ্য, রাসুলের স্ত্রীদের মাঝে অনেকেই স্বহস্তে পরিশ্রম করে উপার্জন করতেন। সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহাও স্বহস্তে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে ব্যাপ্ত ছিলেন। ঘরে বসে তাঁরা ঘরোয়া যেসব মেয়েলি কাজ আছে,

www.pathagar.com

সেগুলোর মাধ্যমে উপার্জন করতেন। বর্তমান যুগের নারীরা যদি ঘরে বসে কোনো মেয়েলি কাজের মাধ্যমে আয়ের কোনো সুযোগ করে নিতে পারেন, তবে সেটা অসম্মানের কিছু নয়, বরং এটা উম্মুল মুমিনিনদের সুন্নত হিসেবে পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হতে পারে।

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা অনেক সময় অনেক সাহসী কথাবার্তা বলতেন। যেহেতু রাসুল ছিলেন ইসলামের সঞ্জীবনী ধারা, এ কারণে ইসলামের যেকোনো বিষয় তাঁর কাছ থেকে সঠিকভাবে অবগত হওয়ার বাসনা তিনি সব সময় লালন করতেন। এতে ভয় বা সংকোচের ধার ধারতেন না।

একদিন তিনি রাসুলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! পুরুষেরা তো জিহাদ করতে পারে কিন্তু নারীরা তো জিহাদ করতে পারে না। আবার উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টনেও পুরুষদের তুলনায় নারীরা অর্ধেক পেয়ে থাকে, এর কারণ কী?'

তাঁর এমন প্রশ্নের জবাবে স্বয়ং আল্লাহ উত্তর দেন সুরা নিসার ৩২ নং আয়াতে, 'তোমরা সে বিষয়ে অযথা লোভ করো না, যে বিষয়ে আল্লাহ একের ওপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।'

আরেকবার তিনি জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! কুরআনে শুধু পুরুষদের কথাই বলা হয়েছে, নারীদের সম্বোধন করে কেন বলা হয়নি?'

তাঁর এ কথার পরিপ্রেক্ষিতেও আল্লাহ কুরআনে নারীদের গুণাগুণ উল্লেখ করে সুরা আহজাবের ৩৫ নং আয়াত অবতীর্ণ করেন:

> 'নিশ্চয় অনুগত পুরুষ-অনুগত নারী, বিশ্বাসী পুরুষ-বিশ্বাসী নারী, সৎকর্মপরায়ণ পুরুষ-সৎকর্মপরায়ণ নারী, সত্যবাদী পুরুষ-সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ-ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ-বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ-দানশীল নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ-রোজা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ-যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, জিকিরপ্রিয় পুরুষ এবং জিকিরপ্রিয় নারী–এ সবার জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।'

শুধু এসব বিষয় নয়, নারীদের একান্ত বিষয়েও তিনি নিঃসংকোচে প্রশ্ন করতেন রাসুলকে। একবার তিনি রাসুলকে প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি মাথার চুল সব সময় শক্ত করে বেণি বেঁধে রাখি। ফরজ গোসলের সময় আমি বেণি খুলে গোসল করব, নাকি সেটা না ভিজিয়ে গোসল করব?'

www.pathagar.com

উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'বেণি খোলার প্রয়োজন নেই। গোসলের সময় যদি তুমি মাথার ওপর তিন কোষ পরিমাণ পানি দিয়ে মাথা ভিজিয়ে ফেলো, তাহলে তোমার পবিত্রতা অর্জিত হয়ে যাবে।'

ইসলামের প্রতিটি বিধানকে তিনি সহজবোধ্যভাবে বুঝে নিতে চেষ্টা করতেন, যাতে পরবর্তী উম্মতের জন্য এসব পাথেয় হতে পারে।

একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামা এবং মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে বসে ছিলেন। এ সময় সেখানে অন্ধসাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম উপস্থিত হন। তাঁকে উপস্থিত হতে দেখেও রাসুলের স্ত্রীদ্বয় পর্দা না করে সেখানেই বসে রইলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদের বললেন, 'তোমরা তার থেকে আড়ালে গিয়ে পর্দা করো।'

উম্মে সালামা রাসুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! তিনি তো অন্ধ। তাঁর থেকে পর্দা করার কী প্রয়োজন? তিনি তো আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না।'

উত্তরে রাসুল মুচকি হেসে বললেন, 'তোমরা তো তাকে দেখতে পাচ্ছ।' সুতরাং, পুরুষদের থেকে নারীদেরও পর্দা করা উচিত।

অনেক সময় মেয়েলি বিষয়ে যখন তিনি রাসুলের সঙ্গে কথা বলতেন, তখন যেসব বিষয়ে রাসুলের অজ্ঞতা থাকত, তিনি তা শুধরে দিতেন। একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হয়তো কোনো সাহাবিকে টাখনুর নিচে কাপড়পরা অবস্থায় দেখেছিলেন। এটা দেখে তিনি বেশ নাখোশ হন। ঘরে এসে উম্মে সালামাকে বিষয়টি জানিয়ে বললেন, 'লুঙ্গি বা পাজামা অহংকারবশত টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরা ইসলামে নিষিদ্ধ। টাখনু ও হাঁটুর মাঝামাঝি রেখে পরা উচিত।'

রাসুলের এমন কথা শুনে উম্মে সালামার মনে অনুসন্ধিৎসা জেগে উঠল। তিনি রাসুলকে প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! তাহলে মহিলাদের কাপড় পরার নিয়ম কী?'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তারা হাঁটু ও টাখনুর মাঝামাঝি থেকে আরও এক বিঘত পরিমাণ নিচে নামিয়ে কাপড় পরবে।'

কিন্তু একজন নারী হিসেবে উম্মে সালামার কাছে এ জবাব মনঃপূত হলো না। কেননা তিনি মনের চোখ দিয়ে ততক্ষণে মেপে ফেলেছেন টাখনু ও হাঁটুর মাঝামাঝি দূরত্ব। সেখান থেকে এক বিঘত পরিমাণও যদি কাপড় ঝোলানো

www.pathagar.com

হয়, তবু পায়ের অনেকখানি দেখা যাবে। রাসুল হয়তো বিষয়টি অনুমান করে বলেছেন, তাই আনুপুঙ্খিকভাবে মাপ নেওয়াটা সম্ভব হয়নি।

রাসুলের অনুমানকে একদিকে রেখে তিনি বললেন, 'না, এতে কাজ হবে না। এ রকম করে কাপড় পরলে সেটা টাখনুর ওপরেই উঠে থাকবে এবং পায়ের অনেকাংশ দেখা যাবে।'

তখন রাসুল নিজের অনুমানকে শুধরে নিয়ে বললেন, 'তাহলে নারীরা হাঁটু ও টাখনুর মাঝামাঝি থেকে এক হাত পরিমাণ নিচে কাপড় পরবে। তবে এর থেকে বেশি নিচে পরলে তা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।'

একবার এক নারী এসে রাসুলকে জিজ্ঞেস করলেন—রোজাদার ব্যক্তি স্ত্রীকে চুমু দিতে পারবে কি না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাধারণত এমন ব্যক্তিঘনিষ্ঠ বিষয়ে কথা বলতে সংকোচ বোধ করতেন। বিশেষত যদি কোনো নারী এসব বিষয়ে প্রশ্ন করতেন, তাহলে তাঁর উত্তর জানতে নিজের কোনো স্ত্রীর কাছে যেতে বলতেন।

আগত নারীর প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য তিনি তাঁকে উম্মে সালামার কাছে যেতে বললেন। নারীটি উম্মে সালামার কাছে প্রশ্ন করলে তিনি শুধু উত্তরই দিলেন না, একদম বাস্তব উদাহরণসমেত বলে দিলেন, 'আল্লাহর রাসুল তো রোজা অবস্থায়ও আমাকে চুমু দিয়ে থাকেন।'

নারীটির জন্য এ উত্তর যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি হয়ে গেল।

রাসুলের সেবায় উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা পূর্ণ খেয়াল রাখতেন। যেদিন তাঁর পালা থাকত, সেদিন তিনি ঘরদোর পরিচ্ছন্ন করে রাখতেন। রাসুলের পছন্দনীয় খাবার রান্না করার চেষ্টা করতেন। সাফিনা নামে তাঁর একজন ক্রীতদাসী ছিল। তিনি তাকে এই শর্তে মুক্ত করে দেন—রাসুল যত দিন জীবিত থাকবেন, তত দিন তাঁর সেবা করবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামও উম্মে সালামাকে তাঁর বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার জন্য যথেষ্ট সম্মান করতেন। প্রতিদিন জোহর বা আসরের নামাজের পর তিনি এক-এক করে সকল স্ত্রীর ঘরে যেতেন এবং তাঁদের হালপুরস্তি করতেন। এই হালপুরস্তি শুরু করতেন উম্মে সালামার ঘর থেকে এবং শেষ করতেন আয়েশার ঘরে এসে।

উম্মে সালামা বরকতের উদ্দেশ্যে রাসুলের কয়েকটি চুল একটি কৌটোর মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। রাসুল-পরবর্তী সময়ে অনেকেই আসত এ চুল থেকে বরকত গ্রহণের জন্য।

www.pathagar.com

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদিন উম্মে সালামার ঘরে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে উম্মে সালামার মেয়ে জয়নবও ছিল। এমন সময় সেখানে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর দুই ছেলে হাসান ও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করলেন। রাসুল তাঁর মেয়ে ও দুই নাতিকে দেখে তাঁদের বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এরাই হলো আমার আহলে বাইত (উত্তরাধিকারী পরিবার)। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন এবং তাদের নিজ রহমত দ্বারা ঢেকে নিন।'

রাসুলের এ কথা শুনে উম্মে সালামা কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁকে কাঁদতে দেখে রাসুল বলে উঠলেন, 'তুমি আবার কাঁদছ কেন?'

উম্মে সালামা চোখ মুছে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আহলে বাইত বলে আমাদের মাঝে দেয়াল তুলে দিলেন যে! আপনি আমি এবং আমার কন্যাকে ভুলে গেছেন।'

রাসুল তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তুমি এবং তোমার মেয়েও আমার আহলে বাইত।'

উম্মে সালামার মেয়ে জয়নবকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ভালোবাসতেন। একদিন তিনি গোসল করছিলেন, এমন সময় ছোট্ট জয়নব রাসুলের মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। রাসুলও দুষ্টুমি করে তার দিকে পানি ছিটিয়ে দিলেন।

উম্মে সালামার অন্য সন্তানদেরও তিনি যথেষ্ট স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে প্রতিপালন করেন। উম্মে সালামার ছেলে সালামার সঙ্গে তাঁর চাচা হামজার কন্যা উমামার বিয়ে দেন। বিয়ের পর তিনি নতুন বর-বধূর দিকে তাকিয়ে সাহাবিদের সম্বোধন করে বলেন, 'দেখো, আমার পক্ষ থেকে সালামার জন্য এ ক্ষুদ্র উপহার।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, তখন উম্মে সালামার পরামর্শেই জীবনের শেষ কটা দিন তাঁকে আয়েশার ঘরে স্থানান্তর করার ব্যবস্থা করা হয়। রাসুলের জীবনের শেষ মুহূর্তেও তিনি তাঁর বিচক্ষণতা ও ভালোবাসা দিয়ে রাসুলকে আনন্দিত করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি সেটা করতে পেরেছিলেন।

রাসুলের পরলোকগমনের পর আরবের মানুষ সকল উম্মুল মুমিনিনকে শ্রদ্ধাভরে সম্মান জানাত। কিন্তু উম্মুল মুমিনিন আয়েশা এবং উম্মে সালামা

www.pathagar.com

রাদিয়াল্লাহু আনহাকে সম্মান জানানোর মাত্রা বরাবরই বর্ধিত ছিল। কারণ, এ দুই মহীয়সী ইসলামি জ্ঞানের প্রধান দুই আধার–হাদিস ও ফিকাহ বিষয়ে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন এবং মানুষের ধর্মীয় বিষয়ে ফতোয়া দেওয়ার ব্যাপারে তাঁদের রায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হতো।

উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা সর্বমোট ৩৭৮টি হাদিস বর্ণনা করেন। বুখারি ও মুসলিম শরিফে সম্মিলিতভাবে তাঁর ১৩টি হাদিস উদ্ধৃত রয়েছে। তাঁর থেকে প্রায় ১২ জন সাহাবি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে আবু হোরায়রা ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসও রয়েছেন।

উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা ৬৩ হিজরি সনে ৮৪ বছর বয়সে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। তিনি মৃত্যুর আগে অসিয়ত করেন–তাঁর জানাজার নামাজ যেন সায়িদ ইবনে জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু পড়ান। কিন্তু সায়িদ ইবনে জায়েদ তাঁর মৃত্যুর আগেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আরও অসিয়ত করে গিয়েছিলেন–তাঁর জানাজার ইমামতি যেন মদিনার তখনকার গভর্নর ওলিদ ইবনে ওতবা না পড়ান। তিনি শাসকগোষ্ঠীর তাকওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। এ কারণে মৃত্যুর পর তাঁর জানাজা পড়ান হাদিস বর্ণনাকারী প্রখ্যাত সাহাবি আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু।

নববি আলোয় উদ্ভাসিত এ অত্যুজ্জ্বল দীপমণিকে মদিনার জান্নাতুল বাকিতে চিরনিদ্রায় সমাহিত করা হয়।

এক নজরে

জন্ম: ৫৯৬ খ্রিষ্টাব্দ।

বিয়ে: বিয়ের সময় উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স ছিল ২৬/২৯ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ৫৬।

বিবাহ: চতুর্থ হিজরির শাওয়াল মাস।

দাম্পত্যজীবন: রাসুলের সাথে তাঁর দাম্পত্যকাল ৭ বছর।

মৃত্যু: ৬০/৬৩/৬৪ হিজরি।

দাফন: মদিনার জান্নাতুল বাকিতে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০/৮৪ বছর।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উম্মুল মুমিনিন
জয়নব বিনতে জাহাশ অধ্যায়
রাদিয়াল্লাহু আনহা

এক

রাসুলের পালক পুত্র জায়েদ ইবনে হারিসা তাঁর স্ত্রী উম্মে আয়মানকে কিছু একটা বলতে চান, কিন্তু জড়তার কারণে বলতে পারছেন না। জায়েদ এমনিতেই একটু চাপা স্বভাবের, নিজের মনের কথা খুলে বলতে পারেন না। তবে আজকে কথাটা উম্মে আয়মানকে বলবেন বলে বেশ কয়েকদিন থেকে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন।

তাঁর স্ত্রী উম্মে আয়মান বয়স্ক নারী। জায়েদের সঙ্গে তাঁর বয়সের পার্থক্য অনেক। প্রায় ২০ থেকে ২৫ বছরের ব্যবধান দুজনের মধ্যে। তবু তাদের সংসারে শান্তির অভাব নেই। পুত্র উসামাকে নিয়ে তাঁদের সুখের সংসার। মক্কা থেকে মদিনায় এসে প্রায় চার বছর ধরে জায়েদের সংসার আগলে রেখেছেন উম্মে আয়মান।

তবে উম্মে আয়মানের বয়স তত দিনে ৬০ পেরিয়েছে। সংসারের কাজ আঞ্জাম দিতে পারলেও স্বামী সংসর্গের ব্যাপারে তিনি আর সক্ষম নন। জায়েদ এখনো প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছাননি, যথেষ্ট যুবক তিনি। এ কারণেই জায়েদ মনে মনে চাচ্ছেন আরেকটি বিয়ে করতে। কিন্তু উম্মে আয়মানকে কথাটা কীভাবে বলবেন, সেটা বুঝে ওঠতে পারছেন না।

একসময় দুরু দুরু বুক নিয়ে উম্মে আয়মানকে বলে ফেললেন, আমি আরেকটি বিয়ে করতে চাচ্ছি।

জায়েদের কথায় উম্মে আয়মান মোটেও অবাক হলেন না। তাঁর নিস্পৃহ ভাব দেখে মনে হলো, তিনি যেন এ কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন

www.pathagar.com

অনেক দিন থেকে। জায়েদের এমন প্রস্তাবে তিনি জবাব দিলেন, তোমার উচিত রাসুলের সঙ্গে কথা বলা। তোমার বিয়ের ব্যাপারে তিনি সবচেয়ে ভালো পরামর্শ দিতে পারবেন।

উম্মে আয়মান স্বামীকে শুধু বিয়ের অনুমতিই দিলেন না, বরং বিয়ের ব্যাপারে তার জন্য কোন সিদ্ধান্ত ভালো হবে সেটারও পরামর্শ দিলেন।

রাসুল একদিকে যেমন জায়েদের পালক পিতা, অন্যদিকে উম্মে আয়মান তাঁর পালক মাতা। সুতরাং এ দুজনের সাংসারিক সকল সিদ্ধান্ত রাসুলের জ্ঞাতসারে হবে, এটাই স্বাভাবিক। জায়েদ সুযোগমতো নিজের বিয়ের বিষয়টি রাসুলকে জানিয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

দুই

উম্মুল মুমিনিন জয়নব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে ইসলাম আবির্ভাবের শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি হিজরতের দেড়-দুই বছর আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও তাঁর স্ত্রী জয়নব বিনতে খোজায়মা এবং উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও তাঁর স্ত্রী উম্মে হাবিবা, বোন হামনাহ বিনতে জাহাশ ইসলামের প্রাথমিক সময়ে মুসলমান হন। প্রাথমিক সময়ে ইসলাম গ্রহণের কারণে মক্কার বিধর্মীদের দ্বারা তাঁর পরিবার সীমাহীণ লাঞ্ছনার শিকার হয়। এ লাঞ্ছনা থেকে বাঁচতে রাসুলের নির্দেশে অন্য অনেকের সঙ্গে তাঁর ভাই উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও তাঁর স্ত্রী উম্মে হাবিবা ইথিওপিয়ায় রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। জয়নব এ সময় মক্কায় ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর ভাইদের সঙ্গে মদিনায় হিজরত করেন।

আত্মীয়তার দিক থেকে জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুলের ফুফাত বোন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ ফুফুর পরিবারকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। তাঁর ফুফাত ভাইয়েরা মক্কার দুঃসময়ে ইসলাম গ্রহণ করে তাঁকে শক্তি সাহসে বলীয়ান করেছিলেন। ইসলামের জন্য তাঁদের আত্মত্যাগ রাসুল সবসময় শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। সে শ্রদ্ধা থেকেই উহুদের যুদ্ধের পর ফুফাত ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ মৃত্যুবরণ করলে রাসুল তাঁর বিধবা স্ত্রী জয়নব বিনতে খোজায়মাকে বিয়ে করে সম্মানিত করেন। যদিও বিয়ের মাত্র তিন-চার মাস পরই জয়নব বিনতে খোজায়মা রাদিয়াল্লাহু আনহা অসুস্থাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

জয়নব বিনতে জাহাশও এ সময় বৈধব্যের জীবন যাপন করছিলেন।

রাসুলের নির্দেশক্রমে জায়েদ ইবনে হারিসা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলেন জয়নব বিনতে জাহাশের কাছে। জয়নবের পরিবারের কয়েকজন সদস্য সেখানে উপস্থিত। সদস্যদের উপস্থিতিতে তিনি জয়নবকে বিয়ে করার আগ্রহ পেশ করলেন।

জয়নব এবং তাঁর পরিবারের লোকজন মনে করেছিলেন বিয়ের প্রস্তাব স্বয়ং রাসুলের কাছ থেকে এসেছে, হয়তো রাসুল নিজেই জয়নবকে বিয়ে করতে আগ্রহী। এ কারণে তাঁরা আশান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু যখন শুনলেন প্রস্তাব জায়েদের জন্য, তখন তাঁরা বেঁকে বসলেন। জয়নব ব্যক্তিগতভাবে কামনা করতেন, রাসুল তাঁকে বিয়ে করবেন।

বংশীয় সমতা অনুযায়ী জয়নব এবং জায়েদ সমকক্ষ নন। কেননা জয়নব ছিলেন মক্কার কুরাইশ গোত্রের মেয়ে, অপরদিকে জায়েদ এক সামান্য মুক্ত ক্রীতদাস। তা ছাড়া জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা যথেষ্ট রূপবতী, তাঁর আত্মসম্মানবোধও ছিল প্রখর। হিজরত করে মদিনায় আসার পর মুহাজির-আনসারদের অনেক পুরুষ তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু রাসুলকে বিয়ে করার অভিপ্রায়ে তিনি সবার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। এ কারণে জায়েদকেও জয়নবের বাড়ি থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হলো।

জয়নবের বাড়ি থেকে ফিরে এসে জায়েদ বৃত্তান্ত জানালেন রাসুলের কাছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজে জায়েদের সঙ্গে জয়নবের বিয়ের আহ্বায়ক ছিলেন। জায়েদ যখন আরেকটি বিয়ে করার ব্যাপারে রাসুলের কাছে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন রাসুল উদ্যোগী হয়ে তাঁকে জয়নবের কাছে পাঠান বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে। কিন্তু জয়নব ও তাঁর পরিবার এভাবে সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দেবে, সেটা তিনি ভাবতে পারেননি।

রাসুল ভালো করে জানতেন, জয়নব ও জায়েদের বংশীয় মর্যাদা সমান নয়। তবু তিনি চাইছিলেন এ বিয়ের মাধ্যমে আরবীয় সমাজে প্রচলিত বংশীয় কৌলিন্য রক্ষার রীতি-নীতি ধীরে ধীরে দূরীভূত হোক। আর রাসুল যখন কোনো সামাজিক রীতি ভেঙে ধর্মীয় সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন, সবার আগে নিজে সেটা করে দেখাতেন অথবা তাঁর পরিবারের সদস্যদের মাঝে সেগুলোর অনুশীলন করতেন। এ কারণেই তিনি জায়েদের মাধ্যমে বংশীয় কৌলিন্যের অহমবোধকে বিদূরিত করতে চেয়েছিলেন।

www.pathagar.com

একদিক দিয়ে দেখলে বংশমর্যাদায় জায়েদ একেবারে হেলার পাত্র নন। ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি হওয়ার আগে তিনি ইয়েমেনের তায়ি গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সন্তান ছিলেন। রাসুলের ক্রীতদাস হওয়ার পর রাসুল তাঁকে মুক্ত করে নিজের পুত্র হিসেবে বরণ করে নেন। সে হিসেবে তিনিও সম্মানের পাত্র।

যাই হোক, জয়নবের পরিবার থেকে বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়ায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেই উদ্যোগী হলেন এবার। তিনি জয়নব ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালা বিবদমান বিষয়টি নিয়ে নির্দেশনা অবতীর্ণ করলেন:

> 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদেশ অমান্য করে; এমন করলে তারা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে।' (সুরা আহজাব, আয়াত ৩৬)

আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন ভীতিপ্রদ নির্দেশনা শুনে জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা আর কোনো কথা বাড়ালেন না। তিনি বিনা বাক্যে রাসুলের প্রস্তাব মেনে নিলেন। অবশেষে রাসুলের মধ্যস্থতায় জায়েদ ও জয়নবের বিয়ে হয়ে গেল।

এখানে একটি বিষয়ের অপনোদন হওয়া প্রয়োজন। অধিকাংশ সিরাত ও ইতিহাসগ্রন্থে বিবৃত হয়েছে, জায়েদের সঙ্গে জয়নবের এটিই প্রথম বিয়ে ছিল। এর আগে জয়নবের আর কোনো বিয়ে হয়নি।

কিন্তু নানা কারণে এই তথ্য গ্রহণ করা সম্ভব নয়। জায়েদের সঙ্গে যখন জয়নবের বিয়ে হয় তখন তাঁর বয়স ৩৪/৩৫। এ বয়সে আরবের একজন মেয়ে অবিবাহিত থাকবে, এমনটি ভাবা কষ্টকর। সিরাত রচয়িতাদের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি রাসুলপত্নীদের মধ্যে যথেষ্ট রূপসী ছিলেন। আবার যেখানে আরবের মেয়েদের সাধারণভাবে ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে বিয়ে হয়ে যেত, সেখানে জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা ৩৪/৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত বিবাহহীন থাকবে, এমনটি ভাবনার অতীত।

তাঁর এই অবিবাহিত থাকার ব্যাপারে গ্রন্থকারগণ নির্দিষ্ট কোনো কারণ উল্লেখ করতে পারেননি। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি রাসুলকে বিয়ে করার বাসনায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিয়ে করেননি। কিন্তু এই মত কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এমন পরিস্থিতি ঘটে থাকলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কিছুতেই তা মেনে নিতেন না এবং এ ব্যাপারে হাদিসের স্পষ্ট ভাষ্য থাকাটাই

www.pathagar.com

যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো হাদিসের বর্ণনা নেই। যারা এমন বর্ণনা করেন, তা সর্বৈব মনগড়া, ভিত্তিহীন।

সবচে গ্রহণযোগ্য বর্ণনা যেটি পাওয়া যায়, ইমাম তাবারি (রহ.) তাঁর 'তারিখুর রাসুল ওয়াল মুলুক' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন–মক্কায় থাকতে জয়নব বিনতে জাহাশের বিয়ে হয়েছিল। তাবারি তাঁর স্বামীর নাম উল্লেখ করতে পারেননি। তবে তিনি নিশ্চিত করেছেন, হিজরতের তিন বছর আগে ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে জয়নবের স্বামী মক্কায় মারা যান। স্বামী মারা যাওয়ার পর বিধবা অবস্থায় তিনি মক্কায় কিছুদিন অবস্থান করেন, এরপর ভাইদের সঙ্গে মদিনায় চলে আসেন।

যদিও ইমাম তাবারি ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে এর বর্ণনা পাওয়া যায় না, কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে এটিকেই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা বলে মনে হয়েছে। জায়েদের সঙ্গে জয়নবের এটি প্রথম বিয়ে নয়, এটি ছিল তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে।

তিন

জায়েদ এবং জয়নবের বিয়েটা শেষতক সুখের হল না। বিয়ের পর থেকে সংসারে নানা ধরনের অশান্তি লেগে রইল। দুজনের মনের মিল হচ্ছিল না কিছুতেই। জয়নব প্রথমত এ বিয়েতে রাজি ছিলেন না, এ কারণে জায়েদের ব্যাপারে তাঁর মনোতুষ্টির অভাব ছিল। তা ছাড়া তিনি কিছুটা উষ্ণ মেজাজের মানুষ ছিলেন। কোনো কারণে দুজনের মধ্যে সামান্য বিষয় নিয়ে তর্ক লেগে গেলে তিনি জায়েদকে দু' কথা শোনাতে ছাড়তেন না।

সংসারে এমন অশান্তির কারণে অধিকাংশ সময় জায়েদ মন খারাপ করে থাকতেন। জায়েদের আগের স্ত্রী উম্মে আয়মান বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের সংসারে কখনো অশান্তির ছাপ লাগেনি। জায়েদ এবং জয়নব সমবয়সী হওয়ায় দুজনের বোঝাপড়াটা আরো দৃঢ় হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঘটছিল তার বিপরীত।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি বুঝতে পেরে একদিন জায়েদের ঘরে গেলেন দুজনকে বুঝাতে। কিন্তু জায়েদ তখন ঘরে ছিলেন না। জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুলকে দেখে ভেতরে আসতে বললেন। এ সময় জয়নবের চেহারা ছিল বিধ্বস্ত, চুল উষ্কখুষ্ক। সংসারের অশান্তি তাঁর অবয়বেও তীব্রভাবে ফুটে ওঠেছিল।

www.pathagar.com

তখন পর্যন্ত পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়নি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জয়নবের এমন অবিন্যস্ত চেহারা দেখে ব্যথিত কণ্ঠে বলে ওঠলেন, 'আল্লাহর কী করুণা! তিনি হৃদয়কে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যান!'

জয়নবের বিধ্বস্ত চেহারা-সুরত রাসুলকে প্রবলভাবে নাড়া দিল। তিনি অল্প সময় জয়নবের সঙ্গে কথা বলে ফিরে এলেন।

জায়েদ বাড়িতে এসে যখন শুনতে পেলেন রাসুল তাঁর ঘরে এসেছিলেন, তখন তিনি রাসুলের আগমনের বিষয়টি তাঁর জন্য সুযোগ বলে ধরে নিলেন। যেহেতু রাসুল তাঁর ঘরের বাস্তব অবস্থাটা অবলোকন করেছেন, সুতরাং এখন তিনি একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলের কাছে এসে জয়নবকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে অনুমতি চাইলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারলেন না। স্বামী-স্ত্রী দুজনই তাঁর অতি আদরের মানুষ। বিশেষত জায়েদ তো তাঁর আত্মার আত্মীয়। তাঁর সংসার এভাবে ভেঙে যাবে, এটা তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল। তিনি জায়েদকে নিষেধ করলেন এমন সিদ্ধান্ত নিতে। তাঁকে বললেন, 'আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমার স্ত্রীর হাত ছেড়ো না। তালাকের ব্যাপারে এখনই কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে বিরত থাকো।'

তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু তাঁদের সম্পর্কটা আর সান্ত্বনার জায়গায় ছিল না। দাম্পত্য সম্পর্ক দিন দিন খারাপ থেকে খারাপ হচ্ছিল। একদিন কোনো কারণে দুজনের কথা কাটাকাটি চলছিল, তর্কের একপর্যায়ে জায়েদ জয়নবকে তালাক দিয়ে দিলেন।

তালাক দেয়ার পর তিনি রাসুলের কাছে এসে এ ব্যাপারে অবহিত করলে রাসুল আফসোস করা ছাড়া আর কোনো উপায় দেখতে পেলেন না।

এ বিয়ে মাত্র এক বছর টিকে ছিল।

যা হবার হয়ে গেছে। এখন ভবিষ্যত করণীয় কী, সে ব্যাপারে চিন্তা করতে লাগলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। জায়েদ এবং জয়নবের বিয়েটা যেহেতু তিনি নিজ উদ্যোগে সম্পাদন করেছিলেন, এ কারণে বর্তমান পরিস্থিতি সামলানোর দায়িত্ব তাঁর ওপর এসে পড়ে। বিশেষত জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা আগে থেকেই এ বিয়েতে রাজি ছিলেন না, এখন এ অবস্থায় কী করণীয়–সেটা রাসুলকে নির্ধারণ করতে হবে।

পারিবারিক দিক থেকে জয়নবের পরিবার যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত। তেমনি রাসুলের প্রতি জয়নবের দুর্বলতা রাসুলকে নতুন চিন্তা করতে বাধ্য করল। তিনি মনে

www.pathagar.com

করলেন, যদি তিনি জয়নবকে বিয়ে করে সম্মানিত করতে পারতেন তাহলে জয়নবের মনোবেদনা অনেকখানি লাঘব হত। কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব? জয়নব ছিলেন তাঁর পালক পুত্রের স্ত্রী। পালক পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করলে সারা আরবে ঢিঢি পড়ে যাবে। আরবে এমন বিয়ের প্রচলন নেই। তিনি লোকলজ্জার ভয়ে মনের উদ্গাত ইচ্ছাকে মনেই চেপে রাখলেন।

কিন্তু এর চেয়ে সুন্দর আর কোনো সমাধান ছিল না। লোকলজ্জার ভয়ে তিনি সমাধানের বিষয়টি গোপন রাখলেও আল্লাহ্ ওহি অবতীর্ণের মাধ্যমে এ সমাধানকে কার্যে পরিণত করার ব্যাপারে পরামর্শ দিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ভেবেছিলেন, আল্লাহর নির্দেশনা নিতান্ত পরামর্শমূলক। এ কারণে ঐশী নির্দেশনা অবতীর্ণের পরও তিনি বিষয়টি নিয়ে কারো সঙ্গে কোনো আলোচনা না করে চুপ রইলেন। কিন্তু আল্লাহর এ নির্দেশনা কেবল পরামর্শমূলক ছিল না, এ ছিল রাসুলের জন্য কার্যে পরিণত করার অত্যাবশ্যকীয় নির্দেশনা। ফলে আল্লাহ্ তায়ালা ঘটমান বিষয়ে দ্বিতীয়বার দীর্ঘ আয়াত অবতীর্ণ করলেন:

> 'স্মরণ করুন, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাঁকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন; আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। অতঃপর জায়েদ যখন তাঁর স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাঁকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাঁদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে।' (সুরা আহজাব, আয়াত ৩৭)

এ নির্দেশনার পর রাসুলের জন্য ভিন্ন কোনো পথ খোলা ছিল না। জয়নবের তালাক পরবর্তী ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তিনি জায়েদকে ডেকে আল্লাহর নির্দেশনা শোনালেন। এমন সংবাদ জায়েদের জন্যও ছিল স্বস্তিদায়ক। এ কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জায়েদকে বার্তাবাহক হিসেবে জয়নবের কাছে পাঠালেন বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে। জায়েদ যেহেতু জয়নবের একান্ত ছিলেন, সে হিসেবে বিষয়টি তিনিই সুন্দরভাবে পরিবেশন করতে পারবেন।

www.pathagar.com

জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এলেন জয়নবের বাড়িতে। জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন আটার খামিরা মাখছিলেন। তাঁর হাতে আটা মাখানো। জায়েদকে আসতে দেখেই তিনি তাঁর চেহারা আরেক দিকে ফিরিয়ে নিলেন। সদ্যই তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছে, ফলে কিছুটা বিব্রতবোধের ব্যাপার ছিল। তবে জায়েদ বিব্রতবোধ দূর করতে সঙ্গে সঙ্গে জানালেন, আমি রাসুলের পক্ষ থেকে তোমার জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

জয়নব জায়েদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেও রাসুলের প্রস্তাব শুনে মুহূর্তে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠল। তিনি আনন্দ গোপন করে জায়েদকে জানালেন, 'আমি এখনই কোনো সিদ্ধান্ত জানাতে পারছি না। আল্লাহর সঙ্গে পরামর্শ করে তারপর তোমাকে জানাব, অপেক্ষা করো।'

জায়েদকে বসিয়ে রেখে জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা সেখান থেকে উঠে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এস্তেখারার নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। আল্লাহর সঙ্গে পরামর্শ করে এসে জায়েদকে জানালেন, তিনি এ বিয়েতে সম্মত। এমন শুভ সংবাদ নিয়ে আসায় তিনি তাঁর গায়ের সব গয়না খুলে জায়েদকে উপহার দিয়ে দিলেন।

জায়েদ জয়নবের সম্মতির কথা জানালে কিছুক্ষণ পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জয়নবের ঘরে এলেন। তবে ঘরে ঢোকার আগে তিনি কোনো প্রকার অনুমতি না নিয়ে সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়লেন। কেননা, তাঁর ও জয়নবের বিয়ে ততক্ষণে সমাধা হয়ে গেছে। স্বয়ং আল্লাহ কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করে এ বিয়ের সত্যায়ন করেছেন। কোনো লোকায়ত আনুষ্ঠানিক রীতি পালনের প্রয়োজন হয়নি।

পরবর্তীতে বিয়ের মোহর হিসেবে ৪০০ দিরহাম নির্ধারণ করা হয়।

চার

রাসুলের বাড়িতে মদিনার মানুষের ঢল নেমেছে। বিয়ে উপলক্ষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আনাস ইবনে মালিককে ডেকে বলেছিলেন, তুমি অমুক অমুককে আমার বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসো। আমি সামান্য ওলিমার ব্যবস্থা করেছি। যাঁদেরকে ডাকতে বলা হয়েছে, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের তো ডাকলেনই, পথে যাকে পেলেন তাঁকেই রাসুলের বাড়িতে বিয়ের দাওয়াত দিতে লাগলেন। ফলে দেখা গেল, দিনভর রাসুলের বাড়িতে লোকজনের সমাগম হতে লাগল।

রাসুল আনাসের মা উম্মে সুলাইমকে ডেকে এনে মালিদা ও ভেড়ার মাংস রান্না করালেন। নববধূ জয়নবের ঘরে আগত অতিথিদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা

www.pathagar.com

করা হল। ঘরে ১০ জন করে অতিথি ডেকে নেয়া হত, তাদের খাওয়া শেষ হলে আবার ১০ জন এসে খেয়ে যেত। এভাবে প্রায় ৩০০ লোক ওলিমার দাওয়াতে অংশগ্রহণ করেন। রাসুলের আর কোনো স্ত্রীর বিয়েতে এত বড় ওলিমা করা হয়নি।

তবে এ ওলিমা উপলক্ষে আগত অতিথিদের নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিল। অতিথিদের অনেকে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে রাসুলের ঘরের আঙিনায় বসে বসে গল্প-গুজব করছিলেন। এতে রাসুল যেমন ঘরে বিশ্রামের সুযোগ পাচ্ছিলেন না, তেমনি নববধূ জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহাও ঘরে বসে বিব্রতবোধ করছিলেন। তিনি তখন ঘরের ভেতর দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে ছিলেন। সম্ভ্রমের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ এভাবে বসে থাকার ফলে তিনি বিরক্ত হয়ে ওঠছিলেন, আবার আগত অতিথিদের কিছু বলতেও পারছিলেন না। এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ পর্দার বিধান অবতীর্ণ করলেন:

> 'হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবির গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমরা আহুত হলে প্রবেশ করো এবং খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা নবির জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ সত্যকথা বলতে সংকোচ করেন না। তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আল্লাহর রাসুলকে কষ্ট দেয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ।' (সুরা আহজাব, আয়াত ৫৩)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরের আশপাশে গল্প-গুজবে মত্ত লোকদের পর্দার ব্যাপারে আল্লাহর বিধান শুনিয়ে দিলেন। সেদিন থেকে ইসলামে পর্দার বিধান বিধিবদ্ধ হয়।

উম্মুল মুমিনিন জয়নব বিনতে জাহাশ রাসুলের ঘরের ঘরনি হয়ে এলেন। বংশীয় দিক থেকে তিনি ছিলেন রাসুলের নিকটাত্মীয় এবং যথেষ্ট রূপসী, অপরদিকে তাঁর বিয়ের নির্দেশনা এসেছিল সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে। এসব কারণে অন্য রাসুলপত্নীদের মধ্যে তাঁর সম্মানের আলাদা একটা স্থান ছিল।

www.pathagar.com

রাসুলের স্ত্রীদের মাঝে এমন প্রতিযোগিতা ছিল–কে রাসুলের অধিক প্রিয়। তখন ধারণা করা হত, আয়েশার পরই জয়নবের স্থান।

এ কথাও প্রণিধানযোগ্য, আয়েশার প্রতি রাসুলের অনুরক্ততার কারণে জয়নব একবার রাসুলের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাঁকে এ ব্যাপারে সমতা বিধান করতে অনুরোধ করলে আয়েশার সঙ্গে জয়নবের সামান্য বাদানুবাদ হয়। তা ছাড়া একদিন রাতের বেলা আয়েশার ঘরে আয়েশা এবং জয়নব বসে ছিলেন। এমন সময় রাসুল ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে অন্ধকারে জয়নবের দিকে হাত বাড়ালে এক বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখনও কিছু কটূ কথা বিনিময় হয় আয়েশা ও জয়নবের মধ্যে। কিন্তু এত কিছুর পরও মদিনার মুনাফিকরা যখন আয়েশার চরিত্রে অপবাদের কালিমা লেপন করতে উঠে পড়ে লাগে, তখন জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম করে বলছি, আয়েশার ব্যাপারে ভালো ছাড়া এক বিন্দু মন্দ কথা আমার জানা নেই।'

আবার আয়েশা যখন জয়নবের কথা স্মরণ করতেন তখন বলতেন, 'রাসুলের স্ত্রীদের মধ্যে জয়নবই একমাত্র আমার প্রতিযোগী ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর খোদাভীতি দিয়ে নিজের স্থান অনেক উচেচ তুলে ধরেছিলেন। সত্য বলতে তিনি কখনো দ্বিধা করতেন না। আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে বরাবর সচেতন ছিলেন। দান-সদকায় তাঁর তুলনা তিনি নিজেই এবং আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার জন্য নিজের সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করতেন।'

জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা কিছুটা চাপা স্বভাবের ছিলেন এবং কিছুটা উষ্ণ মেজাজের ছিলেন। তবে তাঁর স্বভাবের উষ্ণতা কখনোই তাঁকে সীমা অতিক্রমে উদ্বুদ্ধ করেনি। তিনি হঠাৎই রেগে যেতেন আবার জলদি তাঁর রাগ পড়ে যেত।

একবার এক হজের সফরে রাসুলের অন্য স্ত্রীদের সঙ্গে জয়নব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহাও রাসুলের সফরসঙ্গী ছিলেন। সফরের মাঝে উম্মুল মুমিনিন সাফিয়্যার উট অসুস্থ হয়ে পড়ে। জয়নবের সঙ্গে একাধিক উট ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'তোমার একটি উট সাফিয়্যাকে দাও।'

জয়নব রাদিয়াল্লাহু আগপিছু কিছু না ভেবে বলে বসলেন, 'আমি ওই ইহুদির মেয়েকে আমার উট দেব? কক্ষনো না!'

তাঁর এ কথায় রাসুল এতটাই কষ্ট পান যে, পরবর্তী আড়াই মাস পর্যন্ত তিনি জয়নবের ঘরেও যাননি এবং তাঁর সঙ্গে মন খুলে কথাও বলেননি। অনেকবার ক্ষমা চাওয়ার পর রাসুল তাঁর এমন দাম্ভিক আচরণ ক্ষমা করেন।

www.pathagar.com

জয়নব বিনতে জাহাশ পরবর্তী সময়ে বলতেন, 'আল্লাহর রাসুলের এমন অসন্তুষ্টি আমাকে একপ্রকার নিরাশ করে ফেলেছিল। আমি শপথ করেছিলাম, জীবনে আর কোনো দিন এমন কথা বলব না।'

রাসুলের ভালোবাসা তাঁর স্ত্রীদের মাঝে এমনই কাম্য ছিল, রাসুলের সামান্য অসন্তুষ্টি তাঁদের অস্থির করে তুলত। সেখানে আড়াই মাস সম্পর্কহীন থেকে জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা পাগলপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। অবশেষে রাসুলের ক্ষমা ঘোষণা হলে তিনি নিজেকে সুস্থির করতে পারেন।

দান-সদকায় জয়নব বিনতে জাহাশের খ্যাতি ছিল প্রবাদতুল্য। মদিনার গরিব-দুঃখীদের মাঝে তিনি অসহায়ের সহায় হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর ঘরে এসে কেউ কখনো খালি হাতে ফিরে যেত না। রাসুল নিজেও জয়নবের এমন দানশীলতাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন।

একদিন রাসুলপত্নীরা রাসুলের সঙ্গে একত্রে বসে ছিলেন। কোনো এক স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনার পরলোকগমনের পর স্ত্রীদের মধ্যে কে সবার আগে আপনার সঙ্গে মিলিত হবে?'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, 'তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে বড়, সে আমার সঙ্গে সবার আগে মিলিত হবে।'

রাসুলের এমন উত্তরের পর সবাই যার যার হাত মাপতে লাগলেন। দেখা গেল, সাওদার হাত সবার চেয়ে বড়। কিন্তু উম্মুল মুমিনিনদের মধ্যে রাসুলের ইন্তেকালের পর সবার আগে পরলোকগমন করেন জয়নব বিনতে জাহাশ। তখন অন্য উম্মুল মুমিনিনরা বুঝতে পারেন, 'বড় হাত' দিয়ে রাসুল মূলত দানশীলতায় যার হাত অধিক বড়, এটা বোঝাতে চেয়েছিলেন। জয়নব বিনতে জাহাশের দানশীলতার কথা মক্কা-মদিনায় মশহুর হয়ে ছিল। তিনি মারা যাওয়ার পর মদিনার গরিব-দুঃখীদের মাঝে মাতম শুরু হয়ে যায়–হায়! এখন কে আমাদের সহায় হবে!

রাসুলের ভালোবাসার ছায়ায় থেকে সকল উম্মুল মুমিনিনই নিজেদের জীবনকে কোনো না কোনো মহত্ত্বে উচ্চকিত করে তুলেছিলেন। কেউ ছিলেন হাদিসবিশারদ, কেউ জ্ঞানের আধার, কেউ খোদাভীতিতে অতুলনীয়, কারো ছিল কুরআন পাঠের মুগ্ধকর চরিত্র, তেমনি দানশীলতায় জয়নব ছিলেন অদ্বিতীয়া।

বিদায় হজের সময় রাসুলের নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি রাসুলের মৃত্যুর পর কখনো মদিনার বাইরে যাননি। রাসুলের মৃত্যুর সাত বছর পর ২০ হিজরি সনে

www.pathagar.com

উম্মুল মুমিনিন জয়নব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন। রাসুলের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এ নশ্বর পৃথিবীকে বিদায় জানান। এসময় ইসলামি খেলাফতের খলিফা ছিলেন উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। উমর নিজে তাঁর কাফন-দাফনের তত্ত্বাবধান করেন।

মৃত্যুর আগে রাসুলের প্রিয়তমা জয়নব বিনতে জাহাশ নিজ কাফনের কাপড়ের বন্দোবস্ত নিজেই করে গিয়েছিলেন। তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী তাঁকে সে কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয় এবং উমর রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জানাজার নামাজ পড়ান।

জানাজার পর রাসুলের অন্য স্ত্রীদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, জয়নবের কবরে তাঁর লাশ কে কে নামাবে? রাসুলের স্ত্রীগণ জবাব দেন, যাঁরা তাঁর ঘরে প্রবেশের অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন তাঁরাই তাঁকে কবরে নামাবে। তাঁদের নির্দেশনা অনুযায়ী উম্মুল মুমিনিনের সৎপুত্র উসামা ইবনে জায়েদ, ভাতিজা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, ভাই আহমদ ইবনে জাহাশ এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাঁকে কবরে নামান।

রাসুলের প্রিয়তমা জয়নব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর প্রেম ও চারিত্রিক অনন্যতা দিয়ে মুসলিম অন্তরে অমর হয়ে থাকবেন চিরদিন।

এক নজরে

জন্ম: ৫৯০ খ্রিষ্টাব্দ।

বিয়ে: বিয়ের সময় জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স ছিল ৩৬/৩৭ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ৫৭।

বিবাহ: ২৭ মার্চ ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক পঞ্চম হিজরির শুরুর দিকে।

দাম্পত্যজীবন: রাসুলের সাথে তাঁর দাম্পত্যকাল ৬ বছর।

মৃত্যু: ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ২০ হিজরি।

দাফন: মদিনার জান্নাতুল বাকিতে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫১/৫৩ বছর।

www.pathagar.com

উম্মুল মুমিনিন

জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস অধ্যায়

রাদিয়াল্লাহু আনহা

এক

বনু মুস্তালিক দুর্গের পতন হয়েছে। দুর্গাধিপতি হারিস ইবনে জিরার পলাতক। তার অবর্তমানে মুস্তালিকের সেনাপতি ছিল তার জামাতা মুসাফফা ইবনে সাফওয়ান। সে-ও মুসলিমদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে নিহত হয়েছে। যুদ্ধ ছিল খণ্ডকালীন, সম্মুখসমরে বনু মুস্তালিকের ১১ জন যোদ্ধা নিহত হওয়ার আগেই তাদের দুর্গাধিপতির পলায়ন এবং সেনাপতির নিহত হওয়ার সংবাদ তাদের হতোদ্যম করে ফেলে। অগত্যা তারা হাতিয়ার রেখে আত্মসমর্পণ করে মুসলিম সেনাপতি আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে।

এটা হিজরি পঞ্চম সনের শাবান মাসের ঘটনা। কিছুদিন আগে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম গুপ্তচর মারফত জানতে পারেন, মুস্তালিক গোত্রের সরদার হারিস ইবনে জিরার মক্কার কুরাইশ এবং পার্শ্ববর্তী আরও কিছু পৌত্তলিক গোত্রের সঙ্গে মিলে গোপনে মুসলিমদের ওপর হামলা করার জন্য সৈন্যসমাবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ সংবাদ পাওয়ামাত্র রাসুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মুস্তালিক অভিমুখে রওনা হন।

মুস্তালিক গোত্র উপকূলবর্তী এলাকায় বসবাস করে। সেখানে পৌঁছাতে কয়েক দিনের লম্বা সফর ছিল। মুসলিমবাহিনী পথিমধ্যে সামান্য যাত্রাবিরতি করে অতি দ্রুত বনু মুস্তালিক দুর্গের কাছে পৌঁছে যায়। অযথা রক্তপাত এড়াতে বনু মুস্তালিক গোত্রকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হলেও তারা আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করায় রাসুল সর্বব্যাপী আক্রমণের আদেশ দেন এবং প্রায় বিনা রক্তপাতে মুস্তালিক দুর্গ দখল করে নেন।

www.pathagar.com

যুদ্ধ শেষে মুস্তালিক গোত্রের নারী-পুরুষ-শিশু মিলিয়ে প্রায় ৬০০ ব্যক্তি মুসলিমবাহিনীর হাতে বন্দী হয়। এ ছাড়াও প্রায় দুই হাজার উট এবং পাঁচ হাজার বকরি হস্তগত হয়। যুদ্ধনীতি অনুযায়ী নারী-পুরুষ সকলেই বিজয়ী বাহিনীর দাস-দাসী হিসেবে বিবেচিত এবং যুদ্ধলব্ধ অন্যান্য সম্পদ সেনাদের মাঝে সমহারে বণ্টনযোগ্য। মুসলিম সেনাপতি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধ শেষে নিজ বাহিনীর সেনাদের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ বন্দী এবং সম্পদ বাঁটোয়ারা করে দিলেন।

দুই

বারাহ বিনতে হারিস আজ নিঃস্ব। অপমানে তাঁর মাথা নুয়ে আছে। মুখ তুলে তাকাতে পারছেন না। কালও তিনি ছিলেন এক গোত্রপতির কন্যা। ছিলেন এক দুর্গ সেনাপতির স্ত্রী। সম্মানের জীবন নিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে ছিলেন। কিন্তু আজ তিনি মৃতপ্রায়। বন্দী হয়েছেন শত্রুসেনাদের হাতে। ভাগ্য আজ তাঁকে রাজকুমারী থেকে দাসীতে পরিণত করেছে। দাসী হিসেবে বণ্টিত হয়েছেন এক মুসলিম সেনার কাছে। এমন দুঃসময়ে মনে মনে ভাবছিলেন–এর চেয়ে তো মৃত্যু ভালো!

মুস্তালিকের দুর্গাধিপতি হারিস ইবনে জিরারের কন্যা বারাহ বিনতে হারিস যুদ্ধ শেষে বণ্টিত হলেন বিজয়ী বাহিনীর যোদ্ধা সাবেত ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাগে। কিন্তু গোত্রপতির কন্যা হওয়ায় বারাহ ছিলেন অত্যন্ত আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন নারী। মুসলিমবাহিনীর সাধারণ এক যোদ্ধার দাসী হিসেবে তিনি নিজেকে কল্পনা করতেই শিউরে উঠলেন। একজন দুর্গাধিপতির কন্যা হয়ে কীভাবে তিনি একজন যোদ্ধার দাসী হয়ে বাঁচতে পারেন? তাঁর পক্ষে দাসী হয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কেনই-বা তিনি দাসী হবেন? তিন দিন আগের এক রাতে তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে স্বপ্ন কি তবে মিথ্যে হবে? সেই আলোকিত স্বপ্ন তিনি কিছুতেই তাঁর চোখ থেকে সরাতে পারছিলেন না।

অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন। যুদ্ধ শেষে মুসলিমবাহিনী সকল বন্দী ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে মদিনা রওনা হওয়ার প্রাক্কালে বারাহ স্বপ্রণোদিত হয়ে সাবেত ইবনে কায়েসের কাছে আবেদন জানালেন–তিনি মুক্ত হতে চান। কী পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করলে তিনি তাঁকে মুক্ত করে দেবেন? সাবেত ইবনে কায়েস তাঁকে জানালেন–যদি ১৯ উকিয়া পরিমাণ স্বর্ণ দেওয়া হয়, তাহলে তিনি তাঁকে মুক্ত করে দেবেন।

www.pathagar.com

বেশ বড় অংকের মুক্তিপণ। এ মুহূর্তে এই পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা বারাহর জন্য অসম্ভব ব্যাপার। একে তো তিনি সব হারিয়ে নিঃস্ব এখন, তার ওপর তিনি বন্দী হয়ে হৃত হচ্ছেন মদিনায়। যেখানে তাঁর আত্মীয়স্বজন বা শুভাকাঙ্ক্ষী এমন কেউ নেই যে তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করবে। তবু তিনি সাবেতের শর্তে রাজি হলেন। তিনি মদিনায় গিয়ে যথাশিগগির সাবেতের কাঙ্ক্ষিত অর্থ পরিশোধ করার প্রতিজ্ঞা করলেন।

বনু মুস্তালিক অভিযান শেষে মুসলিমবাহিনী মদিনায় ফিরে এল।

কিন্তু মদিনা বারাহর জন্য একেবারেই অপরিচিত এক জনপদ। এখানে না তাঁর কোনো আত্মীয় আছে, আর না আছে কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী। তিনি বিজিত শত্রুদলের অধিনায়কের কন্যা, মদিনায় তিনি এসেছেন যুদ্ধবন্দী এক দাসী হিসেবে। তিনি সকলের ঘৃণার পাত্র। সবার করুণা আর দয়ার দাসী। এখানে কে তাঁকে সহযোগিতা করবে এ দাসত্বের জীবন থেকে মুক্ত হতে?

বারাহ শুনেছেন–মদিনার নবি মুহাম্মদ অত্যন্ত দয়াশীল ব্যক্তি। তাঁর কাছে জাত-পাত আর দাসী-আমিরের কোনো ভেদাভেদ নেই। সকলকে তিনি সমান চোখে দেখেন। মানুষের সাহায্যে তিনি সবার আগে এগিয়ে আসেন। ন্যায় আর সম্মানের জন্যই তিনি প্রেরিত হয়েছেন এ পৃথিবীতে।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে বারাহ আশান্বিত হলেন। তিনি আশান্বিত হলেন তাঁর স্বপ্নের কথা ভেবেও, যা তিনি কয়েক দিন আগেই দেখেছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন–মদিনা থেকে একটি চাঁদ উদিত হয়ে তাঁর ঘরে এসে পড়ল। এ স্বপ্ন এর আগে তিনি তাঁর স্বামী বা গোত্রের অন্য কাউকে বলেননি। কেননা বলার পর তারা যদি তাঁকে ভুল বুঝে–হয়তো এর দ্বারা মুস্তালিক গোত্রের পরাজয়ের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অবশেষে একদিন বারাহ বিনতে হারিস সাহস করে রাসুলের ঘরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রাসুল তখন আয়েশার ঘরে অবস্থান করছিলেন। বারাহ অনুমতি প্রার্থনা করলে রাসুল তাঁকে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করতেই আয়েশা শঙ্কিত বোধ করলেন। কেননা বারাহ ছিলেন যথেষ্ট সুন্দরী এবং তাঁর গলার স্বর ও কথা বলার ভঙ্গি ছিল মোহনীয়। নিজের আরেকজন সতিন বাড়ার ব্যাপারে চিন্তা করে আয়েশার শঙ্কিত হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক। তিনি মনে মনে ভাবলেন, নিশ্চিতভাবেই রাসুল এ মেয়ের মোহময়তার প্রেমে আটকে যাবেন!

www.pathagar.com

বারাহ বিনতে হারিস ঘরে প্রবেশ করে রাসুলকে তাঁর বিষয়টি খুলে বললেন। তিনি উঁচু বংশের মেয়ে এবং তাঁর আত্মসম্মানবোধ তীব্র। একজন সাধারণ যোদ্ধার দাসী হয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি সাবেত ইবনে কায়েসের দাসত্ব থেকে মুক্তি চান এবং এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কৃত চুক্তির ব্যাপারেও রাসুলকে সবকিছু খুলে বললেন। এখন তিনি চান–রাসুল যদি তাঁর এ মুক্তিপণ পরিশোধের ব্যাপারে কিছুটা সাহায্য করতেন, তাহলে তিনি দ্রুত মুক্ত হয়ে আবার স্বাধীনভাবে নিজের জীবনযাপন করতে পারতেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বারাহর কথায় যথেষ্ট প্রভাবিত হলেন। তিনি বিষয়টি নিয়ে আগে চিন্তা করেননি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন–সম্ভ্রান্ত বংশের একজন আরবীয় নারীর ব্যাপারে আর দশজন নারীর মতো আচরণ করাটা ঠিক হয়নি। এটা নারীত্বের যেমন অপমান, তেমনি গোত্রগত শিষ্টাচারেরও অসম্মান।

তিনি বারাহর আবেদন শুনে তাঁকে বললেন, 'আমি কি তোমাকে এর চেয়ে অভিনব কোনো পন্থার ব্যাপারে পরামর্শ দেব?'

বারাহ চমৎকৃত হলেন। তাঁর মুক্তিপণ শোধ করার চেয়ে অভিনব আর কী ঘটতে পারে এ মুহূর্তে? তিনি দ্বিধান্বিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! এর চেয়ে অভিনব পন্থা আর কী হতে পারে আমার জন্য?'

রাসুল প্রত্যুত্তর দিলেন, 'আমি তোমার মুক্তিপণ পরিশোধ করে দেব, বিনিময়ে তোমাকে আমার স্ত্রী হিসেবে সম্মানিত করতে আগ্রহী।'

বারাহ রাসুলের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত তিনি বিজিত গোত্রের একজন নারী হিসেবে সামান্য দাসী হয়ে ছিলেন, আর এখন তিনি আরবের নবির স্ত্রী হওয়ার সুসংবাদ শুনতে পেলেন। এর চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে! তিনি তো কেবল তাঁর দাসত্ব থেকে মুক্তির ব্যাপারে সাহায্যের আবেদন নিয়ে এসেছিলেন, আর এই অদ্ভুত মানুষটি তাঁকে দাসত্ব থেকে তো বটেই, তাঁকে মুক্তি দিতে চাচ্ছেন পার্থিব সমস্ত দুর্দশা থেকেও। যাঁর পিতা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে পলাতক, যাঁর স্বামী যুদ্ধের ময়দানে নিহত, যিনি বন্দী অবস্থায় গলায় পরেছেন দাসত্বের জিঞ্জির–তিনি হবেন রাসুলপত্নী! বারাহর দেখা সেই স্বপ্ন বুঝি আজ সত্য হলো। মদিনার আলোকোজ্জ্বল চন্দ্র সত্যি সত্যি আজ তাঁর ভাঙা হৃদয়কুটির মানবতার দ্যুতি দিয়ে আলোকিত করে তুললেন।

www.pathagar.com

বারাহ লাজুক কণ্ঠে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি যদি আমাকে এই সম্মানে ভূষিত করতে চান, তবে নিঃসন্দেহে এর চেয়ে সম্মানিত প্রতিদান আমার জন্য আর কিছুই হতে পারে না।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাবেত ইবনে কায়েসকে নির্ধারিত মুক্তিপণ পরিশোধ করে বারাহকে মুক্ত করে দিলেন।

তিন

দাসত্বের অর্গল থেকে মুক্ত হয়ে বারাহ বিনতে হারিস কালেমাপাঠ করে মুসলিম হলেন। এরপর রাসুলের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শামিল হলেন উম্মুল মুমিনিনদের বেহেশতি মিছিলে। নিজেকে সঁপে দিলেন রাসুলের ভালোবাসার অতল সায়রে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সদ্য বিবাহিত স্ত্রীর 'বারাহ' নামটি পছন্দ করলেন না। তিনি তাঁর জন্য নতুন একটি নাম রাখলেন–জুয়াইরিয়া। যার অর্থ–আদুরে নারী। বারাহ থেকে তিনি হলেন জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা। এ নামেই তিনি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরিচিত হলেন অনাগত পৃথিবীর কাছে।

জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে শুধু তাঁকেই দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করল না, তাঁর বিয়ে তাঁর গোত্রের জন্যও বয়ে আনল এক বরকতের ঝরনাধারা। তাঁর গোত্রের প্রায় ৬০০ নারী-পুরুষ বন্দী হয়ে নীত হয়েছিল মদিনায়। তাদের সকলেই দাস-দাসী হিসেবে বণ্টিত হয়েছিল মুসলিম বাহিনীর সেনাদের মাঝে। কিন্তু সাহাবিরা যখন জানতে পারলেন রাসুল মুস্তালিক গোত্রের বন্দী রাজকুমারী বারাহকে বিয়ে করে সম্মানিত করেছেন, তখন তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন–যে গোত্রের রাজকুমারী আমাদের রাসুলের স্ত্রী, সে গোত্রের লোকজনকে দাস হিসেবে রাখা তাঁদের জন্য চরম অপমানজনক। সাহাবিরা রাসুল-জুয়াইরিয়ার বিয়ের সংবাদ পাওয়ার পরপরই তাঁদের করতলগত মুস্তালিক গোত্রের সকল নারী-পুরুষকে মুক্ত করে দিলেন।

মুস্তালিক গোত্রের লোকদের জন্য এ ছিল এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতা। তারা কোনো দিন ভাবতেই পারেনি এ দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে তারা মুক্তি পাবে। তারা যুগ যুগ ধরে কেবল দেখে এসেছে পরাজিত বাহিনীর বুকফাটা আর্তনাদ, দাসত্বের জিঞ্জিরে বাঁধা তাদের যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবন। কিন্তু এভাবে একজন মানুষকে সম্মান দেওয়ার অভিপ্রায়ে পুরো গোত্রের প্রায় ৬০০ বন্দীকে দাসত্বের জিঞ্জির

www.pathagar.com

থেকে মুক্ত করে দিতে পারে কোনো যোদ্ধা জাতি, এ ছিল তাদের ধারণাতীত অভিজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতায় তাদের চোখে জল এসে গেল। তারা সবাই এক জায়গায় সমবেত হয়ে ঘোষণা দিল—যে ধর্ম মানুষকে এভাবে সম্মান করতে শেখায়, সে ধর্মের জয়গান গাইব আমরাও। আমরাও ঘোষণা করতে চাই—আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসুল।

পুরো মুস্তালিক গোত্রের ৬০০ সদস্য একদিন একবাক্যে মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করল। সাহাবিদের এমন আত্মপ্রণোদনার খবর রাসুল নিজেও জানতেন না, জানতেন না তাঁর সদ্য বিবাহিত স্ত্রী জুয়াইরিয়াও। জুয়াইরিয়া রাসুলের কাছে বা অন্য কোনো সাহাবির কাছে তাঁর গোত্রের লোকদের মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে কোনো আবেদন জানাননি। সাহাবিরা স্বপ্রণোদিত হয়ে রাসুল এবং উম্মুল মুমিনিন জুয়াইরিয়ার বিয়েকে সম্মানিত করার জন্য এমন মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

এ কারণেই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলতেন, 'নিজের জন্য এবং তাঁর গোত্রের জন্য জুয়াইরিয়ার চেয়ে সৌভাগ্যের পরশমণি হওয়া আর কোনো উম্মুল মুমিনিনের ভাগ্যে জোটেনি।'

জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার পলাতক পিতা হারিস ইবনে জিরার কিছুদিন পর আত্মগোপন থেকে নিজ গোত্রের কাছে ফিরে এসে যখন জানতে পারলেন কন্যার দাসত্ববরণের খবর, তিনি দুঃখে ভেঙে পড়লেন। নিজের আদরের কন্যার এমন অপমানজনক পরিণতি তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। খবর শুনেই কয়েকটি উটে মূল্যবান সামগ্রী বোঝাই করে মদিনার পথে রওনা হয়ে গেলেন। যে করেই হোক, যত মুক্তিপণ লাগুক—তিনি তাঁর কন্যাকে মুক্ত করে নিয়ে আসবেন মদিনা থেকে।

মদিনার কাছাকাছি এসে হারিস ইবনে জিরার ভাবলেন, সামগ্রী বোঝাই সবগুলো উট মদিনায় নেওয়ার প্রয়োজন নেই। পালের সবচেয়ে ভালো দুটো উট কোথাও লুকিয়ে রেখে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। মুহাম্মদের সঙ্গে দর-কষাকষিতে যদি কুলিয়ে না ওঠা যায়, তখন এ মূল্যবান উট দুটো পেশ করা যাবে। এমনটি ভেবে তিনি মদিনার নিকটবর্তী আকিক নামক স্থানে দুটো উট কাফেলা থেকে আলাদা করে রেখে বাদবাকি উট নিয়ে মদিনায় পৌঁছালেন।

মদিনায় পৌঁছে তিনি সরাসরি রাসুলের কাছে চলে গেলেন। রাসুলের সামনে গিয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মদ! আপনি আমার কন্যাকে বন্দী করে নিয়ে এসেছেন। আমি তাকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে এসেছি। এই দেখুন, তার মুক্তির

www.pathagar.com

জন্য মূল্যবান সামগ্রী বোঝাই উটের বহর দাঁড়িয়ে আছে। এগুলো গ্রহণ করে তাকে মুক্ত করে দিন।'

হারিসের কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সে দুটো উট কেন নিয়ে আসেননি, যেগুলো আপনি আকিক উপত্যকায় লুকিয়ে রেখে এসেছেন?'

রাসুলের কথা শুনে হারিস চমকে গেলেন। মুহাম্মদ কীভাবে জানবেন সে উট দুটোর কথা? কেননা তিনি যে পথে মদিনায় এসেছেন, সে পথে তাঁর আগে আর কেউ মদিনায় আসেনি। তাহলে তিনি কীভাবে সে উট দুটোর খবর জানলেন? মুহাম্মদের ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্ব হারিসকে প্রভাবিত করল। তিনি নিজের কৃতকর্ম স্বীকার করলেন।

এবার ফের তিনি মেয়ের মুক্তির ব্যাপারে কথা বললেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোনো দ্বিধা না করে তাঁকে জানালেন–তিনি তাঁর কন্যাকে মুক্তি দিয়ে সসম্মানে বিয়ে করেছেন। এখন স্বাধীন নারী হিসেবে জুয়াইরিয়ার অধিকার আছে নিজের মত প্রকাশের। সে ইচ্ছে করলে তার পিতার সঙ্গে চলে যেতে পারে, আবার সে যদি রাসুলের সঙ্গে থাকতে চায়, তবে সেটাও তার একান্ত নিজস্ব মতামত। এ ব্যাপারে তাকে কোনো রকম জোর-জবরদস্তি করা হবে না।

অভাবিত এক প্রস্তাব। আরবের পরিবেশে এক প্রথাবিরুদ্ধ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। নারীরা যেখানে গণ্য হতো দলন আর পেষণের মানবীরূপে, সেখানে সদ্য বিবাহিত স্ত্রী জুয়াইরিয়াকে তার মতপ্রকাশের ইচ্ছাধিকার দিয়ে রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সপাটে চাবুক চালালেন আরবের সেই ঘৃণ্য সংস্কৃতির ওপর। আর এভাবেই মুহাম্মদ পৃথিবীকে দীক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন নারীস্বাধীনতার সত্যনিষ্ঠ সবক। ইতিহাস এখান থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে গর্বিত করেছে।

পিতা হারিস ইবনে জিরার কন্যা জুয়াইরিয়ার কাছে এলেন। তাঁকে জানালেন–পিতৃস্নেহের ভালোবাসায় তিনি তার জন্য পাগলের মতো ছুটে এসেছেন। তিনি তাকে মুক্ত করে নিয়ে যাবেন এখান থেকে। মেয়েকে বললেন, 'বেটি, তোমার মতামত মুহাম্মদকে জানিয়ে দাও। আমার বিরুদ্ধ মত দিয়ে আমাকে অপমানিত করো না।'

কিন্তু কন্যা জুয়াইরিয়া তাঁর পিতার কথা রাখতে পারলেন না। তিনি রাসুলের জীবনসান্নিধ্যকে বেছে নিয়ে সত্যি সত্যি পিতাকে অপমানিত করলেন।

www.pathagar.com

সাফ জানিয়ে দিলেন, 'আমি আল্লাহর রাসুলকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছি এবং তাঁর সঙ্গে বাঁধা আমার ভবিষ্যৎ জীবন।'

পিতা হারিস ইবনে জিরার নিজ কন্যার এমন দৃঢ়তর কথা শুনে সত্যি কি অপমানিত হলেন? না; বরং তিনি নিজেও সম্মানিত হলেন। সম্মানিত হলেন সেই পয়গাম পাঠ করে, যে পয়গাম আবু বকরকে করেছিল সিদ্দিকে আকবর, উমরকে করেছিল ফারুকে আজম, খাদিজাকে করেছিল খাদিজাতুল কুবরা।

মুস্তালিক গোত্রপতি হারিস ইবনে জিরার রাসুলের প্রতি কৃতজ্ঞ হলেন। রাসুলের প্রতি কন্যার আত্মোৎসর্গিত ভালোবাসার দৃঢ়তা দেখে তিনিও পাঠ করলেন কলুষিত পৃথিবীকে নিষ্কলঙ্ক করার অমীয় মন্ত্রধ্বনি–কালেমায়ে শাহাদাত।

হারিস ইবনে জিরার রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনায় এসেছিলেন কাফের হয়ে, কিন্তু নিজ গোত্রে ফেরার সময় তিনি হয়ে গেলেন পূর্ণ ঈমানদার। এসেছিলেন ইসলামের শত্রুতার বোঝা কাঁধে নিয়ে, ফিরে গেলেন নিজের নামের সঙ্গে রাদিয়াল্লাহু আনহু উপাধি ধারণ করে। তিনি রাসুলের হাতে হাত রেখে বেহেশতের পয়গাম বুকে মোহরাঙ্কিত করে নিয়ে গেলেন।

তাঁর বদৌলতে পুরো মুস্তালিক গোত্র মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে।

চার

রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং উম্মুল মুমিনিন জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার দাম্পত্যজীবন নিয়ে খুব বেশি কিছু বিবৃত হয়নি রাসুলজীবনী ও ইতিহাসে। তবে শিক্ষণীয় দুটো ছোট ঘটনা হাদিসের গ্রন্থাদিতে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা অত্যন্ত ইবাদতগুজার মহিলা ছিলেন। মুসলিম হওয়ার পর তিনি দীর্ঘ সময় ধরে নামাজে মশগুল থাকতেন। নামাজ পড়তে তিনি ভালোবাসতেন। একদিন ফজরের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জুয়াইরিয়াকে তাঁর কুটিরে নামাজরত অবস্থায় রেখে মসজিদে নববিতে গেলেন নামাজ আদায় করতে। নামাজ শেষ করে তিনি বাইরে অন্য আরও কিছু কাজ সেরে বেশ বেলা করে আবার জুয়াইরিয়ার কাছে এলেন। এসে দেখেন জুয়াইরিয়া এখনো সেই আগের মতোই নামাজের জায়নামাজে ইবাদতরত অবস্থায় আছেন। তাঁকে এভাবে জায়নামাজে বসে থাকতে দেখে রাসুল জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি এখনো সেভাবেই বসে আছো?'

জুয়াইরিয়া উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।'

www.pathagar.com

রাসুল বললেন, 'তোমার এখান থেকে যাওয়ার পর আমি এমন চারটি বাক্য পাঠ করেছি, সেগুলো যদি তোমার এ সকল আমলের সঙ্গে ওজন করা হয়, তবে সেগুলোই ভারী হবে।'

এরপর তিনি তাঁকে বাক্য চারটি শিখিয়ে দিলেন।

জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার আরেকটি ঘটনা প্রসিদ্ধ। একবার তিনি শুক্রবারে রোজা রেখেছিলেন। এমনিতেও তিনি অধিক রোজা রাখতেন। এটা তাঁর নিয়মিত আমল ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে এসে জানতে পারলেন তিনি আজ রোজা। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গতকাল কি রোজা রেখেছিলে?'

তিনি জবাব দিলেন, 'না, গতকাল রাখা হয়নি।'

রাসুল আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আগামীকাল রাখার নিয়ত করেছ কি?'

তিনি একই জবাব দিলেন, 'না, আগামীকাল রাখার নিয়ত নেই।'

রাসুল তাঁকে বললেন, 'তাহলে রোজা ভেঙে ফেলো।' কেননা শুধু এক দিনের রোজা ইহুদিদের রোজার সদৃশ। এ কারণে রাসুল শুধু এক দিনের রোজা রাখা পছন্দ করতেন না।

এ ধরনের নির্দেশনা ছিল শিক্ষণীয় বিষয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের লোকদের দিয়েই ইসলামের নানা বিধিবিধান পালন করা শিখিয়ে গেছেন। এভাবেই তিনি নিজের পরিবারের মাধ্যমে অনাগত পৃথিবীর জন্য আদর্শ পরিবারের নমুনা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

উম্মুল মুমিনিন জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহা সর্বমোট সাতটি হাদিস বর্ণনা করেন। এর মধ্যে দুটি বুখারি শরিফে, দুটি মুসলিম শরিফে এবং বাকি তিনটি বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

রাসুলের ভালোবাসায় অধিষ্ঠিত উম্মুল মুমিনিন জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহা গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী ৫৬ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে মদিনায় জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

www.pathagar.com

এক নজরে

জন্ম: ৬০৮ খ্রিষ্টাব্দ।

বিয়ে: বিয়ের সময় জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স ছিল ২০ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ৫৭/৫৮।

বিবাহ: ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক পঞ্চম হিজরির শাবান মাস।

দাম্পত্যজীবন: রাসুলের সাথে তাঁর দাম্পত্যকাল ৬ বছর।

মৃত্যু: ৫০/৫৬ হিজরি।

দাফন: মদিনার জান্নাতুল বাকিতে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫/৭১ বছর।

www.pathagar.com

উম্মুল মুমিনিন

উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান অধ্যায়

রাদিয়াল্লাহু আনহা

এক

উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হয়ে গেলেন। বেশ চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এর আগে এমনটি হয়নি আর এ অঞ্চলে। এ ঘটনা তাঁর মাতৃভূমি মক্কায় ঘটলেও কথা ছিল, ঘটনা ঘটল মক্কা থেকে বহু দূরের দেশ ইথিওপিয়ায়। মক্কার কিছু মুসলিম রাজনৈতিক উদ্বাস্তু হিসেবে ইথিওপিয়ায় আশ্রয় নেওয়ার পর। সংগত কারণে এ ঘটনা আশ্রিত মুসলিমদের মাঝে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় কুরাইশদের গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে অন্য অনেকের সঙ্গে উবায়দুল্লাহও ইথিওপিয়ায় হিজরত করেছিলেন। স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে হিজরত করলেও মানসিকভাবে উবায়দুল্লাহ ততটা শক্তপদ ছিলেন না। তা ছাড়া মদপানের ব্যাপারে তাঁর আসক্তি ছিল প্রবল। অতিরিক্ত মদ্যপান তাঁকে মানসিকভাবে যেমন অস্থিরচিত্ত করে তুলেছিল, তেমনি ধর্মের বিধিবিধান পালনেও তিনি অনাগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। উপরন্তু ইথিওপিয়ার মানুষের মাঝে প্রচলিত খ্রিষ্টধর্ম তাঁকে নানাভাবে আকৃষ্ট করতে থাকে। কেননা খ্রিষ্টধর্মে আচরিক উপাসনা অনেকটা শিথিল। ফলে যা হওয়ার ছিল না অবশেষে তা-ই হলো। উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশ এক রাতে স্ত্রী উম্মে হাবিবার কাছে এসে জানালেন–তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে ইথিওপিয়ায় প্রচলিত খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন।

উম্মে হাবিবার নাম রমলা। রমলা বিনতে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহা। মক্কার বিখ্যাত কুরাইশনেতা আবু সুফিয়ানের কন্যা। ইসলামকে

www.pathagar.com

অবদমিত করতে মক্কার যে কজন ব্যক্তি সবার শীর্ষে ছিল, আবু সুফিয়ান তাদের অন্যতম। রাসুলকে নিপীড়ন করার অন্যতম হোতা ছিলেন তিনি। এমন ব্যক্তির মেয়ে এবং মেয়ের জামাই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল মুহাম্মদের ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে। বেশ হইচই ফেলে দেওয়ার মতো ঘটনা ছিল।

উম্মে হাবিবা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন নবুওয়াত আবির্ভাবের কিছুদিন পরই। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একসঙ্গে ইসলামে বিভাসিত হয়েছিলেন। কিন্তু যাঁর পিতা ইসলাম ও ইসলামের নবিকে চিরতরে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকেন সব সময়, তাঁর কন্যা হয়ে ইসলাম গ্রহণ করা কতটা দুঃসাধ্য ছিল, তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। স্বামী-স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের কথা জানাজানি হওয়ার পর আবু সুফিয়ান স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হন। নিজে তো বটেই, তাঁর সেঙাত নানাজনকে দিয়েও মেয়ে ও মেয়ের জামাইয়ের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাতে লাগলেন।

মক্কায় তখন এমনটিই চলছিল নবদীক্ষিত সকল মুসলিমের সঙ্গে। কুরাইশদের অত্যাচারে সেখানে টেকাই দায় হয়ে গেল। অগত্যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের হিজরতের পরামর্শ দিলেন।

উম্মে হাবিবা ও উবায়দুল্লাহর জন্য দেশান্তর হওয়াটা বেশি জরুরি ছিল। কেননা তাঁদের পিতা আবু সুফিয়ান ইসলাম ও মুসলিমদের ওপর যে পরিমাণ নির্দয় আচরণ করছিলেন, যেকোনো সময় তিনি একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারেন। তাই দ্রুতই তাঁরা গোপনে ইথিওপিয়াগামী কাফেলার সঙ্গী হয়ে গেলেন।

কিন্তু ইথিওপিয়ায় এসেও যেন উম্মে হাবিবার দুঃখের দিন শেষ হলো না। কিছুদিন পর স্বামী উবায়দুল্লাহ খ্রিষ্টান হয়ে গেলেন।

উম্মে হাবিবা যখন উবায়দুল্লাহর মুখে তাঁর খ্রিষ্টান হওয়ার কথা শুনলেন, তখন মনে হচ্ছিল তিনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবেন। এ কী শুনছেন তিনি! যার পৌরুষদীপ্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে তিনি ছেড়ে এসেছেন মাতৃভূমি, পরিবার-পরিজন সব; সে আজ ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী! যার হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সকল দুঃখ-দুর্দশাকে দু'পায়ে মাড়িয়ে নতুন উষা দেখার, আজ সে তার বিশ্বাসের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করল? উম্মে হাবিবা আর কিছু ভাবতে পারেন না, ব্যথায় ভেঙে পড়লেন।

উবায়দুল্লাহ অবশ্য স্ত্রীর বেদনায় খুব একটা ব্যথিত হলেন না। তিনি বরং উম্মে হাবিবাকে তাঁর মতো খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হতে বললেন এবং নিজের

www.pathagar.com

স্বামীত্বের অধিকার নিয়ে তাঁর ওপর নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করতে লাগলেন। উম্মে হাবিবা ঘৃণাভরে তাঁর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন। যে ধর্মের জন্য নিজের জীবন বাজি রেখে দেশান্তরকে বুক পেতে নিয়েছি, পার্থিব সামান্য আয়েশের আশায় সেই ধর্ম ত্যাগ করব? উবায়দুল্লাহকে সাফ জানিয়ে দিলেন–তাঁকে এ ধরনের প্রস্তাব আবার দিলে তাঁদের দুজনের পথ আলাদা হয়ে যাবে।

উবায়দুল্লাহর এমন অযাচিত ঘটনায় মুসলিম উদ্বাস্তু শিবিরে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ ছেয়ে গেল। একটা কারণ–উবায়দুল্লাহর খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ তাদের জন্য ছিল বেদনার এবং অপমানজনক। যে ধর্মকে রক্ষা করার জন্য তারা মক্কা থেকে পালিয়ে ইথিওপিয়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল, উবায়দুল্লাহ সেই ধর্মকেই অপমান করে অন্য ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেল। দ্বিতীয়ত–রাসুলের চাচাতো ভাই জাফর ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ উদ্বাস্তু শিবিরের মুসলিম নেতারা চিন্তা করছিলেন, উবায়দুল্লাহর এই ধর্মান্তর যদি অন্য মুসলিমদের মাঝেও প্রভাব ফেলে, তবে সেটা তাঁদের জন্য অত্যন্ত খারাপ ফল বয়ে আনবে। বিষফোড়ার মতো আরেক সমস্যা ছিল, মক্কার কুরাইশরা আশ্রিত মুসলিমদের ফিরিয়ে নিতে ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে তাদের দূত পাঠাচ্ছে। তারা যদি উবায়দুল্লাহর ইসলাম ত্যাগের কথা জানতে পারে, তবে এর পেছনে জোরেশোরে ইন্ধন জোগানো শুরু করবে।

এসব কারণে আশ্রিত মুসলিমরা উবায়দুল্লাহকে নানাভাবে বোঝাতে লাগল ইসলামে ফিরে আসার জন্য। কিন্তু উবায়দুল্লাহ ফিরে এলেন না, বরং তিনি মুসলিমদের মাঝে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার বাণী প্রচার করতে লাগলেন।

এ সমস্যার সমাধান আল্লাহই করে দিলেন। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে উবায়দুল্লাহর ফুসফুস বিকল হওয়া শুরু করল এবং তাঁর কিডনিতেও সমস্যা দেখা দিল। অসুস্থতার প্রকোপ একসময় মারাত্মক আকার ধারণ করে। নানা রকম পথ্য প্রয়োগ করেও তাঁকে আর সুস্থ করা সম্ভব হলো না। অবশেষে একদিন কিডনি জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে মদ্যপান অবস্থাতেই তিনি ইথিওপিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন।

মুসলিম এবং অন্য ধর্মাবলম্বী স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাহবিচ্ছেদের বিধান তখনো অবতীর্ণ হয়নি। উবায়দুল্লাহ খ্রিষ্টান হলেও এত দিন উম্মে হাবিবার স্বামী হিসেবে জীবিত ছিলেন। আর কিছু না হোক, এই সুদূর প্রবাসে সাংসারিক নিরাপত্তার একটা স্তম্ভ ছিলেন তিনি। কিন্তু উবায়দুল্লাহ এখন মৃত। উম্মে হাবিবা তাঁর সন্তানদের নিয়ে অকূলপাথারে পড়ে গেলেন। আশ্রিত মুসলিমরা আছেন

www.pathagar.com

বটে কিন্তু একজন নারীর জন্য পারিবারিক ভরসার যে আশ্রয়স্থল থাকা প্রয়োজন, সেটা তিনি গভীরভাবে অনুভব করতে লাগলেন।

দুঃখের এই ঘোর তমসায় একদিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন-কেউ একজন তাকে 'উম্মুল মুমিনিন' বলে সম্বোধন করে ডাকছে। তিনি স্বপ্ন দেখে ধড়ফড় করে জেগে উঠলেন। এ এক অন্য রকম অভিজ্ঞতা। একদিকে যেমন ভয় জাপটে ধরছিল তাঁকে, তেমনি মনের মধ্যে ভালো লাগার একটা আলোড়ন উঠছিল ক্ষণে ক্ষণেই-সত্যিই কি আমি উম্মুল মুমিনিন হওয়ার গৌরব অর্জন করব? তাঁর কষ্টকে যেন আলোকিত করে তুলছিল স্বপ্নীল এক আবেশ।

দুই

উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশের মৃত্যুর পর কেটে গেছে বেশ কিছুদিন। একদিন ইথিওপিয়ার উপকূলে ভিড়ল একটি যাত্রীবাহী জাহাজ। জাহাজ থেকে নেমে এলেন এক আগন্তুক। বন্দরে এসে লোকজনের কাছে জানতে চাইলেন, এ দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের বাসভবন কোন দিকে। স্থানীয় লোকজন তাঁকে রাষ্ট্রপ্রধান নাজ্জাশির বাসভবনের ঠিকানা জানাতেই তিনি আর দেরি করলেন না, বাহন নিয়ে জলদি ছুটলেন সেদিকে।

ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান নাজ্জাশির বাসভবনে এসে তিনি প্রহরীদের বললেন-রাষ্ট্রপ্রধানকে যেন সত্বর সংবাদ পৌছানো হয়, মদিনা থেকে আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদের পক্ষ হতে একজন দূত এসেছেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পত্র নিয়ে এসেছেন তিনি। দ্রুত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

প্রহরী আগন্তুকের কথা শুনে দেরি করল না, জলদি সংবাদ পৌছাল নাজ্জাশির কাছে। কিছুক্ষণ পর নাজ্জাশি ডেকে পাঠালেন মদিনার রাষ্ট্রদূতকে।

মদিনার এ রাষ্ট্রদূতের নাম আমর ইবনে উমাইয়া আদ-দামেরি রাদিয়াল্লাহু আনহু। আমর সত্বর উপস্থিত হলেন রাষ্ট্রপ্রধানের দরবারে। তাঁর সামনে পেশ করলেন রাসুল মুহাম্মদ কর্তৃক প্রেরিত তিনটি পত্র। প্রথম পত্রে তিনি ইথিওপিয়ায় উদ্বাস্তু মুসলিমদের আশ্রয়দানের জন্য রাষ্ট্রপ্রধান নাজ্জাশির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। একই সঙ্গে নাজ্জাশিকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত প্রদান করেছেন।

দ্বিতীয় পত্রে মক্কার বিশিষ্ট নেতা আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ানকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রপ্রধান স্বয়ং যেন এ বিয়ের আয়োজন সুসম্পন্ন করেন, এমন অনুরোধ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

তৃতীয় পত্রে তিনি আরেকটি আবেদন করেছেন—ইথিওপিয়ায় আশ্রিত সকল মুসলিমের জন্য তিনি যেন একটি জাহাজের ব্যবস্থা করেন, যাতে তাঁরা ইসলামের নতুন পুণ্যভূমি মদিনায় পৌঁছাতে পারেন।

রাষ্ট্রপ্রধান নাজ্জাশি বরাবরই মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল। দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর তিনি তাঁর রাষ্ট্রে মুসলিমদের আশ্রয় প্রদান করে তাঁর সে অনুভূতিশীল মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। এবারও পিছপা হলেন না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আবেদনের ব্যাপারে তিনি তখনই উদ্যোগী হলেন।

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মত অনুযায়ী, তিনি রাসুলের পত্র মারফত দাওয়াতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামও গ্রহণ করেছিলেন।

মদিনা থেকে উম্মে হাবিবার বিয়ের সওগাত এসেছে, এ সংবাদ তখন পর্যন্ত তিনি জানতে পারেননি। তিনি নিজের ঘরে একাকী বসে ছিলেন। এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেলেন। দরজা খুলে দেখেন সামনে নাজ্জাশির সেবিকা আবরাহা দাঁড়িয়ে আছেন। আবরাহাকে তিনি আগে থেকে চিনতেন। তিনি নাজ্জাশির একান্ত সেবিকাদের একজন। রাষ্ট্রপ্রধানের দরবার এবং মহলে তাঁর বেশ প্রভাব রয়েছে। তাঁকে দেখে তিনি কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন। কোথাও কিছু হয়ে গেল না তো? স্বামীর খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ এবং তাঁর মৃত্যুর পর অযাচিত ভয় তাঁকে উৎকণ্ঠিত করে তুলত। কিন্তু আবরাহার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, তিনি মুচকি হেসে তাঁকে সম্ভাষণ জানাচ্ছেন।

আবরাহা ঘরে ঢোকার অনুমতি চাইলে উম্মে হাবিবা তাঁকে ভেতরে ঢোকার আমন্ত্রণ জানালেন। ভেতরে ঢুকে আবরাহা বললেন, 'আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদিনা থেকে রাষ্ট্রদূত মারফত আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে পত্র প্রেরণ করেছেন। তিনি আপনার কাছে তাঁর বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছেন।'

উম্মে হাবিবা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। তিনি অস্ফুটে বলে উঠলেন, 'আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। কী বলছ তুমি, আমি বুঝে উঠতে পারিনি!'

উম্মে হাবিবার এমন বেচইনি দেখে আবরাহা একই কথা আরও কয়েকবার তাঁকে শোনালেন। এবার তিনি কিছুটা ধাতস্থ হলেন। আবরাহা তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'এখন কি আমার কথা বুঝে আসছে?' উম্মে হাবিবা লজ্জাবনত হয়ে মাথা নাড়লেন। বিধবা হোক কিংবা বয়স হোক ৩৬-৩৭, বিয়ের পয়গাম এলে নারী বলতেই রাঙা লজ্জায় অধোবদন হয়ে যায়।

www.pathagar.com

আবরাহা আবার বলতে শুরু করলেন, 'যদি বুঝেই থাকেন, তাহলে এবার আরেকটি কাজ করুন। রাষ্ট্রপ্রধান বলেছেন, আপনার যদি এ বিয়েতে সম্মতি থাকে তবে আপনার পক্ষ থেকে বিয়ের জন্য কাউকে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করতে, যিনি এ বিয়ের যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করবেন।'

উম্মে হাবিবা নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে জানালেন, তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর আত্মীয় খালিদ ইবনে সায়িদ এ বিয়ের মধ্যস্থতাকারী হতে পারেন। এ দূরদেশে তিনিই তাঁর একমাত্র কাছের মানুষ।

আবরাহা উম্মে হাবিবার সম্মতি পেয়ে ফিরে যেতে উদ্যত হলেন। উম্মে হাবিবা তাঁকে থামালেন। তিনি তাঁর হাতের কঙ্কন, গলার মালা, কানের দুল এবং পায়ের পায়েল খুলে আবরাহার হাতে দিলেন, 'এ শুভ সংবাদ নিয়ে আসায় তোমার জন্য আমার পক্ষ থেকে সামান্য উপহার। গ্রহণ করে ধন্য করো।'

বিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধান নাজ্জাশির নিজস্ব বাসভবনে। নাজ্জাশি ইথিওপিয়ায় আশ্রিত সকল মুসলিমকে নিমন্ত্রণ করেছেন তাঁর মেহমানখানায়। আশ্রিত মুসলিমদের প্রধান নেতা জাফর ইবনে আবু তালিব, আবদুল্লাহ ইবনে হোসামা আস-সাহমি, খালিদ ইবনে সায়িদসহ সকলেই উপস্থিত হয়েছেন। সংক্ষিপ্ত সময়ে হলেও আয়োজনের কোনো কমতি রাখেননি নাজ্জাশি। একে তো মদিনার রাসুল মুহাম্মদ স্বয়ং পত্র প্রেরণ করে তাঁর মাধ্যমে বিয়ে সম্পন্ন করার আবেদন করে তাঁকে সম্মানিত করেছেন, অন্যদিকে উম্মে হাবিবাও মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কন্যা, সুতরাং তিনি যথাসাধ্য চেষ্টার মাধ্যমে এ শাদি আয়োজন সুসম্পন্ন করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

আমন্ত্রিত অতিথিরা সকলে মিলনায়তনে একত্রিত হলে নাজ্জাশি দাঁড়িয়ে রাসুলের পক্ষ হয়ে সংক্ষিপ্ত খুতবা পাঠ করলেন। খুতবা শেষ করে তিনি উম্মে হাবিবার জন্য নির্ধারিত মোহর চার হাজার দিরহাম খালিদ ইবনে সায়িদের কাছে অর্পণ করলেন। রাষ্ট্রপ্রধান রাসুলের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ এ মোহর নিজের তরফ থেকে প্রদান করেন। খালিদ মোহর গ্রহণ করে উম্মে হাবিবার পক্ষ হতে সংক্ষিপ্ত খুতবা পাঠ করে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা পূর্ণ করেন।

আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে সবাই যখন ভরা মজলিস থেকে উঠতে যাবেন, তখন নাজ্জাশি সকলের অবগতির জন্য জানালেন–বিয়ের মজলিসে মেহমানদারি করা আপনাদের নবির একটি সুন্নত। সবাইকে তিনি বিয়ের জন্য আয়োজিত ভোজপর্বে শরিক হতে আহ্বান করেন। নাজ্জাশির এমন দরাজদিলের পরিচয় পেয়ে সাহাবিরা আরেকবার তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হলেন।

www.pathagar.com

পরদিন সকালবেলা আবারও নড়ে উঠল উম্মুল মুমিনিন উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহার দরজার কড়া। দরজা খুলে দেখলেন আবরাহা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতভর্তি রাজ্যের উপঢৌকন। এর মধ্যে ছিল চন্দন, ঘৃতকুমারীর নির্যাসজাত তেল, আম্বরসহ নানা ধরনের প্রসাধনসামগ্রী। উম্মে হাবিবা আবরাহাকে দেখে যারপরনাই আনন্দিত হলেন। কিন্তু এ উপঢৌকন কোথা থেকে এল? আবরাহা বললেন, 'আপনার বিয়ে উপলক্ষে এ সবই রাষ্ট্রপ্রধান নাজ্জাশির বেগমদের দেওয়া উপহার। তাঁরা আপনার বিয়েতে শুভকামনা পাঠিয়েছেন।'

উম্মে হাবিবা দারুণ প্রীত হলেন। কাল বিয়ের মোহর হিসেবে পাওয়া চার হাজার দিরহাম থেকে পাঁচ শ দিরহাম তিনি তুলে দিলেন আবরাহার হাতে। বললেন, 'গতকাল আমি নিঃস্ব ছিলাম, আমার কাছে কোনো দিরহাম ছিল না। আজ আমার কাছে যা আছে, তা থেকে তোমাকে এ সামান্য উপহার দিলাম। তুমি গ্রহণ করলে আমি খুশি হব।'

আবরাহা উম্মে হাবিবার উপহার দেখে আঁতকে উঠলেন। জানালেন, নাজ্জাশি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন কোনোভাবেই যেন আপনার কাছ থেকে কোনো প্রকার উপহার গ্রহণ না করা হয়। কিন্তু উম্মে হাবিবা তাঁর কথা শুনলেন না, জোর করে ভালোবাসার এ উপহার আবরাহাকে অর্পণ করলেন।

কিছুক্ষণ পর। আবরাহার চোখে-মুখে খেলা করছিল অন্য রকম দ্যুতি। তিনি কিছু একটা বলতে চান উম্মে হাবিবাকে। উম্মে হাবিবা তাঁর উচাটন ভাব লক্ষ করে কারণ জানতে চাইলেন। আবরাহা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জানালেন, তিনি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছেন। তাঁর কথা শুনে উম্মে হাবিবা খুশিতে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এক ছিল তাঁর বিয়ের আনন্দ, আবার আবরাহার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ তাঁকে আবেগে ভাসিয়ে দিল। তিনি স্মরণ করলেন নিজের স্বামীর ধর্মত্যাগের কথা। কেউ বিশ্বাসের পরশমণি পাওয়া সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় তা পায়ে মাড়িয়ে অবিশ্বাসের নিকষ তিমিরে হারিয়ে যায়, আবার কেউ ঘোর অমানিশায় থেকেও গলায় পরে বিশ্বাসের বরমাল্য। উম্মে হাবিবার চোখ জলে ভিজে ওঠে।

আবরাহা উম্মে হাবিবার কাছে আবেদন জানালেন, 'আমার ছোট্ট একটা অনুরোধ আছে, রাখবেন?'

'কেন নয়? নিঃসংকোচে বলতে পারো।' উম্মে হাবিবা ভালোবাসায় অভয় দিলেন তাঁকে।

www.pathagar.com

আবরাহা বললেন, 'আপনি যখন মদিনায় যাবেন, তখন রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন এবং তাঁকে বলবেন, আবরাহা নামের এক অচিন মেয়ে দূরদেশে তাঁর আনীত সত্যধর্ম ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে।'

কিছুদিন পর উম্মে হাবিবা যখন সত্যি সত্যি মদিনায় ফিরে আসেন, তখন রাসুলের সঙ্গে দেখা হলে তিনি আবরাহার পুরো বৃত্তান্ত তাঁকে শুনিয়ে তাঁর সালাম পৌঁছে দেন রাসুল-সকাশে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবরাহার সালাম শুনে মুচকি হাসেন এবং উত্তর দেন–ওয়ালাহাস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু!

উম্মে হাবিবার সঙ্গে রাসুলের বিয়ে নানা কারণে ইসলামের ইতিহাসে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত উম্মে হাবিবা তাঁর স্বামী উবায়দুল্লাহর মৃত্যুর পর ইথিওপিয়ায় আশ্রিত অন্য কোনো মুসলিমকে বিয়ে করার ব্যাপারে আগ্রহী হননি। কেননা তিনি ছিলেন বড় ঘরের মেয়ে। আরবে বিয়ের সময় পারিবারিক বংশমর্যাদা সমমানের হওয়াটা ছিল বাঞ্ছনীয়। এ কারণে আশ্রিত অন্য মুসলিমরাও তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। এ বিষয়টির সুরাহা হয় রাসুলের সঙ্গে বিয়ের মাধ্যমে।

এ বিয়ের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উম্মতে মুহাম্মদির জন্য ইসলামি আইনের একটি অনন্য নিদর্শনও স্থাপন করেন। দূরবর্তী বর-কনের বিয়ে কীভাবে মধ্যস্থতাকারীর (উকিল) মাধ্যমে হতে পারে, তার বাস্তব একটি উদাহরণ ছিল এ বিয়ে।

আরেকটি কারণ ছিল রাজনৈতিক। আবু সুফিয়ান যেহেতু মক্কার প্রভাবশালী নেতা ছিলেন এবং তাঁর মেয়ে দূরদেশে দুর্ভাগ্যক্রমে বৈধব্যের শিকার হন, তখন রাসুলের ভালোবাসার বাহুডোর উম্মে হাবিবার জন্য যেমন প্রশান্তিদায়ক ছিল, তেমনি আবু সুফিয়ানসহ মক্কায় অবস্থানরত তাঁর আত্মীয়স্বজনের জন্যও ছিল প্রভাবিত সংবাদ। বাস্তবে ঘটেছিলও তা-ই। আবু সুফিয়ান যখন মুহাম্মদের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ের ঘটনা জানতে পারেন, তখন স্বগতোক্তি করে বলেছিলেন, 'মুহাম্মদ তো এমন ব্যক্তি, যার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া অসম্ভব!'

এ ঘটনা আবু সুফিয়ানকে ইসলামের পথে অনেকটাই প্রাগ্রসর করে এবং এর বছরখানেক পর মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করে রহমত বারিধারায় স্নাত হন।

www.pathagar.com

তিন

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রপ্রধান নাজ্জাশিকে পত্র মারফত উদ্বাস্তু মুসলিমদের মদিনা প্রেরণের জন্য একটি জাহাজের ব্যবস্থা করে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। ইথিওপিয়ার মহানুভব রাষ্ট্রপ্রধান একটি নয়, আশ্রিত মুসলিমদের মদিনা অভিমুখে যাত্রা করার জন্য দুটো জাহাজের বন্দোবস্ত করে দিলেন। সাহাবিরা নাজ্জাশিকে হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসা জানালেন। মুসলিমদের জন্য তাঁর ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং অভিভাবকের মতো সার্বিক দেখভাল সাহাবিদের স্মরণ হতে লাগল বারবার। বিদায়বেলায় উভয় দলের চোখই অশ্রুতে ভরে উঠল। ইথিওপিয়ার কালো মানুষেরা যে বিশাল হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছিলেন, ইসলামের ইতিহাস শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছে। রাষ্ট্রপ্রধান নাজ্জাশির নাম আজও সসম্মানে উচ্চারিত হয় পৃথিবীর প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়ে।

ইথিওপিয়ায় যেসব সাহাবি আশ্রিত ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশেরই প্রায় ১০ বছর কেটে গেছে এখানে। ১০ বছর পর তাঁরা আবার ফিরে যেতে পারছেন আরবের মরু বিয়াবানে। হয়তো মক্কায় নিজেদের ফেলে আসা মাতৃভূমিতে এখনই ফিরে যেতে পারছেন না, তবু আরবে তো যাওয়া হচ্ছে। ফের দেখা হবে ফেলে আসা শত শত চেনামুখের সঙ্গে। যে ইসলাম ও রাসুলের ভালোবাসার বরমাল্য গলায় জড়িয়ে দেশান্তর হয়েছিলেন, আবার দেখা পাবেন সেই রাসুলের। মদিনায় কীভাবে গড়ে উঠছে ইসলামের নবরাষ্ট্র, এটা দেখার কৌতূহলও তাড়িত করছিল তাঁদের। পুরো জাহাজযাত্রায় তাঁরা সীমাহীন উত্তেজনা নিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন, কখন পৌঁছাবেন মদিনায়!

এ কাফেলা যখন মদিনায় পৌঁছাল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন কেবলই খায়বার অভিযান থেকে ফিরে এসেছেন। খায়বার অভিযান তাঁর জন্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরব থেকে ইসলামের চিরশত্রু ইহুদিদের চিরতরে বিতাড়িত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। খায়বার বিজয় সেই লক্ষ্যকে সত্যে পরিণত করে। এ কারণে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে রাসুল অত্যন্ত খোশহালে ছিলেন। এরই মধ্যে যখন ইথিওপিয়ায় আশ্রিত মুসলিমরা ফিরে এলেন, তখন সে আনন্দ কয়েক গুণ বেড়ে গেল।

বিশেষত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচাতো ভাই জাফর ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাতে এতটা আনন্দিত হন যে, তাঁকে

www.pathagar.com

এমন আনন্দ প্রকাশ করতে মদিনাবাসী এর আগে কখনো দেখেনি। জাফর রাসুলের চাচাতো ভাই তো বটেই, রাসুলের সেই ছোট্টবেলার খেলার সাথিও ছিলেন। চাচা আবু তালিবের বাড়িতে যখন তিনি আশ্রিত ছিলেন, তখন থেকে দুজনের নিবিড় বন্ধুত্ব। একসঙ্গে দুজন বড় হয়েছেন, কাটিয়েছেন শৈশব, কৈশোর আর যৌবনের দুরন্ত দিন। গলায় গলা মিলিয়ে থাকতেন দুজন। অবশেষে যখন নবুওয়াত আলোকিত করে মক্কার আলো-বাতাসকে, তখন ইসলাম গ্রহণেও পিছপা হননি জাফর। কিন্তু কুরাইশদের অত্যাচারের দরুন সময়ের প্রয়োজনে আলাদা হতে হয় দুই বন্ধুকে। মক্কার মুসলিমদের নিয়ে জাফরকে পাড়ি দিতে হয় ইথিওপিয়ায়। অবশেষে আজ ১০ বছর পর জাফর ফিরে এসেছেন বন্ধুর বুকে। রাসুল অনেকক্ষণ বুকে জড়িয়ে ধরে রাখেন তাঁকে।

উম্মে হাবিবার জন্য মদিনা একেবারেই নতুন। এর আগে কখনো মদিনায় আসা হয়নি তাঁর। কিন্তু তাই বলে তাঁকে অস্বস্তিতে পড়তে হয়নি। তিনি আসার আগেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অন্য উম্মুল মুমিমিনদের ঘরের পাশে তাঁর জন্যও একটি ঘরের বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। রাসুলের একান্ত সেবক বেলাল হাবশি রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মে হাবিবাকে সসম্মানে তাঁর ঘরে পৌঁছে দিলেন।

অন্যান্য উম্মুল মুমিনিনের মতো ছোট একটি কুটিরই ছিল এটি। কিন্তু উম্মে হাবিবার জন্য এটি তাঁর রাজপ্রাসাদ, এটিই তাঁর গুলমহল। তিনি তাঁর ক্রীতদাসীকে নিয়ে কাজে নেমে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরটি একদম সাফ-সুতরো করে ফেললেন। সামান্য আসবাব যা ছিল, সেগুলো পরিপাটি করে রাখলেন জায়গামতো। মেঝেতে উটের পশম দিয়ে তৈরি একটি মাদুরও বিছিয়ে দিলেন।

সন্ধেবেলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এলেন উম্মে হাবিবার রাজপ্রাসাদে। ঘরে চন্দনের সুবাস মোহিত করে রেখেছিল। রাসুল ভেতরে ঢুকে ঘরের চারপাশ এবং মেঝের দিকে চেয়ে চমকিত হলেন। উম্মে হাবিবার দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বাসভরা কণ্ঠে বললেন, 'কুরাইশ নারীরা ঘর সাজাতে দারুণ পারদর্শী। বেদুঈনদের মতো তারা অগোছালো নয়।'

বিয়ের পর প্রথম দর্শনেই রাসুল উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরকন্নার যে প্রশংসা করলেন, এটা তাঁর জন্য ছিল পরম পাওয়া। রাসুলের এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় তিনি আপ্লুত হলেন।

www.pathagar.com

রাসুলের ব্যাপারে উম্মে হাবিবা যখন কথা বলতেন, তখন রাসুলকে সব সময় 'প্রিয় রাসুল' বলে সম্বোধন করতেন। রাসুলের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল নিখাঁদ এবং লৌকিকতাহীন। চরম দুঃসময়ে রাসুল তাঁকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে যে সম্মান দিয়েছিলেন, তিনি তা কখনো ভোলেননি। তাই রাসুলের সম্মান রক্ষার্থে তিনি সদা সচেষ্ট থাকতেন।

বিয়ের কিছুদিন পরের কথা। দুই বছর আগে মক্কার কুরাইশ এবং মদিনা রাষ্ট্রের মাঝে এক দ্বিপক্ষীয় সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু দুই বছর যেতে না যেতেই কুরাইশপক্ষীয় কিছু গোত্র সে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করলে সন্ধিচুক্তি ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়। এ চুক্তি নবায়ন করার লক্ষ্যে মক্কার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসহ কুরাইশনেতা আবু সুফিয়ান হন্তদন্ত হয়ে মদিনা আগমন করেন। ইচ্ছা ছিল–সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা করা এবং এই ফাঁকে প্রিয় কন্যাকে একবার দেখে যাওয়া।

মদিনায় আগমন করে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য মুসলিম নেতার সঙ্গে চুক্তিভঙ্গের বিষয়টির সুরাহা করতে চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু উভয় পক্ষের দাবিদাওয়া একীভূত না হওয়ায় আলোচনা ভেঙ্গে গেল। যেহেতু কুরাইশদের মিত্র গোত্র শর্ত ভঙ্গ করেছিল, সুতরাং এ চুক্তির আর কোনো বৈধতা নেই। মদিনার পক্ষ থেকে এ মর্মে সাফ জানিয়ে দেওয়া হলো মক্কা থেকে আসা নেতাদের। আবু সুফিয়ান রাসুল, আবু বকর ও উমরের সঙ্গে দেখা করে একটি সমাধানের চেষ্টা করলেন, কিন্তু কেউ তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে আর কথা বাড়াতে আগ্রহী হলেন না।

আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ায় আবু সুফিয়ান মক্কায় ফিরে যাওয়ার আগে তাঁর কন্যা উম্মে হাবিবার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ১০ বছরের দীর্ঘ বিচ্ছেদ। বাবা-মেয়ে দুজনেরই আবেগাপ্লুত হওয়ার কথা। কিন্তু উম্মে হাবিবার মাঝে তেমন কোনো ভাবাবেগ দেখা গেল না। একজন নারী হয়ে দীর্ঘ ১০টা বছর তিনি ভিনদেশে কাটিয়েছেন। উদ্বাস্তু অবস্থায় তাঁর স্বামী বিধর্মী হয়ে তাঁকে ছেড়ে গেছে, স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি বৈধব্যে কাটিয়েছেন দুঃসহ জীবন। কেন? শুধু তাঁর পিতার কারণে। ইসলামের প্রতি তাঁর পিতার সীমাহীন বিরুদ্ধাচরণের জন্যই তাঁকে ঘরছাড়া হতে হয়েছিল। সেসব কি তিনি এত সহজে ভুলে যাবেন?

আবু সুফিয়ান উম্মে হাবিবার ঘরে এলেন। পিতা ঘরে ঢুকতেই উম্মে হাবিবা মেঝেতে পেতে রাখা উটের পশমের তৈরি মাদুরটি গুটিয়ে নিলেন। দাম্ভিক আবু সুফিয়ান মেয়ের এমন কাণ্ড দেখে খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

জিজ্ঞেস করলেন, 'মাদুরটি আমার বসার যোগ্য নয়, নাকি আমিই মাদুরটির যোগ্য নই?'

উম্মে হাবিবার কণ্ঠে কোনো জড়তা নেই। তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন, 'এ মাদুরটিতে আল্লাহর রাসুল বসেন। যে মাদুরে তাঁর মতো সম্মানিত মানুষ বসেন, আপনার মতো একজন পৌত্তলিক বিধর্মীর এমন মাদুরে বসার সৌভাগ্য নেই।'

আগের আচরণে আবু সুফিয়ান অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন, এবার মেয়ের কথা শুনে তিনি ক্ষোভে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। রাগে গজরাতে গজরাতে বললেন, 'আমাদের থেকে চলে যাওয়ার পর তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

উম্মে হাবিবা মোটেও ভয় পেলেন না পিতার রক্তচক্ষু দেখে। তিনি দ্বিধাহীন ঘোষণা করলেন, 'বরং আল্লাহ আমাকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন।'

এ কথার পর আবু সুফিয়ানের জন্য সেখানে থাকার মতো আর মুখ রইল না। তিনি মেয়েকে ভর্ৎসনা করে মক্কার পথে রওনা হয়ে গেলেন।

দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর ইথিওপিয়ায় থাকার পর মদিনায় আগমনের প্রথম দিকে উম্মে হাবিবা ইসলামের অনেক আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। এ কারণে অনেক সময় বিব্রত অবস্থায় পড়তে হতো তাঁকে।

একদিন তিনি একান্ত মুহূর্তে রাসুলকে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আমার বোন মায়মুনাকেও বিয়ে করে নিন।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথায় আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কী বলছ তুমি! তোমার এমনটা বলার কারণ কী?'

উম্মে হাবিবা বললেন, 'আমি যে বরকতের অধিকারী হয়েছি, আমি চাই আমার বোনও সে বরকতের ভাগীদার হোক।'

রাসুল তাঁর ভুল ভেঙে দিয়ে বললেন, 'তোমার হয়তো জানা নেই, একসঙ্গে দুই বোনকে বিয়ে করা আমাদের জন্য বৈধ নয়।'

উম্মে হাবিবা আবার বললেন, 'তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু আমি শুনলাম আপনি নাকি আবু সালামার কন্যা দুররাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক?'

রাসুল আবারও অবাক হলেন, 'কার কথা বলছ তুমি? উম্মে সালামার কন্যা দুররা?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।'

রাসুল বললেন, 'উম্মে সালামার কন্যা আমার সৎমেয়ে। তাকে তো আমিই কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। তাকে বিয়ে করাও আমার জন্য নিষিদ্ধ। এ

www.pathagar.com

ছাড়া সে আমার দুধভাইয়ের মেয়ে। তার পিতা আবু সালামা এবং আমাকে ক্রীতদাসী সুয়াইবা দুধপান করিয়েছে। দুধভাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করা আমাদের জন্য বৈধ নয়। আশা করি, ভবিষ্যতে তুমি আর কখনো তোমার মেয়ে বা বোনের ব্যাপারে এমন প্রস্তাব করবে না।'

রাসুলের আদেশ-নিষেধের পূর্ণ আনুগত্যের ব্যাপারে তিনি সব সময় সচেষ্ট থাকতেন। একদিন তিনি রাসুলকে বলতে শুনলেন, 'যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১২ রাকাত নফল নামাজ পড়বে, তার জন্য বেহেশতে আলিশান অট্টালিকা তৈরি করা হবে।' এই হাদিস শোনার পর তিনি কখনো ১২ রাকাত নফল পড়ায় বিরতি দেননি।

তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান যখন মারা যান, তখন তিনি চেহারা ও হাতে সুগন্ধি মাখিয়ে বলতে থাকেন, 'কোনো নারীর পিতা মারা গেলে তার জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করা জায়েজ নেই। তবে স্বামী মারা গেলে তার জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালনের নিয়ম। রাসুলের মুখ থেকে আমি এমনটিই শুনেছি। তিনি যদি আমাকে এসব না জানাতেন, তাহলে এ ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই ছিল না।'

রাসুলের সঙ্গে উম্মে হাবিবার দাম্পত্যজীবনের ছায়াছবি এর চেয়ে আর বিশেষ কিছু সিরাত ও ইতিহাসে বিবৃত হয়নি। তবে তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় উপনীত হন, তখনকার একটি ঘটনা সবার জন্যই বেশ শিক্ষণীয়।

কী এক কারণে দাম্পত্যজীবনের কোনো এক সময় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহার সামান্য মনোমালিন্য হয়েছিল। বিষয় সামান্যই ছিল, আয়েশা হয়তো সেসব ভুলেও গিয়েছিলেন। উম্মে হাবিবা যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন আয়েশা আসেন তাঁকে দেখতে, সঙ্গে উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামাও ছিলেন। উম্মে হাবিবা আয়েশাকে কাছে ডেকে বললেন, 'আমাদের মাঝে সম্পর্ক ছিল সতিনের। সতিনের ঘর করতে গেলে স্বাভাবিক দু-চার মন্দ কথা হয়েই যায়। অনেক সময় মনোমালিন্য হয়ে থাকে। আমরাও এর থেকে ভিন্ন ছিলাম না। যদি কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকে ক্ষমা করবেন এবং আমার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করবেন।'

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা উম্মে হাবিবার হাত ধরে বললেন, 'আমি সকল কিছুই ক্ষমা করে দিয়েছি।' তিনি উম্মে হাবিবার মাগফেরাতের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন।

www.pathagar.com

উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা আয়েশাকে বললেন, 'হে আয়েশা! আপনি আমাকে খুশি করলেন। আল্লাহও আপনাকে তাঁর করুণাধারায় খুশি করুন।'

ইসলামের জন্য আত্মত্যাগে উদ্ভাসিত এই মহীয়সী নারী তাঁর ভাই মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে ৪৪ হিজরিতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। মদিনার জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

তিনি সর্বমোট ৬৫টি হাদিস বর্ণনা করেন।

এক নজরে

জন্ম: ৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দ।

বিয়ে: বিয়ের সময় উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স ছিল ৩৬/৩৭ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ৫৮।

বিবাহ: ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক সপ্তম হিজরির মুহাররম মাস।

দাম্পত্যজীবন: রাসুলের সাথে তাঁর দাম্পত্যকাল ৪ বছর।

মৃত্যু: ৬৬৪/৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৪৪/৪৫ হিজরি।

দাফন: মদিনার জান্নাতুল বাকিতে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০/৭২ বছর।

www.pathagar.com

উম্মুল মুমিনিন
সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই অধ্যায়
রাদিয়াল্লাহু আনহা

৬২৮ ঈসায়ি সনের জুন মাস। সপ্তম হিজরি সনের মুহররম মাস। মদিনা মুনাওয়ারার ১২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমের সাবা নামক স্থানে খায়বারফেরত মুসলিমবাহিনী যাত্রাবিরতি করেছে। তখন রাত। কাফেলার একটি তাঁবুতে একাকী বসে আছেন একজন নারী। রূপবতী, চেহারায় আভিজাত্যের জৌলুশ। প্রথম দেখাতে যে কেউ তাঁর রূপ নয়, সমীহ করবে তাঁর আভিজাত্য দেখে। তবে সে জৌলুশ ছাপিয়ে এই মুহূর্তে তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে বেদনার ছাপ।

বয়স অল্পই–১৭ কি ১৮। এ বয়সী একজন নারীর চেহারায় যে চাঞ্চল্য আর উচ্ছলতা থাকার কথা, তাঁর চেহারায় তা অনুপস্থিত। চেহারাজুড়ে গাম্ভীর্যের আবরণ যেন ঢেকে দিয়েছে তারুণ্যের উন্মীলনকে। বিষাদ আর প্রজ্ঞা লেপ্টে আছে তাঁর আয়ত দুই চোখে।

একা বসে ভাবছেন কী যেন। কারও জন্য প্রতীক্ষা?

তাঁবুর পর্দায় কারও আগমনের শব্দ হলো। বাইরে থেকে কেউ একজন সালাম দিলেন। একাকী নারীটি এ কণ্ঠটির সঙ্গে সদ্য পরিচিত হয়েছেন। মাত্র দুই দিন। অথচ কেমন আপন মনে হলো গলার আওয়াজটা!

তিনি পর্দা সরালেন। পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দীর্ঘকায় সৌম্যদর্শন এক সুপুরুষ ব্যক্তি। মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি। মাথার চুলগুলো তেলচর্চিত, পেছনের দিকে টান করে আঁচড়ানো। ঠোঁটের কোণে শুভ্র বিশ্বাসের হাসি।

মেয়েটি অনেক আগে থেকে জানেন এ ভুবনজয়ী হাসিমুখের লোকটিকে। যদিও তাঁর জন্ম মদিনাতে, শৈশব-কৈশোর কেটেছে এখানেই; তবে মাঝখানের

www.pathagar.com

কয়েকটি বছর পরিবারের সঙ্গে মদিনার বাইরে খায়বারে কাটিয়েছেন। তাই অনেক দিন চোখের আড়ালে ছিলেন এ মানুষটি।

কয়েক দিন আগে খায়বারে রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধে নিহত হয়েছেন নারীটির ভাই ও স্বামী! সব হারিয়ে তিনি হয়ে পড়েছিলেন নিঃস্ব। দাঁড়িয়েছিলেন দাসীর সারিতে। ইচ্ছে হলে যে কেউ কিনে নিতে পারত, বিক্রি করে দিতে পারত দাসবাজারে। স্বজনহীন পৃথিবী কতটা ভয়ংকর হতে পারে, যুদ্ধ শেষে সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন তিনি।

কিন্তু আজ এই মুহূর্তে পর্দার সামনে দাঁড়ানো ব্যক্তিটিকে দেখে তাঁর মনে হলো–সব হারানোর পরও তিনি নিঃস্ব নন। এই চেহারা যেন তাঁর চিরচেনা। শত সহস্র বছর ধরে তিনি আপন করে বুকের মাঝে আগলে রেখেছেন। সারা পৃথিবীকে নিঃস্ব করেও নিশ্চিন্তে তাঁর পাশে বসে কাটিয়ে দেওয়া যায় হাজার অমাবস্যার রাত্রি। তিনি যে রহমত বারিধারা এ পৃথিবীর–রহমাতুল্লিল আলামিন!

নারীটি সহসা সচকিত হলেন–আহ্! এ ছোট্ট তাঁবুতে কোথায় বসতে দিই চন্দ্রালোকিত এ চাঁদমুখকে! শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এগিয়ে এলেন দুঃখী এ মেয়েটির দিকে। মেয়েটির চোখে চোখ রেখে চিরাচরিত অভয়কণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'কেমন আছো, সাফিয়্যা?'

তিনি সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই রাদিয়াল্লাহু আনহা। উম্মুল মুমিনিন।

খায়বারের ইহুদিনেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের সদ্যবিধবা কন্যা। রাসুল নিঃস্ব সাফিয়্যাকে যুদ্ধদাসী থেকে সমাসীন করেছেন উম্মুল মুমিনিন হিসেবে।

হঠাৎ রাসুলের নজর পড়ল সাফিয়্যার গালের দিকে, 'তোমার গালে ও কিসের দাগ, সাফিয়্যা?'

সাফিয়্যা সচকিত হয়ে গালের দাগটি লুকোতে চাইলেন, 'ও কিছু না!'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তবু জানতে চাইলেন, 'আমাকে বলো...!'

সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইতস্তত করে বলতে লাগলেন, 'আমার প্রথম বিয়ের পর এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখি, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ জ্বলজ্বল করছে। আমি চাঁদের দিকে তাকাতেই চাঁদটি নিচে নামতে শুরু করে এবং আমার কোলে এসে পড়ে। আমার ঘুম ভেঙে যায়, খুব ভয় পাই আমি। স্বপ্নটি আমি আমার স্বামীকে বলি। সে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে ধারণা রাখত। আমার স্বপ্নের কথা শুনে সে খুবই রাগান্বিত হয় এবং সর্বশক্তি দিয়ে আমার গালে থাপ্পড় মেরে বলে

www.pathagar.com

ওঠে–আরবের রানি হওয়ার স্বপ্ন দেখো তুমি, তাই না? সেই থাপ্পড়ের দাগ আমার গালে এখন পর্যন্ত রয়ে গেছে। তবে আজ বুঝতে পারছি, আমার সে স্বপ্ন মিছে ছিল না। আজ সত্যিই আমি আরবের রানি হয়ে গেছি।'

দুই

কয়েক দিন আগের কথা। খায়বার বিজিত হয়েছে। একে একে মুসলিমদের করতলগত হয়েছে খায়বারে ইহুদিদের অধিকারে থাকা আটটি দুর্গ। দীর্ঘ লড়াইয়ে নিহত হয়েছে কামুস দুর্গের অধিপতি খায়বারের অন্যতম ইহুদিনেতা আবুল হাকিকসহ ৯৩ জন ইহুদি যোদ্ধা। মুসলিমবাহিনীর ১৯ জন সাহাবি শাহাদাতবরণ করেছেন।

এ যুদ্ধে খায়বারের দুর্গগুলোর সকল নারী ও শিশুকে যুদ্ধলব্ধ দাস হিসেবে বন্দী করা হয়েছে। দুর্গগুলো থেকে যুদ্ধলব্ধ যেসব সম্পদ হস্তগত হয়েছে, রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেগুলো মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করে দিচ্ছিলেন।

যুদ্ধের ক্ষত এখনো শুকায়নি। নিহতদের লাশ দুর্গের সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। রক্তের ধারা শুকিয়ে মরুর বালিয়াড়ি খয়েরি রং ধারণ করেছে। এসবকে ছাপিয়ে দুর্গের ভেতর থেকে যুদ্ধবন্দী নারী ও শিশুদের বের করে আনছিল মুসলিম যোদ্ধারা। এরই মধ্যে রাসুলের একান্ত সেবক বেলাল হাবশিকে দেখা গেল, তিনি দুজন মেয়েকে দুর্গের সামনে পড়ে থাকা লাশের মিছিলের মাঝখান দিয়ে নিয়ে আসছেন। তাঁদের একজন ছিলেন সাফিয়্যা এবং আরেকজন তাঁর চাচাতো বোন। লাশের মধ্য দিয়ে হেঁটে আসার সময় সাফিয়্যার চাচাতো বোন নিজের একান্ত আত্মীয়দের লাশ ময়দানে পড়ে থাকতে দেখে নিজেকে সামলাতে পারলেন না, আহাজারি করে কাঁদতে শুরু করলেন।

রাসুল কাছেই ছিলেন। কান্নার আওয়াজ তাঁর কানে গেল। তিনি চোখ তুলে এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে বেলালকে ধমক দিলেন, 'বেলাল! তোমার অন্তরে কি রহম-দয়া বলে কিছু নেই? তুমি এমন স্থান দিয়ে এ দুই মেয়েকে নিয়ে আসছ, যার চারপাশে তার ভাই বা পিতার লাশ পড়ে আছে!'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধবন্দী সাফিয়্যা এবং তাঁর চাচাতো বোনকে যুদ্ধের রক্তাক্ত ময়দান থেকে খানিক দূরে বসিয়ে দিলেন। এমন সময় সাহাবি দাহিয়্যা ইবনে খলিফা কলবি রাদিয়াল্লাহু আনহু এলেন রাসুলের কাছে। এসে জানালেন, তাঁর একজন দাসী প্রয়োজন। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে তাঁকে যেন

www.pathagar.com

একজন দাসী দেওয়া হয়। রাসুল ধৃত যুদ্ধবন্দী নারীদের থেকে যেকোনো একজনকে পছন্দ করে নিয়ে নিতে বললেন। দাহিয়্যা কলবি দাসী নির্বাচন করতে চলে গেলেন।

একটু পর এক সাহাবি এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি দাহিয়্যার জন্য এমন একজনকে দাসী হিসেবে নির্বাচন করেছেন, যিনি কুরায়জা ও নজির গোত্রের সম্ভ্রান্ত নারী। সংগত কারণে এমন সম্মানিত নারী দাহিয়্যার উপযুক্ত নয়, তাকে আপনার বিয়ে করা উচিত।'

রাসুল তখন পর্যন্ত জানতেন না কুরায়জা গোত্রের নেতার মেয়ে যুদ্ধবন্দী হিসেবে গ্রেপ্তার হয়েছে। তিনি বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে তখনই দাহিয়্যা ও সাফিয়্যাকে ডেকে আনতে বললেন। দাহিয়্যা আসার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, 'তুমি অন্য কোনো মেয়েকে পছন্দ করো।'

রাসুল বন্দী সাফিয়্যার দিকে তাকালেন। কেবলই কৈশোর পেরোনো সদ্য তরুণী। দেখতে ছোটখাটো গড়নের ফরসা অবয়ব। ভয় আর উৎকণ্ঠায় ফরসা মুখটা শুকিয়ে গেছে। গোত্রপতির মেয়ে হিসেবে সারা জীবন বিলাসে কেটেছে তাঁর, কখনো চিন্তা করেননি জীবন তাঁকে এমন ভয়াবহ সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে। রাজকুমারী থেকে যুদ্ধদাসী! ভবিষ্যৎ তাঁর জন্য কী ভয়ংকর বাস্তবতা নিয়ে অপেক্ষা করছে, তিনি ভাবতে পারছেন না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সব হারানো সাফিয়্যার দিকে একনজর তাকিয়ে পড়ে ফেললেন তাঁর চোখের ভাষা। নরম কণ্ঠে বললেন, 'তুমি যদি মুসলিম হও, তাহলে এর বিনিময়ে তোমাকে মুক্ত করে দিতে পারি। তুমি ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারো। আর তুমি যদি স্বধর্মে থাকতে চাও, তাহলে তোমাকে আমি মুক্ত করে দেব। তুমি তোমার গোত্রের সঙ্গে বসবাস করতে পারবে।'

সাফিয়্যা রাসুলের কথা শুনে চমকে গেলেন। তাঁর স্বপ্ন কি তবে সত্য হলো? কয়েক দিন আগে, যখন কেবল মুসলিমবাহিনী মদিনা থেকে খায়বারের পথে রওনা হয়েছে, তখন তার বিয়ে হয়েছিল কামুস দুর্গাধিপতির ছেলে কেনানা ইবনে আবুল হাকিকের সঙ্গে। বিয়ের রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন তাঁর কোলে চাঁদ নেমে আসছে। এ কথা তাঁর নতুন স্বামীকে বলতেই সে তাকে সজোরে থাপ্পড় মারে এবং রেগে গিয়ে বলেছিল, 'আরবের শাসক মুহাম্মদের রানি হওয়ার স্বপ্ন দেখো তুমি, তাই না?'

স্বামীর কথাটা মনে মনে আওড়াচ্ছিলেন কয়েক দিন থেকে। আজ রাসুলকে সামনে দেখে এবং তাঁর মুখ থেকে কেবলই অভূতপূর্ব কথাটি শুনে মনে হলো,

www.pathagar.com

তাঁর স্বপ্ন সত্য হতে চলেছে। তিনি রাসুলকে সরাসরি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই আমি ইসলামের দাওয়াত পেয়েছি। আমি মনে মনে এ ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে চিন্তা করছিলাম। আমি আনন্দের সঙ্গে আপনার প্রস্তাব মেনে নিচ্ছি। এ মুহূর্তে আমার পিতা, ভাই বা স্বামী বা ইহুদি আত্মীয়স্বজনের কেউ নেই। আপনি যদি আমাকে মুক্ত করে দেন, তবে আমার গোত্রের কাছে ফিরে যাওয়ার চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকেই বেছে নেব।'

চমৎকার স্বীকারোক্তি। ইহুদিকন্যা সাফিয়্যার মুখ থেকে এত তাড়াতাড়ি স্বীকারোক্তি পাবেন, এটা হয়তো রাসুল ভাবেননি। তবে সাফিয়্যার কাছে রাসুলকে নবি হিসেবে সত্যায়ন করতে তেমন কোনো বেগ পেতে হয়নি। কারণ, তিনি আগে থেকেই রাসুলের সত্যতার ব্যাপারে ধারণা রাখতেন।

বিয়েটা ফিরতি যাত্রার আগেই হয়ে গেল। বিয়ে উপলক্ষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনিন সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে মোহর দিতে চাইলেন। কিন্তু সাফিয়্যা বললেন, তাঁর মুক্তিই তাঁর মোহর হিসেবে ধার্য করা হোক। কথামতো তা-ই হলো।

রাসুল সে রাতে সাফিয়্যার সঙ্গে রাত্রিযাপনের ইচ্ছা করলেন। কিন্তু সাফিয়্যা আপত্তি জানিয়ে বললেন, আজ নয়, তাঁর কিছুটা সময় প্রয়োজন। রাসুল কিছুটা বিব্রত হলেও নববধূর মন-মানসিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে তাঁকে একা থাকতে দিলেন।

যদিও আরবের প্রচলন অনুযায়ী বিয়ের প্রথম রাতে স্বামীর অবশ্যই স্ত্রীর সঙ্গে থাকার রীতি। এমনটি না করলে নববধূ ও তার গোত্রীয় স্বজনরা এটিকে তাদের অপমান হিসেবে গন্য করে। তবু রাসুল সাফিয়্যার মতামতকেই গুরুত্ব দিলেন। তিনি কোনো অহেতুক রীতির ধার ধারেন না।

পরদিন সকালে গণ্যমান্য সাহাবিদের একত্র করে সামান্য ওলিমার আয়োজন করলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। ওলিমার আয়োজন ছিল সামান্যই-খেজুর, ঘি আর যবের ছাতু।

তিন

ওলিমা শেষ হলে খায়বার বিজয়ী মুসলিমবাহিনী মদিনার পথে রওনা হলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যাকে নিজের উটের হাওদায় চড়িয়ে নিজের গায়ের জামা দিয়ে তাঁর ছায়ার ব্যবস্থা করলেন। একটি বর্ণনা থেকে

www.pathagar.com

জানা যায়, রাসুল সাফিয়্যাকে নিজের উটে চড়ানোর সময় উটের সামনে হাঁটু পেতে দেন। সাফিয়্যা রাসুলের হাঁটুতে পা রেখে উটের হাওদায় আরোহণ করেন। নিজের হাঁটু পেতে দেওয়া এবং নিজের জামা দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করার দুটো কারণ ছিল। প্রথমত নতুন বধূকে সম্মান দেওয়া এবং রোদের তাপ থেকে বাঁচানো; দ্বিতীয়ত সবাইকে এ কথা জানানো যে, আল্লাহর রাসুল সাফিয়্যাকে নিজের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছেন।

মদিনার কাছাকাছি সাবা নামক স্থানে এসে কাফেলা রাত্রিযাপনের উদ্দেশ্যে যাত্রাবিরতি করল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নববধূর সম্মতি নিয়ে তাঁর কাছে কিশোর-সাহাবি আনাস ইবনে মালিকের মা উম্মে সুলাইমকে পাঠালেন, যেন তিনি নববধূকে বাসরের জন্য সজ্জিত করেন।

উম্মে সুলাইম রাসুলের অন্য স্ত্রী উম্মে সালামাকেও নিয়ে গেলেন সঙ্গে করে। তাঁরা গিয়ে সাফিয়্যাকে নতুন কনে হিসেবে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিলেন।

রাত্রিবেলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যার কাছে এলেন। দুই দিন আগের বিষাদক্লিষ্ট মুখটা আজ পূর্ণিমার মতো আলোকিত হয়ে আছে। সাফিয়্যা রাসুলকে সম্ভাষণ জানিয়ে বরণ করে নিলেন। সে রাতে রাসুল একটুও ঘুমালেন না।

পরদিন উম্মে সুলাইমের কাছে সাফিয়্যা নিজেই বলেছিলেন, আল্লাহর রাসুল সারা রাত একফোঁটা ঘুমাননি। শুনে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন উম্মে সুলাইম। সাফিয়্যা জানালেন, কয়েক দিন আগে তিনি সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর স্বামী-ভাইসহ অনেক আত্মীয়স্বজন সেদিন নিহত হয়েছিল খায়বারের যুদ্ধে। রাসুল তাঁকে সে ব্যথার সান্ত্বনা দিয়েছেন। তিনি খুব নিবিড়কণ্ঠে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন কেন যুদ্ধ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এবং কেন এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। ইহুদিদের ষড়যন্ত্র এবং পুনঃপুন তাদের বিশ্বাসঘাতকতা তাদের এই করুণ পরিণতির জন্য দায়ী। তিনি বোঝাচ্ছিলেন—ইসলাম কখনোই সাধারণ দৃষ্টিতে মানবহত্যাকে সমর্থন করে না। ইসলাম মানবতার ধর্ম, মানবতাকে রক্ষা করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআন। তিনি রহমাতুল্লিল আলামিন অভিধা ধারণ করে পৃথিবীতে এসেছেন। শুধু অনন্যোপায় হলেই কেবল তিনি তলোয়ার দিয়ে তলোয়ারের জবাব দেন।

সেদিন রাতে তাঁরা ব্যক্তিগত অনেক কথাও বলেছেন একে অপরের সঙ্গে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মূলত চাচ্ছিলেন সদ্য ভগ্নহৃদয় নিয়ে ফিরে আসা সাফিয়্যার মন থেকে বিষাদ ও দুশ্চিন্তার কালো মেঘ যেন বিদূরিত হয়ে

www.pathagar.com

যায়। যে ১৭ বছরের মেয়ে নিজের প্রিয়জনের লাশ ডিঙিয়ে শুধু ভালোবাসার আহ্বানে তাঁর সঙ্গে চলে এসেছেন, সেই মেয়ের মনের কালিমা দূর করা তাঁর তো একান্ত দায়িত্ব। তিনি রাতভর সে চেষ্টাই করে গেছেন। তিনি তো এ মহান বারতা নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছেন। মানুষের মন থেকে বিষাদ দূর করে ঝলমলে রোদ্দুর নিয়ে আসাই তাঁর দায়িত্ব। সদ্যবিবাহিত নববধূর মন থেকে তিনি সে বিষাদ দূর করার কাজে ব্যাপ্ত ছিলেন সারা রাত। তিনি ঘুমাবেন কী করে!

কথায় কথায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেদিনের বিব্রতবোধের কথাটাও তুললেন সাফিয়্যার কাছে–খায়বারে কেন তিনি সেদিন রাসুলের সঙ্গে রাত্রিযাপন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন?

সাফিয়্যা উত্তর দিলেন, তাঁর গোত্রের অনেক লোক তখনো খায়বারের আশপাশে অবস্থান করছিল। তিনি আশঙ্কা করছিলেন, রাসুলের সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা শুনে তারা রাসুলকে হত্যা করতে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র করতে পারে। রাসুলের নিরাপত্তার কথা ভেবে তিনি সেদিন বিয়ের কোনো প্রকার আনুষ্ঠানিক প্রথা পালনে বাধা দিয়েছিলেন।

কথা বলতে বলতে সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা অতীতের একটি ঘটনাও বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, 'আমি তখন ছোট। আমি আমার পিতা হুয়াই ইবনে আখতাব এবং আমার চাচা আবু ইয়াসিরের খুব আদরের মেয়ে ছিলাম। একদিন তাঁরা উভয়ে খুব চিন্তিত অবস্থায় আমাদের বাড়িতে এলেন। তাঁদের চেহারায় দুশ্চিন্তা এবং ক্ষোভের রেখা ফুটে উঠেছিল। আমি তাঁদের সঙ্গে বাচ্চাসুলভ দুষ্টুমি করতে লাগলাম। কিন্তু তাঁরা আমার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছিলেন না।

'একপর্যায়ে আমার চাচা আবু ইয়াসির আমার পিতাকে বললেন, "এই কি প্রতিশ্রুত সেই ব্যক্তি?"

'আমার পিতা উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, খোদার কসম এ সেই ব্যক্তিই!"

'"তুমি কি তার আগমনের সকল নিদর্শন এবং তাকে শনাক্ত করার সকল চিহ্ন ভালোভাবে পরখ করেছ?" প্রশ্ন করলেন আমার চাচা।

'আমার পিতা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। চাচা এবার প্রশ্ন করলেন, "তাহলে এখন তুমি কী করতে চাও?"

'আমার পিতা উত্তর দিলেন, '"খোদার কসম করে বলছি, যত দিন আমি জীবিত থাকব, তত দিন তার দুশমন হয়েই থাকব।"'

www.pathagar.com

সাফিয়্যা বলেন, 'কার কথা বলা হচ্ছে, তখন আমি না বুঝলেও পরবর্তী সময়ে বুঝতে পারি, তাঁরা আপনার কথা বলছিলেন।' তিনি জানালেন রাসুলকে।

সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহার এ কথার সত্যতা পাওয়া যায় শিগগিরই। সালাম ইবনে মিশকাম নামের এক ইহুদির স্ত্রী রাসুল এবং তাঁর কতিপয় সাহাবিকে বাড়িতে দাওয়াত করে বিষমিশ্রিত মাংস খেতে দেয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেও বাশার ইবনে বারা নামের এক সাহাবি এক টুকরো মাংস খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

নববধূর মনোবেদনা দূর করতে এবং তাঁর মন জয় করতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাত ভোর করে ফেললেন। কখন যে রাত পোহায়ে সুবহে সাদিক হয়ে গেছে, সেদিকে রাসুলের খেয়াল ছিল না। তিনি জলদি বাইরে এসে পবিত্র হয়ে ফজরের নামাজ আদায় করতে যাবেন এমন সময় দেখতে পেলেন, তাঁর তাঁবুর সামনে আবু আইয়ুব খালিদ ইবনে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু তরবারি হাতে দণ্ডায়মান। তাঁকে দেখে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! এই মহিলার (সাফিয়্যা) কারণে আমি আপনার জীবনের ব্যাপারে শঙ্কিত ছিলাম। কেননা দুই দিন আগে মাত্র আপনি ইহুদিদের পরাজিত করেছেন এবং তাঁর ভাই ও স্বামী যুদ্ধে নিহত হয়েছে। তিনি কেবল নতুন মুসলিম হয়েছেন, এখনো নিজ ধর্মের ভালোবাসা হয়তো তাঁর অন্তর থেকে মুছে যায়নি। আমি আশঙ্কা করছিলাম, তিনি যদি আপনার কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করেন!'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবির কথা শুনে মুচকি হেসে তাঁর রাত্রি জাগরণের প্রতিদানের জন্য দোয়া করলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে রাসুল কাফেলাকে মদিনার দিকে যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন।

চার

খায়বার বিজয়ী মুসলিমবাহিনী মদিনায় পৌঁছাল। ইহুদিদের বিরুদ্ধে এটা ছিল রাসুলের বড় বিজয়। পুরো মদিনা খুশির জোয়ারে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তবে

www.pathagar.com

বিজয়ের আনন্দকে ছাপিয়ে আলোচনা হতে লাগল রাসুলের নতুন স্ত্রী ইহুদি-কন্যা সাফিয়্যাকে নিয়ে। বিশেষত, নারীমহলে বেশ একটা রোল পড়ে গেল। যখন তারা শুনল, সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা অসম্ভব সুন্দরী, তখন তাদের আগ্রহের মাত্রা বাড়তে লাগল। সবাই সাফিয়্যাকে একনজর দেখার জন্য ছুটে এল তাঁর কাছে।

অভিযান থেকে ফিরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যাকে উঠিয়েছেন মদিনার বিত্তশালী সাহাবি হারিস ইবনে নোমানের বাড়িতে। তখন পর্যন্ত সাফিয়্যার জন্য মসজিদে নববির পাশে নতুন করে হুজরা তৈরি করা সম্ভব হয়নি বিধায় এই পরোপকারী সাহাবির বাড়িতে প্রাথমিকভাবে উঠতে হলো তাঁকে। হারিস ইবনে নোমানের বাড়িতে মদিনার কৌতূহলী নারীদের ঢল পড়ে গেল সাফিয়্যাকে দেখার জন্য।

হোক উম্মুল মুমিনিন, নারী তো শেষ পর্যন্ত নারীই। কৌতূহলের শেষ নেই। মদিনায় অবস্থানরত অন্য উম্মুল মুমিনিনগণ যখন রাসুলের নতুন স্ত্রীর রূপ-লাবণ্যের কথা শুনতে পেলেন তখন আয়েশা, জয়নব, হাফসা, জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমও তাঁকে দেখার জন্য এলেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সাফিয়্যাকে দেখার জন্য নিজেকে একটি চাদরে ঢেকে সাহাবি হারিস ইবনে নোমানের বাড়ির দিকে যেতে লাগলেন। রাসুল তখন আশপাশেই ছিলেন কোথাও। কিছুক্ষণ পর যখন আয়েশা সাফিয়্যাকে দেখে বের হলেন, তখন রাসুল তাঁর হাত ধরে নিজের দিকে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আয়েশা, তাঁকে কেমন দেখলে?'

আয়েশা নিজের স্বভাবমতো বললেন, 'সে তো এক ইহুদির মেয়ে!'

আয়েশার এমন অকপট স্বীকারোক্তি শুনে রাসুল মনঃক্ষুণ্ন হলেন। তিনি বললেন, 'এ কী কথা আয়েশা! সে তো ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণ একদম খাঁটি!'

আয়েশা আর কিছু না বলে হাফসার ঘরের দিকে চলে গেলেন।

উম্মুল মুমিনিন জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা রূপবতী সাফিয়্যাকে দেখে সঙ্গে আসা উম্মুল মুমিনিন জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, 'জুয়াইরিয়া, আমি নিশ্চিত—এ যুদ্ধদাসী ঠিকই রাসুলের মন জয় করে নেবে।'

জুয়াইরিয়া উত্তর দিলেন, 'না, আমার মনে হয় না তিনি তেমন নারী হবেন।'

রাসুলের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মাঝে সাধারণ নারীত্বের অনুভূতি কখনো কখনো প্রকাশ পেত। যেহেতু তাঁরা রাসুলকে সীমাহীন ভালোবাসতেন, এ

www.pathagar.com

কারণে ভালোবাসার অংশীদারে সকলেই ঈর্ষান্বিত হতেন। এ স্বাভাবিক বিষয়, নারীমনের এমন অনুভূতি হলেও কখনো তা সীমা অতিক্রম করত না।

কিছুক্ষণ পর রাসুল-তনয়া ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা দেখতে এলেন সাফিয়্যাকে। সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন জানতে পারলেন তিনি রাসুলের আদরের মেয়ে, তখন নিজের কানের মূল্যবান দুল খুলে তাঁর কানে পরিয়ে দিলেন। ফাতেমার সঙ্গে যেসব নারী এসেছিলেন, তিনি তাঁদেরও বিভিন্ন উপহার দিয়ে বরণ করলেন।

উম্মুল মুমিনিনগণ যাঁরা তাঁকে দেখতে এসেছিলেন, তাঁরা গোপনে গোপনে তাঁকে দেখে চলে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ নিজের পরিচয় প্রকাশ করেননি। সাফিয়্যা যাঁদের ব্যাপারে জানতে পারলেন, তাঁদেরও সোনার চুড়ি এবং অন্যান্য গহনা উপহার দিলেন। কেননা উপহার মানুষের মাঝে হৃদ্যতা বাড়িয়ে তোলে।

সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা যথেষ্ট সুন্দরী হলেও তাঁর চরিত্রে অহংকারের লেশমাত্র ছিল না। তিনি খুবই শান্ত ও ধীর-স্থির প্রকৃতির নারী ছিলেন। কখনো নিজের মনোভাব কাউকে বুঝতে দিতেন না। কারও সঙ্গে কখনো উঁচু আওয়াজে কথা বলতেন না। তিনি ইহুদি গোত্রের মেয়ে হওয়ার দরুন অনেক সময় তাঁকে নানা গঞ্জনা সহ্য করতে হতো, তবু তিনি কখনো রাসুলের কাছে বা অন্য কারও কাছে এ বিষয়ে নালিশ করা থেকে বিরত থাকতেন। তাঁর এমন শান্ত চরিত্রের কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সব সময় তাঁর প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতেন। তিনি জানতেন, তাঁর অভাব-অভিযোগের কথা তিনি কখনো মুখ ফুটে বলবেন না। এ কারণে রাসুলই আগ বাড়িয়ে তাঁর মনের কথা বুঝতে চেষ্টা করতেন।

বিদায় হজের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সকল স্ত্রীকে নিয়ে হজ পালনের জন্য মক্কায় আগমন করেন। তাওয়াফে ইফাদার সময় সাফিয়্যার উটটি দুর্বল থাকায় তিনি কাফেলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিলেন না। চাপা স্বভাবের ছিলেন বিধায় কাউকে কিছু বলতেও পারছিলেন না। কিন্তু তাঁকে উটের পিঠে এভাবে কাঁদতে দেখে রাসুল জলদি কাছে এসে তাঁর চোখের পানি মুছে জানতে চান, কেন তিনি কাঁদছেন। তিনি উটের চলৎক্ষমতাহীনতার কথা বললে রাসুল তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর কান্না থামানোর ব্যবস্থা করেন।

এ সফরে জয়নব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহাও রাসুলের সফরসঙ্গী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে একাধিক উট ছিল। রাসুল তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'তোমার একটি উট সাফিয়্যাকে দাও।'

www.pathagar.com

জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা একটু গরম মেজাজের ছিলেন। তিনি আগপিছু কিছু না ভেবে বলে বসলেন, 'আমি ওই ইহুদি মেয়েকে আমার উট দেব? কক্ষনো না!'

তাঁর এ কথায় রাসুল এতটাই কষ্ট পান যে, পরবর্তী আড়াই মাস পর্যন্ত তিনি জয়নবের ঘরেও যাননি এবং তাঁর সঙ্গে ভালোভাবে কথাও বলেননি। অবশেষে অনেকবার ক্ষমা চাওয়ার পর রাসুল তাঁর এমন দাম্ভিক আচরণ ক্ষমা করেন।

জয়নব বিনতে জাহাশ পরবর্তী সময়ে বলতেন, 'আল্লাহর রাসুলের এমন অসন্তুষ্টি আমাকে একপ্রকার নিরাশ করে ফেলেছিল। আমি শপথ করেছিলাম, জীবনে আর কোনো দিন এমন কথা বলব না।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নবি হিসেবে পৃথিবীতে এসেছেন মানুষের মন থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, রিপুর তাড়না বিদূরিত করতে। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর মনেই যদি এমন বিদ্বেষ রোপিত থাকে, তাহলে তো তাঁর আনীত ধর্মের বারতাই বিফল হয়ে যাবে। এ কারণে তিনি জয়নবকে এমন শাস্তি দিয়েছিলেন। তিনি মানুষের মাঝে বর্ণবৈষম্য দূর করতে নিজের পুরোটা জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। উঁচু-নীচু আর সাদা-কালোর তফাতকে তিনি ইসলামের তরবারি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করেছিলেন।

সাফিয়্যার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হজব্রত স্থগিত করে অন্য স্ত্রীদের কাছে এসে বললেন, 'সাফিয়্যার কারণে তোমাদের কি দেরি হয়ে যাচ্ছে?'

স্ত্রীদের মধ্য থেকে আয়েশা বললেন, 'অসুবিধা নেই, তিনি তো তাওয়াফে ইফাদাহ সম্পন্ন করে ফেলেছেন।'

আয়েশার সত্যায়ন শুনে রাসুল বললেন, 'তাহলে সে আমাদের দেরি করিয়ে দেবে না।' এভাবেই রাসুল সাফিয়্যার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করতেন।

সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা মদিনায় আগমনের বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা। তত দিনে অন্যান্য উম্মুল মুমিনিনের সঙ্গে তাঁর বেশ সদ্ভাব হয়ে গেছে। একদিন উম্মুল মুমিনিনদের কয়েকজন রাসুল-তনয়া ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে সমবেত হয়েছেন। সকলে মিলে নিজেদের অতীত জীবনের নানা মজার কাহিনি নিয়ে আলাপ করছিলেন এবং নিজেদের বংশ ও সম্মানের বিষয়ে কথা বলছিলেন। একদিকে ছিলেন আয়েশা ও হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা,

www.pathagar.com

অন্যদিকে ছিলেন সাফিয়্যাসহ আরও দু-তিনজন রাসুলপত্নী। মাঝখানে বসে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন তাঁদের কথার মধ্যস্থতাকারী।

সবাই যাঁর যাঁর বংশমর্যাদা এবং তাঁদের অতীত ইতিহাস নিয়ে গর্ব করছিলেন। বিশেষত আয়েশা ও হাফসা নিজেদের কুরাইশ বলে আত্মগৌরব করছিলেন এবং তাঁদের পিতা রাসুলের অন্যতম সহযোগী বলে নিজেদের অবস্থান সবার উর্ধ্বে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছিলেন। যখন সাফিয়্যার কথা বলার পালা এল, তখন তিনি নিজের অতীত এবং বংশমর্যাদার বলার মতো কিছু না পেয়ে চুপ রইলেন। যেহেতু তিনি আগে থেকেই জানতেন ইহুদিদের কী পরিমাণ ঘৃণা করা হয় মদিনায়, এ কারণে কিছু না বলে চুপ করে থাকাটাই ভালো মনে করলেন। যদিও মনে মনে তিনি যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছিলেন।

এ ঘটনার পর তিনি ঘরে এসে একা একা কাঁদছিলেন। কিছুক্ষণ পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে এসে তাঁকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, তিনি কাঁদছেন কেন। তিনি চোখের অশ্রু মুছতে মুছতে বলেন, 'আয়েশা ও হাফসা বলছিলেন, তাঁরা কুরাইশ এবং সম্মানের দিক থেকে অন্য স্ত্রীদের চেয়ে রাসুলের অধিক নিকটবর্তী।'

রাসুল সাফিয়্যার কষ্টের কথা শুনে মুচকি হেসে বললেন, 'আরে বোকা, তুমিও-বা কম কিসে? তুমি তাঁদের বলে দিতে–আমার স্বামী রাসুল মুহাম্মদ, আমার বংশীয় পিতা নবি হারুন এবং আমার বংশীয় চাচা মুসা আলায়হিমাস সালাম।'

এভাবেই রাসুল দুঃখিনী সাফিয়্যার মনের মেঘ দূর করে সেখানে আনন্দের ঝলমলে সূর্য এনে দিতেন। এ কারণে রাসুলের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অন্যতম ভরসাস্থল। তিনি কোনো কিছুতেই রাসুলের এ ভালোবাসাকে হারাতে চাইতেন না।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা একদিন সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহার ছোটখাটো গড়নের দিকে ইঙ্গিত করে রাসুলকে বললেন, 'আপনি ভরণ-পোষণের তাঁকে যা দেন, তা-ই তাঁর জন্য যথেষ্ট।'

এটা সাফিয়্যার ব্যাপারে অপমানসূচক বাক্য। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আয়েশার এমন কটাক্ষপূর্ণ কথায় ব্যথিত হলেন। তিনি আয়েশাকে তিরস্কার করে বললেন, 'তোমার এ কথাকে যদি সাগরে নিক্ষেপ করা হতো, তবে সাগরের পানিও দূষিত হয়ে যেত।' এমনই মন্দ কথা বলেছ তুমি।

আয়েশা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি খানিকটা দুষ্টুমি করেই কথাটি বলেছিলেন। কিন্তু রাসুল এভাবে কষ্ট পাবেন, তা তিনি বুঝতে পারেননি। তিনি

www.pathagar.com

সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল শুধরে বললেন, 'আমি এমনিই তাঁর বর্ণনা দিচ্ছিলাম শুধু।'

কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আয়েশাকে সংশোধনের জন্য তাঁকে সতর্ক করে দিলেন, 'আমাকে যদি পুরো পৃথিবীটা দিয়ে দেওয়া হয়, তবু আমি এমন কথা কখনো বলব না।'

একদিন কোনো এক কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহার ওপর রাগ করে ফেললেন। রাগ হয়তো খুব সামান্য ছিল, কিন্তু সাফিয়্যা রাসুলের রাগের কারণে অস্থির হয়ে পড়লেন। তাঁর রাগ ভাঙাতে কী করবেন কিছু বুঝতে পারছিলেন না। অবশেষে বুঝলেন, এর সমাধান আয়েশা ছাড়া আর কেউ করতে পারবেন না। কেননা আয়েশাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অন্য সব স্ত্রীর চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন এবং তাঁর কথা তিনি কখনো ফেলতে পারতেন না। তাই তিনি আয়েশার দ্বারস্থ হলেন।

কিন্তু এমনিতে তো আয়েশাকে পটানো যাবে না। সাফিয়্যা ভালো রান্না করতে পারতেন, উপাদেয় কিছু রান্না করে আয়েশার ঘরে পাঠানোর কথা ভাবলেন একবার। কিন্তু অতীতে একবার আয়েশার ঘরে খাবার পাঠানো নিয়ে বেশ তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাঁর, আয়েশা তাঁর খাবারের পাত্র ছুড়ে ভেঙে ফেলেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি তাঁর কাছে অনুশোচনা করেছিলেন। কিন্তু এবার খাবার পাঠানোর চিন্তা বাদ করে দিলেন। তাহলে কী করা যায়? চিন্তা করে একটা বুদ্ধি বের করলেন।

তিনি এক অন্য রকম প্রস্তাব নিয়ে গেলেন আয়েশার কাছে। আয়েশার কাছে রাসুলের রাগ এবং তাঁর অস্থিরতার কথা জানিয়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে একটি রাত কাটানোর সৌভাগ্য আমি পৃথিবীর কোনো কিছুর বিনিময়েই ছাড়তে রাজি নই। কিন্তু আপনি যদি রাসুলের সঙ্গে আমার মনোমালিন্যের বিষয়টি সুরাহা করে দিতে পারেন, তাহলে আমার এবারকার পালার দিনটি আমি আপনাকে দিয়ে দেব।'

সাফিয়্যার কথায় আয়েশা খুশি হলেন। রাসুলকে কাছে পাওয়ার সামান্য সুযোগও তিনি হাতছাড়া করতেন না। সুতরাং, তিনি রাসুলের রাগ প্রশমিত করার চেষ্টা করবেন বলে কথা দিলেন।

সেদিন বিকেলে রাসুল আয়েশার ঘরে নিয়মিত সাক্ষাৎ করতে এসে দেখেন আয়েশা একটি হলুদ ওড়না পরে এবং গায়ে সুগন্ধি মেখে বেশ সেজেগোজে বসে আছেন। তাঁকে দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একটু ভ্রু কুঁচকে

www.pathagar.com

বললেন, 'আয়েশা, আমার থেকে দূরে থাকো। আজকে নিশ্চয় তোমার দিন নয়।'

আয়েশা খানিক ভাবুকচিত্তে জবাব দিলেন, 'সবকিছুই আল্লাহর ইশারায় হয়; তিনি যাকে ইচ্ছে তাকেই তাঁর প্রতিদান দেন।' এরপর তিনি সাফিয়্যার বিষয়টি খুলে বলেন এবং রাসুলের রাগ ভাঙাতে সচেষ্ট হন। রাসুল আয়েশার এমন পরোপকারে যেমন খুশি হলেন, তেমনি সাফিয়্যার ক্ষমা প্রার্থনার বুদ্ধিমত্তা দেখেও সন্তুষ্ট হলেন।

এখানে আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য, সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে প্রথম দেখে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যদিও কিছুটা ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন, কিন্তু মানবিকতার সকল দূরত্ব খুব শিগগির তাঁদের থেকে দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া আয়েশা ও সাফিয়্যা দুজন প্রায় সমবয়সী ছিলেন, দুজনের মাঝে বন্ধুত্ব হতেও খুব বেশি দেরি হয়নি। আয়েশা-হাফসা মসজিদে নববির পাশে যে মহল্লায় থাকতেন, সাফিয়্যাকেও রাসুল সে মহল্লায় ঘর বানিয়ে দিয়েছিলেন।

পাশাপাশি বাড়ি থাকলে এক-আধটু বিষয় নিয়ে সামান্য ঠোকাঠুকি খুবই স্বাভাবিক বিষয়। বিশেষত সতিনদের মাঝে কোনো বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু এই মহীয়সী নারীরা নববি ছায়ায় নিজেদের এমন করে গড়ে তুলেছিলেন, মানবীয় সকল মন্দ রিপু তাঁদের খোদাভীতি আর একনিষ্ঠতার দেয়াল ভেদ করে কখনো সামনে আসতে পারত না। যদিও-বা মানবীয় দুর্বলতায় নিজেদের মধ্যে কখনো মনঃকষ্টের কোনো ঘটনা ঘটাত, নিজেরাই তা শুধরে নিতেন ত্বরিত। অনুশোচনায় একেকজন এমন দগ্ধ হতেন, চোখের জলে খোদার করুণা কামনা করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতেন।

রাসুল যখন আয়েশার ঘরে মৃত্যুশয্যায় ভীষণ যাতনা ভোগ করছিলেন, তখন অন্য স্ত্রীদের সঙ্গে সাফিয়্যাও তাঁর পাশে বসে কাঁদছিলেন। কেঁদে কেঁদে বলছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি যে কষ্ট ভোগ করছেন, সে কষ্ট যদি আমার হয়ে যেত...।' এ কথায় অন্য উম্মুল মুমিনিনগণ তাঁর দিকে বাঁকা চোখে তাকাতে লাগলেন এবং নিজেদের মধ্যে কানাঘুষা শুরু করলেন। স্ত্রীদের কানাঘুষা রাসুলের কান এড়াল না। তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমাদের মুখ পবিত্র করা উচিত।'

রাসুলের এমন সতর্কবাণী শুনে স্ত্রীরা ভয় পেয়ে বলে উঠলেন, 'কেন, হে আল্লাহর রাসুল!'

www.pathagar.com

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা তোমাদের বান্ধবীর ব্যাপারে কানাঘুষা করছ। আল্লাহর কসম! সে তা হৃদয়ের যাতনা থেকেই বলেছে।'

রাসুল জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও স্বজনহীন সাফিয়্যার জন্য নিজের ভালোবাসা দেখিয়ে গেছেন। যিনি পিতা-মাতা, ভাই-স্বামীহীন হয়ে শুধু রাসুলের ভালোবাসার মায়াডোর গলায় পরে মদিনায় এসেছিলেন, রাসুল কখনো তাঁর সে ভালোবাসার অবমূল্যায়ন করেননি। ভালোবাসার কোমলতায় ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন তাঁর স্বজনহীনতার কষ্ট। নিঃস্ব সাফিয়্যাকে রাসুল কখনো নিঃসঙ্গ হতে দেননি।

উম্মুল মুমিনিন সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা কুরআন পাঠ করতে ভালোবাসতেন। দিনের অধিকাংশ সময় তিনি কুরআন পাঠে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন। রাসুলের ইন্তেকালের পর অন্যান্য উম্মুল মুমিনিনের মতো তিনিও নিজেকে ইবাদত ও জিকিরে নিবৃত করে ফেলেন। গভীর ধ্যান ও মনোযোগের সঙ্গে তিনি কুরআন পাঠ করতেন। তাঁর কুরআন পাঠের মগ্নতায় অভিভূত হয়ে আরবের নারীরা তাঁর কাছে এসে কুরআন শুনত।

দান-সদকাতেও তিনি উদারহস্ত ছিলেন। রাসুল-পরবর্তী সময়ে খেলাফত থেকে যে ভাতা পেতেন, তার অধিকাংশই তিনি গরিব-দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। এ ছাড়া খায়বারে তাঁর যে সম্পত্তি ছিল, সেসবেরও সিংহভাগ তিনি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন।

তিনি সর্বমোট ১০টি হাদিস বর্ণনা করেন। বুখারি ও মুসলিম শরিফে একাত্মভাবে তাঁর একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

রাসুলের ভালোবাসায় ধন্য প্রেমময়ী নারী উম্মুল মুমিনিন সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই রাদিয়াল্লাহু আনহা ৫০ হিজরি সনে খলিফা মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের সময়কালে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকিতে সমাহিত করা হয়।

www.pathagar.com

এক নজরে

জন্ম: ৬১০ খ্রিষ্টাব্দ।

বিয়ে: বিয়ের সময় সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স ছিল ১৭/১৮ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ৫৮/৫৯।

বিবাহ: ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক সপ্তম হিজরির সফর মাস।

দাম্পত্যজীবন: রাসুলের সাথে তাঁর দাম্পত্যকাল ৪ বছর।

মৃত্যু: ৬৭০/৬৭২ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৫০/৫২ হিজরি।

দাফন: মদিনার জান্নাতুল বাকিতে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর।

www.pathagar.com

উম্মুল মুমিনিন
মায়মুনা বিনতে হারিস অধ্যায়
রাদিয়াল্লাহু আনহা

এক

সপ্তম হিজরি সনের জিলকদ মাসের শেষ সপ্তাহ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাজার সাহাবিকে নিয়ে মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য–বছরখানেক আগে হজ পালনের নিমিত্তে মক্কা যাত্রার সময় হোদায়বিয়ায় মক্কার কুরাইশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন এবং চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে হজ না করেই মদিনায় ফিরে আসেন; এ বছর সেই অসম্পাদিত হজ ও উমরাহ (উমরাতুল কাজা) আদায় করতে যাওয়া।

মক্কায় যাওয়ার পথিমধ্যে রাসুল আবওয়া নামক স্থানে খণ্ডকালীন যাত্রাবিরতি করলেন। এ স্থানটি রাসুলের জন্য সীমাহীন বেদনার এক স্থান। আজ থেকে প্রায় ৫৪ বছর আগে এখানেই রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর মা আমিনাকে হারান। মদিনার পিতৃগৃহ থেকে মক্কায় স্বামীগৃহে যাওয়ার পথে তিনি এখানে ইন্তেকাল করেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর মায়ের কবরের পাশে গিয়ে বসলেন। তাঁর চোখ অশ্রুসজল। তিনি হাত দিয়ে মায়ের কবরের মাটি স্পর্শ করে বোবাকান্নায় ভেঙে পড়লেন। সাহাবিরা রাসুলের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের চোখও অশ্রুতে ভরে গেল। রাসুলের বেদনার নোনাজল তাঁদের হৃদয় ভিজিয়ে দিল।

একজন নিঃস্ব এতিম হয়ে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন, জীবনের নানা বাঁকে তিনি অনেক আঘাত সয়েছেন, অনেক বেদনা তাঁকে বিদ্ধ করেছে; কিন্তু মা হারানোর বেদনা মনের গভীরে তিনি একা সয়েছেন। এই বেদনা পৃথিবীর কেউ

www.pathagar.com

কোনো দিন জানতে পারেনি। তাঁর একান্ত স্ত্রীদেরও কোনো দিন বুঝতে দেননি তাঁর নিঃস্বতার একাকী কষ্ট। কিন্তু আজ মায়ের কবরের পাশে বসে নিজের অবদমিত আবেগকে কোনোভাবেই বাধা দিয়ে রাখতে পারলেন না। হু হু করে বুক উজাড় করে কান্না চলে এল।

আবওয়ায় মায়ের কবর জিয়ারত শেষে রাসুল আবার মক্কার পথে রওনা হলেন।

মক্কার কুরাইশদের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা তিন দিন। মক্কায় প্রবেশ করে তিন দিনের মধ্যে উমরার কার্যাদি শেষ করে আবার মদিনার পথে ফিরে যেতে হবে। এ তিন দিন কুরাইশরা মক্কায় তাদের ঘর-বাড়িতে থাকবে না। বসতি ছেড়ে তারা পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে চলে যাবে। সাহাবিরা উমরা সম্পাদন শেষ করলে তারা আবার তাদের আবাসে ফিরে আসবে।

হোদায়বিয়ার সন্ধি যখন সম্পাদিত হয়, তখন এসব শর্ত সন্ধিপত্রে লেখা হয়েছিল। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মুসলিমরা শহরে ঢোকার আগেই মক্কার লোকজন কাবার চারপাশের বসতি ছেড়ে পাশের পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিল। রাসুল তাঁর সাহাবিদের নিয়ে হজের কার্যাদি সম্পন্ন করা শুরু করলেন।

কুরাইশরা পাহাড় থেকে রাসুলের দুই হাজার সাহাবির তাওয়াফ দেখতে লাগল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের আগেই বলে দিয়েছিলেন, তাঁরা যেন বীরদর্পে মক্কায় প্রবেশ করেন। কোনো ভয় বা শঙ্কা যেন না থাকে তাঁদের আগমনী ব্রতপালনে।

পাহাড়ের ওপর থেকে কুরাইশরা সাহাবিদের বীরত্বপূর্ণ চলাফেরা দেখে ভাবতে লাগল–সেই দুর্বল গুটিকয়েক মুসলিম এখন আর দুর্বল নেই। তারা এখন শক্তিমত্তায় ভরপুর সুশৃঙ্খল এক জাতিগোষ্ঠী। মুহাম্মদও এখন আর একাকী নয়, তার কথায় হাসতে হাসতে জীবন দিতে তৈরি হয়েছে নির্ভীক এক সেনাদল।

দুই

মক্কার পার্শ্ববর্তী পাহাড় থেকে এক নারীও দেখছিলেন রাসুলের ঐকান্তিক উমরা পালন। এ নারীর নাম বাররা বিনতে হারিস। বয়স ৩৬। দু-দুবার বৈধব্যের যাতনা নিষ্পেষিত করেছে তাঁকে। নবুওয়াতের প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের কারণে প্রথম স্বামী মাসউদ ইবনে আমর আস-

www.pathagar.com

সাকাফির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। পরে বিয়ে করেন আবু রুহুম ইবনে আবদুল উজ্জাকে। কয়েক বছর পর আবু রুহুমও মৃত্যুবরণ করেন।

বিধবা বাররা বিনতে হারিস আগে থেকে রাসুলকে চিনতেন, বেশ ভালোভাবে চিনতেন। রাসুলের পূর্ববর্তী স্ত্রী জয়নব বিনতে খোজায়মা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন তাঁর নিকটাত্মীয়। দুজন একই গোত্রের মেয়ে। তা ছাড়া তাঁর তিন বোনের বিয়ে হয়েছিল রাসুলের ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে। রাসুলের চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বিয়ে করেন তাঁর বড় বোন উম্মে ফজলকে, যিনি নারীদের মধ্যে খাদিজার পরই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর দুই সৎবোন (মাতা এক, পিতা ভিন্ন) আসমা বিনতে উমায়েসকে বিয়ে করেন রাসুলের চাচাতো ভাই জাফর ইবনে আবু তালিব এবং অপর বোন সালমা বিনতে উমায়েস ছিলেন রাসুলের অপর চাচা উহুদের বীরশহিদ হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী। তাঁরা সবাই ইসলামে বিভাসিত হয়েছিলেন।

মক্কায় সেদিন রাসুলকে হজ পালন করতে দেখে বাররা বিনতে হারিসের দুই চোখে লেগে গেল প্রেমের অন্য এক মায়া। রাসুলকে যতবার দেখছিলেন ততই তাঁর মনের মধ্যে অপরিমেয় এক ঢেউ খেলে যাচ্ছিল।

হজ পালনের শেষ দিন। হজযাত্রীদের সঙ্গে আসা বাররা বিনতে হারিসের ভগ্নিপতি আব্বাস রাদিয়াল্লাহু মক্কায় তাঁর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে পাহাড়ের অস্থায়ী তাঁবুতে এসেছিলেন। কথায় কথায় রাসুলের প্রতি শ্যালিকা বাররার হৃদয় ও চোখের মুগ্ধতা তাঁর নজর এড়াল না। আব্বাসের স্ত্রী উম্মে ফজলও বোনের সঙ্গে আলাপ করলেন বিষয়টি নিয়ে।

কিছুক্ষণ পর আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এলেন রাসুলের কাছে। তাঁর কাছে নিজের শ্যালিকা বাররা বিনতে হারিসের বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম চাচার আনীত প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারলেন না। তিনি বিয়েতে সম্মতি দিলেন।

রাসুলের পক্ষ থেকে তখনই একজন বার্তাবাহক গেল বাররার কাছে। বাররাকে গিয়ে বলল–আল্লাহর রাসুল আপনাকে বিয়ে করতে আগ্রহী। বাররা এ সময় একটি উটে আরোহিত ছিলেন। তিনি উটের ওপর থেকেই জবাব দিলেন, 'এ উট এবং উটের বাহক দুজনই আল্লাহর রাসুলের জন্য উৎসর্গিত।'

চমৎকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সম্মতি। বাররা প্রস্তাব গ্রহণ করার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আর দেরি করতে রাজি ছিলেন না। তিন দিনের বেঁধে

www.pathagar.com

*দেওয়া সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে বাররার সম্মতি পাওয়ার পর বিয়ে উপলক্ষে তিনি একটি ভোজের আয়োজন করতে চাচ্ছিলেন। এমন সময় মক্কার কুরাইশদের পক্ষ থেকে হোয়াইসিব ইবনে আবদুল উজ্জা এসে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জানালেন, 'আপনাদের সময় শেষ, এবার আপনাদের চলে যেতে হবে।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, 'আমি আমার বিয়ের একটি ভোজের আয়োজন করতে চাচ্ছিলাম, যেখানে তোমাদেরও দাওয়াত করা হবে।'

ইবনে আবদুল উজ্জা জানালেন, 'আমরা আপনার দাওয়াত খেতে ইচ্ছুক নই, আপনি যেতে পারেন।'

এরপর ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে আর কোনো কথা চলে না। রাসুল তাঁর অনুসারীদের মক্কা খালি করার নির্দেশ দিয়ে তাঁর ক্রীতদাস আবু রাফেকে পাঠিয়ে দিলেন নববধূ বাররাকে নিয়ে আসার জন্য। রাসুল সাহাবিদের নিয়ে মদিনার পথে যাত্রা শুরু করলেন।

এ সময় একটি বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটল। উহুদ যুদ্ধে শহিদ হওয়া রাসুলের পিতৃব্য বীর হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছোট মেয়ে উমামা 'চাচা চাচা' বলে আলি এবং আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার পেছনে পেছনে দৌড়ে আসতে লাগল। আলি তাকে কোলে তুলে নিলেন। সে বায়না ধরল, সেও তাঁদের সঙ্গে মদিনায় চলে যাবে।

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে কোলে করে রাসুলের কাছে চলে এলেন। রাসুলের কাছে এলে আলি, জায়েদ ও জাফর সবাই হামজা-কন্যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করতে চাইলেন। সবাই দাবি করছিলেন, হামজার মেয়েকে লালন-পালনের অধিক হকদার সে-ই। অবশেষে রাসুল হামজা-কন্যাকে জাফরের হাতেই তুলে দিলেন। জাফরের সহধর্মিণী আসমা বিনতে উমায়েস ছিলেন উমামার খালা। সে হিসেবে তিনিই সবচেয়ে কাছের নিকটজন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে বের হয়ে প্রায় ১০ মাইল দূরবর্তী সারাফ নামক স্থানে গিয়ে যাত্রাবিরতি করলেন। কিছুক্ষণ পর রাসুলের ক্রীতদাস আবু রাফে বাররা বিনতে হারিসকে নিয়ে রাসুলের কাফেলার সঙ্গে মিলিত হলেন। এখানে রাসুল ও বাররা বিনতে হারিসের শুভ পরিণয় সম্পাদিত হলো এবং এ নবদম্পতি এখানে রাত্রিযাপন করলেন। এ বিয়ের মোহর ছিল ৫০০ দিরহাম, যেমনটি সাধারণত রাসুলের অন্য সব স্ত্রীর বেলায় হত।

www.pathagar.com

রাসুলের একটি অভ্যাস ছিল, প্রিয়জন কারও নাম পছন্দ না হলে তিনি তাঁর ইসলামসম্মত নতুন নাম রেখে দিতেন। নববধূর 'বাররা' নামটিও তাঁর পছন্দ হলো না। তিনি তাঁর নাম রাখলেন মায়মুনা। উম্মুল মুমিনিন মায়মুনা বিনতে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহা। যার অর্থ সৌভাগ্যের পরশমণি। এর কারণ হলো, তাঁর চার বোনের সবাই রাসুলের প্রিয় ব্যক্তিদের সঙ্গে বিবাহবদ্ধ ছিলেন এবং সকলেই সাচ্চা মুসলিম ছিলেন। রাসুল তাঁদের চার বোনকে একত্রে 'বিশ্বাসী চতুষ্টয়া বোন' বলে সম্বোধন করতেন।

এ বিয়ের তিনটি পরোক্ষ কারণ ছিল।

এক. উম্মুল মুমিনিন মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার বংশ মক্কার বনু হেলাল তখনো ইসলামের ছায়াতলে আসেনি। এ বিয়ে ছিল বনু হেলালের সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক জোরদার করার অন্যতম উপায়।

দুই. মায়মুনা যেহেতু মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আত্মীয় ছিলেন, তাঁকে বিয়ে করায় মক্কার সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের বিষয়টি সামনে চলে আসে। একই সঙ্গে রাসুলের পিতৃব্য আব্বাস ইবনে মুত্তালিবসহ অন্য আত্মীয়দের মনোতুষ্টির বিষয়ও ছিল।

তিন. মায়মুনাকে বিয়ে করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, তোমাদের শহরে এসে তোমাদের মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে গেলাম। তিনি মক্কার মানুষদের চেয়ে তাঁর অবস্থানকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার প্রয়াস করেছিলেন। এটা ছিল একধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিজয়। আরবের লোকজন তাদের কন্যা শত্রুর হাতে চলে যাওয়াকে নিজেদের পরাজয় বলে ভাবত।

মদিনায় পৌঁছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর অন্য স্ত্রীদের মতো উম্মুল মুমিনিন মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার জন্যও মসজিদে নববি-সংলগ্ন মহল্লায় একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দিলেন। অধিকাংশ সিরাত রচয়িতা এবং ঐতিহাসিক একমত যে, মায়মুনাকে বিয়ে করার পর রাসুল আর কোনো নারীকে বিয়ে করেননি। কিন্তু সবার পরে তিনি রাসুলের ঘরনি হলেও রাসুল কখনো তাঁর প্রতি কোনো প্রকার অসমতা দেখাননি। বরং অন্য সবার মতো তাঁকেও সমানভাবে ভালোবাসতেন এবং পালা বণ্টনের বেলায়ও তাঁর অধিকার অন্য সবার সমান ছিল।

www.pathagar.com

রাসুলের প্রতি উম্মুল মুমিনিন মায়মুনার ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম এবং সম্মানের। রাসুলের ঘরনি হয়ে যে সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, তিনি সব সময় এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন।

একদিন মায়মুনার ঘরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এলেন। তাঁর সঙ্গে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, ফজল ইবনে আব্বাস এবং অন্য এক মহিলা ছিলেন। মায়মুনা সবার জন্য খাবার পরিবেশন করলেন। খাবারের মধ্যে কোনো একটা প্রাণীর মাংস ছিল। রাসুল জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কিসের মাংস?'

মায়মুনা উত্তর দিলেন, 'এটা গিরগিটির মাংস।' আরবের মরুতে একধরনের গিরগিটি পাওয়া যেত, যেগুলো বেশ মাংসল হতো এবং আরবে এগুলো খাওয়ার প্রচলন ছিল।

গিরগিটির কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত গুটিয়ে নিয়ে বললেন, 'এ প্রাণীর মাংস আমি আগে কখনো খাইনি। এগুলোর মাংস খেতে আমি পছন্দ করি না।' রাসুলের অসম্মতি দেখে অন্যরা মনে করলেন, সম্ভবত এগুলো খাওয়া হারাম। কিন্তু সবাইকে আশ্বস্ত করে তিনি বললেন, 'তবে তোমরা খেতে পারো, তোমাদের খেতে কোনো বাধা নেই।'

রাসুলের কথায় আশ্বস্ত হয়ে খালিদ, ফজল ও ঘরে উপস্থিত মহিলা তা খাওয়া শুরু করলেন। তবে মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা সে মাংস খাওয়া থেকে বিরত রইলেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসুল যে প্রাণীর মাংস খান না, আমিও সে মাংস খাব না।'

রাসুল হয়তো কখনো এ প্রাণীগুলোর মাংস খাননি, তাই এগুলো খেতে তাঁর অস্বস্তি ছিল। মায়মুনা হয়তো আগেও এ প্রাণীর মাংস খেতেন, কিন্তু রাসুলের অপছন্দকে তিনি নিজের অপছন্দের কারণ বানিয়ে নিলেন। এ কেবল দুজন মানুষের মাঝে অপরিমেয় ভালোবাসা থাকলেই সম্ভব। একজন মানুষ যখন তার অপর সঙ্গীর পছন্দ-অপছন্দকে নিজের সৌভাগ্যের ললাটলিখন করে নেয়, তখন এ ভালোবাসা জাগতিক সকল ক্ষুদ্রতা ও পরিসীমাকে ছাড়িয়ে যায়। এমন ভালোবাসার জন্যই যুগে যুগে রচিত হয়েছে অসংখ্য মহাকাব্য।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন জীবনের অন্তিম মুহূর্তে চলে এসেছিলেন, তখন আয়েশার ঘরে যাওয়ার আগে তিনি মায়মুনার ঘরে ছিলেন। রাসুলের মনোবাসনা বুঝতে পেরে তিনি অন্য উম্মুল মুমিনিনদের সহায়তায় রাসুলকে আয়েশার ঘরে শয্যা পেতে দেন। এটা তাঁর চারিত্রিক বদান্যতা এবং রাসুলের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

www.pathagar.com

তিন

রাসুলের ইন্তেকালের পর অন্য উম্মুল মুমিনিনদের মতো তিনিও আরবের মানুষদের ধর্মীয় বিষয়াদি শিক্ষা দিতেন। খোদাভীতি এবং ইবাদতের আধিক্য তাঁকে অনন্য উচ্চতায় উচ্চকিত করেছিল। প্রজ্ঞা ও জ্ঞানে তিনি উল্লেখ করার মতো ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বিশিষ্ট হাদিস বর্ণনাকারী এবং ধর্মজ্ঞ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তাঁর একান্ত ছাত্র। ইবনে আব্বাস যেহেতু তাঁর ভাগনে ছিলেন, এ কারণে রাসুলের জীবনের অনেক ছায়াছবি তিনি উম্মুল মুমিনিন মায়মুনার মুখ থেকে সরাসরি শুনতে পেতেন।

একদিন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস উষ্কখুষ্ক চুল নিয়ে মায়মুনার ঘরে এলেন। তাঁকে দেখে মায়মুনা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমার স্ত্রী সাধারণত আমার চুল পরিপাটি করে দেয়। কিন্তু বর্তমানে সে ঋতুমতী হওয়ায় বেশ কয়েক দিন ধরে চুলের যত্ন নিতে পারেনি।'

মায়মুনা ভাগনের কথায় বুঝতে পারলেন, স্ত্রী ঋতুমতী হওয়ার কারণে সে স্ত্রীর কাছাকাছি হওয়াকে অবজ্ঞা জ্ঞান করছে। তিনি কিছুটা রাগতস্বরেই বললেন, 'কোনো নারী ঋতুমতী হলে তার হাতও কি অপবিত্র হয়ে যায়?' এরপর তিনি রাসুলের জীবনের জীবন্ত ছায়াছবি তুলে ধরলেন এ ফকিহ সাহাবির সামনে, 'আমরা যখন ঋতুমতী অবস্থায় থাকতাম, তখনো আল্লাহর রাসুল আমাদের কোলে মাথা রেখে শুতেন এবং কুরআন তেলাওয়াত করতেন।'

ইবনে আব্বাসের মতো হাদিস বর্ণনাকারী এবং ধর্মপণ্ডিত সাহাবিকেও ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানদানে পিছপা হতেন না তিনি। বস্তুত উম্মুল মুমিনিনদের সবাই ছিলেন রাসুলের জীবনের টুকরো টুকরো আয়না। যে আয়নায় তাকালে রাসুলের জীবনের ছায়াছবি স্বচ্ছ হয়ে ভেসে উঠত। তাঁরা তাঁর আলোকেই নিজেদের জীবনকে সাজিয়ে তুলেছিলেন এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য উৎসর্গ করছিলেন তাঁদের লব্ধ জ্ঞানের আধার।

৫১ হিজরি। উম্মুল মুমিনিন মায়মুনা বিনতে হারিস মক্কায় মৃত্যুশয্যায় উপনীত। রাসুলের পরলোকগমনের পর চলে গেছে প্রায় ২০টি বছর। ২০টি বছর রাসুলের বিরহযাতনা সয়েছেন নিভৃতে। রাসুলের স্মৃতিচিহ্ন বুকে ধারণ করে কাটিয়ে দিয়েছেন নিরালা দিনগুলো। আজ সময় এসেছে এ নশ্বর ধরণির সকল মায়া ত্যাগ করে আবার রাসুলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার।

মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তিনি ইয়াজিদ ইবনে আল-আসামকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে বললেন, 'আমাকে মক্কার বাইরে নিয়ে চলো। আল্লাহর রাসুল আমাকে

www.pathagar.com

বলেছেন, আমার মৃত্যু সেখানে হবে, যেখানে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম রাত্রিযাপন হয়েছিল।'

ইয়াজিদ ইবনে আল-আসাম এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাঁকে মক্কার ১০ মাইল দূরবর্তী স্থান সারাফে নিয়ে গেলেন, যেখানে রাসুলের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর তাঁদের প্রথম মোলাকাত হয়েছিল। তিনি আজীবন কামনা করতেন–রাসুলের সঙ্গে প্রথম মোলাকাতের স্থানে যেন তাঁর মৃত্যু হয় এবং সেখানে যেন তাঁকে সমাহিত করা হয়।

আল্লাহর রাসুলের ভালোবাসায় জীবন বিলিয়ে দেওয়া এই অতুল্য নারী কিছু সময় পর সারাফে ইন্তেকাল করেন। যেখানে তিনি প্রথম মিলিত হয়েছিলেন রাসুলের সঙ্গে, সেখান থেকে তিনি ঊর্ধ্বাকাশে রাসুলের সঙ্গে ফের মিলিত হওয়ার নতুন যাত্রা শুরু করলেন।

তাঁর ভাগনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জানাজার নামাজ পড়ান। তিনি নিজে উম্মুল মুমিনিনের জানাজার খাট কাঁধে তুলে নেন এবং লাশ বহনকারী অন্যদের বলেন, 'এ মহীয়সী আল্লাহর রাসুলের সহধর্মিণী ছিলেন। খুব সম্মানের সঙ্গে তাঁকে বহন করো, কোনো প্রকার অসম্মান যেন না হয়।'

উম্মুল মুমিনিনের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে সারাফেই সমাহিত করা হয়।

উম্মুল মুমিনিন মায়মুনা বিনতে হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহা সর্বমোট ৭৬টি হাদিস বর্ণনা করেন। বুখারি ও মুসলিম শরিফে তাঁর বর্ণিত সাতটি হাদিস সন্নিবেশিত হয়েছে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে গ্রন্থিত হয়েছে তাঁর বর্ণিত ৬০টি হাদিস।

এক নজরে

জন্ম: ৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দ।

বিয়ে: বিয়ের সময় মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স ছিল ৩৬ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ৫৯।

বিবাহ: ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক সপ্তম হিজরির জিলকদ মাস।

দাম্পত্যজীবন: রাসুলের সাথে তাঁর দাম্পত্যকাল ৩ বছর।

মৃত্যু: ৫১ হিজরি।

দাফন: মক্কার নিকটবর্তী সারাফে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০/৮১ বছর।

www.pathagar.com

উম্মুল মুমিনিন
মারিয়া কিবতিয়া অধ্যায়
রাদিয়াল্লাহু আনহা

এক

ঊষর মরু পাড়ি দিয়ে আসছিলেন তাঁরা। একজন পুরুষ, দুজন নারী এবং সঙ্গে একজন নপুংসক ক্রীতদাস। নারী দুজন রূপবতী, দীর্ঘ মরুযাত্রা তাঁদের চেহারার লাবণ্য সামান্য ম্লান করতে পারেনি। তাঁদের একজন স্বর্ণকেশী। সোনালি চুলের ছটা তাঁর ঘোমটার প্রান্তদেশ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আছে। লু-হাওয়ায় থেকে থেকে উড়ছিল তাঁর চুলের ডগা। এ স্বর্ণকেশীর নাম মারিয়া। তাঁর সঙ্গে কালোকেশী নারীটির নাম শিরিন।

মারিয়া তাঁর সঙ্গে থাকা পুরুষটির সঙ্গে কথা বলছিলেন। ভিন্ন দেশের লোক হওয়ায় তাঁর আরবি বাচনভঙ্গি লোকটির বাচনভঙ্গি থেকে খানিকটা ভিন্ন, এ কারণে পাশাপাশি দুই উটে থাকা সত্ত্বেও কথা বলতে দুজনেরই খানিকটা বেগ পেতে হচ্ছিল। তবে মারিয়া তাতে দমে যাওয়ার পাত্রী নন, তিনি নিজের বাচনভঙ্গিতেই নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছিলেন তাঁকে।

মারিয়া বলছিলেন, 'আপনাদের ধর্ম তাহলে মূর্তিপূজার অনুমতি দেয় না?'

লোকটি বললেন, 'না, একদমই না। আমরা অদৃশ্য একক খোদার ইবাদত করি। তিনি সবকিছুর স্রষ্টা, এ বিশ্বজাহান তিনিই পরিচালনা করেন। তিনি একাই সবকিছুর নিয়ন্তা, তাঁর কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই। পাথরের তৈরি প্রতিমা কখনো মানুষের ভালো-মন্দের বিধায়ক হতে পারে না।'

মারিয়া আবার প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে আপনারা আপনাদের খোদার উপাসনা করেন কীভাবে?'

www.pathagar.com

লোকটি বিরক্ত হলেন না, উত্তর দিলেন, 'আমরা যে খোদার ইবাদত করি তিনি নিরাকার, তাঁর কোনো আকার নেই। তিনি সর্বত্র বিরাজমান, সকল কিছু তাঁর গোচরে। এ কারণে তাঁকে যেখানে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা ডাকা যায়। তাঁর জন্য আলাদা কোনো অবয়বের প্রয়োজন পড়ে না। হ্যাঁ, প্রাত্যহিক উপাসনা করার জন্য আমাদের আলাদা প্রার্থনাকেন্দ্র রয়েছে, আমরা সেটাকে মসজিদ বলি।'

'আচ্ছা!' মারিয়া বুঝতে পারার ভঙ্গি করে আবার বললেন, 'আপনাদের নবি কেমন মানুষ? তিনি কি অনেক বীরপুরুষ?'

এবার লোকটি হেসে ফেললেন, 'তিনি খুব সাধারণ একজন, কিন্তু তিনি অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর মতো আর কেউ নেই। সারা আরব কেন, সমগ্র পৃথিবীতে তাঁর মতো নিখুঁত ব্যক্তিত্বের দ্বিতীয় কোনো মানুষ নেই। তিনি সবার মতোই, কিন্তু সবার চেয়ে আলাদা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি আমাদের দীক্ষা দিয়েছেন... ।'

মারিয়া ও সঙ্গের লোকটির কথা চলতে লাগল। মারিয়ার অপার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে লোকটি তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে কখনো কসুর করতেন না। সঙ্গের এ পুরুষটির নাম হাতিব ইবনে আবি বালতায়া রাদিয়াল্লাহু আনহু।

ছোট্ট এ কাফেলা আসছিল মিসর থেকে। মিসরের আলেক্সান্দ্রিয়ার বাদশাহ জুরাইজ ইবনে মাতার দরবার থেকে ফিরছেন তাঁরা। গন্তব্য মদিনা। হাতিব ইবনে আবি বালতায়া মদিনার রাষ্ট্রপতি আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন মিসরের বাদশাহর কাছে। ইসলাম গ্রহণের আহ্বান ছিল সে পত্রে। পত্রপাঠ করে মিসরের বর্তমান মুকাওকিস (তৎকালীন মিসরীয় বাদশাহদের উপাধি) জুরাইজ ইবনে মাতা অভিভূত হন। রাষ্ট্রদূত হাতিব ইবনে আবি বালতায়াকে নতুন ধর্ম এবং নবি বিষয়ে বিস্তর প্রশ্ন করেন তিনি। হাতিব তাঁর প্রতিটি প্রশ্নের যোগ্য উত্তর দিয়ে তাঁর মনের দ্বিধা দূর করার চেষ্টা করে যান।

নতুন এ ধর্মের পরিচয় পেয়ে বাদশাহ জুরাইজ যারপরনাই আপ্লুত হন। তিনি সত্যায়ন করেন যে, ইসলাম সত্যধর্ম এবং নবি মুহাম্মদ শেষ নবি। তিনি রাজনৈতিক কারণে ইসলাম গ্রহণে বিরত থাকলেও শেষ নবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক রাষ্ট্রদূত হাতিব ইবনে আবি বালাতায়া মারফত বেশ কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করেন রাসুল সমীপে। সেসব উপঢৌকনের মধ্যে রূপসী

www.pathagar.com

ক্রীতদাসী মারিয়া ও শিরিন নামের এ দুই সহোদরাও ছিলেন। সমগ্র মিসরের সবচেয়ে রূপসীকন্যা বলে তাঁদের সুনাম ছিল মিসরে।

মিসর থেকে মদিনায় যাওয়ার পথে মারিয়া ও শিরিন নতুন দেশ, নতুন ধর্ম এবং নতুন নবি সম্পর্কে তাই কৌতূহলী হয়ে নানা প্রশ্ন করছিলেন রাসুলের সাহাবি হাতিবকে। সাহাবি তাঁদের প্রশ্নগুলোর ঠিকঠাক উত্তর দিচ্ছিলেন। একে তো মেয়ে দুটো রাসুলের জন্য পাঠানো মিসরের বাদশাহর সম্মানীয় উপঢৌকন, অপরদিকে নিজ দেশ ছেড়ে তাঁরা ভিন্ন দেশে পাড়ি জমাচ্ছেন, তাঁদের মন এমনিতেই বিষণ্ন থাকার কথা। তাঁদের বিষণ্নতা দূর করার জন্য হাতিব ইবনে আবি বালাতায়া তাঁদের সঙ্গে সহানুভূতিশীল আচরণ করছিলেন।

এ মরুযাত্রার মাঝেই স্বর্ণকেশী মারিয়া ও কালোকেশী শিরিন ইসলাম সম্পর্কে বেশ জ্ঞানলাভ করেন। ধীরে ধীরে তাঁরা ইসলামের প্রতি দুর্বল হতে থাকেন এবং একপর্যায়ে মদিনায় পৌঁছানোর আগেই হাতিব ইবনে আবি বালতায়ার হাতে ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের ধন্য করেন।

দুই

কাফেলা একসময় মদিনায় এল। এটা সপ্তম হিজরি সনের শুরুর দিকের ঘটনা। রাসুলপ্রেরিত রাষ্ট্রদূত হাতিব ইবনে আবি বালতায়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মিসরের বাদশাহর কাছ থেকে নিয়ে আসা পত্র ও উপহারসামগ্রী রাসুল সমীপে অর্পণ করলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আনন্দচিত্তে পত্র ও উপহার গ্রহণ করলেন। যেহেতু বাদশাহর পাঠানো উপহার, এ কারণে রাসুল কিছু উপহার নিজে গ্রহণ করে বাদবাকি জিনিস সাহাবিদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। ক্রীতদাসী মারিয়াকে নিজের কাছে রেখে শিরিনকে অর্পণ করলেন অনলবর্ষী কবি হাসসান ইবনে সাবিতকে।

মারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নিজের জন্য রাখলেও তাঁর জন্য তখনো কোনো ঘরের ব্যবস্থা করতে পারেননি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। অগত্যা তাঁকে মসজিদে নববির পার্শ্ববর্তী হারিস ইবনে নোমানের বাড়িতে রাখতে হলো। প্রথম কিছুদিন তিনি এখানেই রইলেন।

রাসুলের অন্যান্য স্ত্রী, বিশেষত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রথম দিকে মারিয়াকে খুব একটা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা না করলেও যখন তিনি তাঁর সৌন্দর্যের ব্যাপারে অবগত হলেন, তখন একদিন তাঁকে দেখতে এলেন।

www.pathagar.com

মারিয়াকে দেখার পর তাঁর সৌন্দর্যের ব্যাপারে আয়েশার ঈর্ষান্বিত হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক। তাঁর ফরসা রং এবং কোকড়ানো চুল পুরুষ তো বটেই, যেকোনো নারীকেও মুগ্ধ করত।

রাসুল মারিয়াকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ না করলেও তিনি কখনো তাঁর সঙ্গে দাসীসুলভ আচরণ করেননি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় কিছুদিন পরই। সাহাবি হারিস ইবনে নোমানের বাড়িতে কিছুদিন থাকার পর রাসুল মারিয়ার জন্য আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেন। এটা সাধারণত রাসুল তাঁর অন্য দাসীদের বেলায় করতেন না। কিন্তু মারিয়া যেহেতু বাদশাহর পাঠানো উপহার ছিলেন, এ কারণে তিনি তাঁকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন। এমনকি পালা বণ্টনের ব্যাপারেও রাসুল তাঁর স্ত্রীদের মতো মারিয়ার জন্য আলাদা দিন ধার্য করলেন। এটা অনেক সম্মানের বিষয় ছিল। অন্য উম্মুল মুমিনিনগণ এটা নিয়ে সামান্য কানাঘুষা করলেও রাসুল তাতে কান দিলেন না। দাস-দাসীদের ব্যাপারে ইসলামের উদারনীতি তাঁকে শিখিয়ে যেতে হবে। আরবের জাহেলি যুগের অন্ধকারে দাস-দাসীদের সঙ্গে যেভাবে পশুর মতো ব্যবহার করা হতো, দাসীদের বাজারের পণ্য মনে করা হতো, নীচু মনে করে তাদের মানুষ হিসেবে গ্রহণ করা হতো না; তিনি সেই বোধ ও বিশ্বাস ভেঙে দেওয়ার পয়গাম নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন।

তিন

বেশ কিছুদিন পরের কথা। একদিন মারিয়া ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘুম ভাঙতেই তাঁর প্রবল বমিভাব হলো। মাথা তুলে বসতে পারছেন না। দুনিয়া অন্ধকার হয়ে আসছে। তিনি মাথা ঘুরে বিছানার ওপর পড়ে গেলেন। ঘাবড়ে গেলেন–আমি কি গর্ভবতী হয়ে পড়েছি?

আরও কয়েকটি দিন চলে গেল, তিনি কাউকে কিছু জানালেন না। আরেকটু নিশ্চিত হতে চান। কয়েক দিন নিজেকে পর্যবেক্ষণ করার পর যখন মোটামুটি নিশ্চিত হলেন, তখন তিনি বোন শিরিনকে ডেকে তাঁর অসুস্থতার কথা জানালেন, তিনি সম্ভবত গর্ভবতী।

মারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা মদিনায় এসেছেন তা-ও বছর পেরিয়ে গেছে, এ সময় তিনি গর্ভবতী হলেন। অষ্টম হিজরি সনের শুরুর দিকের ঘটনা। এখন পর্যন্ত তিনি তাঁর গর্ভধারণের কথা গোপন রেখেছেন সবার থেকে, শিরিন বাদে আর কাউকে বলেননি। যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে

www.pathagar.com

এলেন, তখন প্রথম তাঁকে এ সুসংবাদ দিলেন। রাসুল সীমাহীন খুশি হলেন এ সংবাদ শুনে। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার পর তাঁর আর কোনো স্ত্রীর গর্ভে কোনো সন্তান হয়নি, এ নিয়ে তাঁর মনে কিছুটা যাতনা ছিল। কিছুদিন আগে তাঁর প্রিয়তম কন্যা জয়নব ইন্তেকাল করেছেন, সে বেদনাও তাঁকে আহত করে রেখেছিল। মারিয়ার এ সুসংবাদ শুনে নিমেষে তিনি সকল যাতনা ভুলে গেলেন। তিনি প্রাণভরে আল্লাহর কাছে মারিয়ার জন্য দোয়া করলেন।

মারিয়া রাসুলের খুশি দেখে নিজেও খুশি হলেন। যদিও রাসুলের বয়স তখন ষাটের উর্ধ্বে, এ বয়সে পিতা হওয়ার সুসংবাদ অন্য রকম এক অনুভূতি। তবে এ বিষয়টি নিয়ে তরুণী মারিয়া কিছুটা অপ্রস্তুত ছিলেন। রাসুল তাঁকে সপ্রতিভ করতে কুরআনের দুটো আয়াত পাঠ করলেন :

'(নবি জাকারিয়া) বললেন–হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার সন্তান হবে? আমার স্ত্রী বন্ধ্যা আর আমিও বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছি।'

'(সংবাদবাহক ফেরেশতা জাকারিয়াকে) বললেন–এভাবেই হয়। তোমার প্রতিপালক বলেছেন–এটা আমার পক্ষে সহজ। ইতোপূর্বে আমিই তোমাকে সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না।' (সুরা মারইয়াম, আয়াত ৮-৯)

রাসুলের তেলাওয়াত শেষ হতেই মারিয়া তাঁর দুশ্চিন্তা দূর করে ফিক করে হেসে ফেললেন। বললেন, 'কিন্তু আমি তো বৃদ্ধা নারী নই, হে আল্লাহর রাসুল!'

খুব শিগগির মারিয়ার গর্ভধারণের সংবাদ মদিনায় ছড়িয়ে পড়ল। মদিনার আনসারি নারীগণ তাঁকে সম্ভাষণ জানাতে তাঁর ঘরে আসতে লাগলেন। কয়েক দিন পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মারিয়ার জন্য মসজিদে নববি থেকে একটু দূরে আলিয়া নামক স্থানে নতুন বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেন। এ স্থানটা একটু উঁচু এবং পল্লি থেকে একটু বাইরে হওয়ায় বেশ হাওয়া-বাতাস বইত। আরবের প্রথা অনুযায়ী সন্তানসম্ভবা নারীদের মরুর খোলা পরিবেশের আবহে রাখা হতো, যাতে গর্ভস্থিত সন্তান মরুবাতাসে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে।

রাসুল মারিয়ার দেখভালের কোনো কমতি রাখলেন না। শিরিনকেও তিনি মারিয়ার দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখার তাগিদ দিলেন।

দিন যেতে লাগল। মারিয়া নিজের অনাগত সন্তান নিয়ে নানা স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইলেন।

www.pathagar.com

অষ্টম হিজরি সনের জিলহজ মাস। এক রাতে হঠাৎ মারিয়ার প্রসবব্যথা শুরু হলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুক্তদাস আবু রাফে এবং তাঁর স্ত্রী সালমাকে নিয়ে মারিয়ার কাছে এলেন। প্রসবব্যথা প্রবল হলে রাসুল সালমাকে ধাত্রী হিসেবে ঘরে রেখে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

এ সময় অভিনব একটি ঘটনা ঘটল। ফেরেশতা জিবরাইল এসে রাসুলকে এক নতুন সম্ভাষণে সালাম জানালেন, 'আসালামু আলায়কুম হে ইবরাহিমের পিতা!'

জিবরাইলের এমন সম্ভাষণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিমোহিত হলেন। কিছুক্ষণ পর সালমা ঘরের ভেতর থেকে আবু রাফেকে ডাক দিলেন। আবু রাফে কাছে যেতেই তাঁর হাতে তুলে দিলেন এক পুত্রসন্তান। মরুপুষ্পের মতো ফুটফুটে পুত্রসন্তান নিয়ে আবু রাফে রাসুলের সামনে এলেন। রাসুলের চোখ অশ্রুসজল। তিনি অশ্রুত নয়নে নিজের পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন।

পুত্র জন্মের সুসংবাদে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়ে সালামা ও আবু রাফেকে একটি ক্রীতদাস উপহার দেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে মদিনার নারীদের ভিড় লেগে গেল মারিয়ার ঘরে। মারিয়ার কোল ভরে গেল সকলের আশীর্বাদে। নারীরা রাসুলের পুত্রের পালক মাতা হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতে লাগলেন। রাসুলপুত্রের পালক মাতা হওয়া নিঃসন্দেহে সম্মানের বিষয়। অবশেষে এ সৌভাগ্যের অধিকারী হলেন মদিনার উম্মে সাইফ। তাঁর কোলে লালিত-পালিত হতে লাগলেন রাসুলপুত্র ইবরাহিম। পরবর্তী সময়ে রাসুল এ মহিলাকে সাতটি বকরি উপহার দেন।

সন্তান জন্মের সাত দিন পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবু হিন্দকে ডেকে আনলেন। তিনি রাসুলপুত্রের মাথার চুল কামিয়ে দিলেন। কামানো চুল ওজন করে রাসুল সে পরিমাণ রুপা গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দিলেন এবং সন্তানের নাম রাখলেন তাঁর আদি পিতা ইবরাহিমের নামে–ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ।

মারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার পুত্রসন্তান জন্মদানে রাসুলের কোনো কোনো স্ত্রী বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন। বিশেষত আয়েশার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদিন ইবরাহিমকে কোলে নিয়ে আয়েশার ঘরে এলেন। ইবরাহিমকে দেখিয়ে বললেন, 'দেখো তো, সে দেখতে ঠিক আমার মতো হয়েছে না?'

www.pathagar.com

আয়েশা তাচ্ছিল্য করে ইবরাহিমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কই, আমার তো তার আর আপনার মধ্যে কোনো মিল নজরে পড়ছে না।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আয়েশার ঈর্ষার কারণ বুঝতে পারলেন। তিনি আর কিছু না বলে ইবরাহিমকে কোলে নিয়ে আয়েশার ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহাও একবার মারিয়ার ব্যাপারে রাসুলের সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলেছিলেন এবং বেশ একটা বিব্রত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। বিষয়টি এ গ্রন্থেরই হাফসা অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। এ ঘটনার পর রাসুল মারিয়ার সঙ্গে আর সঙ্গমলিপ্ত হবেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

এ ঘটনার পর হাফসা ও আয়েশা যথেষ্ট খুশি হলেও কিছু সময় পর আল্লাহ তাঁর রাসুলের প্রতি সুরা তাহরিম অবতীর্ণ করেন এবং হালাল জিনিসকে হারাম করার ব্যাপারে তাঁকে সতর্ক করেন। কেননা তিনি মারিয়ার সঙ্গে আর কোনো ধরনের শারীরিক সম্পর্কে জড়াবেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু মারিয়া ছিলেন তাঁর জন্য সম্পূর্ণ বৈধ নারী। এভাবে একজন বৈধ নারীকে শারীরিক সংসর্গের ক্ষেত্রে হারাম সাব্যস্ত করায় আল্লাহ রাসুলকে সতর্ক করে আয়াত অবতীর্ণ করেন এবং মারিয়ার মর্যাদা সুউচ্চে তুলে ধরেন। মারিয়ার জন্য এটা ছিল পরম সম্মানের বিষয়। একজন ক্রীতদাসী হলেও স্বয়ং আল্লাহ তাঁর ভালোবাসার নিষ্পাপ অনুভূতির পক্ষ নিয়ে তাঁর উকালতি করেছেন। এর পর থেকে আল্লাহর রাসুল মারিয়াকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিতে কোনো কসুর করেননি।

চার

এসব কিছু সত্ত্বেও ইবরাহিমকে নিয়ে রাসুল ও মারিয়ার দিন কাটছিল বেশ আনন্দে। পুত্র জন্মের আনন্দে রাসুল তাঁর কন্যা হারানোর বেদনা অনেকটা ভুলে গিয়েছিলেন। রাসুল শিশুদের অনেক পছন্দ করতেন। তিনি তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামার সন্তান এবং তাঁর নিজের নাতি-নাতনিদের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসতেন। নিজের সন্তানকেও তিনি বুক উজাড় করে স্নেহ-ভালোবাসায় আচ্ছন্ন করে রাখলেন।

কিন্তু এ খুশির দিন বেশি দিন স্থায়ী হলো না। পুত্র ইবরাহিমের বয়স তখন দেড় বছর, কেবল হাঁটতে শিখেছেন। ছোট ছোট পা দিয়ে রাসুলের দিকে

www.pathagar.com

এগিয়ে আসতেন। মুখে বুলি ফুটতে শুরু করেছিল, বা বা বলে মারিয়ার কোল থেকে রাসুলের কোলে এসে পড়তেন। এ সময় ইবরাহিম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মারিয়া ও তাঁর পালক মাতা উম্মে সাইফ নানা ধরনের ওষুধ-পথ্যের জোগাড় করলেন, কিন্তু কোনোভাবে অসুখ কমছিল না। দিন দিন পুত্র ইবরাহিম নিস্তেজ হয়ে পড়ছিলেন। মারিয়া শিরিনকে ডেকে আনলেন, শিরিনও ইবরাহিমের রোগাক্রান্ত মুখ দেখে ভেঙে পড়লেন। নিজেকে কোনোভাবে প্রবোধ দিতে পারলেন না।

ইবরাহিম মারিয়ার কোলে। তিনি তাঁর ছোট্ট জীবনের শেষ সিঁড়িতে নড়বড়ে পা ফেলছিলেন তখন। তাঁর নিবুনিবু চোখ দিয়ে শেষবার মায়ের কান্নারত মুখটা দেখলেন। মায়ের বেদনা তাঁকেও স্পর্শ করে গেল, মুখে কিছু বলতে পারলেন না। হাত দিয়ে মায়ের অশ্রু স্পর্শ করতে পারলেন না। মা-ছেলে একজন আরেকজনের দিকে নির্বাক চোখে তাকিয়ে রইলেন শুধু। দুজন কথা বলছিলেন চোখের জলে। দুজন বুঝে নিলেন দুজনের বেদনার বোবাকান্না।

একসময় ইবরাহিম রাদিয়াল্লাহু আনহু স্তব্ধ হয়ে গেলেন। শেষ নিশ্বাস বাতাসে মিলিয়ে গেল। তাঁর পেলব ছোট্ট শরীরটা মারিয়ার কোলে নিথর হয়ে গেল হঠাৎ করেই। মারিয়া নাড়িছেঁড়া ধনকে বুকে জড়িয়ে বুক চাপড়ানো কান্নায় আকাশ-বাতাস ভারী করে তুললেন।

রাসুলকে খবর জানানো হলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দেরি না করে ইবরাহিমের পালক মাতা উম্মে সাইফের বাড়িতে এলেন। উম্মে সাইফের স্বামী পেশায় কর্মকার। তিনি হাপরে কাজ করছিলেন বিধায় বাড়ি ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ধোঁয়া সরিয়ে উম্মে সাইফের ঘরে গেলেন। ঘরে গিয়ে মৃত সন্তানকে কোলে তুলে নিলেন। ইবরাহিমের ছোট্ট শরীরটা আজ খুব ভারী মনে হলো তাঁর। নিজ সন্তানের নিঃসাড় দেহ বুঝি এতটা ভারী হয়ে বাজে বুকের মধ্যে।

রাসুল ইবরাহিমের নিথর দেহ কোলে নিয়ে বসে আছেন। বেদনায় ভারী হয়ে আছে তাঁর হৃদয়। মারিয়া ও শিরিনকে কাঁদতে দেখে নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না, আপনা থেকেই চোখ জলে ভরে গেল। কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ইবরাহিমের নিথর গালে। মৃত সন্তানকে বুকে চেপে ধরে বলতে লাগলেন, 'আমার বেটা, আল্লাহ যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেন, তখন আমরা কিছুই করতে পারি না। আমার চোখে জল, হৃদয় ব্যথায় পূর্ণ। হায়! আমি তোমাকে আমার

www.pathagar.com

বেদনা দেখাতে পারিনি। কিন্তু আমি আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এমন কোনো কথা বলতে পারব না, যাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।'

এরপর তিনি সন্তান হারিয়ে আহাজারি করতে থাকা মারিয়ার দিকে তাকালেন। মারিয়াকে সান্ত্বনা দিলেন, 'ও মারিয়া! ইবরাহিম আমার সন্তান। সে দুধপানের বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। বেহেশতে দুজন ধাত্রী তাকে দুধ পান করাচ্ছে। তুমি শান্ত হও। আল্লাহ এর প্রতিদান তোমাকে দেবেন।'

কিছুক্ষণ পর মদিনার নারীরা ইবরাহিমকে গোসল করিয়ে জানাজার জন্য প্রস্তুত করে দিলেন। সসম্মানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো জানাজার স্থানে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজে জানাজা পড়ালেন। জানাজার পর নিজ সন্তানের কাফনবন্দী লাশ নিজেই কোলে তুলে জান্নাতুল বাকির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

ইবরাহিমের জন্য ছোট একটা কবর খোঁড়া হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং উসমান ইবনে মাজউন কবরে নেমে ইবরাহিমকে মাটির বিছানায় শুইয়ে দিলেন। রাসুল শেষবার একনজর তাকালেন নিজ সন্তানের দিকে। এর চেয়ে বড় কষ্ট আর বুঝি জীবনে পাননি তিনি। ইবরাহিমের কবরে মাটি ভরাট করতে লাগলেন আগত সাহাবিরা। রাসুলের চোখের সামনে ইবরাহিম ঢাকা পড়ে গেলেন শুষ্ক মাটির অতলে।

এদিন ইবরাহিমকে দাফন করার কিছুক্ষণ পর মদিনায় সূর্যগ্রহণ শুরু হয়। সাহাবিরা ভীত হয়ে রাসুলের সামনে উপস্থিত হতে থাকেন। অনেকে বলাবলি শুরু করেন–ইবরাহিমের মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। রাসুল লোকজনের কথা শুনছিলেন। যদিও তাঁর অন্তর ব্যথায় পূর্ণ, কথা বলার মতো অবস্থায় তিনি নেই, তবু মানুষের ভুল বিশ্বাসকে তিনি স্থায়িত্ব দিতে পারেন না। তিনি মসজিদে নববির সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, 'চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর দুটো সৃষ্টি। সেগুলোতে কারও জন্ম বা মৃত্যুতে গ্রহণ লাগে না। যখন তোমরা এমন গ্রহণ দেখবে, তখন আল্লাহর কাছে মাগফেরাত কামনা করো এবং প্রার্থনা করতে থাকো।'

এ ঘটনার এক বছর পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে মহান প্রভুর কাছে চলে গেলেন। মারিয়া এত দিন পুত্রশোকে কাতর ছিলেন, আজ রাসুলের তিরোধানে নিঃস্ব হয়ে গেলেন। সুদূর আলেক্সান্দ্রিয়া

www.pathagar.com

থেকে পরিবার-স্বজন সব ছেড়ে চলে এসেছিলেন এই মরুর বালিয়াড়ি মদিনায়। রাসুলের ভালোবাসা তাঁর সকল নিঃসঙ্গতা দূর করে দিয়েছিল। মায়ের মমতা, বাবার স্নেহ আর ভাইবোনের ভালোবাসা তিনি সব খুঁজে পেয়েছিলেন রাসুলের মাঝে। সন্তান তাঁর হৃদয় ভরিয়ে তুলেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাঁর থেকে সন্তানকে নিয়ে নিলেন, রাসুলও চলে গেলেন তাঁকে ছেড়ে। মদিনা তাঁর কাছে দিন দিন অসহ্য এক বিরানভূমি মনে হতে লাগল। পুত্রশোক, নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব তাঁকে কুরে কুরে লীন করে দিচ্ছিল। বুকের ভেতর চোরা বেদনা ধীরে ধীরে তাঁকে নিঃশেষ করতে লাগল। প্রায়ই তাঁকে দেখা যেত ইবরাহিমের কবরের পাশে বসে একা একা কাঁদছেন। কখনো রাসুলের রওজা পাশে রোনাজারি করছেন। সবকিছুর আড়ালে তিনি নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছিলেন।

রাসুলের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর ১৬ হিজরি সনের মুহররম মাসে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে মিসরের সুন্দরীতমা মারিয়া কিবতিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। শেষ সফরের যাত্রী এ সুন্দরী দুলহানের বিদায়যাত্রায় সামান্যতম ত্রুটি করলেন না খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব। তিনি সমগ্র মদিনাবাসীকে মারিয়ার জানাজায় একত্র হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সকলকে নিয়ে তিনি নিজে মারিয়ার জানাজা পড়ালেন এবং তিনি নিজ হাতে তাঁকে কবরে শুইয়ে দিলেন।

জান্নাতুল বাকির কঠিন মৃত্তিকাপাষাণে শুয়ে আছেন রাসুলের প্রিয়তমা উম্মুল মুমিনিন মারিয়া কিবতিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা।

চার

রাসুলের মৃত্যুর পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জন্য সমপরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করেন, যা অন্য উম্মুল মুমিনিনদের দেওয়া হতো। উমর তাঁর খেলাফতের সময়ও এ সুবিধা অব্যাহত রাখেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মারিয়ার ব্যাপারে সব সময় যত্নবান ছিলেন। তিনি যখন মারিয়ার ঘরের সামনে গিয়ে কথা বলতেন, তখন অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে কথা বলতেন। তাঁর সামান্য সুবিধা-অসুবিধার প্রতি তাঁর ছিল সতর্ক খেয়াল। কখনো তাঁকে সামান্যতম অসম্মান করতেন না।

মারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুলের মুক্তদাসী হওয়ার সুবাদে মিসরের সঙ্গে মুসলিমদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় হয়েছিল। শুধু তাঁর মাতৃভূমি হওয়ার কারণে সাহাবিরা মিসরকে অন্য রকম সম্মানের চোখে দেখতেন। স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলে গিয়েছিলেন, 'তোমরা মিসরবাসীর সঙ্গে ভালো আচরণ করো, কেননা তাদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এ আত্মীয়তা হয়েছে ইসমাইলের মা হাজেরা ও ইবরাহিমের মা মারিয়ার মাধ্যমে।'

বিখ্যাত বীর সাহাবি উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু মিসর জয় করার পর সেখানকার লোকজনকে জিজ্ঞেস করেন 'হাফান' এলাকাটি কোথায়। হাফান এলাকায় ছিল মারিয়ার বাড়ি। লোকজন তাঁকে হাফানে নিয়ে গেলে তিনি সেখানে মারিয়ার পিতার পুরোনো বাড়ি দেখতে পান এবং পরবর্তী সময়ে সেখানে একটি দৃষ্টিনন্দন মসজিদ নির্মাণ করেন।

রাসুলদৌহিত্র হোসাইন ইবনে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিবাদের একপর্যায়ে যখন মিসর নিয়ে কথা ওঠে, তখন হোসাইন বলেন, হাফান এলাকার লোকজন থেকে কর নেওয়া যাবে না। কেননা সেখানে রাসুলপুত্র ইবরাহিমের মামারা এখনো বসবাস করেন। অর্থাৎ, মারিয়ার ভাইয়েরা সে অঞ্চলে বসবাস করেন বিধায় সে অঞ্চলের খাজনা মওকুফ করার দাবি জানান তিনি।

রাসুলের ভালোবাসায় সিক্ত মারিয়া কিবতিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার আত্মত্যাগ এই পৃথিবীর নারীদের জন্য মাইলফলক তৈরি করুক।

এক নজরে

জন্ম: অজ্ঞাত।
বিয়ে: মদিনায় আগমনের সময় মারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স ছিল ১৮/২০ (সুনির্দিষ্ট নয়) এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ৫৭।
অবস্থান: রাসুলের সাথে তাঁর অবস্থানকালীন সময় ৫ বছর।
মৃত্যু: ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৬ হিজরি সনের মুহররম মাস।
দাফন: মদিনার জান্নাতুল বাকিতে।

www.pathagar.com

উম্মুল মুমিনিন
রায়হানা বিনতে জায়েদ অধ্যায়
রাদিয়াল্লাহু আনহা

এক

বনু কুরায়জার অভিযানে যুদ্ধ হলো না। কুরায়জা গোত্রের দুর্গ কয়েক দিন অবরোধ করে রাখার পর ইহুদিরা অস্ত্রসমর্পণ করল। কিন্তু এতে তাদের অপরাধের ক্ষমা হলো না। সাহাবিদের পরামর্শ অনুযায়ী কুরায়জা গোত্রের সকল সক্ষম পুরুষকে হত্যা করা হলো। এদের সংখ্যা ছয় থেকে সাত শ। বাকি বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের যুদ্ধবন্দী হিসেবে গ্রেপ্তার করা হলো।

এটি ষষ্ঠ হিজরি সনের ঘটনা।

রায়হানা বিনতে জায়েদ এ বন্দীদের মধ্যে ছিলেন। তাঁকে রাসুলের সামনে উপস্থিত করা হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসল্লাম তাঁকে প্রস্তাব দিলেন, 'তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করো, তাহলে তুমি আমার স্ত্রী হিসেবে সম্মানিত হতে পারো।'

কিন্তু রায়হানার মধ্যে তখনো জাত্যাভিমান জাগ্রত ছিল এবং তিনি তাঁর স্বামী হাকামকে যথেষ্ট পরিমাণ ভালোবাসতেন। হাকামকে কুরায়জা অভিযানের পর হত্যা করা হয়। তাঁর হৃদয় তখন ব্যথায় পূর্ণ ছিল। এ কারণে তিনি রাসুলের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি বরং আপনার দাসী হিসেবেই থাকতে পছন্দ করব। এতে আপনার প্রতি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না এবং মুসলিম নারীদের মতো আমি মাথায় হিজাব পরা পছন্দ করি না।'

যদিও স্পর্ধিত উচ্চারণ, তবু রাসুল রায়হানার প্রস্তাব মেনে নিলেন। রায়হানা রাসুলের দাসী হিসেবে মদিনায় আগমন করলেন।

www.pathagar.com

মদিনায় আগমন করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রায়হানাকে উম্মুল মুনজির বিনতে কায়েস নামের এক মহিলার বাড়িতে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন। যেহেতু রায়হানা তখনো ইসলাম গ্রহণ না করে ইহুদি ছিলেন, এ কারণে রাসুল তাঁর ব্যাপারে কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করতেন। এ সময় সালাবা ইবনে শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলের উষ্মা বুঝতে পেরে বিষয়টি সুরাহা করতে এগিয়ে আসেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবিদের নিয়ে বসে ছিলেন। তখন কারও আগমনের শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি সাহাবিদের বললেন, 'নিশ্চয় এ ইবনে শুবার পায়ের আওয়াজ। সে আমাকে রায়হানার ব্যাপারে সুসংবাদ শোনাতে আসছে।'

ইবনে শুবা এসে রাসুলকে জানালেন, রায়হানা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ কথা শুনে রাসুল খুশি হন এবং তিনি পরবর্তী সময়ে রায়হানার কাছে যাতায়াত শুরু করেন। উম্মুল মুনজিরের বাড়িতেই রাসুল ও রায়হানার রাত্রিযাপন হয়।

তবে রায়হানা ইসলাম গ্রহণ করলেও রাসুল তাঁকে বিয়ে করেছিলেন নাকি তিনি দাসী হিসেবেই ছিলেন–এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক তাঁকে রাসুলের মুক্তদাসী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মুক্তদাসী হলেও রাসুল তাঁকে স্ত্রীদের মতো মর্যাদা দিতেন। তাঁর জন্য অন্য স্ত্রীদের মতো আলাদা পালার দিন নির্ধারিত ছিল এবং তিনি তাঁকে আলাদা বাসস্থান দিয়েছিলেন।

রায়হানা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারে ইতিহাস ও সিরাতগ্রন্থগুলোতে আর খুব বেশি কিছু উল্লেখ নেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসল্লাম বিদায় হজ থেকে ফিরে আসার পর দশম হিজরিতে রায়হানা মদিনাতে ইন্তেকাল করেন। রাসুল তাঁর জানাজা পড়ান এবং জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে দাফন করা হয়।

এক নজরে

জন্ম: অজ্ঞাত।

বিয়ে: রাসুলের অবস্থানে আগমনের সময় রায়হানা রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স জানা যায় না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ৫৬।

অবস্থান: রাসুলের সাথে তাঁর অবস্থানকালীন সময় ৪ বছর।

মৃত্যু: ১০ হিজরিতে রাসুলের বিদায় হজের পর।

দাফন: মদিনার জান্নাতুল বাকিতে।

www.pathagar.com

সূত্রগ্রন্থ

আর রাহিকুল মাখতুম
আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপুরি

সিরাত ইবনে হিশাম
আবু মুহাম্মদ আবদুল মালেক ইবনে হিশাম

আল বিদায়া ওয়াননিহায়া
আবুল ফিদা হাফেজ ইবনে কাসির

সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

নবীয়ে রহমত
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী : আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত

আয়েশা রা. : জীবন ও কর্ম
রশীদ হাইলামায : আদম আলী অনূদিত

খাদিজা রা.
রশীদ হাইলামায : আদম আলী অনূদিত

সীরাতে আয়েশা
সুলাইমান নদভি

আসহাবে রাসুলের জীবনকথা
ড. *মোহাম্মদ আবদুল মাবুদ*

হযরত আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা'র নির্বাচিত একশত কাহিনী
আল্লামা শোয়াইব সরওয়ার, অনুবাদ : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

www.pathagar.com

রিজালুন হাওলার রাসুল : রাসুলের স্নেহছায়ায় ধন্য যাঁরা
খালিদ মুহাম্মদ খালিদ : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক অনূদিত

সাহাবিয়্যাতু হাওলার রাসুল
খালিদ মুহাম্মদ খালিদ : কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক অনূদিত

মহিলা সাহাবী রাযি. : জীবন, কর্ম ও অবদান
হাফেজ মাওলানা হাবীবুর রহমান

মহীয়সী নারীদের জীবনকথা
মুফতী আবদুস সালাম নুমানী

সংগ্রামী নারী
মুহাম্মদ নূরুয্যামান

বিশ্ব নবীর ডায়েরী
আল্লামা মাখদূম মুহাম্মাদ হাশেম সিন্ধী : প্রিন্সিপাল মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান অনূদিত

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর এগার জন স্ত্রীর জীবন ও কর্ম
মাওলানা আশেক এলাহি বুলন্দশহরি : মাওলানা মুহাম্মদ রফীকুল্লাহ নেছারাবাদী অনূদিত

নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন
ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা : মাওলানা মাসউদুর রহমান অনূদিত

মহিলা সাহাবী
নিয়াজ ফতেহপুরী : গোলাম সোবহান সিদ্দিকী অনূদিত

মহিলা সাহাবি রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুন্না
তালিবুল হাসেমী : রুহুল আমীন অনূদিত

নবী পরিবারের নারীগণ
মাওলানা মুহাম্মদ মাহযূরা : মুফতী এনামুল হক রায়পুরী অনূদিত

عائشة أم المؤمنين موسوعة علمية عن حياتها وفضلها ومكانتها العلمية وعلاقتها بآل البيت
المؤلف: مجموعة من الباحثين

أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم
محمود المصري أبو عمار

سيرت امهات المومنين
مولانا محمد عبد المعبود

www.pathagar.com

The Mothers of the Believers : Wives of Prophet Muhammad (saw)
Halime Demireşik

Khadija bint Khuwaylid (A.S) : Wife of Prophet Muhammad
Yasin T. al-Jibouri

The Wives of the Prophet Muhammad : Their Strives and Their Lives
Muhammad Fathi Musad

Great Women of Islam : Who were given the good News of Paradise
Mahmood Ahmad Ghadanfar : Translated by Jamila Muhammad Qawi

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নবপ্রকাশ

শুধু বই নয়...

www.pathagar.com

আয়েশার (রা.) সঙ্গে রাসুল মুহাম্মদের (সা.) দাম্পত্যজীবন কি অসুখী ছিল? একজন কেবলই কিশোরী, আরেকজন পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রবল ব্যক্তিত্ববান মানুষ; কেমন ছিল অসম বয়সী এ দুজনের প্রেমময় সংসারের ছায়াছবি? ঝগড়া হতো? খুনসুটি? মান-অভিমানে কান্না হতো?

খাদিজা (রা.) কেন প্রৌঢ়ত্বের দ্বারপ্রান্তে এসে হাত বাড়িয়ে আগলে নিলেন যুবক মুহাম্মদের হাত? মুহাম্মদ (সা.) যেদিন নবি হলেন, ভয়ে কাঁপছিলেন তিনি; খাদিজা কেন তাঁকে বুকে জড়িয়ে বলেছিলেন, 'আপনার কোনো ভয় নেই?'

কেন সুদূর ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান নাজ্জাশির রাজপ্রাসাদে আয়োজন করা হলো মুহাম্মদ (সা.) এবং কুরাইশকন্যা উম্মে হাবিবার বিয়ে? কেন ইহুদি রাজকুমারী সাফিয়্যাকে যুদ্ধদাসী থেকে বরণ করে নিলেন উম্মুল মুমিনিন হিসেবে?

রাসুল মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর ১১ জন স্ত্রীর দাম্পত্যজীবনের অসংখ্য গল্পভাষ্য নিয়ে রচিত ইতিহাস-অনুসন্ধানী লেখক সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর-এর উপাখ্যানগ্রন্থ 'প্রিয়তমা'। একদিকে নিরেট নির্মোহ ইতিহাসের বর্ণিল আয়োজন, আরেক দিকে উম্মুল মুমিনিনদের জীবনের অনালোচিত অধ্যায়ের অভিনব আবিস্কার। অনবদ্য ভাষাশৈলী ও প্রাঞ্জল গদ্যে রাসুলের দাম্পত্যজীবনের পূর্ণ ছায়াছবি উঠে এসেছে এ গ্রন্থে।

e-store:
rokomari.com/noboprokash

নবপ্রকাশ

PRIYOTOMA
By Salahuddin Jahangir
Price: BDT 520.00 | US$ 18.00

ISBN 9789849265597

noboprokash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash | 01974 888441